শাস্ত্র সংশয় নিরসন

(প্রশ্নোত্তরমালা)

শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার
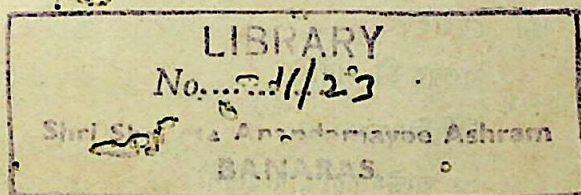
১৩৬০

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবানুকূল্যে—৫, (পাঁচ টাকা মাত্র)

প্রকাশক :
শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ বাটী, পোঃ শাঁকারী, (বর্দ্ধমান)

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভবন
১০৯।১১এ হাজরা রোড, কলিকাতা—২৬

২। শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ বাটী
পোঃ শাঁকারী, (বর্দ্ধমান)

৩। বেঙ্গল অটোটাইপ কোং
২১৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

৪। শ্রীকালিদাস বিশ্বাস
সদ্গুরুসঙ্গ পাব্লিকেসন্স্
১৪ বি ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা—৪

৫। শ্রীতিনকড়ি পাল
নূতনগঞ্জ, বর্দ্ধমান

৬। সেবাইত
ঠাকুরবাড়ী, পুরী

৭। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
৫এ আউধ ঘর্‌বি, বারাণসী

৭। শ্রীনরেশ ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীকুলদানন্দ তাপস আশ্রম
পোঃ কলগং (ভাগলপুর)

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

কাশীধামে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ-প্রতিষ্ঠাতা ও 'মন্দির'-পত্রিকা প্রবর্ত্তক, শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর পরম-কৃপাপাত্র, পরমশ্রদ্ধেয়, শ্রীশ্রীস্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয়ের এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে অভিমত—

[একখানি চিঠির নকল]

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ-মঠ
বারাণসী
১২ই আষাঢ়, ১৩৫১

কল্যাণভাজনেষু—

তোমার নূতন লেখাটি পাইলাম। এদিকে আষাঢ় মাসের কাগজে তোমার শেষ "প্রশ্নোত্তর"টি দিতে না পারিয়া অন্নদা উহা শ্রাবণে দেওয়ার জন্য compose করিয়াছে বলিয়া চিঠি দিয়াছে। কাজেই তোমার এ লেখাটি শ্রাবণে যাইতে পারিল না। 'জাতিভেদ' লেখাটি বেশ হইয়াছে, আমি পড়িয়া দেখিলাম। তোমার সব লেখার মধ্যেই গোঁসাইজীর বাক্য ও চিন্তার ধরণ প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই। একটুও ভুল বা এদিক্ ওদিক্ নাই। আশ্চর্য্য!

কল্যাণ হোক্!
শুভার্থী
দরবেশ

'শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর'-পত্রিকার সহ-সম্পাদক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ,
সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীল কেদারনাথ
ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের অভিমত—

মন্তব্য

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ মহাশয়ের লিখিত ভগবৎ-সেবা ও আর্ত্তসেবা প্রভৃতি সূচীপত্র নির্দ্দিষ্ট ২৮টী প্রবন্ধই আমি ভালভাবে পড়িয়াছি। এই প্রকার প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্র উক্তি সকল বিশ্লেষণ অভাবেই আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য হয়, পরিশেষে উহাতে আমরা শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ি। প্রবন্ধাবলীতে যে সকল বিষয় সন্দেহ উঠাইয়া আলোচিত হইয়াছে সে সন্দেহ অনেকেরই মনে উদয় হয় এবং সমাধান না পাইয়া শাস্ত্রবাক্যে আস্থাহীন হইয়া পড়ে। শ্রীল মজুমদার মহাশয়ের বিশ্লেষণ পরিপাটীও অতীব সুন্দর। সত্য কথা বলিতে কি—ঐ সকল বিষয়ে আমারও সন্দেহ ছিল। যদিও আমি শাস্ত্রবাক্যে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া পড়ি নাই তথাপি দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, বা লোকাতীত চরিত্র বলিয়া, ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের যুক্তি এবং বিশ্লেষণ ও প্রমাণসকলে আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে এবং বুঝিয়াছি বিশ্লেষণ অভাবেই শাস্ত্রবাক্য-সকলে আমরা বিশ্বাসহীন হইতেছি। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে মজুমদার মহাশয়ের বহুদর্শিতার ও জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের চিন্তা ধারা বহুদূর প্রসারিত ও জনকল্যাণ-কামিতায় জড়িত বুঝিতে পারা যায়। প্রবন্ধগুলি ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলে, শাস্ত্র বাক্যে অবিশ্বাসরূপ দুরন্ত ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক ঔষধ ও পথ্য মিলিবে ইহা আমি আশা করি। শ্রীরাসলীলা সম্বন্ধে আমার অনেকেরই নাসিকা কুঞ্চিত করার ভাব আছে, উহা যেন সত্য নমী

অচল। এইসকল জাগতিক ভাব দেখিয়া আক্ষেপেই যেন লেখকের লেখনী পরিচালিত হইয়াছে মনে হয়। পরিশেষে আমার বক্তব্য যে,—যে-যে শাস্ত্র বাক্যের উপর আমাদের সন্দেহ, ঠিক সেই-সেই স্থানেই লেখক দৃষ্টি দিয়াছেন। সত্যই আমি অনেক ভ্রম হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আশা করি আমার মত যাঁহারা শাস্ত্রের তত্তৎ স্থানে সন্দিগ্ধ আছেন, তাঁহাদেরও ইহা পাঠ করিলে সন্দেহ সকল দূরীভূত হইবে। আর্য্যজাতির শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাসই সম্পদ্ : সেই সম্পদ্ লাভের অনেক উপায় লেখক দিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি লেখক এই প্রকার শাস্ত্র বাক্যে সন্দেহ-নিরসনী লেখনী গ্রহণে আমাদের মত সন্দিগ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কল্যাণ সাধন করুন—অলমধিকেন।

শ্রীকেদারনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ,
বরাহনগর পাঠবাড়ী আশ্রম

মদীয় পরমগুরু

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
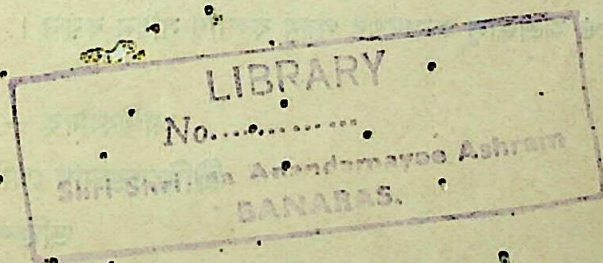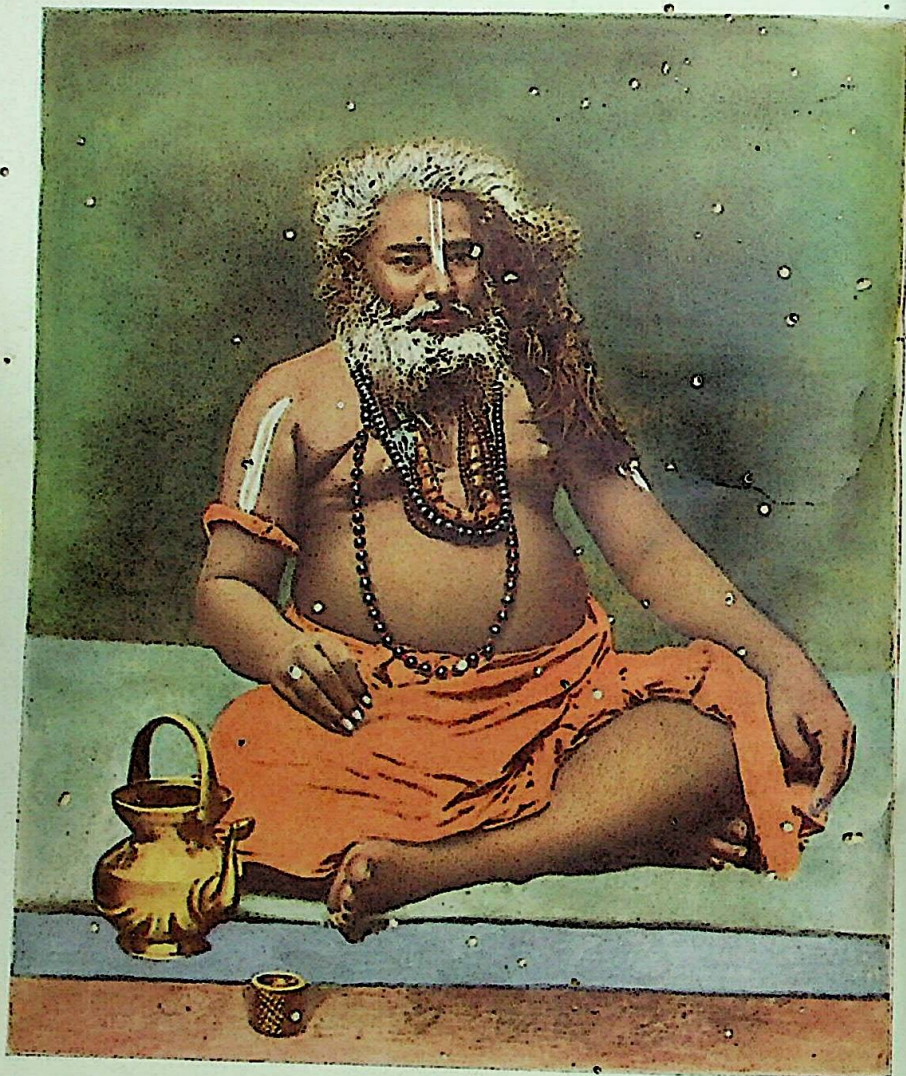
শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ

নিবেদন

প্রবন্ধগুলি লিখিবার উদ্দেশ্য—(৮); ইংরাজী শিক্ষা ও মিশনারীগণের প্রচারের প্রভাবে হিন্দুশাস্ত্র ও আচারের প্রতি শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধা—(৯); উহার প্রতীকারার্থ রাজা রামমোহন রায় ও দেশহিতৈষী মান্য-গণ্য ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টা, এবং রাজা কর্ত্তৃক বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা—(৯); মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক নিজ বিচার অনুসারে শাস্ত্রের কেবল পছন্দ-মত অংশগুলি বাছিয়া-বাছিয়া লইয়া ব্রাহ্মদের ব্যবহার জন্য নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন—(১০); ব্যক্তিত্বাভিমানী, বিবেকানুবর্ত্তী, শ্রদ্ধেয় কেশব সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক মহর্ষির স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করিয়া নববিধান সমাজ স্থাপন—(১৫); তাহাতেও আদর্শের মতভেদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুকে আচার্য্যপদে বরণ—(১৫); তৎকালে শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর, এক সাধুর সঙ্গপ্রভাবে, ধর্ম্মরাজ্যে গুরুকরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তার অনুভব,—নানাস্থানে গুরু অন্বেষণ,—অলৌকিক দীক্ষা, ১১ দিন সমাধিস্থ-অবস্থা ও পরে শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস জাগরণ ও ভগবৎ-দর্শন—(১৬); ভারতের বৈশিষ্ট্য—ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড—স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত—(২০-৩৬); বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমান অশান্তির মূল কারণ বিশ্লেষণ ও তাহার প্রতীকার নির্ণয়; শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর দিব্যদৃষ্টি—(২৩); যুগসন্ধিক্ষণের লক্ষণ—(২৩); এই সঙ্কটকালে পাশ্চাত্য মনীষিগণের ভারতের নিকট হইতে আলোক পাইবার প্রত্যাশা—(৩৩); দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূল কারণ—(৩৪); Cultural Conquest বড় সর্ব্বনাশা বস্তু; ইহা হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়—(৩৫); প্রবন্ধগুলি লিখিবার ইতিহাস—(৩৭); আকর গ্রন্থকারগণের ও এই গ্রন্থ সমালোচকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—(৩৮)

আমার পরমারাধ্য, পরমগুরু, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে, তাঁহার ভজন-কুটীরের-গাত্রে

সাতটী অমূল্য উপদেশ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠটি—

(৫) শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

(৬) শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

এই দুইটী অমৃতময় মহা-বাণীকে ভিত্তি করিয়াই আমার এই প্রবন্ধগুলি লিখিবার প্রয়াস। তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ অনুরূপ আধুনিক শিক্ষিত সমাজে যাহাতে শাস্ত্রে ও মহাজনবাক্যে যথাযথ শ্রদ্ধা জাগরিত হয়, এই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের যে যে স্থলে সাধারণের সংশয় উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থলে, সেবা বুদ্ধিতে, যথাশক্তি ঐগুলি নিরসনের চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সুধীসজ্জনগণ বিচার করিবেন। তবে আমার এই আন্তরিক সেবাবুদ্ধি প্রয়াসে শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু ও মদীয় আচার্য্যদেব শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী জীউ প্রসন্ন হইবেন এবং যথাযোগ্য শক্তি ও প্রেরণা জোগাইবেন এই ভরসাতেই লেখনী ধারণ করিয়াছি; নতুবা, আমার মত শাস্ত্রানভিজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির এরূপ দুঃসাহস ধৃষ্টতামাত্র!

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর ঐ দুইটি উপদেশবাণীর উপর এতাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করিবার পশ্চাতে বেশ একটি গভীর রহস্যপূর্ণ সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ত্তমান। দেশের কল্যাণার্থে ইহার সম্যক আলোচনা, বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বাভিমানী, যুক্তিবাদের যুগে, বিশেষ সময়োপযোগী মহৌষধিরূপে গণ্য হইবার যোগ্য; এ কারণ বিস্তৃতভাবেই ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান শাসনের অধীন ছিল এবং দেশে নানাপ্রকার ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছিল। তৎকালে আমরা নানাবিধ নির্য্যাতন ভোগ করার ফলে, এবং আমাদের মধ্যে যথাযথ ধর্ম্মানুশীলন ও প্রচারের অভাবে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে অতি মর্ম্মান্তিক

বিপর্য্যয় ঘটে। তাহার পরেই, ইহভোগসর্ব্বস্ব, গলিত শবের উপর বাহ্য-চাকচিক্যময় মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায়, আধুনিক সভ্যতার প্রতীক ইংরাজের শাসনাধীনে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষায়, ও মিশনারীগণের প্রচারের ফলে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের নিকট, আমাদের দেশটা নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত, অতীব কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক প্রতিপন্ন হইতে থাকে; এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতাভিমানিগণের অনেকে সাহেব-দিগের আপাত-মধুর আচার ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণে আগ্রহান্বিত হয়েন, তাহাতে তখন দেশের মধ্যে একটা সামাল-সামাল রব উঠিতে থাকে। দেশের এই অতি সঙ্কটকালে মহাধীসম্পন্ন দেশের পরম-কল্যাণকামী রাজা রামমোহন রায় মহাশয় বেদের জটিল কর্ম্মকাণ্ড ও তৎসহ পুরাণ-তন্ত্রাদি বাদ দিয়া, বেদের শুধু জ্ঞানকাণ্ডের,—উপনিষদের ব্রহ্মবাদের,—উপর ভিত্তি করিয়া, ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করতঃ তাৎকালিক শিক্ষিত সমাজকে আকর্ষণ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।*

তিনি শঙ্করের জ্ঞানবাদ, বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ; ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, বা সগুণ ব্রহ্মবাদ;—এই উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য

*এই সময়ে বেদজ্ঞ, পরম পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ও আমাদের পুরাণাদি প্রক্ষিপ্ত, আধুনিক, প্রভৃতি আখ্যা দিয়া, বেদের উপর ভিত্তি করিয়া তৎকালোপযোগী বিশুদ্ধ আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হয়েন। এদিকে বঙ্গদেশে সেই সময় হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণ-কল্পে পণ্ডিত প্রবর শশধর তর্ক-চূড়ামণি-প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞগণ দেশে দেশে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়া এবং দেশপূজ্য বঙ্কিমবাবু, ভাগবত ও পুরাণ হইতে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য ও সংশয় উৎপাদক অংশ সকল,—যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্য, মিথ্যা ভাষণ, পরদারা-ভিমর্ষণাদি লীলা, প্রক্ষিপ্ত অথবা অশ্লীল আখ্যায় পরিত্যাগ করিয়া, তাৎকালিক শিক্ষিতাভিমানীগণের বোধগম্য আদর্শ কৃষ্ণ-চরিত্র আদি গ্রন্থ রচনা করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা জাগাইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের ভাবধারার অনুবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পা'ন। তিনি শাস্ত্র নির্দ্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেও, পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম আচার্য্য-গণের ন্যায়, শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তিমি বেদের আংশিক ভাগ (কেবল জ্ঞান কাণ্ড) গ্রহণ করিলেও, তাহা হইতে নিজের রুচিমত উহার কোন অংশই বাদ দেন নাই ; এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও বিজ্ঞত্ব। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়, এই আদি ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণান্তর, দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রগুলির নিজ বিবেক বুদ্ধি মত হেয় (?) অংশ বাদ দিয়া, তাঁহার বুদ্ধি-সম্মত উপাদেয় অংশগুলি গ্রহণ করিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে ব্রতী হইলেন। এই খানেই আমাদের সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পাইল এবং উহা যে অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত, এই বিশ্বাস শিথিল হইতে লাগিল।*

মহর্ষি শাস্ত্রার্থ নিদ্ধারণে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্র উপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ভার অর্পণ করেন। তখন অনেকেই তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, যে ব্রাহ্ম সমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী নেতৃবর্গ যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তিনি একান্ত ভাবে শাস্ত্র প্রামাণ্য বর্জ্জন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ বেদকে প্রামাণ্য মর্য্যাদা হইতে ভ্রষ্ট করিয়া, শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির উপরেই ঐকান্তিক ভাবে সত্যা-সত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসার ভার অর্পণ করেন।

---

* ইহার সবিশেষ বিবরণ শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'চরিত কথা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

রাজা বেদান্ত-প্রতিবাদ্য ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার আত্মপ্রত্যয়, বা স্বানুভূতি-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকেই, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। উপনিষদের যে শ্রুতি মহর্ষির নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেইগুলিকেই বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন; ঋষিরা কি সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন, বা জানিয়াছেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। কোন শ্রুতির উত্তরার্দ্ধ, কোনটির বা অপরার্দ্ধ,—যার যতটুকু তাঁহার নিজের মনোমত পাইয়াছেন তাহাই কাটিয়া-ছাঁটিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে গাঁথিয়া দিয়াছেন। উহার মতামত তাঁহার নিজের, ঋষিদিগের নহে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানী পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে, আমাদের তদানীন্তন ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের বিচার, শাস্ত্রাশ্রয় এবং সদ্‌গুরুর শিক্ষা ও সাহায্যকে, উপেক্ষা করিয়া, মৌলিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই বিচার একান্তই প্রত্যক্ষবাদী, এই যুক্তিবাদের বা 'Rationalism' এর সঙ্গে জড়বাদের বা 'materialism' এর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও জড়বাদ উভয়েই, গীতার "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ"র আসুর-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এই যুক্তিবাদের উপর ধর্ম্ম-বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মানুষের প্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণাদির ন্যায়, অপ্রত্যক্ষ অথচ বুদ্ধিগম্য একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। তাঁরা মানুষের মধ্যে 'ধর্ম্মবুদ্ধি' বা 'Religious sense' বলিয়া একটা অতীন্দ্রিয়বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর ধর্ম্মের প্রাধান্যকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। মহর্ষিও কতকটা এই পথ ধরিয়া ছিলেন। তিনি ইহাকে আত্মপ্রত্যয় নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা আমাদের শাস্ত্রের স্বানুভূতির নামান্তর মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিত্বাভিমানী পাশ্চাত্য জড়বাদের উপরেই মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁহার সাধনা ও নিরুপম চরিত্রগুণে তাহা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই, এবং

একারণে তিনি যে ধর্ম্মের ও সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা যে একান্তই শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত, এ ভাবটা বহুদিন ধরা পড়ে নাই। তৎকালে সাধারণ লোকেরতো কথাই নাই, দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বেদ বেদান্তাদির বড় একটা ধার ধারিতেন না। মহর্ষি আর্য্য-প্রজ্ঞা অনাদর করিয়া, প্রাচীন শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামে সঙ্কলিত, গ্রন্থকেই প্রামাণ্য শাস্ত্র গ্রন্থের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন গুরু-আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া, মহর্ষির ব্রাহ্ম-শিষ্য-মণ্ডলী তাঁহাকেই নূতন ধর্ম্মের গুরুরূপে বরণ করেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত, স্বানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মে বাহ্যতঃ ও লোকতঃ, গুরু ও শাস্ত্র উভয়েরই প্রতিষ্ঠা হয়। এজন্য ভাবগত কোন প্রকার বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই।

আমাদের সাধনায় শাস্ত্র ও গুরু আনুগত্যের একটা নিগূঢ় সঙ্কেত আছে, মহর্ষির ব্রাহ্ম-সমাজ সে সঙ্কেতটি লাভ করেন নাই। আমাদের গুরু ও শাস্ত্রের মধ্যে, পূর্ব্বতন গুরু পরম্পরা ও সনাতন শাস্ত্র ধারার সঙ্গে, একটা গভীর ও অঙ্গাঙ্গী যোগ সর্ব্বদাই রক্ষিত হইত। পরন্তু এইরূপ স্বয়ং-কৃত, বা মনগড়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদা কদাপি কোথাও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যেখানেই এইরূপ ঘটিয়াছে, সেই খানেই ক্রমে বিদ্রোহীর দল উৎপন্ন হইয়া, স্ব-সম্প্রদায়কে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমাদের ব্রাহ্ম সমাজেও এই কারণে পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে তিনটা দলের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুও যখন ব্রাহ্ম সমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন, তখন মৌনাবস্থায় স্বহস্তে লিখিয়াছেন,—"রামমোহন রায় মহাশয় ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করেন। সেই পথ হারা হয়ে নানা দিকে গতি।" (করুণাকণা—১০১ পৃঃ)

এইখানে বিবেকবাণী, ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিচারবুদ্ধি বস্তুটী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মিথ্যা হইতে সত্যকে, অনিত্য হইতে নিত্যকে, বাহির করিয়া লইবার যে শক্তি, সাধারণতঃ সেই

শক্তিকেই বিবেক বোঝায়। আমরা যাহাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকবাণী বা Conscience বলি তাহা সর্ব্বথা এককথা নহে। এই ধর্ম্মবুদ্ধি আজ এককথা, কাল আর এককথা বলে। ব্যক্তিত্বাভিমান, ও অনধীনতা প্রযুক্ত, যদি যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া শুধু এই পরিবর্ত্তনশীল বিবেকের নির্দ্দেশমত চলি তাহা কতদূর সঙ্গত বা সমীচীন, বা নিরাপদ পন্থা, তাহা বিচার্য্য। আমরা দেখিতে পাই নারদের সঙ্গগুণে, ও তাঁহার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই, দস্যু রত্নাকরের বিবেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে, 'সনাতন-শিক্ষা'য় দেখি, 'মৃগারি' ব্যাধেরও নারদের সঙ্গ ও উপ-দেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিবেকের পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং যে ব্যাধ, পশুগণকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ছট্ ফট্ করিতে দেখিলে পরম আনন্দ অনুভব করিত, সেই ব্যাধ অচিরে হিংসাশূন্য পরম বৈষ্ণবে পরিণত হইল। সাধারণতঃ ছিপে বড়্‌শী-বিদ্ধ মাছ প্রাণের দায়ে ছট্ ফট্ করে, আর অজ্ঞব্যক্তি উল্লাস-ভরে বলে 'মাছটি কেমন খেলিতেছে!'—তখন একটু বোঝাইলেই তাহার বিচার বুদ্ধির পরিবর্ত্তন ঘটে।—এইতো অবস্থা! অধিক কি, গীতাতেই তো দেখি যে অর্জ্জুন, নিজের বিবেকমত, আত্মীয় স্বজন বধ অতীব গর্হিত কার্য্য জ্ঞানে যুদ্ধ করিতে একান্ত নারাজ; আবার, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাদি শ্রবণে বিগত-মোহ হওয়ায়, তখনি হৃষ্টচিত্তে নিজ-বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। —এইরূপই সর্ব্বত্র। এরূপক্ষেত্রে, কোন ধীমান ব্যক্তির শুধু নিজ বিবেকবাণীর উপর নির্ভর করিয়া চলিতে প্রয়াস পাওয়া কখন সঙ্গত কি? অনেক সময় দেখা যায়, দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে প্রাতঃকালে পশ্চিম দিকে সূর্য্য উঠিতেছে মনে হয়! নিজ প্রত্যয়ে বা ধারণায় কিছুতেই এই ভ্রম অপনোদন হয় না। যে ধারণার দৌড় মাত্র তো এতটুকু, তাহার উপর নির্ভর করা কতদূর দুঃসাহসিক বা মূঢ়তার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। এক্ষেত্রে যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিক ভিন্ন কদাচ অন্যদিকে উদয় হয় না, ইহা নিশ্চিন্তরূপে জানি, একারণ নিজের ধারণা কোন প্রকারে

দূর করিতে না পারিলেও যাহা সত্য সেই পথেই চলি, তদ্রূপ ত্রিকালজ্ঞ-ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র যদি অভ্রান্ত বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস্ করি, তাহা হইলে তখন শাস্ত্রের কোন স্থলে নিজ সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে তাহার সামঞ্জস্য হইল না বলিয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা উড়াইয়া দিবার প্রয়াস না পাইয়া, যাঁহারা যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদের নিকট উহার সংশয় নিরসন জন্য শ্রদ্ধালু-চিত্তে গমন করিলে, ভগবৎ কৃপায় ও ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে। কিভাবে তত্ত্বদর্শীগণের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে হয়, গীতায় ভগবান তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" গীতা—৪।১৫

তবে একথাও স্থির যে, শাস্ত্র বাক্যও যথাযথ শ্রদ্ধাসহকারে নিজ বিচারের সহিত মিল করিয়া লইতে হইবে—ইহা শাস্ত্রেরই অনুশাসন।

মহর্ষি যে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের উপর আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহতে তাঁহার অসঙ্গত একতন্ত্র-প্রভুত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে তিনি একটা প্রবল প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিলেন। মহর্ষি যে ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞান বা Conscience আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ও পুরাগত শাস্ত্র বর্জ্জন করিলেন, সেই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র, গোস্বামীপ্রভু প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের যুবকৃদল, তাঁহার একতন্ত্র-আধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন বিদ্রোহীদল সৃষ্টি করেন। মহর্ষি শুধু স্বদেশের প্রাচীন শ্রুতি হইতে আপনার মনোমত সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি উদ্ধার করিয়া তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন, কেশবচন্দ্র এই পথে যাইয়াই, জগতের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে 'সার-সংগ্রহ' করিয়া ঐ 'সার-সংগ্রহ'কেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐতিহাসিক ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহর্ষির উপদেশে ও সাধনে একটা হিন্দুভাব জাগিয়াছিল

এজন্য আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা বিনয়, একটা শ্রদ্ধা ও একটা সংযমের প্রভাব সর্ব্বদা দৃষ্ট হইত। কেশবচন্দ্রের শিক্ষা দীক্ষাতে, তাঁহার 'নববিধানে' ব্যক্তিগত সংজ্ঞানের ভাবটা নিরতিশয় প্রবল হইয়া, এই বিনয় সংযম ও শ্রদ্ধার বস্তুকে এক প্রকার নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ভাবে খৃষ্টীয় রোমান কেথোলিক হইতে প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মের অনুরূপ অবস্থা ব্রাহ্মসমাজেও ঘটিল।

মহর্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাই তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে দেয় নাই। সাধারণ সামাজিক ব্যাপারে মহর্ষি সর্ব্বদাই স্বদেশের সমাজের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রাখিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষির জাতি-বিচার, উপবীত-ধারণ, প্রভৃতি রক্ষণশীল ভাবের আনুগত্য স্বীকার বা অনুমোদন, শ্রদ্ধেয় কেশব সেন, গোস্বামী প্রভু প্রমুখ যুবকগণের বিবেক বিরুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু এখানেও কেশবচন্দ্রের প্রবল ধর্ম্ম-প্রবণতা ও অসাধারণ বিস্ময়কর বাগ্মীতার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, অনেকে তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করায়, কেশবচন্দ্রের অত্যধিক প্রতিষ্ঠাতে, ব্যক্তিত্বাভিমানী ব্রাহ্মগণ, অনধীনতা ও সাম্যবাদ আদর্শের অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটায়, এবং কুচবিহার-বিবাহোপলক্ষে তাঁহার আচারে ও প্রচারে সঙ্গতির অভাব দর্শন করিয়া শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, এই প্রতিপক্ষ দলের মুখপাত্র ও অগ্রণী হইয়া, কেশবচন্দ্রের অধিনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতঃ, ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হন। গোস্বামী প্রভুও এই ব্যাপারে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বিবেকবুদ্ধিতে গুরুতর আঘাত লাগায়, তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্মী কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া এই দলের সঙ্গে যোগদান করেন এবং এই নূতন (সাধারণ বাহ্ম) সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ গোস্বামী প্রভুকে আচার্য্য পদে বরণ করেন। তিনিও তখন নব-উদ্যমে মনপ্রাণ খুলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হ'ন।

এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতিতে তীব্র অনুরাগসহ উপাসনা করার কালে, গোস্বামী জীউর ভিতর নানা প্রকার অবস্থা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অপ্রাকৃত-দর্শন, শ্রবনাদিও সবই হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হইল না। সত্যবস্তু একবার প্রকাশ হইলে তাহা আবার যায় কেন, এই সংশয় তখন তাঁহার চিত্তে উপস্থিত হইল।—এই সময়ে একদিন মেছোবাজার ষ্ট্রীটে একটী মহাপুরুষের দর্শন পাইলেন, তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলায়, তিনি বলিলেন,—"অনেক অবস্থাই প্রকাশ হতে পারে তাহাতে কি হইল, থাকে না ত? যথাশাস্ত্র গুরুর নিকট দীক্ষা না গ্রহণ করিলে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হ'বে না।"—ইহার পর হঠাৎ একদিন ঐ মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিয়া যাবার বেলায় বলিয়া গেলেন,—"ঘরখানা ত বেশ প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু আল্‌গা খুঁটির উপরে,—ভিত্তিশূন্য, দাঁড়াবে কি প্রকারে? গুরু নাই, এ কখন টিকিবে না।"

এই কথা শ্রবণান্তর গোস্বামী প্রভুর চমক ভাঙ্গিল এবং তিনি নিত্য-সত্য-বস্তুর অনুসন্ধানে একান্ত প্রাণে বাহির হইলেন এবং এতদর্থে বহু স্থানে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও বহু মহাপুরুষের সঙ্গ করিলেন কিন্তু কোথাও প্রাণের পিপাসা দূর হইল না, তখন দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে, অনাহারে, অনিদ্রায়, সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিলে, পরিশেষে গয়াধামে আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে মানস-সরোবর-নিবাসী শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী সূক্ষ্ম-শরীরে আবির্ভূত হইয়া, শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা গ্রহণ মাত্রই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হয় এবং এইরূপ প্রায় একই অবস্থায়, এগারদিন, এগাররাত্রি কাটিয়া যায়! ইহার পর হইতেই তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গেল! একদিন শাস্ত্রসমূহ মূর্ত্তিমান-রূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, শাস্ত্রের নিগূঢ়-রহস্য ও প্রকৃত-তথ্য তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই

প্রকাশিত হইল। তখন হইতে ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। অনেক ঘুরিয়া, অতীব তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, এই মহাসত্যে উপনীত হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য তিনি নিজ ভজন কুটীর গাত্রে পূর্ব্বোল্লিখিত উপদেশ বাণীগুলি স্বহস্তে লিখিয়া রাখেন এবং তৎকালে মৌনাবস্থায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে স্বহস্তে লেখেন,—

"যিনি সমস্ত বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, অতএব শব্দ-ব্রহ্ম ও পর-ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ, ঋষি পদবাচ্য।" "শাস্ত্র—ঋষিবাক্য; সদাচার—মহাজন-দিগের আচরণ, ইহাভিন্ন আর সকলই অসার। ইহার সঙ্গে মিলিলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা বিষবৎ ত্যজ্য।" "শাস্ত্রে বিশ্বাস হইলেই শুভ বুদ্ধির উদয় হয়।" "আমরা ঋষিবাক্য ও সদাচারের দাসানুদাস।"

"শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্যপথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, তাহাও যাইবে না।" "যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন, তাঁরা দেবতা; যাঁরা নিজের বুদ্ধিতে চলেন, তাঁরা অসুর।" "যাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন তাহাদেরও যুক্তি ও আত্ম প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রেরই উপদেশ।" (করুণা কণা—১৭-১৮ পৃঃ)

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—কুরুক্ষেত্র-সমরাবসনে পাণ্ডব-শিবিরে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডব-পুত্র, নিদ্রিত অবস্থায় জঘন্যভাবে নিহত হইলে, আকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে, অশ্বত্থামার ছিন্নমস্তক অবিলম্বে তাঁহার নিকট আনিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া, অর্জ্জুন রথে আরোহণ করতঃ দ্রুত গতিতে অশ্বত্থামা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন অশ্বত্থামা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, অস্ত্র সংহরণ উপায় না জানিলেও, অর্জ্জুনের প্রতি দুর্ব্বার 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন! তখন, সারথী শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে, উহা প্রতিরোধার্থ, অর্জ্জুন

ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং পরিশেষে উভয় অস্ত্রই সংহরণ করিয়া অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং ঐরূপ জঘন্য ক্রুর-প্রকৃতি আততায়ীকে হত্যা করিবার জন্য বারম্বার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন! কিন্তু, 'ব্রহ্মহত্যা বেদ-বিরুদ্ধ' বিধায়, ব্রহ্মণ্যদেবের যোগ্য-সখা অর্জ্জুন, এই বেদবিরুদ্ধ আজ্ঞাতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তদবস্থায় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে, আর্য্যললনা-গৌরব দ্রৌপদী, শোকে একান্ত মুহ্যমান হইলেও, গুরুপুত্রকে পশুবৎ রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দর্শন করিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে, অমর্য্যাদার ভয়ে স-সম্ভ্রমে, দ্রুতগতিতে নিকটে আসিয়া গুরুপুত্রচরণে প্রণাম করিলেন!! —(ভক্তচূড়ামণিগণের কি অলৌকিক চরিত্র! ইহার গুণেই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি 'অজিত' গোবিন্দ তাঁহাদের নিকট চিরভরে বাঁধা!) এবং, 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বাবস্থায় সকলের গুরু' বিধায়, তন্মুহূর্ত্তে গুরুপুত্রকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন! তখন দ্রৌপদীর এই সুমহৎ আচরণে যুধিষ্ঠির প্রমুখ সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের নিরুপম শাস্ত্র-নিষ্ঠা ও ভক্তিদর্শনে পরমতুষ্ট হইয়া পুলকিতান্তরে, উভয় দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই অতি কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে উদ্যত হইয়া, অর্জ্জুনকে ইঙ্গিত করিলেন,—"পতিত ব্রাহ্মণকেও বধ করিতে নাই'; পুনশ্চ,—'আততায়ীকে কোন বিচার না করিয়া বধ করিবে'—শাস্ত্রে আমার দুই আজ্ঞাই আছে; হে অর্জ্জুন! যাহাতে দুই দিক—তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং দ্রৌপদীরও প্রীতিকর হয়, এইরূপে আমার আজ্ঞা পালন কর।' (ভাঃ—১।৭।৫১) অর্জ্জুন ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ অসিদ্বারা অশ্বত্থামার কেশসহ-শিরোমণি কর্ত্তন করিলেন।—এইরূপ বহুক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ সুধীগণ, বিচারসহ শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য,—এমন কি, সাক্ষাৎ

ভগবানের আদেশ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। (এই পুস্তকের ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

গোস্বামীপ্রভুর মত একান্ত সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের অভিজ্ঞতা প্রসূতঃ ঐ মহা-বাক্যগুলির মূল্য কত তাহা সুধীগণই বিচার করিবেন।

ভগবান স্বয়ং গীতায় দেবাসুর-সম্পদ-বিভাগ যোগে বলিয়াছেন—;

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি॥" গীতা—১৬।২৩-২৪

আমদের দেশে, ধর্ম্মরাজ্যে কালে কালে বহু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, আবার ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে ও ভগবৎ-কৃপায় সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; নতুবা কত তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিজখাঁ, কালাপাহাড়, প্রভৃতি আমাদের ধর্ম্মের ও দেবতা মন্দিরের উপর অকথ্য অত্যাচার করিলেও, উহার মূল অদ্যাবধি অচল-অটল হিমালয়ের মত অটুটই রহিয়াছে! উহার সুগভীর অন্তঃস্থল অবিকৃত, চির-বিশুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাই ইহার নিরুপম বৈশিষ্ট! আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ এতাদৃশ মর্ম্মান্তিক বিপ্লবের মধ্যেও বিন্দুমাত্র বিলুপ্ত হয় নাই, সব ঠিকই রহিয়াছে। সময় সময় যাহা কিছু বাহ্যিক বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা সমস্তই এই সকল অমূল্য জাতীয় ধর্ম্মপুস্তকের সাহায্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চার হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইহা এখন একপ্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত। ঐ সময়ে সর্ব্ব উপনিষদের-সার, জগতের অমূল্য, গীতার-বাণী প্রচার হইয়াছিল। এতাদৃশ নিরুপম জ্ঞানগর্ভ-বাণী প্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেও অন্ততঃ ২।৩ হাজার বৎসর, ঐ প্রকার সভ্যতার স্থিতির প্রয়োজন। তাহা

হইলে দেখা যাইতেছে অন্ততঃ ৭।৮ হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সভ্যতা নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কোন প্রকার বিপ্লবই ইহার সুদৃঢ়ভিত্তি স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই, ইহাতেই অনুমান করা যায়, ইহার অন্তঃস্থলে ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এমন কিছু অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে, যাহার বলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর কত নব নব সভ্যতার অভ্যুত্থান ও অন্তর্ধান ইহা দর্শন করিয়াছে এবং তাহা হইতে আত্ম-সংরক্ষণের নব নব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে। এহেন সনাতন-ধর্ম্মাত্মক সভ্যতার আত্যন্তিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া নূতন কিছু প্রবর্ত্তনের প্রয়াস কতদূর বিজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রত্যুত পাশ্চাত্য বালসুলভ আপাত-মধুর বাহ্য চাকচিক্যময় সভ্যতা দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া একান্ত মূঢ়তার কার্য্য। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী সুন্দর একটি উপমা* দিয়াছেন।—

নদীতে যখন প্রবল বন্যা হয়, তখন সন্নিকটস্থ জনপদ সমূহ প্লাবিত হওয়ায়, ঘরবাড়ী জীবজন্তু ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে;

---

* এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজী নিম্নের নিরুপম কবিতাটি 'হরিজন' পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"The East bowed low before the blast,
In patient deep disdain;
She let the thundering legions past,
And plunged in thought again."

'ধৈর্য্যসহ ঘৃণাভরে উপেক্ষিয়া তায়,
ঝটিকায় রহে প্রাচী হয়ে নতশির।
সবেগে বিজয়-সেনা দ্রুত চলি যায়,
প্রাচী পুনঃ ধ্যানে ডুবি চিত্ত করে স্থির॥'

—কি নিরুপম ভাবের অভিব্যক্তি! কি অপূর্ব্ব মহিমান্বিত দেশ! না জানি জীব কত সুকৃতির ফলে এই পুণ্য-ভূমি ভারতে মানবজন্ম লাভ করিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য পায়।

কিন্তু ঐ নদী-সংলগ্ন কেশে-বন-গুলির মূল দৃঢ় হওয়ায়, এবং বন্যার সময় উহারা স্রোতাভিমুখে নত হওয়ায় উহাদের কোনই ক্ষতি হয় না, পরন্তু উহাদের মূলে পলি পড়ায়, উহারা সতেজে বর্দ্ধিত হয়। ঠিক ঐ রূপ, ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে বহির্দ্দেশ হইতে নব নব সভ্যতার বন্যা আসিয়া দেশে সাময়িক বিপর্য্যয় ঘটাইলেও, দেশ অচিরকালমধ্যে পুনরায় আত্মস্থ হয় এবং ঐ নব নব সভ্যতার সদ্‌গুণ সকল নিজ কলেবরে অঙ্গীভূত করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণের সুরক্ষিত, সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, জাতীয় ধর্ম্ম-পুস্তক সকলের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় দেশ অচিরে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই গুহ্য রহস্য।

এবারও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। যখনই নব্য সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষতাভিমানীগণ আমাদিগকে অসভ্য পৌত্তলিক বলিয়া পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল, অমনি বিধাতার বিধানে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ প্রভৃতির উদ্ভব হইল, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; এবং শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের মত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া আমাদের পূজার বিগ্রহাদি যে পুতুল নহে, মানুষের মত কথা ক'ন, জাগ্রত জীবন্ত সাক্ষাৎ চিন্ময়ী প্রতিমা, এবং 'ভগবানকে দেখা যায়, দেখিয়াছি এবং দেখাইতে পারি' মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিশ্ব-বিশ্রুত "পুরুষ সিংহ" স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব পাশ্চাত্য জগতে বিস্ময়কর সাফল্যের সহিত প্রচার করিলেন ও ভারতে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম ও দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইলেন। ঐ সময় নিষ্কপট জীবন্ত-সত্যের-প্রতীক, শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্যে ও দেবদেবী পূজাতে বিশ্বাস হারাইয়া উপবীত ত্যাগ করতঃ, গুরুবাদে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের দলে যোগ দান করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় রত থাকিয়া তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমধিক উৎকর্ষসাধন করিলেন এবং

শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসুগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন শেষ হইলে, সদ্‌গুরুর দীক্ষা প্রভাবে শাস্ত্র সদাচারে পরম শ্রদ্ধালু হইয়া বিভ্রান্ত দেশবাসীগণসহ অসাম্প্রদায়িক সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া, ইহার যথাযথ পুনপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইলেন।

ঐ সময়ে একদিন জনৈক ব্রাহ্মের প্রশ্নে তিনি জলদ্‌গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"...আপনি জানেন আমি পরের মুখে ঝাল খাইয়া কখন কোন কথা বিশ্বাস করি নাই। যখন যে সত্যটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি, তখন তাহাই ধরিয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি। যে মুখে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়াছি, সেই মুখেই ঈশ্বর সাকার বলিতেছি। তাঁহার রূপ অবাঙ্‌মনসোগোচর। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁহার মুখ, হস্ত, পদ সকলি আছে, তবে তাহা জড়ীয় নহে। সত্যই তাঁহাকে দর্শন করা যায়, আস্বাদন করা যায়। শুধু তাঁহাকে দর্শন করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই। তাঁর দুটি হাত, দুটি পা টিপে দেখেছি।...আমি তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছি, আর আপনাকে কত বলবো।..."

(আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—৪১৩ পৃঃ)

এই সময়ে একদিন ব্রাহ্ম সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—"শোনা কথায় ও বইএর কথায়, প্রাণ বাঁচে না। প্রকৃত বিশ্বাস চাই। তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহা কল্পনা নয়। তাঁকে দেখা যায়, ধরা যায়, আস্বাদন করা যায়, শোনা যায়,—এ কথার কথা নয়, আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বলিতেছি।"

('বক্তৃতা ও উপদেশ'—৫৩ পৃঃ)

এই প্রকারে দেশের ঐ দুর্দ্দিনে, যথা প্রয়োজনে, আরও অনেক সাধু ও মহাপুরুষগণের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহারা দেশকে পুনরায় আত্মস্থ হইবার পথে দাঁড় করাইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। দেশ স্বাধীন হইবার বহু পূর্ব্বে গোস্বামীপ্রভু একদিন অর্দ্ধবাহ্য-অবস্থায় বলিয়াছিলেন,—"বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন হইবে! একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিবে, স্বরাজ

পতাকা উড়িতেছে" ।* তাঁহার এই দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন ভবিষ্যৎ-বাণী, সত্যে পরিণত হইতেছে। আর একদিন ঐরূপ আবিষ্ট অবস্থায় বলিয়াছিলেন,—"আহা কি চমৎকার! আজ সত্যযুগের ধ্বজা আকাশে উড়িল! আজ হইতে সত্যযুগ আরম্ভ হ'ল!...আজ মহা আনন্দের দিন!" (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ—২য়, ১৮০ পৃঃ)

---

* অবসর প্রাপ্ত সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের Executive Engineer, পরম-শ্রদ্ধেয় শ্রীল ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্বন্ধে (ইং ৭।৪।৫৩) লিখিয়াছেন—

ইং ১৯১৯ বা ১৯২০ সালে যখন আমি সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে ঢাকা সহরে থাকিতাম, তখন প্রতি শনিবারে, রবিবার বা ছুটির দিন, এবং অবকাশ মত আমাদের পরম পূজ্যপাদ বরদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গেণ্ডারিয়া-স্থিত বাটীতে যাইতাম এবং শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পরম ভক্তিমান শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ও আসিতেন। সেই সময় কুঞ্জবাবুর মুখে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোস্বামীজির মুখ বিগলিত একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। এই ঘটনা যতদূর স্মরণপথে আছে এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।—

যখন মণিপুরের টিকেন্দ্রজিতের ইংরাজ কর্তৃক (১১৯১, ১৩ই আগষ্ট, অপরাহ্ন ৫টা) ফাঁসি হয়, ঐ সময়ে গোস্বামীপ্রভু তাঁহার গেণ্ডারিয়া আশ্রমস্থ নিজ আসনে সমাধিস্থ অবস্থায় উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত, কিম্বা তার পরদিন সকাল পর্য্যন্ত, ঐ ফাঁসির সম্বন্ধে কোন সংবাদ-পত্রে বা লোকমুখে কিছুই খপর প্রকাশ পায় নাই। এই সময়ে হটাৎ সমাধি অবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'আহা, কি হইল! আহা, কি হইল! একজন নিরীহ বৈষ্ণবের ফাঁসি হইল!'—এই সময় তাঁহার জটাসকল খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল!

এই শব্দে আকর্ষিত হইয়া তাহার আশ্রমস্থ শিষ্যগণ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মহাশয়! কি হইল? আপনার জটা সকল খাড়া হইয়া উঠিল কেন?" প্রত্যুত্তরে, গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—"একজন নিরীহ বৈষ্ণবের ফাঁসি হইয়া গেল! টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হইল?" ইহার উত্তরে উপস্থিত শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিল,—"টিকেন্দ্রজিৎ কি সত্য সত্যই নির্দোষ ছিলেন?"—

—এই সকল অমৃতময় ভবিষ্যৎ বাণীও অবশ্যই যথা সময়ে সফল হইবে। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মহাপুরুষের বাণী কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

আর একদিনের ঘটনা—১২৯৫,৭ই আষাঢ়, দ্বিপ্রহর আহারের পর, একটি আশ্চর্য্য শক্তির প্রকাশ হয়। শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু বলেন,—"...মহাপুরুষ-সহ গিয়া সে স্থানে দেখিলাম—সমস্ত মহাপুরুষ আজ একত্র হইয়া ভারতের দুর্গতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। তখন ভগবান খুব উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইলেন। এইরূপ প্রকাশের পর বাণী শোনা গেল,—"শীঘ্র দেশের দুর্গতি দূর হ'বে।"—ইহার পর নগেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাপ্রভু ইহার ভিতর ছিলেন কি?" গোস্বামীপ্রভু বলিলেন—"**তিনিই এই বিষয়ে প্রধান।**" (শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র সামন্ত কথিত) ('মন্দির'—১৩৫৮, ১২৬ পৃঃ)

শাস্ত্রে যুগসন্ধিক্ষণের যে সব লক্ষণ বর্ণিত আছে, বর্ত্তমান সময়ে সে সমস্ত লক্ষণেরই যেন সূচনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে পৃথিবীব্যাপী দারুণ অশান্তি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, কলহ, অভাব-অভিযোগের আর্ত্তনাদ ও প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের বিভীষিকায় সমগ্র জগৎ যেন সন্ত্রস্ত এবং অতি ভীষণ ভীষণ মারণ অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ক্রমেই যেন সকলেই ধ্বংসের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে! এইভাবে যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে। পৃথিবী

ইহার প্রতিবচনে গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—হাঁ, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। —দেবগণ ও ঋষিগণ ভারতের পুনরভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন!—সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইল!"—"সে কি মহাশয়, ইহা কি সম্ভব; ইংরাজদের এই প্রতাপশালী সৈন্যদের সহিত কে লড়্‌বে? প্রশ্নের উত্তরে, গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—"ইংরাজেরা বিনাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।"

আমি এই সকল ঘটনার কথা, ইংরাজদের বিনাযুদ্ধে চলিয়া যাইবার ২৫।২৬ বৎসর অগ্রে শুনিয়াছি; গোস্বামী প্রভু তাহার বহুদিন আগে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন!

জুড়িয়া এরূপ আত্ম-ঘাতী সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবীভাব জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই অস্বাভাবিক অশান্তির কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বর্ত্তমান জগতের মনীষীগণ,—কেহ বা বৈষম্যময় সমাজনীতিকে, কেহ বা রাষ্ট্রনীতিকে, কেহ বা অর্থনীতিকে, কেহ বা শিক্ষানীতিকে,—এর জন্য দায়ী বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন এবং বৈষম্যই যত বিশ্বব্যাপী অনর্থের মূল কারণ বোধে, তাহার প্রতিকারকল্পে, যাহাতে সকল মানুষ একই প্রথার সমাজ ব্যবস্থা, একইপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে,—সর্ব্বপ্রকার উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদ রহিত হইয়া, সকলেই সমান সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এবং জগৎ সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতেছেন। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারের নামই আধুনিক 'সাম্যবাদ'।

বৈষম্য যে জগতকে বিপদ ও বিঘ্নসঙ্কুল পথে পরিচালিত করে, আমাদের ত্রিকালজ্ঞ, স্বাধীন ভারতীয় চিন্তানায়ক ঋষিগণও, সেইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারকল্পে যথাযথ আর্ষ-প্রজ্ঞাস্বরূপ-'সাম্যবাদ', উপদেশ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের চিন্তার ধারা অতীব সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী এবং চরম-পরম কল্যাণপ্রদ।

বৈষম্যই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈষম্য লইয়াই সৃষ্টির অস্তিত্ব। এই বাহ্য বৈষম্যই বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও অনর্থের মূল কারণ নহে; অধিকন্তু, এই বৈষম্যের বিলোপ সাধন মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণই দেবতা, রজপ্রধানগণই অসুর এবং তমপ্রধানগণ রাক্ষস। সৃষ্টিকে ভালমন্দ, ছোট বড়, সুন্দর কুৎসিৎ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সুস্থ অসুস্থ,—বৈচিত্রতা লইয়াই বিভিন্ন প্রকৃতি জীবসহ, বাঁচিতে হইবে। ইহা কখন জগতের অকল্যাণের কারণ হইতে পারে না।

যে বৈষম্যের ফলে জগৎব্যাপী অশান্তির উদ্ভব হয়, তাহার মূল, বহির্জগতে নহে অন্তর্জগতে। এই বৈষম্য-দোষ মানুষের অন্তরে যে পরিমাণে সঞ্চারিত হয়, তাহার বিষময় ফলস্বরূপ বর্হিজগতে—দ্বেষ, হিংসা, কলহ, অভাব-অভিযোগাদি অশান্তিরূপে বাহিরে ব্যক্ত হইয়া থাকে। মানবের অভ্যন্তরস্থিত সমতা সুরক্ষিত হইলে, বর্হিজগতে বৈষম্য ঘটিলেও তাহাতে মানবসমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় না।

'মনুষ্য' বলিতে আমাদিগকে মানবাত্মা ও মানবদেহ, এই উভয়ের সম্মিলন-ক্ষেত্র বুঝিতে হইবে। মানব-আত্মা—চিন্ময়বস্তু এবং মানব-দেহ-ইন্দ্রিয়াদি—জড়বস্তু। চিৎ ও জড়, বা চেতন ও অচেতনের, পার্থক্য বোধই মানবের অন্যপ্রাণী হইতে সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সকল প্রাণীর মধ্যে কেবল মানবেরই বুঝিবার যোগ্যতা আছে যে,—মানব আত্মা, জড় দেহেন্দ্রিয় হইতে, স্বতন্ত্র চিন্ময় বস্তু। এই মানব আত্মা ও মানব দেহ মধ্যে, আত্মাই মুখ্য বা প্রধান ; দেহাদি গৌণ, বা অপ্রধান। আত্মার সান্নিধ্যবশতঃই দেহের যাহা কিছু গৌরব, নতুবা ইহা 'শব'। অতএব ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া, অপরের প্রয়োজনাতিরিক্ত পুষ্টি-সাধন করিলে, আভ্যন্তরিক সমতার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া যতকিছু অনর্থের মূল উৎপাদন করিয়া থাকে।

'দেহের' পক্ষে তাহার যাহা প্রয়োজনীয় তৎসমুদয় প্রাপ্য হইতেও তাহার অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষা ; এবং 'আত্মার' যাহা প্রয়োজন তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার প্রয়াসই,—**হইতেছে বর্ত্তমান জগৎ-ব্যাপী সকল অনর্থ ও অশান্তির মূল।** এই বৈষম্যমূলক প্রচেষ্টার প্রতিকার সংবাদই ভারতীয় মনীষীগণের প্রবর্ত্তিত **'সাম্যবাদ'**,—যাহা ভারতের **'আধ্যাত্মবাদ'** নামে অবিহিত।

মানব 'আত্মা', চিন্ময়—অপ্রাকৃত বস্তু। তাহার অভাব একমাত্র তৎ-স্বজাতীয় চিণ্ময় বস্তু দ্বারাই পূরণ হওয়া সম্ভব ; জড়বস্তু দ্বারা

তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত চিন্ময়-বস্তু ব্যতীত মানব-আত্মার অভাব পূরণের আর অন্য উপায় নাই। একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই মানব-আত্মার অন্ন; 'আনন্দ চিন্ময়-রস—ভগবৎ-প্রেমই, আত্মার পানীয়; ভগবৎ বিশ্বাসই ('বিশ্বাসংধর্ম্মমূলং হি') আত্মার নিশ্বাস বায়ু।

"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—'ভূমাতেই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই'। মহৎ, নিরতিশয়, অনন্ত,—যাহা পাইলে আর কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না,—'তাহাই ভূমা'। মানবাত্মা,—সচ্চিদানন্দময় ভগবানেরই—পরমাত্মারই অংশ। জীব অণুচৈতন্য, অণুপরিমাণে হইলেও ভগবানের সমস্ত গুণই তাহাতে বর্ত্তমান; এজন্য জীব মায়ামুগ্ধ থাকিলেও মানবের অন্তরাত্মা—সীমাবদ্ধ, অনিত্য সুখে কখনই সে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তাহার অন্তরাত্মা চায় অসীম, নিত্য, আনন্দ। জীব মাত্রই সুখের—আনন্দের, কাঙ্গাল। সে মোহাচ্ছন্ন প্রযুক্ত অনিত্য দেহ-ইন্দ্রিয়-মনকেই সমগ্র 'আমি' মনে করে এবং মূঢ়তাবশতঃ ঐ সকল দ্বারা অনিত্য আনন্দভোগেই পরিতৃপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু পরিণামে বিফল-মনোরথ হয়। 'সত্য (চিন্ময়) আমি'র, বা মানবাত্মার পিপাসা বা অভাববোধ কদাচ তাহাতে প্রশমিত হইতে পারে না। এ কারণ অপরিসীম বিষয় ভোগ করিলেও, তাহার অন্তরাত্মার যে পিপাসা, সে পিপাসা, থাকিয়াই যায় এবং তাহাই আবার পরক্ষণে দেহেন্দ্রিয়েরই আর কোন নূতন বিষয়-ভোগবিলাস-রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। তাহার আর অন্ত নাই।

অধুনা তথাকথিত সভ্যজগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের—বা 'নশ্বর আমি'র খোরাক জোগাইবার জন্যই নিরন্তর উদ্‌ভ্রান্ত; 'সত্য আমি'র বা 'আত্মার' খোরাক জোগান যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, সেকথা আধুনিক জগৎ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এবং সেকারণ, নিদারুণ বিষময় ফলও ভোগ করিতেছে। সেই ক্ষুধিত, তৃষিত, অতৃপ্ত মানবাত্মার অন্তরপ্রদেশ

হইতে অবিরত অসন্তোষ,—তাহাই দেহাত্মবোধে আবৃত হইয়া, বাহ্য-জগতের স্থূল বৈষম্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক, মনুষ্যসমাজে প্রবল হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, যুদ্ধাদি সৃষ্টি করিয়া জগৎকে 'অতিষ্ঠ' করিয়া ফেলে। যেমন কোন ক্ষুধার্ত্ত শিশু, নিজ প্রকৃত অভাব বুঝিতে না পারিয়া, ক্রন্দনরত হইয়া নানাবিধ খেল্‌নাদির 'বায়না' করে এবং তাহা পাইলে একটু পরেই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় নূতন নূতন খেল্‌নার জন্য আব্দার করে, ও অধিকতর ক্রন্দন করিয়া সকলকে বিব্রত করিয়া তোলে; পরিশেষে, তাহার জননী উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া, ঐ শিশুর ক্রন্দনের মূল কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বুকে লইয়া স্তন্যপানে উদর পূরণ করিয়া দিলেই সকল উৎপাতের উপশান্তি হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান জগতে বিশ্ব-ব্যাপী অশান্তির একমাত্র কারণ সেই দেহাত্মবোধ-বিভ্রান্ত, আত্ম-বঞ্চিত মানবাত্মারই তৎস্বজাতীয় চিন্ময়, বা আত্মিক বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ত অস্ফুট অভিযোগ! ইহার উপশান্তির একমাত্র উপায়, দয়াদ্রহৃদয় মহা-পুরুষগণের নির্দ্দেশিত পারমার্থিক পথে অনুগমন ও মানব 'আত্মার' যথার্থ তৃপ্তিসাধন।

আধুনিক জড়বাদ-মূলক শিক্ষা ও সভ্যতা অচিরে চরমে উঠিয়া ঐ জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অশনি (আনুবিকবোমা, হাইড্রোজন বোমা প্রভৃতি) দ্বারা আপনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহার যথেষ্ট সূচনা দেখা যাইতেছে! উহার ধ্বংসাবশেষ হইতেই 'চিদ্-বিজ্ঞান' জাগিয়া উঠিবে। তাহাই আমাদের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ আর্ষ-প্রজ্ঞার দ্বারা আবিষ্কার করিয়া জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন।

অসংযত দুর্ব্বার ভোগের পরিণাম কীদৃশ দারুণ দুঃখপ্রদ তাহার সবিশেষ পরীক্ষা পুরাকালে এই দেশেই হইয়া গিয়াছে; এবং বিভ্রান্ত জগতের চৈতন্য উৎপাদনের জন্য সেই অভিজ্ঞতা পুরাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।—সসাগরা ধরণীর অধিপতি মহারাজ যযাতি তাঁহার অসংযত

ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের প্রসাদে, পুত্র পুরুর নিকট হইতে যৌবন মাগিয়া (!) লইয়া সহস্র বৎসর অশেষ-বিশেষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া, পরিশেষে তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া, জগতে এক অতি মূল্যবান সতর্ক-বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে,—সমগ্র পৃথিবীর রমণী ও ধন-রত্নাদি কাহার একাকীর ভোগ্য হইলেও তাহা তাহার পরিতৃপ্তি সাধনে সমর্থ নহে ; বরং ক্রমশঃই ভোগলালাসা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পরিশেষে ঘোর বাসনা-আবর্ত্তে নিপতিত করিয়া অশেষ প্রকার দুঃখই প্রদান করিয়া থাকে। যে হেতু,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ভাঃ—৯।১৯।১৪

অর্থাৎ,—'কাম', কামনার উপভোগের দ্বারা প্রশমিত হয়না ; পরন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন ঐ অগ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়, তদ্রূপ, ঐরূপ উপভোগের ভোগবাসনা পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।'—এইখানে কিন্তু একটি বিশেষ কথা প্রণিধানযোগ্য এই যে,—'উপ' ভোগের দ্বারা প্রসমিত হয় না ; পরন্তু ; যথা শাস্ত্র-বিহিত 'ভোগের' দ্বারা সাম্য হয়। অর্থাৎ নিজ খেয়ালমত, এলোমেলো ভাবে, ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিলে, তাহা কোনদিন প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু যথাশাস্ত্র ভোগের দ্বারা কামনা বাসনার উপশান্তি হয়, ইহাই ঋষিদিগের স্থির সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতার অনুশাসন— এই শ্লোকটি অতীব মূল্যবান।

এ জগতে 'কামের'—'কামনার,' বা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের (ভোগসুখের), প্রতিযোগিতা যত বৃদ্ধি পাইবে ; অথবা যে যত ভোগী সে তত সৌভাগ্যবান বা সম্মানার্হ বলিয়া, জনসমাজে গণ্য হইতে থাকিবে, ততই পরস্পর দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে। ইহার পরিবর্ত্তে,— যিনি যত পরিমাণে ত্যাগী, তিনি সেই পরিমাণে সৌভাগ্যবান ও

সম্মানার্হ বলিয়া গণ্য হইবেন, এই আদর্শ যদি সমাজে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে এবিষয়ে প্রতিযোগিতা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই জগতে দ্বেষ, হিংসাদি নিবৃত্তি হইয়া পরম সুখ-শান্তি উদয় হইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদর্শন এই যে,—যিনি যে পরিমাণে বাহ্য ইন্দ্রিয় তর্পণ-সামগ্রী নিচয়ের অধিকারী, বা যিনি যে পরিমানে ভোগী, তিনি সেই পরিমাণে ভাগ্যবান এবং জনসমাজের নিকট সম্মানার্হ বলিয়া পরিগণিত। পরন্তু, আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন এই যে, যিনি 'যত স্বল্প পরিমাণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ-সামগ্রীতে পরিতুষ্ট, তিনি সেই পরিমাণে উন্নত,—সেই পরিমাণে সম্মানার্হ এবং সেই পরিমাণে সৌভাগ্যবান বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত ;—এমন কি যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া, বৃক্ষতল সার করিয়া, কৌপীনধারী হইয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান— বলিয়া পরিকীর্ত্তিত,—"কৌপিনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত।"—ইহাই আর্য্যজাতির চরম পরম আদর্শ। এই পথে প্রতিযোগিতা যত বেশী, ততই জগতে সুখশান্তি বৃদ্ধি। ভোগরাজ্যে ঠিক তাহার বিপরীত। যতই ভোগের প্রতিযোগিতা ততই ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, কলহ, দুঃখ, অশান্তির, বৃদ্ধি অনিবার্য্য। ভোগ্যরাজ্যে সুপ্রসিদ্ধ ত্যাগী মহাপুরুষ 'বুনো রামনাথ'— অসভ্য, বর্ব্বর বলিয়া খ্যাত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহা-মানব মহাত্মা গান্ধী —'*Half naked Fakir*' বলিয়া অভিহিত হইয়া উপহাসের আস্পদ হইয়াছেন !! কিন্তু প্রত্যুতঃ তাঁহারাই আমাদের আর্য্য সভ্যতার আদর্শ পথ-প্রদর্শক। অপরে যে যাহা খুসী বলিয়া আনন্দ উপভোগ করেন করুন, আমাদের কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে—এই অর্দ্ধ-উলঙ্গ ফকিরই তাঁহার বিপক্ষ, বিধর্ম্মীগণকে বিপদের সময় আশ্রয় দান করিতে গিয়াই তাঁহার স্বজাতি, সহ-ধর্ম্মী আততায়ীর হস্তে জঘন্য নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়া, ত্যাগের এক অতি মহান দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন ! মৃত্যুতো একদিন না একদিন হইতই, কিন্তু এভাবে ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্টের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন রক্ষা করিয়া, জগতে এমন এক নিরুপম কীর্ত্তি রাখিয়া
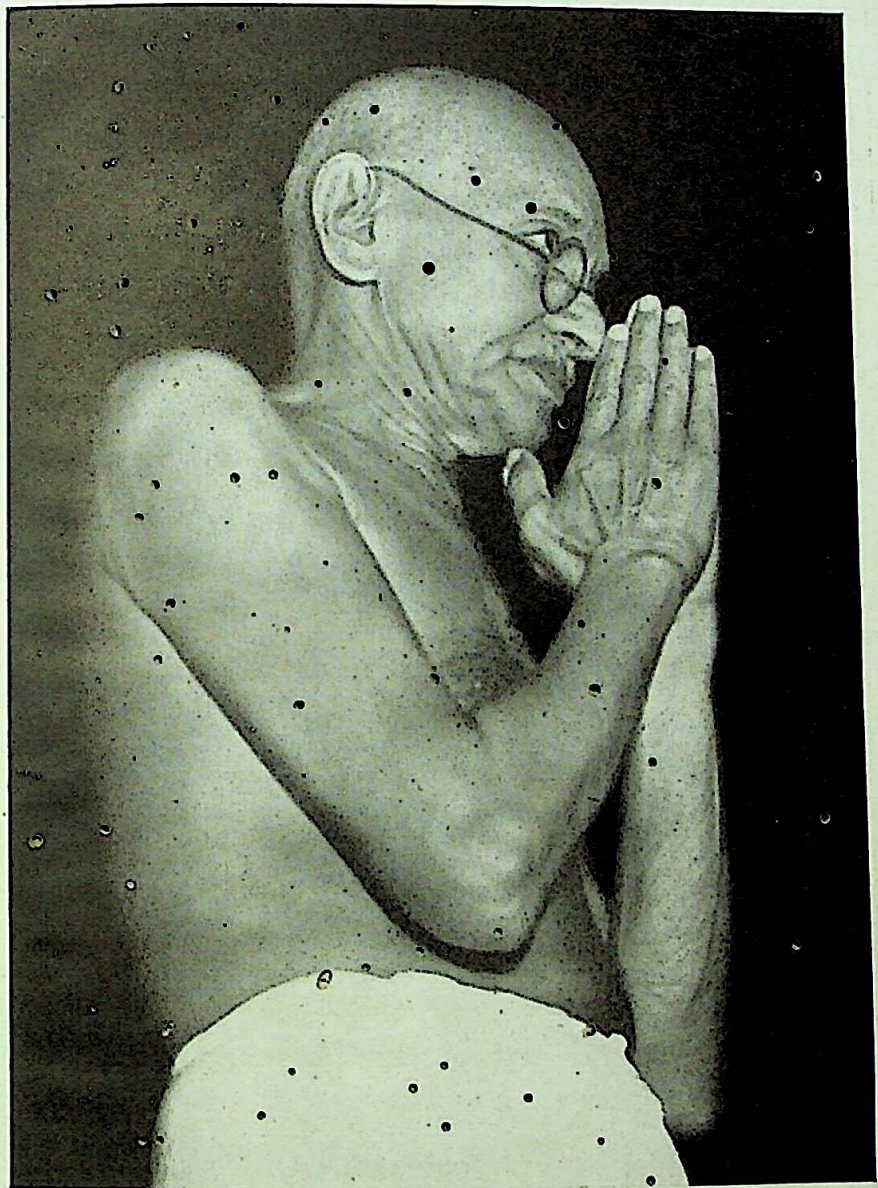
মহাত্মা গান্ধী
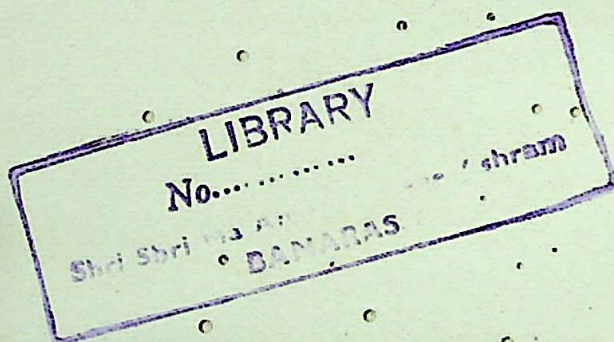
গেলেন, যাহা বিশ্ব-মানব-সভ্যতার-দরবারে চিরদিনের তরে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিবে! জাতির জনকের মৃত্যুতে যাঁহারা প্রকৃতই কাতর; এই আশ্বাস-বাণীই তাঁহাদের পরম সান্ত্বনা।

আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষিদের আদর্শের প্রতি এই দেশের মজ্জাগত শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই, এই জাতি এতকাল ধরিয়া, এত ঝড়-তুফানের মাঝেও নিজ সংস্কৃতি অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অধিক কি, মহাত্মার আদর্শে কথঞ্চিৎ অনুপ্রাণিত বলিয়াই, এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার এত অল্পকাল মধ্যেই, সমগ্র সভ্যজগতের এতাদৃশ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে! শুধু এই কারণেই প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজী,—যাঁহাকে মহাত্মাজী তাঁহার ভাবী যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন; এবং মহাত্মার আদর্শধারক উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণজী—যিনি বর্ত্তমানে ভারতের সংস্কৃতির যোগ্য পথপ্রদর্শক;—ইঁহারা উভয়েই আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবগণের অন্যতম বলিয়া গরিগণিত। এবং এই একই কারণে, আজ সমগ্র জাতি-সঙ্ঘের বিশ্ব-দরবারে, সভানেত্রীর গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদ একজন ভারতীয়-মহিলার (শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মীর) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে! চিন্তাশীল মানব মাত্রেরই উহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

আমাদের দেশে ত্রিকালজ্ঞ চিন্তানায়ক ঋষিগণ আর্য-প্রজ্ঞার ফলে ঐ 'ভোগের' ভ্রান্ত পথে না ছুটিয়া চরম-পরম-কল্যাণকর,—'ত্যাগের' পথে চলিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। একমাত্র ইহার দ্বারাই জগতে যথার্থ স্থায়ী শান্তি বিরাজ করা সম্ভব।

ঋষিগণের প্রজ্ঞায় প্রবর্ত্তিত আমাদের 'আধ্যাত্মবাদ' অন্ততঃ আট হাজার বৎসরের অধিক কাল আমাদের দেশকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার বিনিময়ে এই একহাজার, দেড় হাজার, বৎসরের বাহ্য চাকচিক্যময়, ঐহিক ভোগসর্ব্বস্ব সভ্যতার (যাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনই নিশ্চয়তা নাই এবং এখনই ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া অনুমিত

হইতেছে !) যূপকাষ্ঠে বলিদানের উদ্ভট প্রয়াস কতদূর সঙ্গত তাহা চিন্তাশীল মহানুভাবগণ মাত্রই বুঝিবেন !

কালে কালে যখনই জড়বাদ-মূলক আসুরিক শিক্ষা ও সভ্যতা প্রবল হয় এবং ঐহিক-ভোগসর্ব্বস্ব মানব-সমাজ হইতে পরমার্থ-চিন্তা বিলুপ্ত হইতে থাকে,—যাহাতে 'ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান' হইয়া জগতে বিষম বিপর্য্যয় ঘটাইয়া জগৎবাসীকে 'অতিষ্ঠ' করিয়া তোলে, তখনি ভগবদ্-বিধানে তাহা প্রশমন (বা ভূভার হরণ) জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইয়া নূতন সভ্যতার সূত্রপাত হয় ।—দ্বাপরের শেষে, ঐরূপ অসুর স্বভাবের অতিমাত্রায় প্রাবল্য ঘটায়, তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য, ভগবৎ-ইচ্ছায় কুরুক্ষেত্র সমরানল প্রজ্বলিত হইল এবং ঐ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে এক নূতন সভ্যতার সূচনা হইল। তখনও এইরূপ বিশ্বব্যাপী বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া জগৎকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছিল এবং তখনও এইরূপ অতি ভীষণ ভীষণ মারণ অস্ত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল! ভীষ্মদেব এক নিমিষে দশহাজার সৈন্য সংহার করিতে পারিতেন! দুর্ব্বার বিশ্বধ্বংসকারী ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার ও সংহরণ অনেকেই জানিতেন। বিরাট-নগরে গোধনহরণ-কালে, অর্জ্জুন একক এক সম্মোহন-বাণে সমগ্র কুরুসৈন্যকে সম্মোহন করিয়াছিলেন ! আবার এক নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসকারী পাশুপত অস্ত্রও তাঁহার আয়ত্তে ছিল। এই ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপতঅস্ত্র আধুনিক আনবিক বোমা, হাইড্রোজন বোমা, হইতে কোন অংশ ন্যূন নহে। এই সঙ্গে একঘ্নী-বান, বিবিধ আগ্নেয় অস্ত্র, বারুণ অস্ত্র, সর্পবাণ, গড়র বাণ প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র সকল প্রচলিত ছিল। আবার ত্রেতার শেষে দেখি, সমগ্র ধরণী রাক্ষসভারে প্রপীড়িত ; ভোগের এত আতিশয্য যে তাহাদের বসত-ভুমিটি 'সোনার-লঙ্কা' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তখনও ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র, শক্তিশেল, নাগপাশ, শব্দভেদি বাণ, এবং ব্রহ্মাস্ত্রেও প্রচলন ছিল এবং জঙ্গী বিমানে আরোহণ করিয়া মেঘের উপর হইতে বোমাবর্ষণ

এবং পুষ্পক-রথে গমনাগমন ইত্যাদি সবই ছিল। এই সকল ভীষণ অস্ত্র পরিশেষে তাহাদের নিজেদেরই ধ্বংসের কারণ হইল এবং তাহাদের ধ্বংসের সাথেই ঐ সকল রোমহর্ষণ অস্ত্রগুলিও ভগবৎ-ইচ্ছায় বিলুপ্ত হইল। কালে কালে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ও ঘটিবে।

বর্ত্তমানেও জড়বাদ-প্রমত্ত ইন্দ্রিয়ভোগ-সর্ব্বস্ব অসুর স্বভাব সম্পন্ন মানব-সভ্যতার-ধ্বংসাবশেষে নবযুগের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে নির্গমনোন্মুখ কলির শেষ ও প্রবলতম আঘাত হইতে জগৎকে রক্ষা করিতে হইলে একান্ত-জড়বাদ-মূলক শিক্ষা ও সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, আমাদের আর্য্য-ঋষিদের প্রদর্শিত, (বর্ত্তমান 'সাম্যবাদের' পরিবর্ত্তে). আধ্যাত্মিক-বাদের পথে পরিচালিত করিবার জন্য,—জড়ের উপর চৈতন্যের মর্য্যাদাকে; ব্যবহারিকের উপর পারমার্থিক আসনকে, সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমূলে ধ্বংস হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার এই গুরু দায়িত্ব বর্ত্তমান সভ্য সমাজের উপর,—বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যঋষি বংশোদ্ভবগণের উপরই সংন্যস্ত রহিয়াছে। এক্ষণে এ বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া আর্য্যসন্তান মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ঘন-ঘটাচ্ছন্ন বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী আঁধার হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত প্রাচ্য মনীষিগণের অন্যতম ইয়ং হাজ্‌বেণ্ড (Young Husband) প্রমুখ মহানুভাবগণ সময়োপযোগী আলোক-বর্ত্তিকা পাইবার প্রত্যাশায় ভারতের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছেন।*

পুরাণে বর্ণিত আছে, মহর্ষি নারদ একদিন বৃন্দাবন শোভাহীন দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, এক গোপী বলিলেন,—"নারদ! অঙ্ক শাস্ত্র জান?—একে শূন্য দিলে কত হয়?—১০; তাহাতে শূন্য দিলে ১০০; তাহাতে শূন্য দিলে ১০০০,—এইরূপ প্রতি শূন্যতে দশগুণ বৃদ্ধি হইয়া—লক্ষ,কোটী, অর্ব্বুদ ইত্যাদি হয়। এক্ষণে পশ্চাতের 'একটি' মুছিয়া

* পরম পূজনীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় প্রণীত "শ্রীশ্রীনাম-চিন্তা-মণি" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে ইহার সবিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ফেল, দেখিবে সব শূন্য! শ্রীবৃন্দাবনের এখন সেই অবস্থা !—এক শ্রীকৃষ্ণ বিহনে এখন সব 'শূন্যে' পরিণত হইয়াছে!—আমাদেরও তদ্রূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য—সেই এক ভগবানকে (ধর্ম্মকে) বাদ দিয়া সমগ্র দেশটা হৃতশ্রী হইয়া, সেই 'শূন্যে' পরিণত হইয়াছে! সহরগুলি পাশ্চাত্য আসুরিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, বাহ্যে চাকচিক্যময় দৃষ্ট হইলেও, ভিতরটা যেন অন্তঃসার শূন্য, প্রাণহীন, এবং এখন তাহাদের সংস্পর্শে নিকটস্থ গ্রামগুলিও, যাহা পূর্ব্বে বারো মাসে তের পার্ব্বনে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, ঐ সকল উৎসবাদি এক্ষণে নামে মাত্র পর্য্যবসিত হওয়ায়, নির্জীব অবসাদগ্রস্ত লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার মাঝে একটি বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে, এখন কোন গ্রামে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ঐ গ্রামে কুত্রাপি কোন জমীদার, বা বড়লোকের, পুরাতন পাকাবাড়ী বা তাহার কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু উহা যত ক্ষুদ্র বা গরীবের বসতি হউক, উহাতে জীর্ণ, পতনোন্মুখ, দেবমন্দির বর্ত্তমান। ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, তৎকালে জমীদারগণ হাজার সঙ্গতি সম্পন্ন হইলেও কদাচ নিজ-বসবাসের জন্য পাকাবাড়ী করিতেন না— সাধারণের মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া তাহাদের মধ্যে সুখ দুঃখের ভাগী হইতেন এবং মজুত ধান্যাদি দ্বারা দুর্ভিক্ষাদির সময় বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়, ধর্ম্মশালা, দেবদেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মান করিয়া,—"বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়", সঞ্চিত অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতেন এবং তাহার ফলে দেশে তাঁহাদের উপর কাহার ঈর্ষা, বিদ্বেষ জগ্রত হইত না এবং আধুনিক 'কমিউনিষ্ট'-গণের মত কাহার দ্বারা জোর করিয়া তাঁহাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি হইত না। ইহাই ছিল তৎকালে তথাকথিত রামরাজত্বে বাস।

পূর্ব্বকালে কোন গ্রামে কেহ বড়লোক হইলে গ্রামবাসী সকলেই আনন্দিত হইত, তাহার কারণ, তাহারা কোন দায়-বিপদে তাঁহার নিকট

সাহার্য্য পাইবার এবং তাঁহা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দোল দুর্গোৎসবাদি পূজা পার্ব্বণে তাঁহারা সকলেই আনন্দের ভাগী হইবার প্রত্যাশা রাখিত। বর্ত্তমানে ঠিক তাঁহার বিপরীত। এখন কোন গ্রামে কেহ (বিশেষতঃ নব্য ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়) বড়লোক হইলে সকলেরই আতঙ্ক পাছে তিনি তাঁহার আধুনিক সভ্যতার হালচালে গ্রামবাসীর ঈর্ষা ও দ্বেষাদি জাগাইয়া তোলেন এবং নিজ ভোগবিলাসের জন্য পাকা বাড়ীঘর করিয়া চারি পার্শ্বের গৃহস্থের আবরু নষ্ট করেন এবং দুর্গন্ধময় পাকা ড্রেনের জলে রাস্তা ও পাড়া দূষিত করিয়া, একটা উৎপাতের কারণ হ'ন!

এদিকে দেবদেবীর মন্দিরগুলি সংস্কার অভাবে পতনোন্মুখ ও সাপ, বেঙ, চামচিকার আবাস ভূমি হইয়াছে এবং দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি ক্রমে আত্মসাৎ করায় বিগ্রহগুলি,—তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের 'নিগ্রহে'র নিদর্শনস্বরূপ, বর্ত্তমানে 'গলগ্রহে' পরিণত হইয়াছে! পূজাপার্ব্বনাদি বিলুপ্ত প্রায়! দেশ হইতে পূর্ব্বের সে আনন্দ যেন চির নির্ব্বাসিত!

ইহার একমাত্র প্রতীকার, স্বামীজী প্রমুখ মনীষিগণের হিতবাণীতে শ্রদ্ধা ও তাঁহাদের আনুগত্যে আমাদের জাতীয় স্বভাব পুনপ্রতিষ্ঠা করতঃ, সংস্কৃতির বিজয় (Cultural Conquest)* হইতে দেশকে সর্ব্বতঃ ভাবে সংরক্ষণ। এই সংস্কৃতি-বিজয় যদি কোনদিন ঘটে তাহা হইলে পরিণামে আমাদের আর্য্য সভ্যতার বিলোপ সাধন অনিবার্য্য।

স্বামীজী বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছেন—

"যদি এদেশে দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে, তারতো এখন উপায় নাই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়িতে গেলেই, সব যাবে বইতো নয়।···(দেশের অন্তঃস্থলে প্রবেশকরিলে) দেখ্‌বে যে, দেশের প্রাণ—ধর্ম্ম, ভাষা—ধর্ম্ম, ভাব—ধর্ম্ম; আর তোমার

---

*Cultuaral Conquest বড়ই সর্ব্বনাশা জিনিস। ইহার বিশেষ তথ্য জানিতেJustice Woodroff সাহেবের—"Is India civilized ?" নামক পরম উপাদেয় গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

রাজনীতি, রাস্তাঝেটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তগণকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যাহা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্যদিয়া হয়ত হবে; নইলে 'ঘোড়ায় ডিম,' তোমায় চেঁচামেচিই সার,—"রামচন্দ্র!" অন্যত্র বলিয়াছেন—"ধর্ম্মই আমাদের শোনিত স্বরূপ। যদি ঐ রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমনকি, আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্য দোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে।...আর আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ধর্ম্মই আমাদের তেজ, বীর্য্য, এমনকি, জাতীয় জীবনের পূর্ণ ভিত্তি।"..."ধর্ম্মই কেবল ভারতের যথার্থ মেরুদণ্ড স্বরূপ।... ধর্ম্মের প্রাধান্য ভারতবর্ষে চিরকাল,"..."ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তি। আর যতদিন ইহা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতে এমন শক্তি নাই যে এই জাতির বিনাশ সাধনে সক্ষম।... "হিন্দু যদি ধার্ম্মিক না হয় তবে আমি তাহাকে হিন্দু বলি না।"

'ভারতে বিবেকান্দ'—৪০৩ পৃঃ

অন্যত্র বসিয়াছেন—"স্মরণ রাখিবে তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমার তিন পুরুষ যাইতে না যাইতে বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্মছাড়িলে হিন্দুর মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল,—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল;—সুতরাং ফল দাঁড়াইল সম্পূর্ণ ধ্বংস!"

আবার বলিয়াছেন—"আমি সারাজীবন কার্য্য করিতেছি, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না।" ভাঃ বিঃ—

এইরূপ, কবিবর রবীন্দ্রনাথের "বিলাসের ফাঁস" ও 'ততঃ কিম্?' প্রভৃতি প্রবন্ধে; শ্রীঅরবিন্দের "ভারত কি সভ্য?" পুস্তকে, এবং মহাত্মা গান্ধীর "হিন্দ্ স্বরাজ" প্রভৃতি পুস্তিকায় সকল মনীষিগণের নিকট এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমার

কাতর অনুনয় এই যে, ভারতের যথার্থ কল্যাণকামী সুধীবৃন্দ, আপনারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া জাগ্রত হউন এবং দেশকে যথার্থ কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে আন্তরিক যত্নবান হউন! ভগবান্ অবশ্যই আপনাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন।

এই 'প্রশ্নোত্তর' গুলি লিখিবার ইতিহাস এই খানে একটু উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। স্ব-গ্রামবাসী আমার পরম স্নেহভাজন, দেবীভক্ত শ্রীমান উমাচরণ বসু সাধারণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবদিগের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া এক প্রকার বিদ্রূপ করিয়াই, কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়া প্রত্যুত্তর আশায় কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে এবং আমাকে পঠাইয়া দেয়। সেই গুলি পাইয়া প্রথমে আমি উপেক্ষার ভাব পোষণ করি; পরে ঐ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে শুধু তাহার একার নয় পরন্তু, আধুনিক শিক্ষিত সমাজে অনেকেই এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন বুঝিয়া, ঐ প্রশ্ন গুলির যথাযথ সমাধান হইলে, সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা জ্ঞানে, যথাজ্ঞান প্রত্যুত্তর লিখিতে আরম্ভ করি। উহার প্রথম প্রশ্ন ছিল—'আর্ত্তসেবা উপেক্ষা করিয়া হরি-ভজন কর্ত্তব্য কিনা'?— সুষ্ঠুভাবে ইহার প্রত্যুত্তর লিখিতে গিয়া দেখিলাম, প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ হইয়া গেল এবং তাহা অনেকের নিকট বিশেষ রুচিকর হইল। তাহাতে উৎসাহ পাইয়া,ঐ ধরণের অনেক প্রশ্নের উত্তর লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রীমান উমাচরণই আমার এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক এবং তাহারই প্রেরণা সূত্রে এতটা সময় পারমার্থিক চিন্তায় নিয়োগ করিবার সৌভাগ্য ঘটিল, এ কারণ আজ আমি তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ঐ সময়ে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় 'মন্দির' পত্রিকাখানি প্রবর্ত্তন করিলেন এবং আমার সতীর্থ পরম শ্রদ্ধেয় ৺নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সহকারী রূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ পত্রিকাতে প্রবন্ধ দিবার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায়, ঐ পত্রিকাতে 'প্রশ্নোত্তর' নাম দিয়া ধারাবাহিক রূপে প্রবন্ধ

গুলি পাঠাইতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে পূজনীয় দরবেশ মহাশয় আমার ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠ করতঃ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। সাধারণের অবগতির জন্য তাঁহার একখানি চিঠি,—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত রূপে, প্রথমেই প্রকাশ করিলাম। ইহা ছাড়া 'মন্দিরে' প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলে, সুধী সমাজ আশাতীত সুখ্যাতি করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন, এবং কেহ কেহ এইগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। এতদিনে তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ করিবার সৌভাগ্য ঘটিল এজন্য আজ আমি পরম আনন্দিত।

প্রবন্ধগুলি 'প্রশ্নোত্তর' নাম দিয়া 'মন্দিরে' বাহির হয় এজন্য সমগ্র পুস্তকখানির নাম হইবে "প্রশ্নোত্তরমালা" এইরূপই আমার সঙ্কল্প ছিল। পরে 'প্রভু প্রেসের' অধ্যক্ষ আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পুস্তকটির নামকরণ লইয়া আলোচনা হয় এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে ও সুসিদ্ধান্ত বাক্যে ইহার 'শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন' এই তাৎপর্য্য পূর্ণ নাম রাখিবারই স্থির হয়। বন্ধুবরের প্রেরণাতেই এই নামকরণটি সাধিত হয় এজন্য আমি তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ।

উপসংহারে জানাইতেছি যে, আমার শাস্ত্রজ্ঞানাভাব ও অজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ প্রবন্ধওলি সঙ্কলনে আমি বহু গ্রন্থ হইতে, সাধু সজ্জনের সেবার্থে, বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, সে কারণ ঐ গ্রন্থকারগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহারা কৃপা করিয়া নিজগুণে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, এই করযোড়ে ভিক্ষা। আমাদের গ্রামের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে এই প্রবন্ধ গুলির পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দেওয়ায় এবং আমার পরম প্রিয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জীবেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সমগ্র পাণ্ডু লিপি খানি, প্রীতি-পরবশ হইয়া, সাতিশয় আগ্রহ সহকারে পাঠ, ও স্থানে স্থানে ইহার ভাষা সংশোধন করিয়া দেওয়ায়, আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ইহা ছাড়া আমার সতীর্থ, প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত কালিদাস বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রণ ও ইহার সহিত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থগুলি (শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীজীউ অদ্যাবধি যে গ্রন্থরূপে বিরাজ করিতেছেন) পুনর্মুদ্রণ কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান নীরদগোপাল বসু ও শ্রীমান লতিতমোহন মিত্র অতীব যত্ন সহকারে এই গ্রন্থের প্রুফগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছে এবং আমার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীমান প্রবোধ-গোপাল ঘোষ বিশেষ শ্রমসহকারে সমগ্র গ্রন্থখানির বর্ণাশুদ্ধির একটি তালিকা করিয়া দিয়াছে। ভগবান তাহাদের চিরকল্যাণ করুন এই তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি। আর বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানির অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থগুলি প্রচারে উদ্যোগী, আমার সতীর্থ পরম প্রীতিভাজন শ্রীল অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত পরম প্রীতিভরে এই গ্রন্থের ছবিগুলি আমার আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

পরিশেষে পরম কৃতজ্ঞতা সহকারে জ্ঞাপন করিতেছি যে, সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীল কেদারনাথ ভাগবতাচার্য্য মহাশয়, বিশেষ কৃপা করিয়া, আমার এই প্রবন্ধগুলি অতীব যত্ন সহকারে আগাগোড়া পাঠ করিয়া, ইহার ভাষা, ভাব ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য জ্ঞাপন করতঃ, এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে 'অভিমত' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি পরম কৃতার্থ হইয়াছি। প্রত্যুতঃ, তাঁহার মত অগাধ শাস্ত্রাভিজ্ঞ, পরম ভাগবতের প্রকৃতই যদি এই প্রবন্ধগুলির দ্বারা বহু সংশয় নিরসন হইয়া থাকে এবং শাস্ত্র বাক্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা জাগরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। অধিকন্তু, যদি সুধী-সজ্জন-সমাজের এইভাবে সেবা করিবার আমার সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইতে আর অধিক ভাগ্যের কথা কি আছে ?

যাঁহাদের সেবার্থে 'শ্রীশ্রীগুরুকৃপার দান-স্বরূপ' এই গ্রন্থখানি* সঙ্কলন হইল, তাঁহাদের চরণধূলি মস্তকের ভূষণ করিয়া এই ভূমিকা সমাপ্ত করিলাম।

গৌর-পূর্ণিমা
৫ই চৈত্র, ১৩৬০

ভক্তপদরজঃ প্রার্থী
দাসানুদাস
শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার

চিত্র-সূচী

* এই গ্রন্থের সমগ্র আয় আমাদের নব-প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবায় ব্যয়িত হইবে। ভক্তদের সেবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানির মূল্য যথাসাধ্য কম করা হইয়াছে।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

(১) ভগবৎ-ভজন ও আর্ত্তসেবা

(২) অহল্যাকে অভিসম্পাত

(৩) অহল্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়া কেন ?

(৪) শম্বুকের শিরশ্ছেদন

(৫) বেদব্যাসের জন্ম

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

(১৬) অজামিল উদ্ধার

(১৭) দৈব ও পুরুষকার

(১৮) পরলোক, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান

বিষয় পৃষ্ঠা

(১৯) জন্মান্তরের অস্তিত্ব

(২০) জাতিভেদ

(২১) বিধবা বিবাহ

বিষয় পৃষ্ঠা

(২৬) রামানন্দ মহাপ্রভু সংবাদ

(২৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকবিগর্হিত লীলা

(২৮) শ্রীশ্রীরাসলীলা

শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন

(প্রশ্নোত্তরমালা)

ভগবৎ-ভজন ও আর্ত্তসেবা

(১) প্রশ্ন ঃ—ভগবৎ-ভজন ও আর্ত্তসেবার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? পথিপ্রান্তে কোন্ অসহায়, মুমূর্ষু রোগী দৃষ্ট হইলে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া কদাচ কোন ভক্তের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর ঃ—সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য সমান নহে। যিনি যে স্তরের মানব, তাঁর পক্ষে তদুপযোগী কর্ত্তব্যই শাস্ত্রে বিহিত আছে। তিনি যথাযথ সেই কর্ত্তব্য পালন করিলেই ভগবানের প্রীতি অর্জ্জনে সমর্থ হইবেন। সাধারণ মানব যে স্তরে অবস্থিত, তাহাতে তাঁহার এ ক্ষেত্রে ঐ মুমূর্ষু রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করিলে প্রত্যবায় হইবে, বলাই বাহুল্য। তাই বলিয়া, রোগীর শুশ্রূষাই সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য, এ ধারণা একান্ত ভ্রান্ত, এজন্য ঐ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির আচরণ বিভিন্ন রূপ। যদি কোন সাধারণ দয়ালু ব্যক্তি ঐ পথে যাইতেন, তবে তিনি নিজেই ঐ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন। পক্ষান্তরে, যদি কোন ভগবৎ-ভজনানন্দে বিভোর উচ্চ স্তরের প্রেমিক ভক্ত ঐ পথে যাইতেন, তিনি হয়ত তাঁর কোন অনুগত জনের উপর ঐ কার্য্যের ভার অর্পণ করতঃ, স্বয়ং তৎসন্নিধানে ভগবৎ নাম-গুণ-কীর্ত্তনাদি ও তাঁর চরণামৃত পানের ব্যবস্থা করিয়া ঐ রোগীর ইহ-রোগ ও ভব-রোগের মহৌষধির ব্যবস্থা

করিতেন, এবং তাহাই স্থূল দেহ-সেবাপেক্ষা ঐ রোগীর অধিকতর কল্যাণকর মনে করিতেন।

কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যবহার সকলের পক্ষে সমান নহে। এ সমস্তই বিভিন্ন স্তর ভেদে বিভিন্নরূপ। কোন স্থানে কলেরা বা বসন্ত আদি মহামারির প্রাদুর্ভাব হইলে, ঐ প্রথম স্তরের মানব, রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় স্তরের মানব তদ্ব্যতীত যথাযোগ্য হোম, স্বস্ত্যয়ন, নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার নিষ্ঠানুযায়ী উহাতেই অধিকতর ফলও লাভ করেন।

স্থূল শরীরের শুশ্রূষা অনেকেই করিতে পারেন; কিন্তু কাহার ভবরোগের চিকিৎসা অতি অল্প ভাগ্যবান ব্যক্তিই করিতে সমর্থ। যাঁহারা ইহাতে সমর্থ, তাঁহারা কদাচ উহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন না। এ কারণ, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োগ-প্রণালী, বিভিন্ন স্তরের মানবের বিভিন্ন প্রকার হওয়াই সঙ্গত। যিনি এম্-এ ক্লাশে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষে ঐ সময়টায় বালকদিগকে "শিশুশিক্ষা" পড়াইতে যাওয়া, সময়ের ও সামর্থ্যের অপচয় ও অপব্যবহার মাত্র। এজন্য কেহ উন্নত স্তরে উঠিলে তদনুরূপ শক্তির প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত; এবং কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত নিম্নস্তরের ব্যক্তির পক্ষে উন্নত স্তরে আরোহণ-কল্পে স্থূল-দেহের সেবাতেই সমধিক যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা তিনি সময় ও শক্তির অধিকতর সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন; পরন্তু, যিনি যতক্ষণ যে স্তরে বর্ত্তমান, ততক্ষণ সেই স্তরের কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া, কদাচ উন্নততর স্তরের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে প্রয়াস পাওয়া সঙ্গত নহে। ভগবান বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥"

গীতা—১৮।৪৭

সকল মানুষের মধ্যে পাঁচটী আবরণ বর্ত্তমান,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। এইগুলি যার যে পরিমাণে, উন্মুক্ত, তিনি সেই পরিমাণে উন্নত। মনে করুন, (১) এক ব্যক্তি শরীর পোষণ উপকরণার্থে কৃষিকার্য্যাদি করিতে সমর্থ। (২) দ্বিতীয় ব্যক্তি, চাষাদি ও রোগীর শুশ্রূষা, অর্থাৎ, শরীর ও প্রাণ রক্ষণ কার্য্য, উভয়ই করিতে সমর্থ। (৩) তৃতীয় ব্যক্তি, ঐ দুইটি কার্য্য এবং মনেরও উৎকর্ষ সাধনার্থ বিদ্যাদানেও সমর্থ। (৪) চতুর্থ ব্যক্তি, এইগুলি ত পারেনই, অধিকন্তু পারমার্থিক শিক্ষা দান করিতেও সমর্থ এবং (৫) পঞ্চম ব্যক্তি, সাধনের চরম স্থানে উঠিয়া, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতির ন্যায়, নিজে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া, অপরকেও ঐ রসামৃত আস্বাদন করাইতে সমর্থ।

এক্ষণে মনে করুন, ঐ পাঁচ জনেরই হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় আছে এবং ঐ পাঁচ জনেরই সম্মুখে, একই সময়ে, ঐ পাঁচ প্রকার কার্য্য করিবার সুযোগ উপস্থিত। এখন যদি কোন উচ্চ স্তরের ব্যক্তিকে নিজ শ্রেষ্ঠ শক্তি সামর্থ্যের অনুরূপ কার্য্য ত্যাগ করিয়া, নিম্নস্তরের কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষ্যে তাহা দুর্ভাগ্যের কথা। তবে যদি লোক-শিক্ষার জন্য, স্বেচ্ছায় কখনও তিনি নিম্নস্তরের উপযোগী কার্য্য করেন, সে কথা স্বতন্ত্র। স্বয়ং ভগবানও অবতীর্ণ হইয়া লোক-শিক্ষার জন্য সময় সময় সাধারণ লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহার কারণ—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

গীতা—৩।২১

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শেখায়" (চৈঃ চঃ)। তাই বলিয়া, ঐ পঞ্চম স্তরের উন্নত ব্যক্তি যদি সাধারণ মানুষের যোগ্য সেবা-শুশ্রূষাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন, তাহা হইলে জগতের যথার্থ কল্যাণ

হয় না। এই জন্যই বিভিন্ন স্তরের কর্ত্তব্যও শাস্ত্রানুসারে দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে বিভিন্ন রূপে ব্যবস্থাপিত।

আবার দেখুন, ঐ পাঁচ জনের প্রত্যেকের হাতে কয়েক হাজার টাকা আসিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির দরিদ্র-ভোজনাদি পুণ্য কার্য্য ব্যতীত, অপর উন্নত স্তরের কার্য্য করিতে প্রবৃত্তিই হইবে না। কিন্তু ঐরূপ ভোজনে দরিদ্র ব্যক্তিদের, হয়তবা, একদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্ভব। পরদিন ঐ দরিদ্র ব্যক্তিগণ স্থূল দেহের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করিবে কিরূপে সে চিন্তার উদয় হইলেই ঐরূপ ভোজন ব্যবস্থার সম্যক উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয় হয় না কি ? দ্বিতীয় ব্যক্তি, দরিদ্রদিগের তদপেক্ষা স্থায়ী কল্যাণকর পথের সন্ধান জ্ঞাত আছেন ; কাজেই তিনি দরিদ্র সাধারণের প্রাণ রক্ষার জন্য ঐ টাকায়, হয়ত, ঔষধ বিতরণ, বা, চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিবেন। তৃতীয় ব্যক্তি, উহাতেও তুষ্ট না হইয়া, উহাপেক্ষাও স্থায়ী কল্যাণকর অনুষ্ঠান অবগত থাকায়, তাহাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন জন্য, বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া দিবেন। চতুর্থ ব্যক্তি, কেবলমাত্র অনিত্য মাসসিক উৎকর্ষে পরিতুষ্ট না হইয়া, যাহাতে তাহাদের পারমার্থিক শাশ্বত কল্যাণ সাধিত হয়, ঐ অর্থ তদনুকূল-কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, অর্থাৎ, তাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি লোপ করিয়া পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধন জন্য—দেবার্চ্চনা, ভাগবতপাঠ, নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি ধর্ম্ম-চর্চ্চার অনুকূল ব্যবস্থা করিয়া তবে তৃপ্তি লাভ করিবেন। পঞ্চম ব্যক্তি, আবার সাধারণকে মহোৎসবাদি দ্বারা তাঁহার নিকট আনাইয়া, কিংবা তাহাদের নিকট স্বয়ং গমন করিয়া, তাহাদিগকে দর্শন, স্পর্শন, দীক্ষাদি দ্বারা সাধন-শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবেন। যেমন, মহাপ্রভু—

> "বাহুতুলি হরিবলি প্রেম দিঠে চায়।
> করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥"

চৈঃ চঃ—৩।৪৮

"এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূরদরশনে॥" চৈঃ চঃ—২।১৬।১২০

অথবা, যাঁহাদের টাকা তাঁহাদের পরম কল্যাণার্থ মহোৎসব, নাম-যজ্ঞাদি কার্য্যে ঐ টাকা ব্যয়িত করিবেন। যেমন, রাজপুত্র রঘুনাথের সংসার বন্ধন ঘুচাইতে নিতাইচাঁদ তাঁর অর্থে পাণিহাটিতে "দণ্ড মহোৎসবের" ব্যবস্থা করিলেন।

এইখানে বিচার্য্য এই যে, নিজ স্তরে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলে কেহই ছোট নয়। সকলেই ভগবানের সমান প্রীতির পাত্র হইবেন। তবে উন্নত স্তরে আরোহণ করিবার, ও সেই স্তরের কার্য্য পাইবার জন্য, আন্তরিক চেষ্টা থাকাও সকলের কর্ত্তব্য। পরন্তু, কোন স্তরের কর্ম্মই উপেক্ষণীয় নয়।

"যে কার্য্য করিলে; মনুষ্য সুখ পা'ন—উৎসাহ পা'ন, দিন দিন আত্মার বিকাশ হইতে থাকে, সেই কাজই তার জীবনের ব্রত।··· মুটের কাজ, মুটে করিবে—ধর্ম্ম প্রচারকের কাজ, ধর্ম্ম-প্রচারক করিবেন,—কোন কাজই ছোট নহে।" শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর—"বক্তৃতা ও উপদেশ"

এইখানে সুচতুর ব্যক্তির পক্ষে একটা বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মহাপ্রভু আমাদের অপেক্ষা কিছু কম বুদ্ধিমান ছিলেন না। তিনি এ সমস্তই জানিয়া শুনিয়া, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও, কেন আপামর সাধারণের জন্যই নাম সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন? সকল স্তরের লোকের জন্য কেন একই চরম পরম কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন, ইহার গূঢ় রহস্য কি? ইহাতে মনে হয়, কলিহত জীবের মজ্জাগত স্বভাব বুঝিয়া, তাহার ধাতে যাহা সহিবে, ভবরোগ মহাবৈদ্য তাহাদের জন্য ঐ একমাত্র ঔষধেরই ব্যবস্থা করিলেন। যথাযোগ্য অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ "অমানী মানদ" হইয়া, নিষ্ঠার সহিত ঐ ঔষধটি ব্যবহার করিলে, জীব অচিরে শুদ্ধচিত্ত হইয়া, প্রেমানন্দের অধিকারী হয়। তাহাতে নিম্নস্তরের আবরণগুলির আপনা আপনি উন্মোচন হইয়া যায়। সেজন্য আর পৃথক চেষ্টা, বা,

সাধনের প্রয়োজন হয় না। এ কারণ, পুলকিত-অন্তরে মহাজনগণ গাহিয়াছেন—"ভাব-গজেন্দ্রে চড়ায়ল অকিঞ্চনে, ঐছন পুঁহুক 'বিলাস।" যেমন কেহ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, ঐ হস্তীই তাহাকে নদ, নদী, গিরি, কন্দর, বন, জঙ্গল, কণ্টকাদি অতিক্রম করাইয়া, তাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, তদ্রূপ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান যদি একবার ভাবরূপ গজেন্দ্রে আরোহণে সমর্থ হ'ন, তাহা হইলে সেই ভাব-গজেন্দ্রই সাধকের সকল বাধা বিঘ্ন ধ্বংস করতঃ, তাহার স্বরূপ জাগাইয়া, তাঁহাকে পরাগতি দানে সমর্থ হয়। অতিবড় দুর্জ্জন পাষণ্ড জগাই মাধাই প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অধুনাও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও আমাদের সাধারণকে কলিযুগোপযোগী এই সহজ, সরল, সুগম, ভক্তিযোগের পথই নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত মা'কে ডাকিতে থাকায়, যথাসময়ে তাঁহার প্রেমানন্দের উদয় হয় এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য আবরণগুলিরও উন্মোচন হয়। তিনি কোনও গ্রন্থাদি পাঠ করেন নাই, কেবলমাত্র মায়ের নাম করিতে করিতে পরাবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কোন রোগীর শুশ্রূষা না করিলেও, (বা এ সকল কার্য্যকে ভজনের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও), তাঁহার মত কৃপালু কে? তিনি জগজ্জনের ভবরোগ মুক্তির পথ, এই ভাবে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, ইহা কি এতই সহজ-লভ্য? তদুত্তরে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, 'অমানী মানদ' হইয়া যথাযথ অনুপানসহ, (এবং এক হিসাবে এই অনুপানটী আদৌ কঠিন ব্যাপার নহে,—ইহাতে বিদ্যা, জাতি, কুল, ধন, কালাকাল, শুচি অশুচি, কিছুরই অপেক্ষা নাই,) তাঁর নাম-গুণ কীর্ত্তন করিলে, হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও বহু ভক্তমোহান্ত পরীক্ষিত সত্য। তবে এই

অবস্থা স্থায়ী করিতে হইলে, তদনুরূপ ভজন প্রয়োজন। যদি সৎবৈদ্যের ঔষধ ও অনুপানে শ্রদ্ধা না থাকে,—সে কথা স্বতন্ত্র। বড়লোকের ছেলের অসুখে 'টোট্‌কা' ঔষধে শ্রদ্ধা হয় না, তিনি বড় বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হন; আর কাঙ্গাল,—যার কোনই সম্বল নাই, তিনি ঐ 'টোট্‌কা' ঔষধ পাইয়াই কৃতার্থ হন। তেমনি, অন্য যুগের কঠোর সাধনে সমর্থ ব্যক্তির এই সকল সহজসাধ্য সাধনে (টোট্‌কায়) শ্রদ্ধা না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মত অলস, মন্দবুদ্ধি, কলিহত, দুর্ব্বল জীবের উহাই পরম সম্বল।

অধিকন্তু, ঐ 'টোট্‌কা' ঔষধটি যার তার ব্যবস্থা নহে—ভবরোগের মহাবৈদ্য স্বয়ং ভগবানের দেশ-কাল-পাত্রোচিত ব্যবস্থা। দ্বিধাশূন্য হইয়া, শ্রদ্ধার সহিত যথাযথ অনুপান-সহ, যিনি ইহা সেবন করিবেন, তিনিই ভবরোগ মুক্ত হইয়া পরাভক্তি লাভ করিবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাহা হইলে আমাদের এক্ষণে নিরাপদ পন্থা এই,—সকলেই নিজ নিজ স্তর উপযোগী অবধারিত কর্ত্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, যতটুকু অবসর ঘটে, ততটুকু সময় ভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি করা,—ইহাই পরম ঔষধ। এই ভাবে নামে যতই অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে, ততই সংসারের, (বা মায়ার,) আসক্তি কমিবে ও লৌকিক কর্ত্তব্য ভার কমিতে থাকিবে এবং চরমে তাঁর প্রেম প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মহৌষধ ও অনুপানের ব্যবস্থা, রাজপুত্র রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া, জগৎকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥"

চৈঃ চঃ—২।১৬।২৪৩

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ সদা কৃষ্ণ নাম লবে।" চৈঃ চঃ—৩।৬।২৫৫

আধুনিক সভ্য জগতের বাহ্যাড়ম্বর, বা চাকচিক্য, দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কিছুই নাই। উহা কবর স্থানের গলিত শবের উপর মর্ম্মর প্রস্তরের চাকচিক্য মাত্র। পৃথিবীর আধুনিক তথাকথিত উন্নত মানবগণ মধ্যে কেহ পূর্ব্বোক্ত তিনটি আবরণের (অন্নময়, প্রাণময়, ও মনোময় কোষের) উর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লইয়াই সকলে ব্যস্ত, তাহার উর্দ্ধে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিকে তাঁহাদের বড় একটা দৃষ্টি যায় না। তাহা হইলেও, ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, যে জাতির মধ্যে সাধারণের হৃদয় যত স্বচ্ছ, (বা, আনন্দময়-কোষের বৃত্তি যে পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত,) সে জাতি, বা, সে মানবই, সেই পরিমাণে যথার্থ উন্নত। ঐ বৃত্তি জাগরণের পক্ষে, ভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি যেমন সহায়ক, তেমনটি আর দ্বিতীয় আছে শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অতি সাধারণ "গোলা" লোকও, ইহার যথাযথ অনুশীলনে, অতি অল্পদিনেই হৃদয়ের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় যে, যাহা আধুনিক অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সুদূরপরাহত। ঐ শ্রেণীর লোক হইতে বহু মহাজন উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের রচিত অপূর্ব্ব পদাবলীই তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উহাদেরই পদাবলীর ভাবধারা অবলম্বনে 'গীতাঞ্জলি' রচনা করিয়া, বিশ্বের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করতঃ, *Nobel Prize* দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন।

তাই বলিয়া কেহ যেন কদাচ মনে স্থানও না দেন যে, আমাদের চারিদিকে রোগ, শোক, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ বর্ত্তমান থাকিতে, ঐ সকলের প্রতিকারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া, আমরা যদি ভজন পরায়ণ না হইয়া, কর্ম্মবিমুখতা ও অলসতা প্রযুক্ত, সাধু বৈষ্ণবের

কপট বেশ-ভূষাধারণ পূর্ব্বক, ধর্ম্মের ভান করিয়া, লোকচক্ষে ধূলি দিবার প্রয়াস পাই, তাহা হইলে কর্ত্তব্য-ত্রুটি জনিত অপরাধ হইতে আমরা কদাচ অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব। চিত্তশুদ্ধিকর ধর্ম্মলাভ অতীব কঠিন কার্য্য। ইহা লাভ করিতে বহু ত্যাগ, তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সংযমাদির প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ যে স্তরের লোক, তাহাতে "অমানী মানদ" হইয়া, ভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা, সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁর বিশুদ্ধ ভক্তির যাজন করা আমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। কিন্তু মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইলে, তাঁহার চরণে শরণাগত ভক্তদের প্রেমলাভ কিছু মাত্র বিচিত্র নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, নিজ স্বরূপ জাগাইবার ও ভগবৎ-প্রেম লাভ করিবার এমন সহজ, অথচ অমোঘ, উপায় থাকিতে জন সাধারণ, বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাহা অবলম্বন করিতে এত বিমুখ কেন? ইহাতে মনে হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মানুষের দাম্ভিকতা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহাতে "অমানী মানদ" হওয়া, বিষম লজ্জা-জনক ব্যাপার এবং হীনতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সকলেই, "আমি ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত," এই সকল অভিমানের বোঝা মাথায় লইয়া সর্ব্বদা মত্ত,—সততই আতঙ্ক, মাথা নত করিলে পাছে অভিমানের বোঝাটি পড়িয়া যায় এবং লোকে তাহাকে ছোট মনে করে! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই স্বভাবের বেশ সুন্দর কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে অবিদ্যা, বা মায়া, নাশের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গীতা—৭।১৪

তাহার সঙ্গেই বলিলেন :—

(কিন্তু,) "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" গীতা—৭।১৫

'আমার চরণে যাহারা শরণাপন্ন হয় তাহারা মায়ার অতীত হইতে সমর্থ হয়,—কিন্তু দুষ্কৃতিশালী, মূঢ়, নরাধম ব্যক্তি আমাতে প্রপন্ন হয় না। কেন না, তাহারা মায়া (অবিদ্যা) দ্বারা অপহৃত জ্ঞান এবং অসুর-স্বভাবসম্পন্ন।' পরে, অসুর স্বভাবের লক্ষণ ভগবান নিজেই বলিয়াছেন ঃ—

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ"। গীতা—১৬।৪

অতএব, "অমানী মানদ" হইয়া ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধা-ভক্তি-অঙ্গের-যাজন সকলের পক্ষে আদৌ সহজ নহে। এ অবস্থায়, তাহারা বরং কোন লোকহিতকর, জনসেবার কার্য্যে সহজে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ, এ কারণে তাঁহাদের ঐ সকল সেবাধর্ম্মে ব্রতী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাহাতে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, পরে তাহারা উন্নত স্তরে,—বিশুদ্ধ ভক্তি-অঙ্গের যাজনে, অধিকারী হইবেন।

আমরা তো নিয়তই নিজ নিজ দেহ ও দৈহিক (পুত্র কলত্রাদি) সেবাতেই পূর্ণ আসক্ত রহিয়াছি। এমত অবস্থায়, ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা সম্ভব না হইলেও, পরম্পরায় আর্ত্তের সেবা ও দীন দুঃখীদের অভাব অভিযোগাদি মোচন করিতে প্রয়াস পাওয়া কদাচ উপেক্ষার বস্তু নহে, পরন্তু, অবশ্য কর্ত্তব্য। এভাবে ভগবৎ প্রীত্যর্থ, পরম্পরায়, তাঁর সেবা করিলে, ক্রমে চিত্তের মালিন্য ঘুচিয়া যায় এবং সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ হয়, তাহাতে সাক্ষাৎ ভজনানুরাগ বৃদ্ধি হয় এবং যথা সময়ে ভগবানে প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" ভাঃ—১১।২০।৯

'ততদিন বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে, যতদিন প্রকৃত বৈরাগ্য না ফুটিবে, বা, আমার কথা শ্রবণাদিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা না জন্মিবে।'

"শ্রদ্ধা"—শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে, সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" চৈঃ চঃ—২।২২।৩৭

'যখন এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, কৃষ্ণ ভজন করিলে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই করা হইয়া গেল, তখন আর পৃথক কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না।' বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে ফল, ফুল, পাতায়, আর পৃথক জল সেচনের প্রয়োজন হয় না—

"গুরুকা নাম শুধারে আকাশ পাতাল।
গুরুকা নাম কাটে সকল জঞ্জাল॥"

মহাত্মা নানক বলিয়াছেন :—

"সর্ব্ব-ধর্ম্ম মহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হরিকো নাম জপি নির্ম্মল কর্ম্ম।"
"সগল উদম মহি উদম ভলা। হরিকা নাম জপহু জীয় সদা।"

সুখমণী—৩।৮

'সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, নির্ম্মল কর্ম্ম, হরি নাম জপ করা।' 'সকল উত্তমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তম, যদি জীব সর্ব্বদা হরি নাম জপ করে।'

যতদিন আমাদের দৃঢ় শ্রদ্ধা না জন্মায়, বা, শ্রদ্ধা মৃদু থাকে, ততদিন আমাদের এদিক ওদিক দুদিক বজায় রাখিয়া চলাই সমীচীন। রোগ হইলে, শুধু চরণামৃত পানে রোগ শান্তি হইবে এই বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে, চরণামৃত পান ও ঔষধ সেবন, উভয় ব্যবস্থাই করিতে হইবে। যতদিন সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবায় শ্রদ্ধা না জন্মিবে, ততদিন সর্ব্ব-জীবে,—"তাঁহারই অধিষ্ঠান" জ্ঞানে, তাঁর প্রীত্যর্থ এইভাবে পরম্পরা-সেবাই প্রশস্ত। ক্রমে যখন তাঁহাতে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইবে, তখন কেবল সাক্ষাৎ সেবাতেই পরিতৃপ্তি লাভ হইবে, পরম্পরা সেবার আর প্রয়োজন থাকিবে না।

এই সকল গূঢ় ভজন-রহস্য ও অধিকারী-নির্ণয়, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এ সমস্তই সাধকের বিভিন্ন স্তর ভেদে, বিভিন্ন আচরণের ব্যবস্থা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা ভাবিবার বিষয়। বিষ্ণুপুরের রাজা,

বীর-হাম্বির প্রভৃতি, অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। পরে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কৃপায় পরম ভাগবত হয়েন এবং বিষয় কার্য্যে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এমন কি, শোনা যায়, পরে তার বংশধরগণ মধ্যে এরূপ বৈরাগ্য ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, একদা মুসলমানগণ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে, বিষ্ণুপুর রক্ষণের সকল ভার মদনমোহনকে অর্পণ করিয়া রাজা অমাত্যবর্গসহ নিরুদ্বেগে হরিনাম জপ করিতে বসেন। তাহার ফলে ভগবান মদনমোহন স্বয়ং যোদ্ধৃবেশে শ্বেতাশ্ব আরোহণ করিয়া 'দলমাদল' কামানের নিকট গমন করেন, এবং আপনি কামান দাগিয়া শত্রু দমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সাজে, অনেকে নাকি, তাঁহাকে গমনাগমন করিতে দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্দিরে বারুদের গন্ধ ও বিগ্রহেও ঘর্ম্মাদি শ্রম-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল! ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান ভক্তের জন্য ভগবানের এ সকল প্রয়াস আদৌ অসম্ভব নহে। তথাপি কথা হইতেছে, রাজ্য শাসনের ভার লইয়া ঐরূপ নির্লিপ্ত ও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা রাজার কর্ত্তব্য কিনা? রাজা যখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনাদি ক্ষত্রিয়োচিত রাজকার্য্যে অশক্ত, তখন তাঁহার ঐ রাজ্য-রক্ষণ ভার রজোগুণসম্পন্ন কোন উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করাই সমীচীন, নতুবা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটা কিছুই বিচিত্র নহে। আমাদেরও মনে হয়, এই অব্যবস্থার দরুণই আজ সোনার বিষ্ণুপুর, "বন বিষ্ণুপুরে", পরিণত হইয়াছে। ইতিহাসে অশোক শাসিত বিরাট মৌর্য্যসাম্রাজ্যের শোচনীয় পরিণামও অহিংস নীতির অপব্যবহারেরই ফলমাত্র।

এক্ষণে ভগবানের পরম্পরা-সেবা ও সাক্ষাৎ-সেবার পার্থক্য বুঝিতে হইলে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। ভাগবতে রাস লীলায় দেখিতে পাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া, গোপীগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইলে, কতকগুলি গোপী পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হ'ন এবং গৃহরুদ্ধ অবস্থায়

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে তীব্র বিরহ বেদনায় তাঁহাদের গুণময় দেহ ত্যাগ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। তাহা শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, গোপীরা ত কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন না; তাঁহাকে তাঁহারা পরম কান্ত বলিয়াই জানিতেন, তাহাতে কি প্রকারে তাঁহাদের গুণময় দেহত্যাগ হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভবপর হইল"?

তদুত্তরে, শুকদেব যাহা বোঝাইলেন তাহার ভাবার্থ এই যে— "নহি বস্তুশক্তি বুদ্ধিমপেক্ষতে"—'বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না।' কেহ যদি না জানিয়া বিষ খাইব মনে করিয়া ভুল ক্রমে অমৃত-ভাণ্ডে হাত দিয়া খানিকটা অমৃত খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইবে না, পরন্তু, অমর হইয়া যাইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'অনাবৃত ব্রহ্ম,"—জানিয়া হউক, বা না জানিয়া হউক, যদি কাহারও তাঁহার প্রতি অত্যাসক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার সংসার বন্ধন ঘুচিয়া যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, সাধারণ পতি, বা পর-পুরুষে, ঐরূপ আসক্ত হইলে তাহা ঘটে না কেন? তাহার কারণ, জীব— 'আবৃতব্রহ্ম'। যেমন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিতে হাত দিলে কাহারও হাত পোড়ে না, তদ্রূপ আবৃত ব্রহ্মের সেবা করিলে কাহার ঐরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। তবে ভগবৎ প্রীত্যর্থ তাঁরই অধিষ্ঠান জ্ঞানে ["জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"—সনাতন শিক্ষা, চৈঃ চঃ] পরম্পরা-জীবসেবা করিলে তাঁর কৃপায় ক্রমে ভববন্ধন মোচন হয়।*

---

* বৈষ্ণবদিগের মতে ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ,—ব্রহ্ম ও জীবে নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। জীব মায়ার অধীন, ঈশ্বর মায়াধীশ,—মায়ার অধীশ্বর। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।" চৈঃ চঃ—২।৬।১৪৯

এসম্বন্ধে মহাভারতে দুএকটী সুন্দর উপাখ্যান আছে। 'পতিব্রতা উপাখ্যানে' আছে—এক পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী, তাঁর পতিকেই জগৎপতি নারায়ণের প্রতিনিধি জ্ঞানে, নিষ্কপটে, কায়মনবাক্যে, সেবা করিতেন। তাহাতেই তাঁহার দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়াছিল, এবং কৌশিক নামক এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ সাধুর কোপদৃষ্টিতে এক বক ভস্ম হইয়াছিল তাহা তিনি যোগবলে জানিতে পারিয়া ছিলেন। তাহাতে ঐ সাধু পতিব্রতার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন এবং কিরূপে ঐ শক্তি লাভ হইল জানিতে চাহিলে,—কেবলমাত্র নিষ্কপটে পতি

জীব ভগবানের অংশ ; তাঁর পরা-প্রকৃতি, ভগবান্ নহে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা—১৫।৭

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।
জীবভুতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" গীতা—৭।৫

বেদান্ত সূত্রে (৪।৪।১৭), ভগবান্ ব্যাসদেব সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন—জীব কখনই ঈশ্বর (শিব) হ'ন না। মুক্ত পুরুষদিগেরও কদাচ জগৎ-স্রষ্টৃত্বাদি শক্তি উপজাত হয় না। জীব মুক্ত হইলেও ভগবানে একেবারে লীন হয় না; তখনও তাহার নিজ স্বতন্ত্রতা থাকে। গীতায় ইহা সুস্পষ্ট—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ গীতা—১৪।২

'এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা পুনরুৎপন্ন হ'ন না এবং প্রলয়কালেও প্রলয়দুঃখ অনুভব করেন না।' নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"—'মুক্ত জীবগণও ভক্তির কৃপায় দেহলাভ করিয়া ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন।'

এমত অবস্থায়, বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত অনুসারে, 'দরিদ্র নারায়ণ'—এই কথাটি ঠিক নহে। কারণ, নারায়ণ—ভগবান, ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী স্বয়ং লক্ষ্মীর পতি ; তিনি কদাচ দরিদ্র হইতে পারেন না। মায়াবদ্ধ জীবই ধনী-দরিদ্র,

সেবাতেই তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতে পারেন। তৎপরে তাঁহার আদেশ ক্রমে, আরও রহস্য জানিবার জন্য ধর্ম্ম-ব্যাধের নিকট গমন করেন এবং যাইয়া দেখেন যে সেই ব্যাধ শালগ্রাম শিলা দ্বারা মাংস ওজন করিয়া বিক্রয় করিতেছে! তাহার সহিত আলাপে জ্ঞাত হয়েন যে, ঐ ব্যাধ তাঁহার আগমনের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক সমস্তই দিব্য-শক্তিতে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিল এবং প্রশ্ন করায় জানিতে পারেন; সুধু ঐকান্তিক পিতৃ-সেবার দ্বারাই তাঁহার ঐ জ্ঞান লাভ হইয়াছে। এই ভাবে পরম্পরা-সেবায় সাধনের অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার

সুখী-দুঃখী, হইতে পারে। তবে যে "সর্ব্বঘটে নারায়ণ" বলা হয়, তাহা তিনি যে সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম রূপে সর্ব্ব হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, সেই হিসাবে। জীব সুখ-দুঃখ ভোগী পুরুষ, আর তিনি তৎহৃদয়ে অবস্থিত নির্লিপ্ত পুরুষোত্তম। জীবকে নারায়ণ বলিলে, "ভক্ত, ভগবান", বলিয়া কোন কিছু পৃথক বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছেন—'আমিই সেই',—এই অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকৃতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, পরে পতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।"

শ্রীশ্রীকথামৃত—১ম, ৮০ পৃঃ

অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তে,—"পাশযুক্ত জীব, পাশমুক্ত শিব";—জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বস্তু নহে। মায়া মুক্ত হইলে জীব, শিব হয়। এই হিসাবেই তাঁহারা জীবকে 'দরিদ্র নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। ইহা কেবল সেই অচিন্ত্যবস্তুর অনুভবের তারতম্য মাত্র।

মূল তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে দেখা যায়, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ নিজেদের সিদ্ধান্ত আদ্যোপান্ত ঠিকই রাখিয়া দিয়াছেন। সিদ্ধান্তে কোনই গোল নাই। আমরা কতক এ-আচার্য্যের, কতক ও-আচার্য্যের, মত গ্রহণ করি তাহাতেই যত গোলমালের সৃষ্টি হয়,—তাই কোন একটি সিদ্ধান্ত স্থির রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মহাপ্রভু আসিয়া বেদ বেদান্ত হইতে দেখাইলেন—

দৃষ্টান্ত অনেক আছে। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেও ঐরূপ একটি সতী রমণীর অলৌকিক শক্তির উল্লেখ আছে—

"কুষ্টিবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি-লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥" চৈঃ চঃ—৩।২০।৪৮

সার কথা এই, সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবার, বা, শুদ্ধা ভক্তি-অঙ্গের (শ্রবণ কীর্ত্তনাদি) যাজনে, বিশুদ্ধ অনুরাগ হওয়া, অনেক জন্মের সুকৃতির ফল; তাহা স্বল্প ভাগ্যে হইবার নহে। কাহারও প্রকৃত সে

---

(১) ভগবান যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ; (২) তিনি যুগপৎ এক হইয়াও বহু; (৩) তিনি জীব ও জগৎ প্রসব করিয়াও অবিকারী; (৪) তিনি বিভু, জীব ও জগতের অবস্থিতির অবিরোধে, তিনি সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান; (৫) জীব—অণুচৈতন্য; তিনি—বিভুচৈতন্য; (৬) জীব মায়ার অধীন,—তিনি মায়াধীশ। চিদংশে, তিনি ও জীব অভিন্ন;—শক্তি অংশে, ভিন্ন। এক অংশে অভেদ, অপর অংশে ভেদ—

"জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি—ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" চৈঃ চৈঃ—২।২০।১০৭

এতাদৃশ তত্ত্বগুলি অপ্রাকৃত; অচিন্ত্য বস্তু—মানব বাক্য মনের অতীত,—তর্কের অগোচর। ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" তত্ত্ব।

এই ভাবে মহাপ্রভু—শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, বিষ্ণু স্বামীর বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মাধবাচার্য্যের দ্বৈত (নিত্য-ভেদ) বাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ) বাদ, এই সকল মতের কোনটিই খণ্ডন না করিয়া, অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্থাপন করিয়া এক সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। গীতাতেও ভগবান এই অচিন্ত্য শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।" গীঃ—৯।৪
"নচমৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ॥ গীঃ—৯।৫

অবস্থা লাভ হইলে, সাক্ষাৎ ভগবৎ-ভজন ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য থাকে না। কিন্তু যতদিন না সে অবস্থা লাভ হয়, ততদিন ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়া কেবল আত্ম-সেবায় রত না থাকিয়া, যতটা সময় পরার্থে নিয়োগ করিতে পারা যায়, ততই আত্মশুদ্ধির পথ পরিষ্কার হয় এবং ক্রমে তাঁর সাক্ষাৎ-সেবার অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হওয়া যায়।

এই পরম্পরা-সেবা প্রসঙ্গের আরও একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, ভগবান—'অনাবৃত ব্রহ্ম', একারণ যে রূপেই হউক তাঁহার সাক্ষাৎ সেবায় জীবের ভব-বন্ধন বিমোচন হয়। সেইরূপ আবার যে মানবের আবরণ যত পরিমাণে কম তাঁহার সেবাও সেই পরিমাণে অধিকতর ফলপ্রদ। একারণ সাধারণ স্তরের মানব-সেবা অপেক্ষা সাধু,মোহন্ত, প্রেমিক, ভক্তের সেবা বিশেষ কল্যাণপ্রদ। এই জন্য কোন গ্রামাদিতে ইতর সাধারণকে অন্নবস্ত্র দানাদিদ্বারা ভরণ পোষণ অপেক্ষা, সেই অর্থে ঐ গ্রামে যদ্যপি মাত্র একটি যথার্থ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারসম্পন্ন, তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বা, কোন যথার্থ ভজনানন্দী প্রেমিক ভক্তের, সেবার ব্যবস্থা হয়, বা, তাঁহাদের ভগবৎ-ভজনের আনুকূল্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তদ্বারা ঐ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

ঐরূপ একটি সদ্ব্রাহ্মণের প্রভাবে ঐ দেশে কদাচার সম্পন্ন লোকেরা শঙ্কিত হয় ও ক্রমে জন-সাধারণের মধ্যে সদাচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে; আবার, একটি যথার্থ ঈশ্বরানুরাগী প্রেমিক ভক্তের সংস্পর্শে, ঐদেশের আপামর সাধারণ ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয় ও ভগবৎ-ভজনে অনুরাগী হয়। সকল মানুষকে সমান পর্য্যায়-ভুক্ত করা কদাচ যুক্তি-যুক্ত নহে। দানের পাত্রের তারতম্যে, দান ফলেরও তারতম্য ঘটে বলিয়াই, শাস্ত্রাদিতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে প্রেতাত্মার পারলৌকিক কল্যাণার্থ মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ-ভোজন ও ব্রাহ্মণদিগকে দানের ব্যবস্থা এবং মহোৎ-

সবাদিতেও প্রধানতঃ সাধু মোহান্ত, বৈষ্ণবাদির ভোজনাদিরই ব্যবস্থা। ঐ কারণে বহু সাধারণ ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্ত্তে, শ্রাদ্ধাদিতে মাত্র ২।১টী যথার্থ সদ্‌ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা সহকারে ভোজনের ব্যবস্থাই মনু-সংহিতাদিতে নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাৎসল্যবতী মাতা, বা, পতিব্রতা সতীর অন্ন আহার করিলে সত্য সত্যই যে আয়ু ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, এবং কোন কামাতুরা ভ্রষ্টাচারিণীর পাকান্ন ভোজনে যে কাম ও তমোগুণ বৃদ্ধি হয়, উহা ঋষিদিগের পরীক্ষিত সত্য। তদ্রূপ আবার, ঘোর বিষয়ীর অন্ন খাইলে যে তমোগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহারও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত হয় ম্লান।" এসকলতত্ত্ব সাধারণ আচার-ভ্রষ্ট বহির্মুখী মানবের বুদ্ধির অগম্য হইলেও, ইহা যে অভ্রান্ত সত্য তাহার প্রমাণ, সাধু মোহান্তদের অনুভব ও ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র।

আর এক কথা, সাধারণ-অন্নদান, ও মহোৎসবাদিতে মহাপ্রসাদ-বিতরণ এই দুই-এ আকাশ পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। সাধারণ অন্নে কেবল স্থূল দেহের তুষ্টি ও পুষ্টি সম্পন্ন হয়; পরন্তু, প্রসাদান্ন ভোজনে ঐসঙ্গে আত্মারও তুষ্টিও পুষ্টি সংসাধিত হয়।

"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলং"—(গীতা ২।৫০), কর্ম্মের কৌশল পরিজ্ঞাত থাকিলে, একই কর্ম্মে ভব-বন্ধন মোচন হয়, আবার কৌশল না জানা থাকিলে ঐ কর্ম্মেই ভব-বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। এজন্য মহাপুরুষগণই যথার্থ "কর্ম্মযোগী" এবং তাঁহারাই যথার্থ কর্ম্ম করিবার অধিকারী। মোহান্ত-গণের আচরণই সুধীব্যক্তির অনুকরণযোগ্য। গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শাস্ত্র সদাচার ভিন্ন অন্য পথে যদি ব্রহ্মা লোকেও লইয়া যায়; তাহাও যাইবে না"।

পূর্ব্বে উল্লিখিত রাজপুত্র রঘুনাথের অর্থে পানিহাটি গ্রামে 'দধি মহোৎসবে' সাধু, বৈষ্ণব, মোহান্ত-গণে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও যথাযোগ্য অর্থাদি দান-রূপ মর্য্যাদা প্রদানে, নিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথের

পারমার্থিক কল্যাণ-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা রঘুনাথের দ্বারা কদাচ সম্ভবপর হইত না। তিনি সাধারণ লৌকিক-প্রথায় দানাদি কার্য্যে উহার কোটিগুণ অর্থব্যয় করিলেও ঐরূপ সুমহৎ ফল কদাচ লাভ করিতে পারিতেন না ; এবং ঐরূপ স্বল্প আয়াসে, এত শীঘ্র, সংসার-বন্ধন মোচন হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ লাভও ঘটিত না। শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুও, তাঁহার লীলা সম্বরণের অনতিকাল পূর্ব্বে, পুরীধামে অনুরূপ উদ্দেশ্যেই, তাঁহার চরণাশ্রিত শিষ্যগণের প্রদত্ত অর্থে, বিরাট সাধু-সেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা দ্বারা, তাঁহাদের চরম-পরম পারমার্থিক কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুসারে তাঁহাদের ঐ প্রদত্ত অর্থে,—প্রদত্ত অর্থে কেন,—তাঁহার কোটি গুণ অর্থেও ঐরূপ কল্যাণপ্রদ মহৎকার্য্য সম্ভব হইত না। বিশেষতঃ, এক্ষেত্রে তাঁহারা ঐ মহৎ অনুষ্ঠানের জন্য যাহাকে-তাহাকে অর্থ প্রদান করেন নাই,—সদ্‌গুরুরূপী সাক্ষাৎ ভগবানকেই প্রদান করিয়াছেন,—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ; ইহার ফল যে কত উচ্চ, কত মহৎ, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ তাঁহার চরণাশ্রিত যোগ্য শিষ্য শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজীও, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া, নিজ শিষ্যদের নিকট হইতে 'ভিক্ষা-লব্ধ' অর্থ দ্বারা, একটি স্থায়ী "ভিক্ষা ভাণ্ডার" স্থাপন করিয়া, গোস্বামীজিউর সমাধি প্রতিষ্ঠানের সেবা-পূজা-মহোৎসবাদির আনুকূল্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার চরণাশ্রিত শিষ্যগণের সুমহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

ভগবৎ-ভজনশীলের হৃদয় স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র। শুধু মনুষ্যতে কেন, ইতর জন্তুতেও তাঁহাদের সমধিক দয়া, এজন্য তাঁহারা নিজ ভোগ সুখের জন্য; জিহ্বার লালসায়, কদাচ ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত হিংসা করেন না। জীবের দুঃখে প্রকৃতই তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে এবং তাঁহারাই জীবের (ইহরোগ ভবরোগ) সেবার প্রকৃত অধিকারী। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৯।২১), ভক্তরাজ রন্তীদেবের উপাখ্যানে, জীবসেবার প্রকৃত

অধিকারী কে, এবং কি ভাবে সেবা করিলে পরাগতি লাভ হয়, তাহা অতি সুন্দর ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

"রামকৃষ্ণমিশন" যদি আর্ত্ত-সেবার জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য প্রথানুসারে কেবল মাত্র চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ কিছু গৌরবের ছিল না—যেকোন ধনী ব্যক্তিই তাহা করিতে সমর্থ। ইহার সহিত মুখ্যভাবে তাঁহারা 'দরিদ্র-নারায়ণ' জ্ঞানে, স্বহস্তে তাহাদের সেবা দ্বারা, পারমার্থিক যোগ সূত্র রক্ষা করেন, একারণেই ইহার এত গৌরব।

"রামকৃষ্ণমিশনের" প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা সারদানন্দ মহারাজজী এই প্রসঙ্গে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—"যতই কাজ থাক, নিত্য অন্ততঃ দুঘণ্টা বসে জপ ধ্যান করিবে; নতুবা ঠিক থাকতে পারবে না,—না,—না, বল্‌ছি।" "কাজ করবি কি করে? আগে চরিত্র গঠন কর্, তারপর কাজ। (শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ, ১৩২ পৃঃ)। মূলকথা, মহাপ্রাণ সকল ব্যক্তিরই চিন্তাধারা একই প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। শুধু ফাঁকা আওয়াজ, বা, চালাকীর দ্বারা, কোন মহৎ কার্য্য হয় না। এইখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন—

> "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
> জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

এবং দরিদ্রকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাই বলিয়া, সাক্ষাৎ ভগবৎ-ভজন পরিত্যাগ, বা উপেক্ষা, করিয়া এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, উহার এইরূপ বিকৃত অর্থ যেন কদাচ মনেও স্থান না দেই। উহাতে শুধু যে তাঁহার উক্তির ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা নহে; পরন্তু, ঐরূপ ভুল ধারণা প্রচলনে, দেশে বিষম অনর্থের সৃষ্টি হইবে, এবং পরিশেষে উহা পাশ্চাত্য দেশের

ঐহিকসর্ব্বস্ব দেহাত্মবাদী নাস্তিকতা আনয়ন করিবে, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। উহার যথেষ্ট সূচনাও পরিদৃষ্ট হইতেছে। উহা আমাদের দেশের পক্ষে কদাচ শুভ লক্ষণ নহে, বলাই বাহুল্য।

অতি সহজ কথাইতেই এই ভ্রমের নিরসন হইয়া যায়; কিন্তু আমরা এমনি চপলমতি ও সুবিধাবাদী হইয়া পড়িয়াছি যে, একটু নিবিষ্ট চিত্তে উহা একবার ভাবিয়া দেখিবার ধৈর্য্যটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই দেখুন না কেন, স্বামীজী নিজেত যথেষ্ট দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিয়াছেন ও অপরকে করিবার জন্যও এত প্ররোচনা দিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কি কোন দিন এই জন্য নিজের ভগবৎ-ভজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাহা করা কি তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভব ছিল? তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি যে গভীর ভগবৎ-ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

স্বামীজীর উক্তির সরল তাৎপর্য্য এই যে, জগতের যত নরনারী সকলেই সেই জগৎ পিতার সন্তান (বা সর্ব্বভূতে তাঁর অধিষ্ঠান); তাঁদের সেবা উপেক্ষা করিয়া শুধু মন্দিরে বিগ্রহাদি অর্চ্চনা করিলে তিনি কদাচ সন্তুষ্ট হয়েন না। যাঁহারা এরূপ আচরণ করেন শ্রীমদ্‌ভাগবতেও (ভাঃ ১১।২।৪৭) ঐরূপ সাধকের সর্ব্ব-নিম্নে স্থান দিয়াছেন ও তাঁহাদিগকে 'প্রাকৃত-ভক্ত' আখ্যা দিয়াছেন। অতএব স্বামীজীর উক্তির সঙ্গে শাস্ত্রের কোনই বিরোধ নাই। সাধারণ কথায় বলে,—

"গুরুছেড়ে গোবিন্দ ভজে। সে পাপী নরকে মজে॥" ইহাও অনেকটা সেই ধরনেরই কথা। তাঁ'রাত ঠিকই বলেন ও করেন; তবে আমাদের বোঝবার দোষে, দুর্দৈব-ক্রমে—"উল্টা বুঝলি রাম," হইয়া দাঁড়ায়, ও যত অনর্থের সৃষ্টি হয়। স্বয়ং যোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত, বেশ্যা সেবা করিতে গিয়া বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ইহাই স্বাভাবিক, ইহাতে তর্ক করিবার কিছুই নাই।

ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"—৭।২৮

অর্থাৎ, পুণ্য কর্ম্ম (বা, ভগবৎ প্রীতিকর কর্ম্ম,) করিতে করিতে যাঁহাদের পাপক্ষয় (বা, চিত্ত শুদ্ধি) হয়, তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার ভজনা করে। এই সকল দরিদ্র-সেবারূপ ভগবৎ-প্রীতিকর পুণ্য কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা হইতে ক্রমে ভগবানে বিশুদ্ধা ভক্তি-অঙ্গ যাজনের অধিকার জন্মে।

স্বামীজী সম্বন্ধে, আরও একটা বিষয়ে, অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। অনেকের ধারণা তিনি সংকীর্ত্তনের একান্ত বিরোধী ছিলেন,—তাহা সত্য নহে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বেলুড়-মঠাদির উৎসবে বিরাট সংকীর্ত্তনের আয়োজনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার সাক্ষাৎগুরু পরমহংসদেব যে সংকীর্ত্তনের এত সমাদর করিতেন এবং নিজ ভক্তগণসহ যোগদান করিয়া পরমানন্দে নৃত্যাদি করিতেন, তাহা কদাচ স্বামীজীর উপেক্ষা বা অবজ্ঞার বস্তু হইতেই পারেনা। পাঞ্জাবে অবস্থিতি কালে, একদিন তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া, নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং খোল না পাওয়ায় অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েন। তবে, স্কুলের যুবক ছাত্রবৃন্দ, বা জনসাধারণ মধ্যে, রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে রস-কীর্ত্তন প্রচলনের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন সেকথা সত্য; এবং তাহা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া আমরাও মনে করি। আপামর সাধারণে ঐ রস-কীর্ত্তনের অবাধ প্রচলনের ফলে, মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এমন পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে কি প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মহাপ্রভু স্বয়ংও এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ লয়ে কর রস আস্বাদন॥"

তাঁহার এই অমৃতময় উপদেশ অবহেলার ফলেই, বৈষ্ণব জগতে আজ এরূপ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। এরূপ রস-কীর্ত্তনের অবাধ প্রচলনের বিরোধিতা করার জন্য স্বামীজীকে কদাচ দোষারোপ করা যায় না,—উহা সঙ্গতই হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা,—সংকীর্ত্তনাদির সময় কাহাকে কাহাকে আবেগভরে নর্ত্তন-কীর্ত্তন, ক্রন্দনাদি করিবার কিছুক্ষণ পরেই, পূর্ব্ববৎ মিথ্যা-ভাষন, প্রবঞ্চনাদি করিতে দেখা যায়। উহা যে ঐব্যক্তির ভণ্ডামী, তাহা নাও হইতে পারে। অনেকের সত্য সত্যই ঐ সময়ে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন, বা ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে, ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নিজ মজ্জাগত কুস্বভাব জাগিয়া উঠে এবং পূর্ব্ববৎ অসদাচরণ করিয়া থাকে। ইহা হওয়া বিচিত্র নহে। অনেক সরল দয়ালুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উহা স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া অনেক সময় দেখা যায় বহু বেশ্যাসক্ত, মাতাল, কদাচারী ব্যক্তির এইরূপ সৎসঙ্গ প্রভাবে সহজে সাময়িক, ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। উহার কারণ, উহার অন্তরে আনন্দ-লিপ্সা-বৃত্তি জাগিয়াছে কিন্তু অসৎসঙ্গে পড়িয়া অতি অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক পরিণামবিরস, ঘৃণিত আনন্দে মত্ত রহিয়াছে। যদি কোনদিন সৌভাগ্যবশে ঐরূপ সংকীর্ত্তনাদি আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার সুযোগ ঘটে, তখন বিমল আনন্দের সন্ধান পাইয়া তাহাতে সাময়িক আবিষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে,—তাহা কপটতা নহে; তবে তাহার মূল্য খুবই কম। বহুদিনের পুরাতন (*Chronic*) রোগের এক আধ দাগ ঔষধ সেবনে আর বেশী কি হইবে। তবে কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিত সেবনে নিশ্চয়ই আশ্চর্যরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মনে করুন, রাম নামক এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর ঘুমাইতেছে। বাহির হইতে কোন ব্যক্তি তাহাকে 'রাম', 'রাম' ছয়বার ডাকার পর সে অঙ্গ সঞ্চালন করিল এবং সপ্তম বার ডাকার পর সাড়া দিল; ইহাতে ইহা

বুঝিতে হইবে না যে, ঐ ছয়বার ডাকা বিফল হইয়াছে এবং সপ্তম ডাকে কাজ হইয়াছে। বস্তুত তাহা নহে। উহাকে প্রথম ডাকা হইতেই উহার অন্তরে স্পন্দন লাগিয়াছে; পঞ্চম ডাক পর্য্যন্ত বাহ্যিক কোন ক্রিয়ার প্রকাশ পায় নাই, ষষ্ঠ ডাকে অঙ্গ সঞ্চালনে জাগরণের কিছু ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং সপ্তম ডাকে পূর্ণ সজাগ হইয়াছে। ঐরূপ ভগবানের নাম-গুণ-গানাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-নর্ত্তনেও প্রথম প্রথম, স্বভাবে বাহ্যিক কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট না হইলেও, ভিতরে-ভিতরে চিত্তশুদ্ধির ক্রিয়া হইতে থাকে এবং নিষ্ঠার সহিত চলিতে থাকিলে ক্রমে অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পাইতে থাকে। তবে তাহা স্থায়ী করিতে হইলে সাধুসঙ্গ, গুরুকরণাদির প্রয়োজন।

আর একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—প্রকৃত ভাব না আসিলে নৃত্য করা কপটতা; সে কথা ঠিক নহে। ভাব না আসিলেও যেমন সঙ্কীর্ত্তন একটি ভজনের অঙ্গ, তদ্রূপ ভাব না আসিলেও নৃত্য একটি ভজনের অঙ্গ; নিষ্কপটে যথাযথ শ্রদ্ধার সহিত উহা অনুষ্ঠিত হইলে যথা সময়ে উহা হইতে যথার্থ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। কীর্ত্তনের সময় নৃত্য করা শাস্ত্রানুশাসন বিধি,—করাই কর্ত্তব্য; লজ্জা, সঙ্কোচ, আলস্যাদি বশতঃ না করাই প্রত্যবায়। মহাপ্রভু পৃথক-পৃথক সংকীর্ত্তনের আরম্ভের পূর্ব্বেই, কোন্ দলে, কে মূল নর্ত্তক হইবেন স্থির করিয়া দিতেন। প্রাণ খুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য ও উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিলে দেহে ও প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব স্ফুর্ত্তি ও আনন্দের উদ্ভব হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহার যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলনের ফলে, এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত এতকাল সুস্থ শরীরে রহিয়াছি এবং দেহে ও মনে কোন প্রকার অবসাদ আসে নাই—কোন ইন্দ্রিয় বিকল হয় নাই। আমার নিজ জীবনেই ইহা এক বিস্ময়কর ঘটনা।

সেবা সম্বন্ধে আর একটা কথা,—রাজা ভরত, পুত্র কলত্র ও সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন কাননে ঐকান্তিক ভগবৎ-ভজনে-রত অবস্থায়, নিরাশ্রয়, স্রোতে ভাসমান, সদ্যপ্রসূত মৃগ

শিশুটিতে দৃষ্টি পড়ায়, অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার এই আচরণ যুক্তিযুক্ত এবং শাস্ত্রানুমোদিতই হইয়াছিল, তথাপি এই সেবাতে অনুরক্ত ও অত্যাসক্ত হইয়া পড়ায়, এত বড় ত্যাগী মহাপুরুষেরও মৃগজন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, ইহা কম দুর্দ্দৈবের কথা নহে। ফল কথা, ওইরূপ ঐকান্তিক ভগবৎ-ভজননিষ্ঠ ব্যক্তির সম্মুখে ঐরূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হওয়াই পরম দুর্ব্বিপাক ও দুর্ভাগ্যের নিদর্শন বলিতে হইবে। কিন্তু, ঐরূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে ঐরূপ আচরণ ব্যতীত আর গত্যন্তর কি? কিন্তু তাই বলিয়া, ঐরূপ উচ্চস্তরের সাধকের পক্ষে ঐরূপ সেবার সুযোগ (ইহা তাঁহার সুযোগ নহে; দুর্যোগ) উপস্থিত হওয়া কদাচ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে।

আর এক কথা, কাহারও পরমার্থিক উৎকর্ষের আনুকূল্যের দিকে মুখ্যভাবে লক্ষ্য না রাখিয়া, যদি কেবল তাঁহার আহার-বিহারাদির দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহা হইলে সেই সেবা তাঁহার ভোগবিলাসের পরিবর্দ্ধকই হইয়া থাকে। এ কারণ ব্রহ্মচারী, বা বৈরাগীকে, ভোগের সামগ্রী ভোজনের জন্য দেওয়া, বা, স্ত্রীলোক দ্বারা পদ সেবাদির ব্যবস্থা করা, কদাচ তাঁহার সেবা নহে—তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মহানির সহায়তা করা হয় মাত্র। তেমনি আবার ক্রূর, বিদ্বেষ স্বভাব সম্পন্ন, ব্যক্তির উত্তমরূপে ভোজন-আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করাও তাহার ঐ স্বভাবের পরিপোষকই হইয়া থাকে।

"অহেরেব পয়ঃ পানং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।"—

সাপের, (প্রথমে বিষ দাঁত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা না করিয়া,) দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে তাহার বিষই বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে জগতের অকল্যাণই সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব একস্থলে বলিয়াছেন—"লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা, কি বলো? সব জীবের ভিতরে তিনি

অগ্নিরূপে রহিয়াছেন,—খাওয়ান কিনা, তাতে আহুতি দেওয়া। কিন্তু তাই বলে অসৎ-লোককে খাওয়াতে নাই।... এমন লোক যাহারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে, খায়, সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।... হৃদে সিওড়ে (হৃদয়ের জন্মভূমি) একবার খাওয়াইতেছিল, তার মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বল্লাম—"দেখ্ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস্, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চল্লুম্।"

(রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ১৭ পৃঃ ও কথামৃত)

বলা বাহুল্য শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের, এই সুস্পষ্ট উক্তি থাকায় দরিদ্র-নারায়ণ সেবার নামে ঐরূপ অসৎ ব্যক্তিকে খাওয়ান সমীচীন নহে। শ্রীচৈতন্যদেবও সেই কথা বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব সেবন—" 'বৈষ্ণব, অর্থাৎ সৎব্যক্তি, সেবন। 'এক পরিশ্রান্ত কসাই একটি অতিথিশালায় অন্ন খাইয়া, বলপাইয়া একটি বলবান অবাধ্য গরুকে কষাইখানায় লইয়া গিয়া ঐ গরুটি বধ করিতে সমর্থ হয়, ঐ কারণ ঐ গো-বধ-পাপ ঐ অতিথিশালার স্বামীকেও স্পর্শ করে।'—শ্রীশ্রীকথামৃত

বিষয়টি একটু জটিল। মনে করুন, এক ব্যক্তি কুষ্ঠ-রোগে ভুগিতেছে। ইহা তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত দুষ্কর্ম্মের ফল,—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। ঐশাস্তি করুণাময়েরই করুণার নিদর্শন মাত্র। জনক জননীর সন্তানের প্রতি কঠোর শাসন কদাচ অপ্রয়োজন বা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে। জীব, জগৎপিতা হরির দাস না হইয়া মায়ার দাস হওয়ায়, বা ভগবৎ বৈমুখ্যের কারণে, ঐসকল তাহার উপর বাহিক দণ্ড মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা তাহাকে তাঁর চরণে উন্মুখ করাইবারই অমোঘ অস্ত্র। অন্যথা কোন প্রকারে হয়ত তাহার চৈতন্যের উদয় হইত না এবং চিরদিন অসৎ পথেই বিচরণ করিত। ইহা করুণাময়ের 'প্রতিকূলে' করুণা মাত্র।

এখন মনে করুন, ঐ কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত লোকটিকে চিকিৎসালয়ে
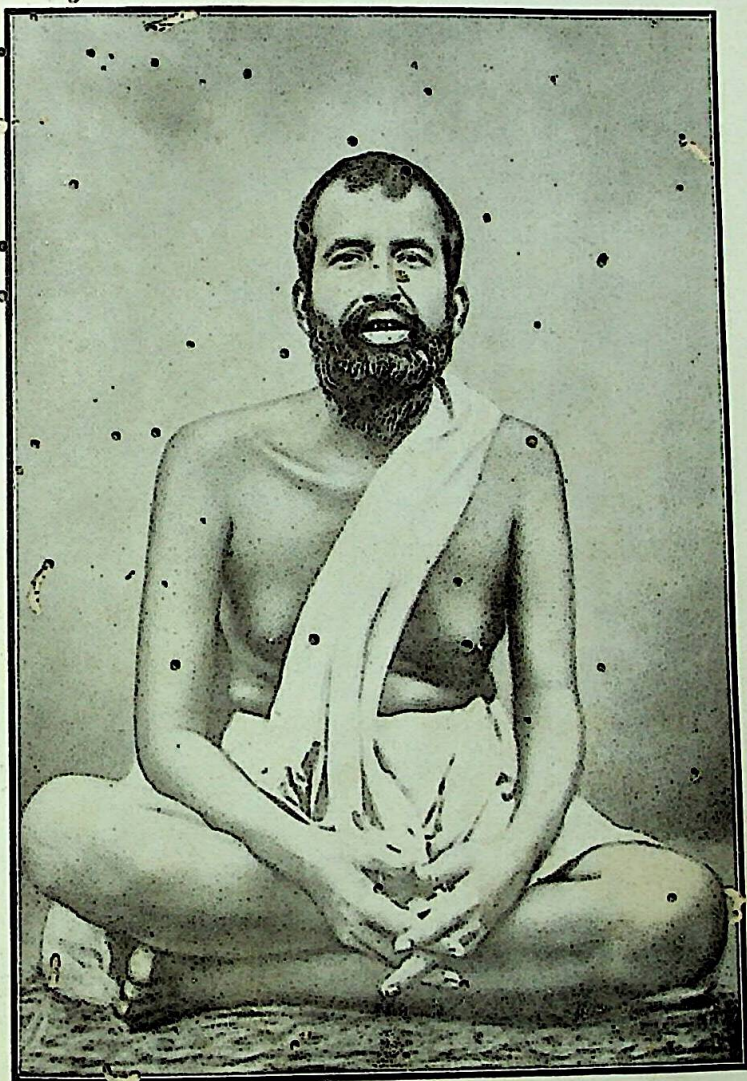
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
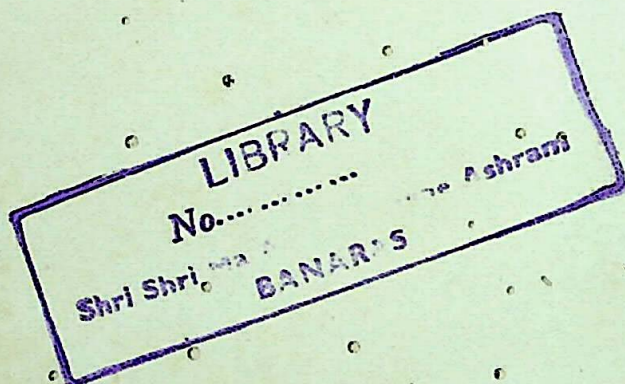
আনিয়া চিকিৎসাদি করাইয়া, তাঁহাকে রোগ মুক্ত করিয়া দিলাম ; কিন্তু তাহার চিত্তশোধনের কোনরূপ ব্যবস্থা করিলাম না। ইহাতে তাহার প্রকৃত কল্যাণ করিলাম, কি অকল্যাণ করিলাম, গভীর ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। মহাপ্রভু এ সকল ক্ষেত্রে যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ স্পষ্টই মনে হয়, তাঁহাকে অনুতাপানলাদিতে জ্বালাইয়া চিত্তশোধন ব্যবস্থাই অগ্রে প্রয়োজন, নতুবা তাহার ওই ভোগের চিরমুক্তি ঘটিবে না, একটু ভাল হইলেই আবার নূতন উৎপাত টানিয়া আনিবে। এই জন্যই কথায় বলে—

"মায়ের চেয়ে ভাল বাসে, তারে বলি ডাইন" ;—অর্থাৎ খোদার উপর খোদ্‌কারী করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তাহা হইলে কি আমরা ঐ সকল উৎকট যন্ত্রণা ভোগ্ দেখিয়া উহাতে উদাসীন থাকিব, বা তাহা উপেক্ষা করিব ?—কদাচ তাহা মানবের কার্য্য নহে, তাহা দানবের কার্য্য। তাহাতে আমাদের হৃদয় আরও নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ও শুষ্ক হইয়া যাইবে মাত্র। আমাদের কর্ত্তব্য,—উহাদের চিত্তশোধনের ব্যবস্থার দিকে মুখ্যভাবে লক্ষ্য রাখিয়া, গৌণভাবে বাহ্যিক সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা। শ্রীবাসের স্থানে উৎকট অপরাধে অপরাধী চাপাল-গোপালের কুষ্ঠ ব্যাধি হওয়ায়, মহাপ্রভু ঐরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথম রুগ্ন অবস্থায়, তাহাকে তাহার গুরুতর অপরাধের জন্য বিশেষ রূপ ভৎর্সনাদি করিলেন ; অতঃপর, তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ ও অত্যন্ত কাতর দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া, শ্রীবাসের শরণাগত হইতে উপদেশ দিলেন ; তাহাতে সে, ইহরোগ-ভবরোগ, উভয় রোগ হইতেই মুক্ত হইল। বদ্ধ জীবের প্রতি যে বদ্ধভাব-মোচনার্থ উপচিকীর্ষা তাহাকে মহাপ্রভু 'দয়া' বলিয়াছেন। এ দয়াতে দয়ার পাত্রের আপাত-ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, কিন্তু সাধারণ সেবাতে, সেবার পাত্রের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে।

ধর্ম্মরাজ্যের এইরূপই বিধি ব্যবস্থা। আধুনিক ব্যবহারিক জগতের কথা স্বতন্ত্র। তাহা হইলেও মহাত্মা গান্ধী, কয়েদীদিগের মধ্যে দণ্ড

বিধানের সাথে সাথে তাহাদের চরিত্রগঠন ও নৈতিক শিক্ষা-দা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থার জন্য আন্তরিক আগ্রহান্বিত ছিলেন।

একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়,—'

'জীবে দয়া, নামে রুচ, বৈষ্ণব সেবন।
ইহা বৈ শিক্ষা নাই শোন সনাতন॥"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সনাতন-শিক্ষার মধ্যে কুত্রাপি ঐরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয় না। ইহা কাহারো স্বকপোলকল্পিত কিনা বলা কঠিন।

আমরাতো 'জীবে দয়া', 'জীবে দয়া', বলিয়া চীৎকার করি— মহাপ্রভু বা পরমহংসদেব প্রভৃতি হইতেও আমরা কি বেশী জ্ঞানী, বেশী দয়ালু! এসব ব্যাপারে পরমহংসদেব কি বলিয়াছেন শুনুন;—(কথামৃত ১ম খণ্ড, ৬০ পৃঃ) (সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিম বাবুর প্রতি,)—"দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি তুমি পরোপকার কর? মানুষের এত নফর-চপর কিন্তু যখন ঘুমায় তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয় তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়? দয়া ঈশ্বরের,—মানুষে আবার দয়া করবে? দান-টান সব 'রামের ইচ্ছে'।

"সংসারী ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে যদি কাউকে দান করে, সে নিজের উপকার জন্য, পরোপকার জন্য নহে, সর্ব্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরির সেবা হ'লে নিজের উপকার হ'ল,—পরোপকার নয়।

"এইরূপ নিষ্কাম কার্য্য কর্‌লে তার নিজের কল্যাণ হয়, এরই নাম কর্ম্মযোগ। কলিযুগের পক্ষে নয়। তাই জীবের কর্ত্তব্য কি? তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেই জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। শম্ভু বলেছিল, 'আমার ইচ্ছা যে খুব কতকগুলি ডিস্‌পেন্সারী, হাসপাতাল করে দিই, তাহলে গরীবদের অনেক উপকার হবে।' আমি বললুম,—"হাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি এসব করো ত মন্দ নয়। তবে ঈশ্বরের উপর

আন্তরিক ভক্তি না থাকলে, অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোন্‌দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে জানতে দেয় না। মনে করছি নিষ্কাম ভাবে করছি, কিন্তু হয়তো যশের ইচ্ছা হ'য়ে গেছে, নাম বাহির করবার ইচ্ছা হ'য়ে গেছে। আবার বেশী কর্ম্ম করতে গেলে কর্ম্মের ভিতরে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়। আরো বললুম, 'শম্ভু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হ'ন তাহলে তুমি তাঁকে চাহিবে, না কতকগুলি ডিস্‌পেন্সারী বা হাসপাতাল চাহিবে?' তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরীর পানা পেলে আর চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের 'পরিশিষ্টে লিখিত আছে,—"ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'ছুরির ব্যবহার জানিয়া ছুরি হাতে কর।' স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ কর্ম্মযোগী কাহাকে বলে দেখাইলেন। দেশের কি উপকার করিবে? স্বামীজী জানিতেন যে দেশের দরিদ্রের ধন দিয়া সাহায্য করা অপেক্ষা অনেক মহৎ কার্য্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া দেওয়া প্রধান কার্য্য, তৎপরে বিদ্যাদান, তৎপরে জীবন দান, তৎপরে অন্নদান। সংসার দুঃখময়, এই দুঃখ তুমি কয় দিনের জন্য ঘুচাইবে?"

একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস পালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা জীবনের উদ্দেশ্য কি?" কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমার মতে জগতের উপকার করা! জগতের দুঃখ দূর করা।" ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তোমার ওরূপ 'রাঁড়ী-পুঁতি' বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখ নাশ তুমি করিবে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের গতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্চেন, তাঁকে আগে জানা এই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা হয় কোরো। কারুর উপকার ইচ্ছা হয় কোরো।"

এখনও যদি কেহ এর উপরও কথা বলেন তাহা হইলে

বুঝিব নিতান্তই আমাদের দুরদৃষ্ট। স্বামীজীও একস্থানে বলিয়াছেন:

"ধর্ম্মদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান, অন্নবস্ত্র দান সর্ব্বনিকৃষ্ট দান।" 'ভারতে বিবেকানন্দ'—২৬।

"অন্নদান চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতন্যদেব তাই অচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়ে দিলেন। দেহের সুখ দুঃখত আছেই। এখানে আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। জ্ঞান ভক্তি প্রয়োজন। ঈশ্বর বস্তু, আর সব অবস্তু।" শ্রীশ্রীকথামৃত -৪র্থ, ৬৩।

মোট কথা, মানুষ নিরন্তর নানা দুঃখে নিপীড়িত, এবং এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্ট; কিন্তু কোন লৌকিক উপায়েই এই দুঃখের নিবৃত্তি হয় না; দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও তাহা সাময়িক মাত্র; কিংবা দুঃখেরই রূপান্তর মাত্র। যে পন্থা অবলম্বনে এই দুঃখের চিরনিবৃত্তি —আত্যন্তিকনিবৃত্তির, উপায় হয়, যিনি সেই পথের সন্ধান দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত পরোপকারী, তিনিই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করেন।

উপসংহারে আমার কেবল একটি কথা বক্তব্য। এক্ষণে আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বানোন্মুখ,—যাবার সময় হয়ে এসেছে। এখন পরস্পর সংশয়-নিরসন জন্য যে টুকু নিতান্ত প্রয়োজন, সেই টুকুই অবশ্য আলোচ্য; তাহার অতিরিক্ত বেশী বাদ-বিতণ্ডা করিবার অবসর নাই এবং প্রবৃত্তিও নাই। 'কথার বানিজ্য' করিতে আন্তরিব ইচ্ছাও আর হয় না। তবে আমার একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হয় যে, বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র সাড়ে-চার-শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বঙ্গদেশ সত্য সত্যই প্রেমের বন্যায় ভাসিয়াছিল এবং আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ সেই প্রেম-পাথারে পরমানন্দে সাঁতার দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদেরই বংশধর, তাঁহাদের সেই দুর্লভ সম্পদের ছিটে ফোঁটা না পাইয়া কি করিয়া প্রাণে স্বস্তি অনুভব করিতে পারি? একে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে কিছুই পাইলাম না, যদি বা কোথাও সেই দুর্লভ

সম্পদের ক্ষীণ প্রভা প্রকাশ পাইবার চেষ্টা দেখি, তাহা যাহাতে আরো উজ্জ্বলতর হয়, সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাহা এত অবজ্ঞার চক্ষে দেখি কেন! ত্রিতাপদগ্ধ কলির জীবের প্রকৃত প্রাণ জুড়াইবার এমন সহজ, অমোঘ, পন্থা আর দ্বিতীয় কেহ কখন কোথাও দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন কি?

স্বীকার করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রসদাচার-সম্মত, বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে কালবশে বহু অনাচার ও কদাচার প্রবেশ করিয়া উহাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি দেশের সৌভাগ্য ক্রমে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু প্রমুখ মহাত্মাগণের আবির্ভাবে সে অভিযোগ বহুল পরিমাণে দূর হইয়াছে এবং পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুনরায় সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। শাস্ত্র সদাচারের প্রয়োজনীয়তা গোস্বামী প্রভু নিজ জীবনে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজ ভজন-কুটিরে স্বহস্তে লিখিয়া, বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন—"শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সহিত যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।" মূলকথা,—কিছুরই অভাব নাই। একান্ত অভাব মাত্র একটি বস্তুর,—সেই মোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুনের মত নিষ্কপট "প্রপন্নভাব" (গীতা ২।৭)। "তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং, জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।"—(চৈঃ চৈঃ ২।৮।১১) ঐকান্তিক লোভই, (আকুল লালসাই,) ইহার একমাত্র মূল্য; কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না।"

'লক্ষ্য স্থানে যাইবার জন্য পিপাসা না হলে, ধর্ম্মকার্য্য করিয়া কখনও ধর্ম্মের গৌরব বুঝিতে পারিবে না। সকল সংসার দিয়েও যদি তাঁহাকে পাই—এই অনিত্য দিয়ে, যদি সেই নিত্য সারাৎ সারকে লাভ করিতে পারি। তবে আমার মত চতুর বণিক আর কে আছে?' শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর 'বক্তৃতা ও উপদেশ'—১০১ পৃঃ

দেশের প্রাণটা যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। ক্রমেই যেন সেই সরল স্নিগ্ধ মধুর ভাব বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তাহার স্থানে—

"দম্ভোদর্পো অভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ"—গীতার সেই আসুরিক স্বভাব যেন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাই আজ রুদ্ধ-হতাশ প্রাণে সেই প্রেমের ঠাকুরের দিকে তাকাইতেছি, আর সকলকে করজোড়ে মহাপ্রভুর অতিবড় নিন্দুক, পশ্চাৎ অনুতাপদগ্ধ, বৈদান্তিক প্রকাশানন্দের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি ঃ—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বাচ কাকুশত মেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগং॥"—'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'—৯০

'হে সজ্জনবৃন্দ, আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক, পদযুগলে নিপতিত হইয়া, দৈন্য সহকারে এই প্রার্থনা করি, সর্ব্বকর্ম্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের চরণে অনুরক্ত হউন।'

অহল্যাকে অভিসম্পাত

(২) প্রশ্ন ঃ—গৌতমঋষি অহল্যাকে কি বিনা দোষে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন ?

উত্তর ঃ—আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে একটা দৃঢ় ধারণা এই যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত গৌতম-পত্নী অহল্যার অবৈধ মিলন ব্যাপারে অহল্যার কোনই অপরাধ ছিল না, ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া রতি-প্রার্থনা করায় অহল্যা-অসন্দিগ্ধ-চিত্তে সম্মতা হয়েন, তথাপি কোপন-স্বভাব গৌতমঋষি, বিনা অপরাধে, তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ম্মম হইয়া এরূপ কঠোর অভিসম্পাত করেন ; কিন্তু, প্রকৃত তথ্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাল্মীকি-কৃত মূল রামায়ণে এইরূপ সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে,—

অহল্যা ইন্দ্রের রূপে পূর্ব্ব হইতেই মুগ্ধা ছিলেন এবং নিজ স্বামীর বেশে ইন্দ্রই তাঁহার সহিত রতি-প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াই তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ছিলেন এবং বিহারান্তে সত্বর পলাইয়া যাইবার জন্য ইন্দ্রকে সতর্ক করিয়া দিয়া ছিলেন। মূল রামায়ণে ইহা সুস্পষ্ট লিখিত আছে, সুতরাং অহল্যা কদাচ নির্দোষ নহেন, এবং ত্রিকালজ্ঞ গৌতম-ঋষি যিনি, ত্রেতায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার এই আশ্রমে আগমন করিবেন, তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন, কদাচ বিনাদোষে তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন নাই ; বরং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য অতি সুন্দর ব্যবস্থাই করিলেন এবং পরে শাপ বিমোচনান্তে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহা তাঁহার অতীব উদারতা ও মহানুভবতারই পরিচয় দিতেছে।

মূল রামায়ণ-গ্রন্থ হইতে আলোচ্য-প্রসঙ্গের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'তুষ্টা অহল্যা, মুনিবেশে সুরপতি ইন্দ্রই আসিয়াছেন বুঝিয়া, তাঁহার সম্ভোগ লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন ; এবং পরে তিনি সন্তুষ্ট মনে ইন্দ্রকে কহিলেন,—'দেবরাজ ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর।'

"মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজ্ঞ কুতুহলাৎ ॥
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থোঽস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্ব্বথা রক্ষ গৌতমাৎ।
ইন্দ্রস্তু পহসন্ বাক্যমহল্যা মিদংঃঅব্রবীৎ ॥"

(মূল) রামায়ণ ১।৪৮।১৯-২১

তৎপরে ; গৌতমঋষি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া অহল্যাকে রোষভরে কহিলেন, 'দুঃশীলে, তোকে এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্য হইয়া ভস্ম রাশিতে শয়ন ও বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক বহু কাল যাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। * * * বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে আগমন করিলে তাঁর আতিথ্য করিবি। তদ্বারা নিশ্চয়ই তোর পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তুই পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবি।" রামায়ণ—১।৪৮

ইহাতে সুস্পষ্টই অহল্যার গুরুতর অপরাধ সপ্রমাণ হইতেছে, এবং গৌতম-ঋষির অনুপম করুণার নিদর্শনও পাওয়া যাইতেছে। ঐ রূপ গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অহল্যাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করাইয়া, যথাযথ শোধন করতঃ, পুনরায় স্বীয় সহধর্ম্মিনীরূপেই গ্রহণ করিলেন ; উহা তাঁহার সুমহৎ মহানুভবতারই পরিচায়ক। ঋষিগণ করুণার সাগর,—জগতের কল্যাণ ভিন্ন তাহাদের আর অন্য কোন কামনা থাকে না।

অহল্যা শাপগ্রস্তা হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে সহস্র বৎসর রামরূপ ধ্যান ও রাম-নাম জপ করিতে লাগিলেন। রাম-নামে মগ্ন থাকিয়া এবং রাম-রূপ সাগরে স্নান করিয়া অহল্যা পরিশেষে সর্ব্ব পাপবিমুক্ত ও পরম পবিত্র হইলেন। সে কারণেই অহল্যাদেবী আজ প্রাতঃস্মরণীয়া।

অহল্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়া কেন ?

(৩) পাঁচটি সাধারণ হিসাবে পতিতা কন্যাই প্রাতঃস্মরণীয়া হইলেন কেন ?

উত্তরঃ—আমাদের নিত্য প্রাতঃ-কৃত্যের মধ্যে নিম্নের স্তোত্রটি আবৃত্তি করিতে হয় ঃ—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা * স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥"

'অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, এই পাঁচটি কন্যা নিত্য-স্মরণীয়া,—ইহাদের স্মরণে মহাপাতক নাশ হয়।'

ইহাদের প্রত্যেকেরই একাধিক পুরুষ-সংসর্গ ঘটায়, কেহই লৌকিক বিচারে পতিব্রতা সতী বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যা নহেন। গৌতম-পত্নী ইন্দ্র কর্ত্তৃক ধর্ম্মচ্যুতা ; দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ; কুন্তীর সূর্য্য, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বায়ু ও পাণ্ডু এই পঞ্চ পতি ; তারার বালী ও সুগ্রীব এবং মন্দোদরীর রাবণ ও বিভীষণ। এমত অবস্থায় ইহারা কিরূপে প্রাতঃ-স্মরণীয়া হইতে পারেন ?

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে প্রথমেই ভগবৎ নাম-গুণ-গান ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, এবং তাঁর ভক্তদের নাম-গুণ-স্মরণ, ও কীর্ত্তন শাস্ত্র-বিধি। ইহাতে ভক্ত ও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হয়, ইহা বেশ সঙ্গত। কিন্তু লৌকিক আচারে-বিচারে ঐ পাঁচটি কন্যাই (ইহার মধ্যে আবার একটি বানরী ও অপর একটি রাক্ষসী) পতিতা,

---

* কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন,—'পঞ্চকন্যা' বিশুদ্ধ-পাঠ নহে। 'পঞ্চকং না' ইহাই বিশুদ্ধ-পাঠ। 'পঞ্চকং'—অর্থাৎ পঞ্চনারীকে ; 'না'—অর্থাৎ নর বা মানব।

তথাপি ইহার প্রাতঃস্মরণীয়া হইবার কারণ কি ? ইহার হেতু এ
যে,—ইহাদিগকে স্মরণ করিলে ভগবানের কারুণ্য ও তাঁর পতিত
উদ্ধারণ লীলার উদ্দীপন হয় এবং তাঁহার নামের ও তাঁর ভক্তের অদ্ভু
মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হয়। তাহাতে আমাদের মত পতিত জনগণেরও
স্বতঃই, তাঁর নাম ও ভক্তবাৎসল্য লীলা স্মরণে নিজ নিজ অন্তরে
উদ্ধারের ভরসা জাগিয়া উঠে। তাঁর নামের, বা তাঁর প্রতি, ভক্তি
যে কত মাহাত্ম্য, ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই ঐ পঞ্চ কন্যার
নাম উল্লেখ করা হয় এবং তৎসঙ্গে বলা হয়,—এই পঞ্চ-কন্যা-স্মরণ
"মহাপাতকনাশনং।"

ইহাদের মধ্যে তিনটি,—অহল্যা, তারা ও মন্দোদরী, শ্রীরাম-নামে
ও তাঁর ঐকান্তিক ভজনে ; এবং অপর দুটি,—দ্রৌপদী ও কুন্তী, প্রগাঢ়
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়াছেন। ইহাতে শুধু তাহাদের
মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হয় না, বরং ভগবৎ-ভজনের ও ভগবানের নামের
এতাদৃশ অদ্ভুত মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হয়।

সুদুরাচারীও তাঁহার অনন্যভজন করিলে, 'সাধু' বলিয়া গণ্য
হইবে এবং তাহাদের কদাচ পতন নাই, স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনকে নিমিত্ত
করিয়া শ্রীশ্রীগীতায় এই অভয় বাণীই জগতে প্রচার করিয়াছেন, যথা,—

(১) "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥" গীতা-৯।৩০

'অতি বিগর্হিত কার্য্যকারী ব্যক্তিও যদি, অন্য ভজন না করিয়া
একমাত্র আমারই ভজন করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, যে হেতু
তিনি উত্তম নিশ্চয় পথ ধরিয়াছেন।'

(২) "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" গীতা-৯।৩১

'চিরদিন দুষ্কর্ম্মান্বিত থাকিয়াও আমার ভক্তি-মাহাত্ম্যে শীঘ্রই সে
ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত

কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; ইহা তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার।'

ভগবদ্‌ভজনে পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। তাহাও ভগবান তৎপরেই বলিলেন—

(৩) "মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

গীতা—৯।৩২

'হে পার্থ! যাহারা পাপিষ্ঠজন্মা, অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য, বা শূদ্র, তাহারাও আমার শরণাপন্ন হইলে পরম-গতি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।' জগতের নরনারী যতই পাপ করুক, ঐ পাপ ঐকান্তিক নিষ্কপটে ত্যাগ করিয়া, যদি আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ ইষ্টদেবের নাম-রূপে ডুবিতে পারে, তবে তাহারা প্রাতঃস্মরণীয় হয়, ইহাই শাস্ত্রের শিক্ষা। অতএব ঐ পঞ্চ-কন্যাকে প্রাতঃস্মরণীয়া বলিয়া গণ্য করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে,—তাঁহারা যথার্থই প্রাতঃস্মরণীয়া হইবারই যোগ্যা।

ইহাদের অনন্যসাধারণ ভগবৎপ্রীতিই, সর্বধর্ম্ম-অতিক্রম করাসত্ত্বেও, উহাদিগকে স্মরণীয়া করিয়াছে। অত্যধিক অনন্য ভগবৎ-প্রীতিই মাত্র পূজ্যত্বেরহেতু ; অন্য সমস্ত বস্তু তদানুগত্যে, পূজ্যত্ব লাভ করে। স্বাধীনভাবে নহে। তথাহি, পদ্মপুরাণে—

"চণ্ডালোপি মুণিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥"
'সর্ব্ববর্ণে যেইভজে—সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
না ভজিলে—সে চণ্ডাল, সর্ব্বশাস্ত্রেকয়॥'

শম্বুকের শিরশ্ছেদন

(৪) প্রশ্ন :—উগ্রতপা তপস্বী শম্বুকের শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শিরশ্ছেদন ও দ্রোণ কর্তৃক একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদনের যৌক্তিকতা কি ?

উত্তর :—শূদ্র তপস্বীকে বধ করিবার হেতু—অসৎ-পাত্রে মাত্রাধিক শক্তি প্রকাশ পাইলে, তাহা জগতের বিষম অকল্যাণেরই কারণ হয়, এবং ঐ শক্তির অপপ্রয়োগের জন্য ঐ শক্তিপ্রযোক্তারও বিশেষ অনিষ্ট হয়।

দেবলোক-জয় ও স্বশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী অধোমুখ-লম্বমান কঠোর অপস্যা নিরত শম্বুক নামক শূদ্রের শিরশ্ছেদন ব্যাপার যেমন উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার বলিয়াই প্রতীত হয়, সেইরূপ স্থূল-দৃষ্টিতে, গুরদক্ষিণা-স্বরূপ দ্রোণ কর্তৃক অনার্য্য একলব্যের নিকট অঙ্গুষ্ঠ-ছেদন আদেশ, নির্ম্মম এবং অতীব নৃশংস আচরণ বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে ইহার ভিতর বেশ একটা রহস্যজনক ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি শক্তি 'হজম' করিতে পারে না, তাহাকে অতিরিক্ত শক্তি দিলে, সে তাহার অপব্যবহারে, জগতের ও তাহার নিজের, অনর্থই ঘটায়, তাহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহিতাঃ॥"

গীতা—১৬।৯

'এই মিথ্যা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ভ্রষ্ট-স্বভাবযুক্ত ও অল্প-বুদ্ধি বিশিষ্ট, সকলের অপকারকারী, উগ্রকর্ম্মা আসুরী-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ কেবল জগতের নাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হয়'।

অশ্বত্থামা উপযুক্ত পাত্র নহে বলিয়াই, নিজ পুত্র হইলেও, দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে অনেক দিব্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন নাই, অথচ অর্জ্জুন এই বিদ্যার উপযুক্ত আধার জানিয়া সাগ্রহে অর্জ্জুনকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যে যুক্তিযুক্ত কার্য্য করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল। অশ্বত্থামা যে কিরূপ ক্রূর-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক, চোরের মত, পঞ্চ পাণ্ডবের নিদ্রিত পঞ্চ-পুত্রের বিনাশ হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাঁহার স্বভাব এত নীচ, তাঁহাকে তাঁহার 'ওজন' অতিরিক্ত শক্তি দিলে কি আর রক্ষা আছে! এই হত্যাকাণ্ডের পরদিনেই অর্জ্জুন-ভয়ে ভীত, পলায়ন-তৎপর অশ্বত্থামা জগতের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না রাখিয়া, নিজ প্রাণ রক্ষার্থ অর্জ্জুনের প্রতি দুর্ব্বার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন! কিন্তু তিনি এই অস্ত্রের সংহরণ কৌশল অবগত ছিলেন না। এই অবস্থায়, অর্জ্জুন যদি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ক্রমে, তাঁহার অস্ত্রের প্রতিরোধ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে অবিলম্বে একটা ভীষণ প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হইত। এই কারণে কৃষ্ণ-নির্দ্দেশে অর্জ্জুন ঐ উভয় অস্ত্রই অবিলম্বে সংহরণ করিয়া লইলেন। তবেই, দেখুন, অশ্বত্থামা নিজের প্রাণটী বাঁচাইবার জন্য, বা, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, কি ভয়ঙ্কর জগৎ-অহিতকর জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন!

আর অর্জ্জুনকে আমরা কি দেখি? কত উৎকট পরীক্ষার সময় আসিয়াছে, কত জীবন-সঙ্কট কাল উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি তিনি যেখানে যে অস্ত্র প্রয়োগ-বিধি তাহা হইতে তীব্রতর দিব্য অস্ত্র কদাচ প্রয়োগ করেন নাই। বিরাট রাজার গোধন-হরণ কালে সম্মোহন অস্ত্রে তিনি একক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি চালিত সমগ্র কুরু সৈন্যকে অবলীলাক্রমে মোহিত করিয়া, তাঁহাদের উষ্ণীষাদি হরণ করিয়া আনাইলেন। ইচ্ছা করিলে, তদবস্থায় তাঁহাদের শিরশ্ছেদনও

করিতে পারিতেন ; কিন্তু এরূপ হীন-চিন্তা তাঁহার মনে উদয়ই হই না। পরে কুরুক্ষেত্র সমরে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই অমানুষিক শক্তি অর্জ্জুন, সমস্ত দিনের যুদ্ধেও জয়দ্রথকে বধ করিতে সমর্থ না হই নিজে অগ্নি প্রবেশ করিয়া মৃত্যুবরণ করিবার জন্য চিতা সজ্জি করিলেন, তথাপি ঐরূপ যুদ্ধে ভীষণ পাশুপতাদি অপ্রযোজ্য অ প্রয়োগে বিরত রহিলেন ! দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালেও, বিপন্না রজঃস্ব যুবতী ভার্য্যার বিবস্ত্রাশঙ্কায়, করুণ আর্ত্তনাদেও, ধর্ম্মচ্যুতি ভয়ে, গাণ্ডী ধারী অর্জ্জুনের কিরূপ নীরবতা, কিরূপ সংযম,—কিরূপ অমানুষি ধৈর্য্য !! এইখানেই তাঁহার শক্তি "হজম" করিবার কিরূপ অপরিসী সামর্থ্য, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় এবং দ্রোণাচার্য্য কে যে অর্জ্জুনকে দিব্য অস্ত্রদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছিলে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

অশ্বত্থামা সম্বন্ধে আরও একবার ঐরূপ একটা ঘটনা ঘটে। একা তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার সুদর্শন-চক্রটী প্রার্থনা করেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্য সহকারে বলেন, তিনি, ইচ্ছা করিলে, উহ লইয়া যাইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই তখন অশ্বত্থামা হৃষ্টচিত্তে সুদর্শনটি লইতে অগ্রসর হ'ন, কিন্তু কো প্রকারে তাহা তুলিতেই সমর্থ না হইয়া ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হই ফিরিয়া আসেন। এখানেও অনধিকারীর কি উৎকট আব্দার! কি নিমিত্ত সুদর্শন প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা করায় অশ্বত্থামা অম্লানবদনে বলিলেন তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিয়া সর্ব্বভূতের অজেয় হইবেন! তাঁর এই অন্যায় আব্দার পূরণ করিলে, অনর্থের সীমা থাকিত না বলাই বাহুল্য। এখানে আর একটী বিষয় অনুধাবনযোগ্য যে তীব্রতপা অসুরগণকে কদাচ অমর-বর দিবার ব্যবস্থা নাই। তাহার অমর-বর পাইলে জগতের কি ভীষণ উৎপাতের কারণ হইত তাহ সহজেই অনুমেয়।

পুরাণে দেখিতে পাই, দেবাসুর উভয়ের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত অমৃত, ভগবান মোহিনীমূর্ত্তিধারণ করতঃ, অসুরদিগকে বঞ্চনা পূর্ব্বক দেবতাগণকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অমর করিলেন। ইহার ভিতর আরও বেশ একটু রহস্য নিহিত রহিয়াছে। মোহিনী মূর্ত্তির হাবভাব কটাক্ষে অসুরগণই বিমুগ্ধ হইল, কিন্তু কৈ, দেবতাগণ তো হইলেন না? ইহাতে তাহারা কিরূপ কাম-পরতন্ত্র ও অজিতেন্দ্রিয় এবং অমর হইবার অযোগ্য তাহাও প্রদর্শিত হইল।

ঐ শূদ্র-তপস্বী শম্বুক, ও নিষাদ-পুত্র একলব্য, উভয়েই নীচ বংশোদ্ভব; একারণ, স্বভাবতঃ, তাহারা তমো-ভাবাপন্ন। তাহাদিগগেক যোগ্যতার অধিক শক্তির অধিকারী করিলে, (ছোট ছেলের হাতে অগ্নি, বা ছুরিকা প্রদান করিলে, সে যেমন আত্মহত্যা, বা, অগ্নিকাণ্ড করিয়া বসিতে পারে তদ্রূপ,) তাহাতে তাহাদের নিজেদের এবং জগতের সমূহ অহিত সাধিত হইত।

এই কারণেই মারণ, উচাটন, বশীকরণ মন্ত্র-তন্ত্রাদি অযোগ্য পাত্রে অর্পণের বিধি নাই। আধুনিক জুয়া (লটারি) খেলায় যদি তেমন একটা নীচ, ক্রূর, লম্পট, মদ্যপায়ী একবারে অত্যধিক ধনের অধিকারী হয়, তবে সেই অর্থ তাহার পক্ষে এবং তাহার সংশ্লিষ্ট জনগণের কিরূপ অনর্থকর হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নখ-দর্পণে দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা যাহাতে যাহার চরম ও পরম হিতসাধন হইবে, তাহার জন্য তাহাই ব্যবস্থা করিতেন।

মূলকথা, তমোগুণ সম্পন্ন অসুর-প্রকৃতির লোকেরা, স্বভাবশতঃই, হিংসাপ্রবণ ও ক্রূরকর্ম্মা; সুতরাং তাহাদের ঐ অসুর-প্রকৃতি ভালরূপে চরিতার্থ করিবার কারণ, শক্তি অর্জ্জনের জন্যই, উগ্র তপস্যায় ব্রতী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক—উগ্র তপস্যা প্রভাবে উহাদের ঐ সকল প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়া থাকে। উহারা উগ্র তপস্যায়

মন্ত্রাদি শক্তি প্রভাবে, দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহাদেরই অনিষ্ট সাধন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে,—বৃকাসুর তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তীব্র তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া, "যাহার মাথায় হাত দিবে সেই ভস্ম হইবে"—এই বরলাভ করিয়া, ঐ বরের সত্যতা প্রমাণের জন্য বৃকাসুর মহাদেবের মস্তকেই হাত দিতে উদ্যত!

এইত বিষম সমস্যা; এই কারণেই কোন নীচ প্রকৃতি ব্যক্তির তীব্র তপস্যা জগতের উদ্বেগের কারণ হয়; নতুবা কেহ ভগবৎ-ভজন দ্বারা চিত্তশোধনরূপ আত্মোৎকর্ষের জন্য অতি বড় কঠোর তপস্যা করিলেও তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র উদ্বেগের কারণ হয় না; এবং কোন মহৎ ব্যক্তিই তাহার তপস্যার হন্তারক হ'ন না; পরন্তু, উৎসাহ ও সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা, পদ্মপুরাণে ঃ—

> "চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
> বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥
> 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী।
> কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র, কি পুরুষ, নারী॥
> সর্ব্ববর্ণে যেই ভজে, সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
> যে না ভজে সে চণ্ডাল, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥'

শ্রীগীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

> "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥
> মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
> স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥

গীতা-৯।৩০, ৩২

অতএব তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কোন অসাধারণ শক্তি অর্জ্জনের জন্য তপস্যা করিতে না দিবার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, কোন প্রকার নীচাশয়তার পরিচায়ক নহে; পরন্তু, তাহা তাহাদের ও জগতের হিতের জন্যই, পরম নিঃস্বার্থ, জগতের যথার্থ কল্যাণ-কামী, ঋষিদিগেরই ব্যবস্থা। উহার ব্যতিক্রম ঘটাইলে, জগতের সমূহ অনর্থই ঘটিয়া থাকে। ইহা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অনেকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন দ্বিজাতিগণ নিজেদের প্রতিপত্তি ও সুবিধা লাভের জন্য শূদ্রগণকে কোন-কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহা কদাচ প্রকৃত তথ্য নহে, উহাও ঐ অযোগ্য পাত্রে শক্তির অপ-প্রয়োগের অনিষ্ট আশঙ্কাতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে; নতুবা, ঋষিগণের মত উদার কে? তবে তাঁহারা জগতের পরম কল্যাণার্থ, যে সকল বিধি-নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বার্থান্ধ, সংকীর্ণচেতা, তপস্যাবিমুখ, জনসাধারণের ধারণার অতীত। পরম উদার গীতা শাস্ত্রেও স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগীতা শ্রবণ-পঠনাদির, এত মাহাত্ম্য বলিয়াও, পরিশেষে, বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন—

> "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
> ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥" গীতা—১৮।৬৭

এই সকল মহাবাক্য কদাচ সংকীর্ণতা, বা নীচাশয়তার, পরিচায়ক নহে। ইহাতে ভগবানের নিগূঢ় পরম করুণাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, সুধীগণ অবশ্যই তাহা অনুভব করিবেন।

শাস্ত্রকারগণ জগতের হিতের জন্যই অধিকারী ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন-ভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বশিষ্ঠ, কামদেব, মার্কণ্ডেয়, কশ্যপ, গৌতম, নারদ, প্রমুখ আটজন মহা-তেজস্বী ত্রিকালদর্শী, জগতের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, উদারচেতা, ঋষিগণের নির্দ্দেশানুসারেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শম্বুকের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

স্থূল দৃষ্টিতে সকল সময় ঐ সকল অচরণের যৌক্তিকতা উপলব্ধি হইলেও উহা কদাচ উপেক্ষা, বা অবজ্ঞার, বস্তু নহে।

এই খানে আর একটি ভাবিবার কথা আছে। দ্রোণাচার্য্য, প্রথম একলব্যের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন—একলব্যকে শিষ্য-গ্রহণ করি অসম্মত হইলেন। তখন সে নিরুপায় হইয়া, মৃত্তিকার দ্রোণ মূ গড়িয়া, ঐ মূর্ত্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া, দৃঢ় অধ্যবসায় ও ঐকান্তি গুরু-নিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনে এতাদৃশ অদ্ভুত ধনুর্ব্বিদ্যা লা করিলেন—যে তাহা এমন কি, অর্জ্জুনেরও বিস্ময় ও লোভ উৎপাদ করিল। তাহার অলৌকিক গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া, স্বয়ং দ্রোণও চমৎকৃ হইলেন, এবং তাহার নিরূপম গুরু-নিষ্ঠার সুযোগ লইয়াই যেন, তাহ ধনুর্ব্বিদ্যা খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে, তাহার অঙ্গুষ্ঠ, গুরু-দক্ষিণা-স্বরূ চাহিলেন। একলব্য সেই কঠোর পরীক্ষাতেও বিন্দুমাত্র বিচলি হইলেন না; জগতে তাহার গুরু-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গুরু প্রার্থিত দক্ষিণা তৎক্ষণাৎ সহাস্য বদনে প্রদান করিলেন। এইরূ গুরু-নিষ্ঠা প্রত্যুতই জগতে অতুলনীয়।

দ্রোণের ঈদৃশ আচরণটি স্থূল দৃষ্টিতে, কদাচ সমর্থন যোগ্য নহে কিন্তু তাহার শিষ্য-স্থানীয় একলব্যের ঐহিক ও পরমার্থিক প্রকৃত কল্যা কামনায়, এবং জগতের হিতের জন্য, যদি স্নেহ-পরবশ হইয়া নির্ব্বিকা চিত্তে, ঐরূপ নির্ম্মম আচরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দ্রোণকে পাপস্পর্শ করা সম্ভব নহে। সাক্ষাৎ ভগবান, বা, কর্ম্ম-পরতন্ত্রহী স্বতন্ত্র, কোন মহাপুরুষ দ্বারা এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাতে সন্দেহের কিছুই থাকিত না। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ঐরূপ উচ্চ স্তরে মহাপুরুষ ছিলেন কিনা বলা কঠিন। যদি তিনি অসদভিপ্রায়ে নি স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, একলব্যের অতুলনীয় গুরু-নিষ্ঠার সুযোগ গ্রহ করিয়া, এই অকার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এ কার্য্য জঘন্য নৃশংসতারই পরিচায়ক তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তি

ঐরূপ জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন এরূপ কুত্রাপি তাহার প্রমাণ নাই। তিনি একাধারে ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যার অনুপম অধিকারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কোথাও সেরূপ নীচাশয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার উদার প্রকৃতিরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

(১) তাঁহার বাল্য-সখা দ্রুপদরাজ তাঁহার উপর অতি জঘন্য দুর্ব্ব্যবহার ও কটুক্তি করায়, উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গুরুদক্ষিণা স্বরূপ বদ্ধাবস্থায় আনিত ঐ দ্রুপদরাজের প্রতি পরম উদারতা প্রদর্শন করতঃ, সর্ব্বান্তকরণে, তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং পরম প্রীতি সহকারে পুনরায় সখ্য-ভাব স্থাপন করিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রত্যর্পণ করিলেন। উহা তাঁহার বিশেষ মহানুভবতারই পরিচায়ক।

(২) অর্জ্জুনকে যোগ্য পাত্র দেখিয়া অনেক দিব্য অস্ত্র নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে না দিয়া অর্জ্জুনকে প্রীতি সহকারে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

আরও এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে উপযুক্ত, সম্মানার্হ, পাত্র দেখিয়াই মহাধীসম্পন্ন মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে অতি সমাদরে পাণ্ডব ও কৌরব রাজপুত্রগণের আচার্য্য-পদে বরণ করেন এবং তিনিও ঐ শ্লাঘনীয় পদের যথাবথ মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। কোন নীচাশয় ব্যক্তির উপর ভীষ্মদেব কর্ত্তৃক কদাচ ঐরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার সমর্পণ সম্ভবপর নহে।

ইহাতেই অনুমান হয় দ্রোণাচার্য্য মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই একলব্যের প্রতি বাহ্যতঃ ঐরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"সাধারণ লোকের অসাধারণ শক্তি লাভ হলে, তার দ্বারা সংসারেই বিশেষ অনিষ্টই হয়, এ জন্যেই শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীকে বধ ক'রেছিলেন।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৩য় খণ্ড, ১৫৭ পৃঃ

বেদব্যাসের জন্ম

(৫) প্রশ্ন :—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম ব্যাপার দোষাবহ নয় কেন ?

উত্তর :—"তেজীয়সাং ন দোষায়"—অগ্নি যেমন সর্ব্বভূক্ হইয়া নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং পাবক-নাম সার্থক করে, সেইরূপ মহাশক্তিধরেরাও কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন। যাঁহারা আসক্তিশূন্য, পদ্মপত্রস্থিত জলের মত নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ, তাঁহারা যেকোন কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম পাশে কদাচ অবদ্ধ হ'ন না। পরাশর মুনি যে কিরূপ মহাশক্তিধর পুরুষ ছিলেন তাহার প্রমাণ,—তাঁহার ইচ্ছা মাত্র কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি হইল, মৎস্যগন্ধা তৎক্ষণাৎ পদ্মগন্ধা হইলেন, দ্বৈপায়ন ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও সত্যবতীর কুমারী ভাব অক্ষুন্ন রহিল—মুণিবর বর দিলেন —"গর্ভ মোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপন কন্যকা অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।" [কুমারী (virgin) মেরীর গর্ভে মহাত্মা যিশুখৃষ্টের জন্মের সহিত ইহার তুলনা করুণ।] একটি দ্বীপ সৃষ্ট হইল এবং বিশেষ প্রয়োজনেই ঐ ভাবে তথায় দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ভুমিষ্ঠ হইবার ব্যবস্থা হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন। এইরূপ একসঙ্গে এতগুলি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইল। ইহাতে ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা কখনই সাধারণ লৌকিক ব্যাপার নহে। ভগবানের আবেশ অবতার ব্যাসদেবের অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া, পরাশর মুনি যে কিরূপ প্রভাব সম্পন্ন ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। সাধারণ লৌকিক বিচার এ সকলক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। সমুদ্র-মন্থোনুদ্ভূত কালকুট ভক্ষণ করিয়া হজম করা, ভগবান নীলকণ্ঠের পক্ষেই সম্ভব,—অপরের নহে।

দেহে যাঁহার আত্মাভিমান নাই, তিনি যে পাপ-পুণ্যের অতীত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যাহার কর্ম্ম আছে তাহারই কর্ম্ম

ফল আছে। দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি যদি 'আমি', 'আমার', না রহিল তবে দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি কৃত কর্ম্মের ফল আমার হইবে কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাতৃ-বাক্যানুরোধে ব্যাসদেব যেভাবে ভ্রাতৃ-বধূতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহাতেও যে, কোন প্রকার অধর্ম্ম স্পর্শ করে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। গীতাতেও ভগবান এই কথাই বলিয়াছেন—

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো, বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি সইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

গীতা—১৮।১৭

'আমি কর্ত্তা এইরূপ যাহার ভাবনা নাই; যাহার বুদ্ধি (পুণ্যে—হর্ষ, পাপে—অনুতাপ, ইত্যাদিরূপ) কর্ম্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হনন করিয়াও হনন করেন না, (বা,) তজ্জন্য বদ্ধ বা ফলভাগী হ'ন না।

ভাগবতে রাসলীলা প্রসঙ্গের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ
বিনশ্যত্যাচচরন্মৌঢ্যাদ যথা রুদ্রোব্ধিজং বিষম্॥"

ভাঃ—১০।৩৩।২৯-৩০

"কুশলাচরিতনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্যায়েণ বানার্থো নিরহঙ্কারারিণাং প্রভো॥"

ভাঃ—১০।৩৩।৩২

শ্রীশুকদেব কহিলেন—'ঈশ্বরগণের সাহস ও ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বভূক অগ্নির ন্যায় তাহা সেই তেজস্বীগণের দোষের নিমিত্ত হয় না। অনীশ্বর ব্যক্তিগণ ইহা মনেও কখন সমাচরণ করিবেন না। মূঢ়তা বশতঃ আচরণ করিলে নিশ্চই মহাদেব ভিন্ন অপর কেহ সমুদ্রোৎপন্ন বিষ-ভক্ষণের ন্যায়, অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।'

'হে প্রভো, ইহারা নিরহঙ্কার, কুশলাকুশল দ্বারা ইহাদের ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্বার্থ নাই; আর সেই কুশলাচরণের বিপরীত আচরণের দ্বারাও কোন অনর্থ নাই।'

পরাশর মুণিবর অলৌকিক দেশ-কাল-পাত্রাভিজ্ঞ ও মহাজ্যোতির্বিদ ছিলেন, এ কারণ যথা-সময়ে, যথাস্থানে, শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে উপযুক্ত আধারে, পরম পবিত্র ও একান্ত অনাসক্ত চিত্তে, বেদব্যাসরূপ যথার্থ 'ক্ষণজন্মা' মহাপুরুষের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন। নিন্দা-স্তুতির অতীত, করুণারখনি, মহাতেজস্বী মুণিবর জগতের পরম কল্যাণার্থে এই (সাধারণ লৌকিক) 'ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম'-রূপ অদ্ভুত 'সাহসের' পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রসাদে আজ আমরা তাঁহার ভুবনপাবন পুত্র, মহামুনি বেদব্যাসদেবকে, ভগবানের অবতার জ্ঞানে —"ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায়, ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে', বলিয়া পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি এবং পরম পুলকিত অন্তরে তাঁর উদ্দেশে নিত্য যথাযোগ্য স্তুতি-গান করিয়া ধন্য হইতেছি—

"নমোস্তু তে ব্যাস বিশাল বুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রনেত্র
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বলিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।"

সত্যভাষণ

(ক)

যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন

(৬) প্রশ্ন ঃ—ভগবৎ-আদেশে, অশ্বত্থামা হত (ইতি গজঃ) বলায়, যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইল কেন?

উত্তর ঃ—অবিচারে নির্ব্বিকার-চিত্তে ভগবৎ-আদেশ জ্ঞানে ঐ আজ্ঞা পালন করিলে যুধিষ্ঠিরকে কদাচ পাপ স্পর্শ করিতে পারিত না। ভগবান স্বয়ং গীতার উপসংহারে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" গীতা—১৮।৬৬

'হে অর্জ্জুন, ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কিছু না দেখিয়া, অবিচারে, আমার শরণ লও; (তাতে যদি প্রত্যবায় জনিত কোন পাপ হয়,) আমি সমুদয় পাপ হইতে তোমাকে বিমুক্ত করিব।'

কিন্তু ঐরূপ গর্হিত কাজ করা ঠিক কিনা এই বিচার যখনই যুধিষ্ঠিরের মনে উদয় হইল, তখনই শ্রীকৃষ্ণের আদেশ এবং শাস্ত্র অনুশাসন, উভয়-দিক রাখিতে গিয়া, 'অশ্বত্থামা হত' উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া 'ইতি গজঃ' অস্পষ্ট বলিলেন। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, যেন তাঁহার হৃদয় দোদুল্যমান; এবং কাজটি যে খুবই গর্হিত তাহাও স্পষ্ট বুঝিলেও উপস্থিত সঙ্কটে মনের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের ও আত্মীয়স্বজনের মনস্তুষ্টির জন্য, কপটতার আশ্রয় লইলেন। ইহা আদৌ সমর্থন যোগ্য নহে। উহা ইংরাজীতে "*white lie*" বলিয়া অভিহিত। উহা সাধারণ সরল-মিথ্যা-ভাষণ হইতেও জঘন্য—মিথ্যার সহিত ছলনা মিশ্রিত। "ন ব্যাজেনা-চরেদ্ধর্ম্মং",—'ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবে না'।

ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধিতে, ভগবৎ-আদেশ অবিচারে পালন করিলে তাঁহার চিত্তে কদাচ কোনরূপ মালিন্য ঘটিত না। পরম ধর্ম্মজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের পিতা, বসুদেবের নিকটও একদিন এইরূপ এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল; কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে, অবলীলাক্রমে, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবকীর সকল পুত্রই, জন্মিবামাত্র কংস হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকিলেও, এবং প্রত্যেকবার, অবিচলিত চিত্তে, সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিলেও, অষ্টম-গর্ভে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া, তৎপরিবর্ত্তে যশোদার কন্যাকে লইয়া আসিবার আদেশ করিলে, মহাধীসম্পন্ন ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বাভিজ্ঞ বসুদেব, বিনা দ্বিধায়, অবিচারে, ভগবৎ আদেশ পালন করায়, চিত্তে কোন প্রকার মালিন্যের উদ্ভব ঘটিল না, একারণ কোন প্রকার পাপেও লিপ্ত হইতে হইল না। এই ভাবে সগৌরবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ ভগবানের পিতা হইবার যোগ্যতারই প্রমাণ দিলেন।

অপর পক্ষে আবার ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শাস্ত্র অনুশাসনও যদি অকপটে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিতেন, এবং ভগবানের আদেশ, তাঁরই পরীক্ষা জ্ঞানে, অনাদর করিতেন, তাহা হইলেও হৃদয়ে পাপ স্পর্শ করিত না, এবং ভগবানও তাহাতে অন্তরে সন্তোষ লাভই করিতেন। পঞ্চ-পাণ্ডব-পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া, বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার প্ররোচিত করিলেও, তাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া অর্জ্জুন কোন মতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিরুপম ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্নই হইলেন, এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার সুন্দর উপায়ও উদ্ভাবন করিলেন।

এই দ্রোণাচার্য্য বধের পরেই ত দেখিতে পাই, অতীব অন্যায়রূপে পিতা দ্রোণকে হত্যা করা হইয়াছে শুনিয়া, অশ্বত্থামা ভীষণ নারায়ণ-অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই অমোঘ অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার একমাত্র উপায়,

সকলেরই রথ হইতে অবতরণ করিয়া অস্ত্রত্যাগ করা ; নতুবা, উহার প্রতিকারের আর অন্য কোন উপায় নাই। তাহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপ অনুরুদ্ধ হইয়াও, ভীম উক্ত কাপুরুষোচিত কার্য্যে কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। তখন, উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনসহ ভীম সমীপে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবল-সম্ভূত তেজোরাশি মধ্যে অবস্থান করিলেন, এবং নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত, ভীমসেনের অস্ত্র-শস্ত্রকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ও পরিশেষে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে আনয়ন করিলেন,—এইরূপে নারায়ণাস্ত্র প্রশমিত হইল।

জয়দ্রথ বধ ব্যাপারেও, অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অশক্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ অদ্ভূত উপায় উদ্ভাবন করিলেন তাহা কাহার অবিদিত নাই। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বহুক্ষেত্রেই, তাঁহার একান্ত শরণাগত পাণ্ডবদিগকে, মহা-মহা সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার উপায়ান্তর বাহির করিয়াছেন। এমন কি, উপায়ান্তর না পাইয়া, অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়া, নিজেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় ধর্ম্মভীরু, একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যুধিষ্ঠির যদ্যপি ঐরূপ গুরুতর অন্যায় আচরণে কোন প্রকারে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কদাচ তাঁহার উপর রুষ্ট হইতেন না ; পরন্তু, তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠায়, অন্তরে অন্তরে সন্তোষ লাভই করিতেন, এবং হৃষ্টচিত্তে দ্রোণ-বধের উপায়ান্তর উদ্ভাবন করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আদেশ করিলেও, কাজটি যে অতীব গুরুতর পাপজনক তাহার প্রমাণ তখনই প্রত্যক্ষ হইল। ইতঃপূর্ব্বে, পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে অবস্থান করিত ; কিন্তু, তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যা বাক্য কহিলে, তাঁহার বাহনগণ তৎক্ষণাৎ ধরাতল স্পর্শ করিল। উহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে উহা অতীব গর্হিত

কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইল। যুধিষ্ঠিরের মত মহৎব্যক্তির উহা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

গুরুবর্গের আদেশও, শাস্ত্র সদাচার বিরুদ্ধ বোধ হইলে, কদাচ পালনীয় নহে,—এমন কি সাক্ষাৎ ভগবানের আদেশও নহে; ইহা শাস্ত্রেরই অনুশাসন। একারণ প্রহ্লাদ পিতার, ভরত মাতার, বিভীষণ ভ্রাতার, বলীরাজ শ্রীগুরুর, অর্জ্জুন (অশ্বত্থামা শিরশ্ছেদন আদেশ) এবং (রাসে সমাগত) গোপীগণ (গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ,) সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের আদেশও, তাহার পরীক্ষা জ্ঞানে, লঙ্ঘন করিয়া, যথার্থ ধর্ম্মাভিজ্ঞ বলিয়া জগতে যশস্বী ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।"

গীতা—১৬।২৪

'কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই প্রমাণ।' আবার শাস্ত্রে একথাও আছে যে—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যং বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"—মনু

'কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানির উদ্ভব হইয়া থাকে।' সাধারণতঃ কোন্ পথে চলিতে হইবে নির্ণয়ের জন্য নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় বেশ একটি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন :—

"সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য",—তবে কোন পথ নিঃশঙ্কচিত্তে ধরিতে হইবে। 'সাধু'—নিজ সম্প্রদায়ী মহাজন; কিংবা, সাধারণ সাধু মহাত্মা। তাঁর কথা বা আচরণ, 'শাস্ত্রের' সহিত যদি মিলে; এবং তাহা যদি নিজ 'গুরু-বাক্যের' সহিত মিলে; এই গুলি 'হৃদয়ের' সহিত মিল করিয়া তবে কোন কিছু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা উচিত।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, চিরকাল পরম বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবন যাপন করিলেও, এক্ষেত্রে যে অতীব গর্হিত আচরণই করিয়াছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহাতে তিনি মিথ্যাভাষণ, বিশ্বাসঘাতকতা ও গুরুদ্রোহাচরণ, তিনটি গুরুতর অপরাধেই যুগপৎ লিপ্ত হয়েন।

অপর কোন ব্যক্তি, যিনি সতত মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহার এক্ষেত্রে মিথ্যা বলিলে তেমন একটা কিছু গুরুতর অপরাধ হইত না। ভীমসেন বিনাদ্বিধায় মিথ্যা কথা বলেন দ্রোণাচার্য্য তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, সে কারণ তাঁহার মুখে পুত্র-নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও তিনি তাহাতে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়া, পূর্ব্ববৎই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বাল্যাবধি একান্ত সত্যনিষ্ঠ বলিয়াই জানিতেন। তাঁহার নিশ্চিত জ্ঞান ছিল, যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পাইলেও, কদাচ মিথ্যাকথা প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই তিনি অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। এমত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাকথা বলা কিরূপ গর্হিত আচরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া দ্রোণাচার্য্য অপর কেহ নহেন— তাঁহার সাক্ষাৎ গুরু। এ কারণ এক্ষেত্রে মিথ্যা বলায় তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে অতীব গুরুতর অপরাধই ঘটিল।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এরূপ অন্যায় আচরণ করিতে প্ররোচনা দিলেন কেন?

মহাভারতকার উহার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—অনন্তর হৃষীকেশ, দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য হইবে স্থির বুঝিয়া দুঃখিত চিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, "হে রাজন, যদি দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধদিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যাকথা বলিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যাকথা প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর

হইতেছে। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যাকথা বলিলে, পাপস্পর্শ হয় না।" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অলঙ্ঘনীয়তা বশতঃ, যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যা-কথনভয়ে যুগবৎ আক্রান্ত হইয়া, দ্রোণ সমক্ষে, 'অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন,' এই কথা স্পষ্ট বলিয়া অস্পষ্টরূপে, 'ইতি গজঃ', শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, তৎকালে পাণ্ডবদের পক্ষে ভীষণ সঙ্কটকাল সমুপস্থিত হইয়াছিল; এবং আপদ-ধর্ম্ম হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ সময়োচিত যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা হয়ত যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল; কিন্তু তত্রাচ যখন উহা বলা অন্যায় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল তখন চিরসত্যবাদী, ধর্ম্মরাজ, যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করা কদাচ সমর্থন যোগ্য নহে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, ভগবান তাঁহার মধ্যে কতদূর নিষ্ঠা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই, এইরূপ প্ররোচনা বাক্য প্রয়োগ করিলেন; এবং ইহা দ্বারা জগৎকেও দেখাইলেন, অপূর্ণ মানব যতই সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক হউন না কেন, সঙ্কট সময়ে লোভ মোহাদিতে অভিভূত হওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে—'অতএব সাধু সাবধান।'

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য, মহাপুরুষ কেন, স্বয়ং ভগবানও যদি করিতে বলেন, অভিমান থাকৃতে, বিচার বুদ্ধি থাকৃতে, তাহা কেহ কর্‌লে, তাকে সেই মত দণ্ডটি পেতে হয়। ভগবানের কথাতেইত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, 'অশ্বত্থামা হত (ইতি গজঃ)' ব'লে, প্রকারান্তরে মিথ্যা কথাটি বলিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন কৈ! ভগবানই এজন্য তাঁকে আবার নরক দর্শন করালেন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আরও ঢের আছে, ভগবানও একটি কম পাত্র নন্ ত! শাস্ত্রকর্ত্তারা সবই দেখিয়েছেন।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, ২৫৭ পৃঃ

সত্যভাষণ

(খ)

দস্যুর নিকট সত্য-গোপন

(৭) প্রশ্ন :—কেহ দস্যুগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া, কোন পলাতক ব্যক্তির সন্ধান গোপন করিলে, বা মিথ্যা বলিলে, পাপ নহে বলা হইয়াছে কেন ?

উত্তর :—ঐ পৃষ্টব্যক্তি তিন প্রকার পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন—(১) সরল সত্যভাষণ, (২) মৌন অবলম্বন, (৩) ঐ নিরীহ ব্যক্তির প্রাণরক্ষার্থ, মিথ্যাভাষণ।

এখানে অধিকারী, বা মানবের স্তরভেদে, ঐ তিন প্রকার পন্থাই, স্থল বিশেষে, যুক্তিযুক্ত হইতে পারে—

(১) প্রথমতঃ, যিনি সাধনের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বত্রই সেই একই ভগবানের প্রকাশ, বা লীলা, দর্শন করিতেছেন—

চোর সাধু, দস্যু আর্ত্ত, প্রভৃতি সকলের ভিতরই সেই এক ভগবানেরই প্রকাশ উপলব্ধি করিতেছেন,—'যিনি সর্প হইয়া দংশন করিতেছেন, তিনিই আবার ওঝা হইয়া ঝাড়িতেছেন ;'—'মারে কৃষ্ণ রাখে কে—রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?' এই সত্য যিনি ঠিক-ঠিক উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই, নিশ্চিন্ত চিত্তে সত্য বলিতে পারেন।* তিনি অপাপবিদ্ধ—কোন কর্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—

---

* এইরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে, বিগত Sepoy Mutinyর সময়, কোন এক বহুদিনের মৌন-ব্রতধারী-সাধুমহাত্মাকে এক সৈনিক পুরুষ, সত্য না বলিলে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, কোন পলাতকের সন্ধান জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্রতধারী হেতু মৌনীই থাকেন। ইহাতে, ঐ সৈনিক ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥" গীতা—১৮।১৭

যিনি কর্ম্ম-পরতন্ত্রহীন, তাঁহার পক্ষে—"ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং", 'সত্য অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই'; তাঁহার নিকট সত্য,—নারায়ণ। কিন্তু এপ্রকার জীবন্মুক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ জগতে একান্ত বিরল। পক্ষান্তরে, যিনি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অহরহঃ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন; অথচ, ঠিক ঐ সঙ্কট সময়ে সত্যবাদী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত, তাঁহার এরূপ আচরণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ,—তাঁহার এক্ষেত্রে অম্লান বদনে মিথ্যা বলাই কর্ত্তব্য।

(২) দ্বিতীয়স্তরের মানব প্রথম হইতে কিছু নিম্নস্তরের, অথচ সত্যসঙ্কল্প সাধক। তিনি যদি মনে করেন, যাহা ঘটিবার ঘটুক, আমি কদাচ মিথ্যা বলিব না, এ আমার আমরণ-ব্রত, এবং সত্য কথা বলিয়াও এই নিরীহ বিপন্ন ব্যক্তির বধের নিমিত্ত হইব না, উহাতে আমার প্রাণ যায় যাউক,—আমি সত্য, বা মিথ্যা, কোন কথাই বলিব না,—মৌনী থাকিব। এক হিসাবে তিনি যে স্তরের সাধক তদনুযায়ী তিনি উক্ত পন্থাই অবলম্বন করেন।

এইখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। ঐরূপ সত্যসঙ্কল্প প্রেমিক ভক্তের নিকট ঐরূপ উৎকট পরীক্ষার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনাই

হত্যা করিলে, তিনি সুদীর্ঘদিনের সেই মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কেবল—"তৎত্বমসি"—'তুমিই সেই' (ভগবান), হত্যাকারীকে এই মাত্র সম্বোধন করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন। ইহার আচরণ দেখিয়া, ইহাই অনুমিত হয় যে ইনি ঐ প্রথমশ্রেণীভুক্ত, সুমহৎ উচ্চ স্তরের সাধক। তিনি মৌনব্রতী ছিলেন, নতুবা সম্ভবতঃ, ঐ সৈনিকের প্রশ্নে সত্য প্রত্যুত্তরই দিতেন। মহাভাগবতের লক্ষণ মহাপ্রভু এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥" চৈঃ চঃ—২।৮।৩১০

বিরল। মহাত্মা গান্ধীজীর ইহাই অভিমত; কথাটি বড়ই মূল্যবান। "ধর্ম্ম রক্ষতি ধার্ম্মিকং"—ইহা ধ্রুব সত্য। যদি বা পরীক্ষার উদ্ভবই হয়, তাহা যে তাঁহার নিজের দুর্দ্দৈবরই পরিচায়ক তাহাতে আর সংশয় নাই। ভগবদিচ্ছাতেই ঐরূপ পরীক্ষা উপস্থিত হইল মনে করিয়া, উহা তাঁহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে এবং মৌনী হইয়া নিজ প্রাণ-পণ করিয়া ঐ বিপন্ন নিরীহ আর্ত্তের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই ঐ স্তরের সাধকের এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য। ঐ স্তরের সাধকের পক্ষেই—"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"।

(৩) যিনি সাধারণতঃ সত্যাশ্রয়ী, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধ্যমত কখনও মিথ্যা বলেন না, তত্রাচ তিনি ঐ নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার্থ এ-ক্ষেত্রে জনহিতের জন্য মিথ্যা বলিতে পারেন, তাহা তাঁহার গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না; বরং আপদ-ধর্ম্ম হিসাবে তাহাই কর্ত্তব্য ও যুক্তিযুক্ত বলিয়াই ধর্ত্তব্য হইবে। "যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্য-ঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ"—'যে স্থলে মিথ্যা সত্য-স্বরূপ হয়'—সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে, তাঁহার পক্ষে এই বিধিই পালনীয়। এইখানে আরও একটা সূক্ষ্মতর প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, ঐ আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন-রক্ষা-কল্পে মৌনী হইয়া নিরুত্তর থাকা অপেক্ষা মিথ্যা উক্তির দ্বারা আততায়ীকে, উল্টা বা ভ্রান্ত পথ, দেখাইয়া হয়ত ঐ ব্যক্তিকে অধিকতর নিরাপদ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; একারণে হিতকরকার্য হিসাবে হয়ত মৌনী থাকা অপেক্ষা উহা অধিকতর শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু ঐ সত্যসঙ্কল্প সাধকের সত্যভ্রষ্ট হইয়া ঐ অসত্য পন্থা অবলম্বন কতদূর যুক্তি সঙ্গত ইহাই অনুধাবন যোগ্য। এ সমস্ত জটিল সূক্ষ্মবিচার মানবের স্তর হিসাবে বিভিন্ন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

তাহা হইলে ইহা হইতে সংক্ষেপতঃ আমরা ইহাই পাইলাম যে—

(১) সাধারণ সংসারী মানুষের এক্ষেত্রে মিথ্যা বলাই সমীচীন,—

'ধর্ম্মানুমোদিত যাহা তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য,'—জ্ঞাত জনহিতার্থে এইরূপ সঙ্কটে মিথ্যা বলাই বিধেয়। (২) যিনি চির সত্যবাদী এবং সর্ব্বত্র ভগবানের অস্তিত্ব, বা লীলা, দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বদা দ্বিধা-শূন্য ভাবে সত্য বলিতে পারেন ; কিন্তু (৩) যিনি ঐরূপ উচ্চস্তরের সাধক নন, অথচ সত্য-সঙ্কল্প, প্রেমিক ভক্ত, তিনি নিজ প্রাণ দিয়াও নিরীহ বিপন্নের প্রাণরক্ষা, এবং সত্যপালন জন্য মৌনী হইতে পারেন।

কুরুক্ষেত্র সমরে, যুধিষ্ঠির কর্ণ-কর্ত্তৃক পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ক্রোধ ও অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া, অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধারণের অযোগ্য বলিয়া ভৎসনা করায়, নিজ ব্রত রক্ষার্থ অর্জ্জুন তাহাকে বধোদ্যত হইলে, যে মহাসঙ্কট উদ্ভব হয়, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দেশ কাল পাত্র ভেদে সত্যাসত্য নির্ণয় সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করেন। সেই প্রসঙ্গে বহুশ্রুত তপস্বীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কৌশিকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তত্রাচ দস্যুগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য পালনার্থ গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত পথিকদিগের সন্ধান বলিয়া দেওয়ায়, ঐ ক্রূর কর্ম্মা দস্যুগণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিক সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন। এইরূপ বহু গবেষণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহা বুঝাইলেন তাহার সার তাৎপর্য্য এই যে—(ক) যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই সত্য, এবং যাহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ তাহা অসত্য। (খ) যাহা লোকের হিত তাহাই ধর্ম্ম। (গ) অতএব যাহা হিত তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহাই অসত্য, (ঘ) এইরূপ সত্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে প্রযোজ্য। মূলকথা যদ্দ্বারা লোকরক্ষা, বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

আর একটা কথা, মানুষের পাপ-পুণ্য, তাহার মনের অভিসন্ধি

লইয়া। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন জীবের মনের অভিসন্ধির দিকে দৃষ্টি করিয়াই তাহার পাপ-পুণ্যের (চিত্তের শুদ্ধাশুদ্ধির) বিচার করেন। এজন্য কোন ক্ষেত্রে জগতের কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ স্বার্থ-শূন্য আত্মোৎসর্গার্থ মিথ্যাভাষণও পরম উপাদেয় ও মহত্বেরই পরিচায়ক হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উদয়পুরের রাণাদের ধাত্রী পান্না যদি সত্য-সত্যই কোনরূপ ঐহিক স্বার্থের (প্রভূত পুরস্কার, বা পরে ঐ শিশু রাজা হইলে তিনি তাঁহার ধাত্রী-মাতা হইবেন এই প্রকার) অভিসন্ধি না রাখিয়া, একমাত্র রাজ্যের কল্যাণের জন্য রাজ্য-লোলুপ দাসীপুত্র বনবীর কর্ত্তৃক বধোদ্যত, একমাত্র রাজবংশধর, শিশু (প্রতাপ সিংহের পিতা) উদয়-সিংহকে স্থানান্তরিত করিয়া নিজ পুত্রকে তৎস্থানে স্থাপন করতঃ, সেই শিশুই রাজপুত্র বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া তাঁহার নিজ পুত্রকে বধার্থ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই তাহা তাঁহার অতি মহৎ হৃদয়েরই পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এতদূর উন্নত স্তরের ছিলেন কি না, এবং একেবারে নিজস্বার্থ-অনুসন্ধান-শূন্য কি না, ইহা ঠিক বোঝা কঠিন,—উহা একমাত্র অন্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন এবং তিনিই তদনুরূপ ভাল মন্দের বিচার করিতে পারেন। তবে তাঁহার মহত্ত্ব যে ভাবে ইতিহাসে বিঘোষিত, তাহাতে মনে হয় তিনি প্রকৃতই ঐ সম্মান পাইবার যোগ্যা।

আরও এককথা নিজ গর্ভজাত পুত্রের প্রতি মাতার যতদূর বাৎসল্য থাকা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে তাহাও ঐ পান্নার থাকা প্রয়োজন, নতুবা স্বার্থ-ত্যাগের ঠিক পরীক্ষা হইল না। নিজ পুত্রের প্রতি স্নেহ-মমতা বা স্বার্থ-বুদ্ধি, যত অধিক, ত্যাগের মহিমাও তত অধিক। যদি এমনই হয়, কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ, ঐ ধাত্রী নিজ পুত্র অপেক্ষা ঐ রাজপুত্রের রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া, বা সর্ব্বদা লালন-পালন হেতু, বা অর্থাগমাদির মোহে, ঐ রাজপুত্রের প্রতি সমধিক মমত্ব জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ আপাততঃ মহদাচরণের ভিতর তেমন একটা কিছু মহত্ত্বের

যথার্থ অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে। এজন্য বাহিরের কোন আচ
দেখিয়াই ভাল-মন্দ নিরূপণ করা অনেক সময় কঠিন সমস্যা হই
দাঁড়ায়। এই হেতু সকল সময়েই শাস্ত্র অনুশাসন, মহতের আচ
ও তাহার সহিত হৃদয়ের ঐক্য হইলে তবে সেই পথে চলা নিরাপ
নতুবা এ সব ক্ষেত্রে পদে পদে ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে একটা সংশয়ের উদ্ভব হইতে পারে যে, তাহা হইলে
কোন নরহত্যাকারীর জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানই ধর্ম্ম। ত
কদাচ নহে। হত্যাকারীর যথাযথ দণ্ডই জনসাধারণের জীবন ও সম
রক্ষার্থ একান্ত প্রয়োজন; নতুবা ঐ হত্যাকারী প্রশ্রয় পাইলে পুন
হত্যা করিবে এবং অপরেও, ঐরূপ প্রশ্রয় দেখিয়া, নিজ স্বার্থ সিদ্ধি
জন্য হত্যা কার্য্যে প্রলুব্ধ হইবে। অতএব হত্যাকারীর শাস্ত্রোচি
দণ্ডই ধর্ম্ম। উহা হত্যাকারীর পক্ষেও কল্যাণকর। যিনি উহ
সহায়তা না করিয়া মিথ্যা বলেন, তিনি অধর্ম্মাচরণই করিয়া থাকেন।

এইখানে আরও একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ত
বলিয়া, জনহিতের দোহাই দিয়া আমরা সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে যে
কদাচ অসত্যের প্রশ্রয় না দেই। অনেকে লোভ-মোহ প্রযুক্ত উৎকো
লইয়া, বা ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, বা ঐরূপ কোন অসৎ-উপায়
অর্জ্জিত অর্থে ধর্ম্মশালা স্থাপন, জলাশয় খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ, বিগ্রহ
স্থাপন, দেবোত্তর সম্পত্তি অর্জ্জন, বা ঐরূপ কোন লোক হিতকর
কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করতঃ একটা চমকপ্রদ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়
দিয়া থাকেন, বা দিবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন; কিন্তু ঐ মূঢ় বোঝে না যে
উহা সেই 'গরু মারিয়া জুতা দানেরই' সমতুল্য। কেহবা উদারতার
দোহাই দিয়া অম্লানবদনে, নিজ নামের Monthly ticket, বা Return
ticket এর অপরার্দ্ধখানি, অপরকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরের হিত
সাধন করিতে প্রয়াস পান! কেহ বা, উৎকোচ দান করিয়া, রেলাদিতে
অধিক মাল-পত্র লইয়া যাইতে, বা অধিক বয়সের ছেলেকে অর্দ্ধ-মূল্যে

টাকাটে লইয়া যাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না! এইরূপে নানা প্রকার প্রবঞ্চনাতে, চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজেকে বড়ই চতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিয়া বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন! কোথাও বা, গুরু পুরোহিতগণ উৎকট স্নেহ দেখাইয়া, অথবা বাধ্য-বাধকতা প্রযুক্ত অপর সাক্ষীর অভাবে, নিজ শিষ্যের হিতার্থ ধর্ম্মালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিয়া, উভয়েরই নরকের পথ প্রশস্ত করেন; এবং যাঁহার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন তাহারই অশ্রদ্ধা ভাজন হইয়া পড়েন। এইরূপ আধুনিক সভ্য জগতে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ভানরূপ কপটতায় চারিদিক পরিপূর্ণ এবং যিনি যত নিজ সত্যভাব গোপন করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দক্ষ, তিনি তত সভ্য,—লোক সমাজে তাঁহারই তত সমাদর! এমন কি, ব্যবহারিক জগতে ব্যবসাদির সুবিধার জন্যই যেন সাধুতার আশ্রয়, নতুবা নহে!—*Honesty* is the best *Policy*!! কি অদ্ভুত সভ্যতার বিকাশ!*

সত্যর জন্যই সত্য বুলিতে হইবে। অন্য কোন কিছু পাইবার প্রলোভনে নহে—(*Virtue has its own reward*)। একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে সমাজ বা যে জাতির মধ্যে অসত্যের প্রসার যত বেশী, সেই সমাজ বা সেই জাতি, সেই পরিমাণে অধঃপতিত—সেই খানে সেই পরিমাণে কলির প্রবেশ ঘটিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্যই ভগবানের স্বরূপ, মিথ্যা লইয়া ঘর করা, আর ভগবানকে দূরে বা পিছনে রাখিয়া সয়তান লইয়া ঘর করা, একই কথা। ঐরূপ ছোট ছোট মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া সমগ্র জাতিরই পরিশেষে মাঝ-দরিয়ায় ভরাডুবি হইয়া থাকে। কোন জাতি, সমাজ বা বংশের প্রকৃত কল্যাণ

* কাহারও গৃহে ডাকাত পড়িলে গৃহস্থিত সকলের, বিশেষতঃ গৃহস্বামী বা গৃহিণীর, ডাকাতগণের প্রতি যথাসম্ভব সরল ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। নতুবা সিন্দুক, পেটরা, বাক্সাদির চাবী গোপন করিলে, বা কোন প্রতারণার ভাব প্রকাশ পাইলে অনর্থক নানারূপ নির্য্যাতন, এমনকি প্রাণহানি হওয়া বিচিত্র নহে। এক্ষেত্রে সাধুতা প্রদর্শন করিলে, '*Honesty is the best Policy*' বাক্যের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন করা হইবে।

কামনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার মূলভিত্তি নৈতিক উৎকর্ষের দি
দৃষ্টি রাখাই একমাত্র প্রয়োজন, নতুবা আঁখেরে পতন অনিবার্য। যে দে
বা যে জাতি যে পরিমাণে সত্যনিষ্ঠ, সে দেশ বা সে জাতির ভবিষ্যৎ সে
পরিমাণে উজ্জ্বল। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"

একদা দেশের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশ
শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন,—"এদেশের যথার্থ কল্যা
কিসে হইবে?" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলেন,—"স্কুল কলেজে
ছেলেদের জীবনের উপরই দেশের সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে
আমাদের দেশে, ঋষিদের সময়ে, ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বীর্য
ধারণ ও সত্য রক্ষা অভ্যাস করায়ে দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ছেলেদে
শিক্ষা সে প্রণালী ধ'রে হয় না। এজন্য শিক্ষা লাভ ক'রেও সে প্রক
ফল হয় না। আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, স্কুল কলেজের ছেলেরা এ
প্রায়ই এই প্রশ্ন করতেন,—'মহাশয়, আমাদের কু-অভ্যাস কিসে ত্যা
কর্‌তে পা'র্‌ব? * * * এখন বুঝ্‌ছি ওতেই আমাদের সর্ব্বনা
হ'চ্ছে * * *।' যে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগ
জীবনের, ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর কর্‌ছে, সম্প্রতি দেশে আ
সে শিক্ষা নাই। একবার অনেক দিন হইল হিমালয়ে এক
মহাপুরুষের* সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলা
—'এদেশের কল্যাণ কিসে হয়?' তা'তে তিনি বলেছিলে
—'একমাত্র সত্য ও বীর্য্যরক্ষা কর্‌লেই দেশের কল্যাণ হবে।
তা ব্যতীত দেশের আর কল্যাণ নাই।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ,—তৃতীয় খণ্ড, ১৪২

* এই মহাপুরুষ হিমালয় পর্ব্বতের এক উচ্চ শৃঙ্গে প্রায় অহোরাত্র অনাবৃ
স্থানে, বরফাচ্ছাদিত অবস্থায় সমাধিস্থ থাকিতেন। দ্বিপ্রহরের সময় বর
গলিলে শিষ্যগণ উহার শরীরে উত্তাপদান করিলে বাহ্যজ্ঞান হইত। গোস্বা
প্রভু, উহা প্রত্যক্ষ করিয়া অবসর মত তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন।

কুন্তীদেবীর পুত্রোৎপত্তি

(৮) প্রশ্ন :—কুন্তীদেবীর দেবতা কর্ত্তৃক পুত্রোৎপত্তি সমর্থন-যোগ্য কিনা ?

উত্তর :—সাধারণ লৌকিক বিচারে এই আচরণ যে অতীব গর্হিত তাহা বলাই বাহুল্য, তবে মহাভারত-প্রণেতা ভগবান বেদব্যাস এরূপ আচরণকে কোথাও সেরূপ গর্হিত বলিয়া আখ্যা দেন নাই। ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার যতটুকু আমাদের বোধগম্য এখন তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

একদা দুর্ব্বাসামুনি কুমারী কুন্তীদেবীর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া যান যে, তিনি তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র সাহায্যে যখন যে দেবতাকে আহ্বান করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ মন্ত্র প্রভাবে তথায় আবির্ভূত হইবেন।

কিছুদিন পরে, কুমারীকালীন ঋতু-স্নাতা অবস্থায়, কুন্তীদেবীর দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রের কথা মনে উদয় হয় এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, ঐ মন্ত্রশক্তি পরীক্ষার্থে, সূর্য্যদেবকে আহ্বান করেন। তাহাতে মূর্ত্তিমান সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হ'য়েন এবং প্রসন্নমনে রতি-প্রার্থনা করেন। তাহাতে কুন্তীদেবী সাতিশয় লজ্জিতা, স্তম্ভিতা, ও অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য অনুতপ্ত হয়েন এবং সূর্য্যদেবের প্রার্থনা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে সূর্য্যদেব প্রসন্ন-বদনে দৈব নির্ব্বন্ধের কথা সবিশেষ ব্যক্ত করেন, এবং ইহাতে তাঁহার অশেষ কল্যাণ হইবে এবং তাঁহার অনুরূপ পুত্র উৎপাদন হইলেও, তাঁহার বরে তাঁহার কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণই থাকিবে, এইরূপ বহু আশ্বাস প্রদান করেন, তাহাতেও কুন্তীদেবী সম্মত না হওয়ায় দিবাকর সুস্পষ্ট বলিলেন—'ভদ্রে, তোমাকে অবশ্যই বর গ্রহণ করিতে হইবে। আমার আগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বর গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি

তোমাকে, তোমার পিতাকে এবং বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্ম করিব।' কুন্তীদেবী সেই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন তিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে তাঁহা মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কি কন্যকাবস্থা দূষিত করিলেন না। পরে পুত্র প্রসব করিলে সূর্য্যদেবে প্রভাবে কুন্তীদেবী অচিরাৎ পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কন্যকাবস্থা প্রা হইলেন। এইভাবে কানীন-পুত্র কর্ণ উৎপন্ন হ'ন। কুন্তীদেবী তাঁহা নদীতে ভাসাইয়া দেন, পরে দৈবযোগে এক সূত কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হই কর্ণ সূত-পুত্ররূপে প্রতিপালিত হ'ন।

অতঃপর কুন্তীদেবীর পাণ্ডুরাজের সহিত বিবাহ হয়। পাণ্ডুরা দৈবক্রমে একদা মৃগয়াকালে রমণাসক্ত মৃগ-মৃগীদ্বয়কে হত্যা করি ফেলেন। তাহাতে ঐ মৃগ (ইনি একজন ঋষি, ঐরূপ রমণার্থ মৃগরূ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন) মৃত্যুকালে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পা করে যে,—"তুমি যেমন আমার রতি-ক্রীড়ার সময় আমাকে বিন করিলে তুমিও রতি-ক্রীড়া করিলেই বিনষ্ট হইবে।" ইহা শ্রবণ করি পাণ্ডুরাজ অতীব কাতর ও বিমনা, এবং সন্তান ও বংশ রক্ষা সম্বন্ধে একান্ত নিরাশ হইলে, কুন্তীদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া, এবং বিধি নির্ব্বন্ধ বুঝিয়া, একান্ত বিমর্ষ পতিকে দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রের কথা সবিশে জ্ঞাপন করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় দেবতাগণকে মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের ঔরসে অভিলষিত পুত্রগণ লাভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যম, বায়ু ও দেবরাজ ইন্দ্রের, ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জ্জুন উৎপন্ন হইলেন এবং মাদ্রী গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্য অশ্বিনী কুমার দ্বয়কে আহ্বান করিলেন; তাহাতে নকুল ও সহদেবের জন্ম হইল। দ্রৌপদীর বিবাহ প্রসঙ্গে দেখাইব, এই পঞ্চ দেবতা প্রকারান্তরে দেবরাজ ইন্দ্রেরই বিভিন্ন অংশে আবির্ভাব মাত্র।

এখন, সাধারণ লৌকিক হিসাবে, এগুলি যে অতীব বিগর্হিত আচরণ

হইয়াছিল তাঁহাতে আর সন্দেহ কি? তবে কথা এই, ইহা কি ঠিক আমাদের মত লৌকিক ব্যাপার? সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সূর্য্য-নারায়ণ, মন্ত্রে আবির্ভূত হইয়া যদি ঐরূপ কাহাকেও আশ্বাস প্রদান করেন, এবং সত্য-সত্যই পুত্র উৎপাদনান্তে তাঁহার কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, তাহা কি কদাচ লৌকিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা চলে? তাহা কি আমাদের ক্ষুদ্র পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের, সামাজিক গণ্ডীর বহু উর্দ্ধে অবস্থিত নহে?

তাহার পর, অপর পুত্রগুলির জন্ম-ব্যাপার অপেক্ষাকৃত কম জটিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ বেদব্যাস কর্ত্তৃক পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র উৎপাদনের অনুরূপ। তাহা ছাড়া পুরাকালে আপদ-ধর্ম্ম হিসাবে, 'দেবরেণ সুতোৎপত্তি' ও তদনুরূপ ব্যবস্থা বহু-শাস্ত্রে ও বহু-স্থানে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল কথা, মানুষের মনের অভিসন্ধি লইয়াই পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় কামোপভোগার্থ কামাসক্ত স্ত্রী-পুরুষের রমণ এবং এইরূপ পরমভক্ত স্বামীর অনুজ্ঞায়, কেবল বংশরক্ষার্থ, পুত্রোৎপাদনের জন্য সঙ্গম, এই উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, উহা বলাই বাহুল্য। ইহার ভিতর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ, বা কাম-গন্ধের লেশ, দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত সাধারণ লৌকিক ব্যাপারের তুলনা হয় না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন, পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" গীতা—৫।১০

'যিনি সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া, আসক্তি ত্যাগ করতঃ কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জলে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনিও কর্ম্ম দ্বারা পাপে লিপ্ত হ'ন না।'

এ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পিতৃস্বসা, পরম ভক্তিমতী কুন্তীদেবীর সেরূপ আসক্তিশূন্য ভাব থাকা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। কুন্তীদেবী

কিরূপ উচ্চাধিকারিণী ছিলেন, তাহা তাঁহার ভাগবতাদিতেবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্তবাদিতে সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাগবতে রাস লীলা প্রসঙ্গেও শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥" ভাঃ – ১৯।৩৩।২৯

'তেজীয়সাং ন দোষায়',—হিসাবেও তাঁহাকে কোন পাপ স্পর্শ ক নাই বলা যায়। মোটের উপর, এ সকল অলৌকিক ব্যাপার আমাদে সাধারণ লৌকিক আচার-বিচারের সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্ব্বে দেখিতে পাই, ব্যাসদেবের অলৌকি তপঃপ্রভাবে, শোকে একান্ত মুহ্যমান ধৃতরাষ্ট্রের মৃত পুত্রগণ দেখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কর্ণশোকেকাতরা কুন্তীদেবী মৃতপু দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট কর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে অকপটে সমুদয় বৃত্তা ব্যক্ত করায়, মহর্ষি বেদব্যাস প্রসন্নমনে কহিলেন,—"শোভনে, তুমি যা কহিলে সে সমুদয়ই সত্য। তুমি কন্যাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বা করিয়াছিলে বলিয়া ঐ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র পাপ নাই দেবতারা অনিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ; তাঁহারা সঙ্কল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ প্রীতি উৎপাদন,—এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারে তুমি মানুষী অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপাদন করাতে তোমা কোনই অপরাধ হয় নাই।* এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ দূর কর। বলব ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় দ্রব্যই পথ্য, সমুদয় বস্তুই পবিত্র, সমুদয় কর্ম ধর্ম্ম এবং সমুদয় দ্রব্যই স্বকীয়।"—মহাঃ আশ্রমঃ,—৩০অঃ।

ব্যাসদেবের এই সান্ত্বনা বাক্যের উপর আমাদের আর কো সংশয় প্রশ্ন উত্থাপন করাই ধৃষ্টতা মাত্র।

---

* এই বাক্যে দেবতারদ্বারা অন্যান্য পুত্রোৎপত্তি-সংশয়ও নিরসন হইল।

দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী

(৯) প্রশ্ন ঃ—দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী যুক্তিযুক্ত কি ?

উত্তর ঃ—মহাভারতে দেখিতে পাই অর্জ্জুন অলোক-সামান্যা দ্রৌপদীকে, স্বয়ম্বর-সভায় নিজ বীর্য্য-প্রভাবে লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ তাঁহাকে ভার্গবালয়ে লইয়া আসেন। কুন্তীদেবী তৎকালে গৃহের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। গৃহের বাহির হইতে ভীম কর্ত্তৃক,—"মা, অদ্য একটি রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে," জ্ঞাপন করায়, তিনি সাহ্লাদে তৎক্ষণাৎ,—"যাহা পাইয়াছ তোমরা সমবেত হইয়া ভোগ কর", অতর্কিত অবস্থায় বলিয়া ফেলেন। পরে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া নিজ অনবধানতার জন্য সাতিশয় অনুতপ্তা হয়েন এবং সত্যভ্রষ্ট ও ধর্ম্মচ্যুতি ভয়ে ঘোর চিন্তাসাগরে নিমগ্না হয়েন। যুধিষ্ঠিরও ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হয়েন। এমন সময় যদৃচ্ছাক্রমে ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কথা সবিশেষ ব্যক্ত করেন।—সত্যযুগে দ্রৌপদী কেতকী-নাম্নী তপস্বিনী ছিলেন। তিনি সুরভীর পশ্চাতে পাঁচটি বৃষকে রমণোদ্যত দেখিয়া উপহাস করেন, তাহাতে সুরভী কর্ত্তৃক,—"তোমারও পঞ্চ-স্বামী হইবে", এই অভিসম্পাত শ্রবণে, তিনি গঙ্গায় দেহত্যাগ করেন। পরে ত্রেতায় সুরভি-শাপজাত সংস্কারবশে শিব-উপাসনা কালে পাঁচ বার,—'পতিং দেহি', উচ্চারণ করেন এবং মহাদেবও পাঁচবারই,—'এবং স্বস্তি', বলেন। একারণ মহাদেবের বর-প্রভাবে উঁহার পঞ্চ-স্বামীই বিধির নির্ব্বন্ধ;—ব্যাসদেব ইহা তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন। তবে এরূপ বিবাহ যে সাধারণতঃ লোকাচার-বিরুদ্ধ ও বেদ-বিরুদ্ধ তাহা ব্যাসদেবও স্বীকার করিলেন।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভগবানের অবতার বেদব্যাসের বাক্যে যাহাদের

যথাযথ শ্রদ্ধা আছে এবং জন্মান্তরবাদে যাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁহারা এই বিচারেই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

সেকালে এক পত্নীর বহু-পতি যে একেবারে বিরল ছিল না, তাহা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিবাহে যুধিষ্ঠিরের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"আমি জানি আমার মুখে কখনও অসত্য কথা বাহির হয় না, মনেও অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। আমি দেখিতেছি এ বিবাহে আমার মত আছে, এজন্য ইহাকে অধর্ম্ম বলিতে পারি না। পুরাণে শুনিয়াছি ধর্ম্মপরায়ণা জটিলা-নাম্নী গৌতম-বংশীয়া এক কন্যা ৭ জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বার্ক্ষী নাম্নী মুনি-কন্যা প্রচেতা নামক দশটি ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা বলেন, গুরু ও মাতা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়। গুরু মধ্যে মাতা পরমগুরু; এ বিবাহ তাঁহারই আজ্ঞা; অতএব, ইহা অধর্ম্ম হইতে পারে না।"

কুন্তীদেবী বলিলেন,—"যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য, আমিই অনুজ্ঞা করিতেছি।" ব্যাসদেব তখন সকলের মত শুনিয়া ও বিচার করিয়া যাহা মীমাংসা করিলেন সেই মতই ধার্য্য হইল। ব্যাসদেবের বাক্যে পঞ্চ-পাণ্ডব ও কুন্তীদেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় তাঁহারা পাঁচজনেই দ্রৌপদীকে যথাবিধি বিবাহ করিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এই প্রশ্নের মীমাংসা আছে এবং ঐ পঞ্চ-পাণ্ডব যে একই ব্যক্তি তাহাও দেখান হইয়াছে।—ত্বষ্টা-প্রজাপতির পুত্র ত্রিশিরা কঠোর তপস্যাচরণ করিতেছেন দেখিয়া, ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন। এই ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাপে ইন্দ্রের তেজোহানি হয়,—সেই তেজ ধর্ম্মে প্রবেশ করে। পরে ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া হোমাগ্নি হইতে বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করেন। ইন্দ্র তাহাকেও নিহত করেন। তাহাতেও ইন্দ্রের বলহানি হয়। সেই তেজ ইন্দ্রশরীরচ্যুত হইয়া বলের-অধিদেবতা বায়ুতে প্রবেশ

করে। ত্রেতাযুগে ইন্দ্র যখন অহল্যা ধর্ষণ করেন তখনও তাঁহার তেজোহানি হয়। সেই সময়ে শচীপতির মনোহর রূপলাবণ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়কে আশ্রয় করে।

স্বয়ং ধর্ম্ম, ইন্দ্র দেহ হইতে প্রাপ্ত, সেই তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। বায়ু ইন্দ্র-তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে ভীমের জন্ম এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয় মাদ্রীগর্ভে ইন্দ্রতেজ নিক্ষেপ করেন, তাহাতে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। সুর-রাজের বলার্দ্ধ কুন্তীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং 'শতক্রতু' ইন্দ্রই এই পাঁচ অংশে অবতীর্ণ হয়েন। ইন্দ্রেরই পত্নী শচী,—'যাজ্ঞসেনী'। সুতরাং দ্রৌপদী প্রকৃত পক্ষে একমাত্র ইন্দ্রেরই পত্নী। মহাত্মাগণ স্বীয় শরীর অনেক ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন।

মোট কথা, এ সমস্তই এক অলৌকিক ব্যাপার, ইহার সহিত সাধারণ লৌকিক ব্যবহারের সামঞ্জস্য, বা তুলনা, করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তবে এ সকল আচরণ যখন ব্যাসদেবের মত মহাপুরুষের অনুমোদিত, তখন উহাকে ধর্ম্ম বিগর্হিত বলা সঙ্গত নহে।

পরে মহর্ষি নারদও আসিয়া এই বিবাহ অনুমোদন করেন, এবং তাঁহারই অনুজ্ঞায়,—পর্য্যায়ক্রমে, যে ভ্রাতা যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবেন, তখন অপর কেহ তথায় গমন করিবেন না,—কোন ক্রমে গমন করিলে, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে,—এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞায় সকলে আবদ্ধ হয়েন। এই প্রসঙ্গে ত্রিলোক-বিজয়ী সুন্দ ও উপসুন্দ নামক পরম-প্রীতি-ভাবাপন্ন দুইভ্রাতা কিরূপ দেবতাদের চক্রে নিরুপমা তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হইয়া পরস্পরে কলহ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হ'ন, ঋষিবর সেই পুরাতন ইতিহাস সবিস্তারে জ্ঞাপন করিয়া, পাণ্ডবদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন এবং পাণ্ডবগণও পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার অনুজ্ঞা-পালনে যত্নবান হইয়া, যথাযথ

সফলকাম হইয়াছিলেন। স্ত্রীর জন্য পাণ্ডবদের কখনও প্রীতি-ভঙ্গ হ
নাই। একদা, এক বিপন্ন ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার কল্পে অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির
সহ দ্রৌপদীর অবস্থিতি কালে, অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়ে
এবং সত্যব্রত পালনার্থ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ক্লেশ স্বীকার করেন।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতেই, তাঁহারা সকলে কিরূপ কঠোর নিয়ম ও
সংযমের সহিত তাঁহাদের ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ
আভাস পাওয়া যায় এবং তাঁহারা যে যদৃচ্ছা ইন্দ্রিয়-ভোগ-পরতন্ত্র হই
ঐ বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই, তাহাও স্পষ্ট বোঝা যায়।

বালিবধ

(১০) প্রশ্ন ঃ—শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বালিবধ সম্বন্ধে যৌক্তিকতা কি?

উত্তর ঃ—বালিবধ প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত মূল-রামায়ণ গ্রন্থে
নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে; মূল সংস্কৃত শ্লোকেরই অনুবাদ প্রদত্ত
হইল ঃ—

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—"বালি, তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম এবং
লৌকিক আচার না জানিয়া বালকত্ব নিবন্ধন আজ কেন আমার নিন্দা
করিতেছ?...দেখ, এই শৈল-কাননপূর্ণ ভূমিভাগ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজ
গণের অধিকৃত। এই স্থানে মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড-পুরস্কার
তাঁহারাই করিয়া থাকেন,...এক্ষণে যখন রাজাধিরাজ ধর্ম্মবৎসল ভরত
পৃথিবী পালন করিতেছে, তখন ধর্ম্ম-বিপ্লব আর কে করিবে? আমরা
স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্ম্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব।
তুমি অধার্ম্মিক, দুশ্চরিত্র এবং কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজধর্ম্মের
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে;...তুমি ক্রোধভরে কেবল আমার নিন্দা করিও না,
এক্ষণে আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি শুন।

"তুমি সনাতন-ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, তাঁহার পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্র-বধূ তুল্যা। তাহাকে অধিকার করায় তোমার পাপ স্পর্শ হইয়াছে। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোক-বিরুদ্ধ ও লোক-মর্য্যাদার অতীত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোনরূপ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়; বল, কিরূপে তোমার পাপ উপেক্ষা করিব। যে ব্যক্তি কামাতুর হইয়া নিজ ঔরসজাতা কন্যা, ভগিনী বা ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত পৃথিবীর অধীশ্বর, আমরা তাহার অধিকৃত, তুমিও ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে কিরূপে উপেক্ষা করিব?

"...যেমন লক্ষ্মণের সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য আছে, সুগ্রীবের সহিতও তদ্রূপ। সুগ্রীব রাজ্য ও স্ত্রীলাভ উদ্দেশ্য করিয়া আমার কার্য্য সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; আমিও বানরগণের সমক্ষে তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে? তুমি নিশ্চয় বুঝিও আমি এই সকল ধর্ম্মানুগত মহৎকারণেই তোমাকে সমুচিত শাসন করিলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম্ম।...মনু বলিয়াছেন,—'মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীত-পাপ হয় এবং পুণ্য-শীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক পাপী শুদ্ধ হয়; কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে। আমি ধর্ম্মানুরোধেই তোমায় বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি,—ধর্ম্ম-পরতন্ত্র। বীর! আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন, কিন্তু ক্রোধ করিও না। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্নবধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোক প্রকাশ্য, বা অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিয়া

নানাবিধ কূট উপায় অবলম্বনে মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভী
বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা সাবধা
হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে ব
করে, ইহাতে অনুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতিগণ অব
মৃগয়া করিয়া থাকে; সুতরাং তুমি শাখামৃগ-বানর, যুদ্ধ কর ব
নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি।

"বীর! রাজা, প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্মরক্ষাকরণে, শুভ সম্পাদ
করিয়া থাকেন এবং উহাদের জীবনও উহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত,...
আমি কুল-ধর্ম্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না বুঝিয়া কেব
ক্রোধ ভরে অকারণ আমায় দোষী করিতেছ।"

"অনন্তর বালির দিব্যজ্ঞান লাভ হইল; তিনি যার প
নাই ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, রাম একান্তই নির্দ্দোষ। তখ
তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—'রাম, তোমার বাক্য অপ্রা
মাণিক নহে, তুমি উৎকৃষ্ট; আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার
কথার প্রত্যুত্তর দিব? যাহা হউক, এক্ষণে প্রমাদবশতঃ তোমায়
যে সকল অসঙ্গত ও অপ্রিয় কহিয়াছি তাহাতে আমার দোষ
নাই। দেখ, ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার পরীক্ষা-সিদ্ধ, তুমি প্রজাগণের হিত
সাধনে তৎপর; পাপ, প্রমাণ ও দণ্ডবিধান সম্বন্ধে তোমার অনশ্বর
বুদ্ধি প্রসন্নই আছে; কিন্তু আমি অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য। ধর্ম্মজ্ঞ!
অতঃপর তুমি ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ দিয়া আমায় রক্ষা কর।"

অন্যত্র পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বালি কঠোর তপস্যার দ্বারা তুষ্ট
করিয়া ব্রহ্মার নিকট এক বর লাভ করেন যে,—'যে কেহ তাঁহার সঙ্গে
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে তাহাকে দর্শনমাত্র বালি তাহার অর্দ্ধেক বল হরণ
করিতে সমর্থ হইবেন'। এমত অবস্থায় ঐ বরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে
হইলে, স্বয়ং ভগবানেরও সম্মুখ-সমরে তাঁহাকে পরাজয় করা এক বিষম
সমস্যার কথা। অধিকন্তু; বালি যেন বিরাট পশুবলের এক মূর্ত্ত প্রতীক!

বালির যেরূপ অদ্ভুত পরাক্রমের কথা বর্ণিত আছে,—এমন কি অতি বড় দুর্দ্ধর্ষ প্রবল প্রতাপান্বিত লঙ্কাপতি রাবণকে পর্য্যন্ত যেরূপ অবলীলা-ক্রমে লাঞ্ছিত ও পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মুখসমরে তাঁহার বধ-সাধন করা শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষেও যে আদৌ সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য যাঁহার ইচ্ছা-মাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবানের পক্ষে, যত বড়ই শক্তিশালী হোক না কেন, একটা বানর বধ করা যে কিছুই নয় তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলেও, যখন তিনি নর-লীলার অনুকরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং রাবণ-বধ ব্যাপারে যেরূপ উদ্যোগ-আয়োজন ও দুর্বিপাক ভোগের লীলা করিয়াছেন, তাহাতে ঐ রাবণ-বিজয়ী বালির বধ-সাধন করিতে তাঁহাকে যে আরও অধিকতর বেগ পাইতে হইত, ও বহু মূল্যবান সময় ক্ষেপণ করিতে হইত, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। এমত অবস্থায় সীতা-উদ্ধার-রূপ বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে, তাঁহার 'আপদ-ধর্ম্ম' আশ্রয় করিয়া, অন্যায় সমরে বালিকে নিধন করাও, তেমন কিছু গুরুতর গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত না হইতেও পারিত; তথাচ মহর্ষি বাল্মীকি যখন রামচন্দ্রের উক্তির মধ্যে, বালি-বধ সমর্থনে, ঐ সকল যুক্তির অবতারণা করেন নাই, তখন শুধু-শুধু আমাদের ঐরূপ কষ্ট-কল্পিত অনুমান করিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। ঋষিবর বর্ণিত বালিবধ কার্য্য সমর্থনে, শ্রীরামচন্দ্রের উক্তির মধ্যে যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। জ্ঞান লাভ করিয়া বালির যখন মোহ বিদূরিত হইল এবং নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীরামচন্দ্রে দুর্বাক্য প্রয়োগ জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হইল, তখন উহা লইয়া আর সংশয় উপস্থাপিত করা কদাচ সমীচীন নহে।

এক্ষণে একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে, তৎকালে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষের রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট, বা রাজসূয়

যজ্ঞকারী সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন এবং ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গ তাঁহাদের শাসনাধীন ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিতেন এবং দিগ্বিজয় করিয়া নিজেদের একাধিপত্য ও প্রাধান্য পুনস্থাপন করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুখে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, বালিরাজ তাঁহাদের অনুশাসন মানিতেন না এবং স্বেচ্ছাচার-প্রযুক্ত বলাৎকারে ভ্রাতৃবধূ-গমন-রূপ গুরুতর ধর্ম্ম-বিগর্হিত আচরণ দ্বারা রাজদ্রোহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একারণ বালি রাজ-ধর্ম্মানুসারে মৃত্যু-দণ্ডার্হ।

এক্ষণে কথা এই যে, চোর, ডাকাত, প্রকাশ্য রাজদ্রোহী (*Outlaw*, বা *Anarchist*), বা দস্যুকে সতর্ক না করিয়া হত্যা করিবার বিধি, শাস্ত্রে এবং আধুনিক আইনেও আছে, তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্তগণকে ছলে-বলে-কৌশলে উচ্ছেদ-সাধন করাই জগতের কল্যাণকর, একারণ তাহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দিয়া সম্মুখ-সমরে আহ্বান করা কদাচ সমীচীন নহে এবং দেশ-কাল-পাত্রাভিজ্ঞ কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই তাহা অনুমোদন করেন না। একারণ শ্রীরামচন্দ্র বলপ্রয়োগ-পূর্ব্বক ভ্রাতৃবধূগমনকারী, স্বতন্ত্র-অভিমানী ও সম্রাট-অনুশাসন উপেক্ষাকারীকে কোনরূপ সতর্ক না করিয়া যে হত্যা করিলেন, ইহাতে রামচন্দ্রের শাস্ত্রবিগর্হিত কোনই অপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্ব উল্লিখিত মূল-রামায়ণে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

এই স্থানে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, তৎকালে সম্রাটগণের অশ্বমেধাদিযজ্ঞ অনুষ্ঠান সময়ে ভারতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে পরাজিত, বা শাসনাধীনে, আনার প্রয়োজন হইত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি দ্বারা তাহা নিরূপিত হইত। এই অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান তৎকালে ঋষিদিগের অনুমোদিত এক পরম শ্লাঘার বস্তু ছিল। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং

শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা উহা সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন। ইহা প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হয়, অথচ আধুনিক যুগে কোন অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন বলবান রাজা, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া, তাহাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া নিজাধীনে আনিলে, ঐ আচরণ এত হেয়-চক্ষে দেখি কেন? ইহাতে বক্তব্য এই যে, ধীর ভাবে বিচার করিলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে।

দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে রাজসিক শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু ঐ রাজসিক শক্তি যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করিতে সাত্ত্বিক শক্তি আবশ্যক, নতুবা পদে-পদে উহার অপপ্রয়োগ হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। রজোগুণের স্বভাবই হইতেছে তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা; এবং ঐ ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ জন্য ছলে-বলে-কৌশলে নানা স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল যুক্তি ও উপায় উদ্ভাবন করাই রাজসিক প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষের স্বভাব; এমত অবস্থায় যদি স্বার্থানুসন্ধান-শূন্য, জগজন-হিতকারী, ত্যাগী, মহাপুরুষগণ-কর্ত্তৃক তিনি নিয়ন্ত্রিত না হয়েন, তবে তাঁহার নিকট হইতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র।

আমরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে দেখি, পুরাকালে সম্রাট্-গণকে স্বার্থত্যাগী, মহানুভব, ঋষিগণই সপ্ত-সমুদ্রের জলে অভিষেক করিয়া রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশক্রমেই সমগ্র সাম্রাজ্য অনুশাসিত হইত। তাঁহাদের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া কোন সম্রাটই স্বেচ্ছাচারীতার বশে চলিতে পারিতেন না,—চলিলে, ঋষিগণ তাহার প্রতিবিধান করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থানে অপর উপযুক্ত সম্রাটকে অভিষিক্ত করিতেন। ঋষিগণ-কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাচারী বেনরাজার অপসারণ ও পৃথুরাজের অভিষেক তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তৎকালে

ক্ষাত্র-শক্তিকে ব্রহ্মণ্য-শক্তি কিরূপ সংযত রাখিত। ক্ষত্রিয়দিগের ক্ষাত্র-শক্তি অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের তপোবলের শ্রেষ্ঠত্ব, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সংবাদে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় বীরগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকটই ধনুর্বিদ্যা ও বিবিধ অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল শিক্ষালাভ করিতেন। ভীষ্মদেব ও কর্ণ পরশুরামের নিকট এবং পাণ্ডব-কৌরব রথী-মহারথীগণ সকলেই দ্রোণাচার্য্যের ও কৃপাচার্য্যের নিকট রণবিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট দিব্য-অস্ত্র সকল লাভ করিয়া তৎপরে, তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে, ঐ অস্ত্র প্রয়োগে, তাড়কা রাক্ষসী বধ করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি অগস্ত্যমুনির নিকট অক্ষয় তূণীর ও ব্রহ্মাস্ত্রাদি বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সান্দিপনি মুনির নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া তৎপরে যথারীতি যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে অঘাসুর, বকাসুর, কংশবধাদিতে কোন অস্ত্রই প্রয়োগ করেন নাই। ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে, তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ পার্থিব ভোগ-সুখে মুগ্ধ না হইয়া আপনাদের ও জগতের কল্যাণের জন্য, যাগ-যজ্ঞ ও তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকিতেন। যাহাতে নিরুপদ্রবে ঐ সকল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারেন, এতদর্থে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় সম্রাট্গণের হস্তে রাজ্য-শাসনের ভার দিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা যথাযথ রাজ্য-শাসন করিতে সমর্থ হয়েন, সেজন্য তাঁহাদিগকে রণবিদ্যা শিক্ষা দিতেন ও দিব্য-অস্ত্রাদি দান করিতেন। এ কারণ তৎকালে তপোবল-প্রভাব-সম্পন্ন তেজস্বী ব্রাহ্মণগণই প্রকৃত পক্ষে ভূদেব-পদবাচ্য ছিলেন ও তাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্রাট্গণ-কর্ত্তৃক সমগ্র রাজ্য সুশাসিত হইত।

যাহাতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজগণ স্বেচ্ছাচারী, বা অত্যাচারী হইয়া না উঠেন, তাহারই প্রতিবিধানকল্পে, সম্রাট্গণ-কর্ত্তৃক সময় সময় অশ্বমেধাদি

যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমগ্র দেশের একাধিপত্য পুনস্থাপন কার্য্য, পরম শ্লাঘনীয় বস্তু বলিয়াই সজ্জন কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইত। তাহার স্থলে ইহভোগসর্ব্বস্ব স্বার্থান্ধ আধুনিক যুগের,—"জোর যার মুলুক তার," দুর্নীতির প্রসারণের যতই বৃদ্ধি ঘটিবে, ততই জগতে অধিকতর উৎপাতের কারণ সৃষ্টি হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সম্রাটের অধীনস্থ বালিরাজকে যথাযথ শাসন করিবার শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, এবং তিনি রাজদ্রোহী, স্বেচ্ছাচারী বালিকে এইভাবে বধ করিয়া জগতের পরম হিতসাধনই করিয়াছিলেন।

বালিবধ বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিন্দুমাত্র কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই; পরন্তু, পরিশেষে পরম উদারতা ও দয়ালুতারই পরিচয় দিয়াছেন। বালিকে, মৃত্যুর পর, পরাগতি প্রদান করিলেন,—তাঁহার পুত্র অঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন এবং তারাকে তদ্দেশাচার-সম্মত সুগ্রীবের সহিত বিবাহ দিয়া পাটরাণী করিলেন। অধিকন্তু অঙ্গদের ক্ষোভ নিবারণ জন্য কৃষ্ণাবতারে ব্যাধরূপী অঙ্গদের দ্বারা ঐ 'চোরাবানেই' আপনার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইলেন!—উহা তাঁহার মহত্বের উপযুক্তই হইল।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু এসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, একান্ত শরণাগত, ভক্ত সুগ্রীবকে রক্ষা করিবার জন্য যে শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃদারাপহারী বালিকে বধ করেছিলেন তাহাতো পরিষ্কার রামায়ণে লেখা আছে। কোন শাস্ত্র গ্রন্থেরই আগাগোড়া সমস্ত বিশ্বাস করে না পড়্‌লে একটা অর্থ বোধ হয় না। শ্রদ্ধার সহিত যাঁরা শাস্ত্র পাঠ না করেন, তাঁরা শাস্ত্র না পড়ে ইংরাজী পুস্তকে বাঘের গল্প, কুকুরের গল্প পড়্‌লেই পারেন। শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করে না পড়্‌লে শাস্ত্র পড়া না পড়া সমান।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৩য় খণ্ড, ৯৮ পৃঃ

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস

(১১) প্রশ্ন : - রাজা দশরথ কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দেও[য়া] কার্য্যটী সমর্থন-যোগ্য কি না ?

উত্তর :—রাজা দশরথ কাপুরুষ, স্ত্রৈণ, সেই জন্যই কৈকে[য়ীর] কথায় ঐরূপ গর্হিত আচরণ করিলেন,—এই রূপই অপবাদ ; কি[ন্তু] প্রকৃত তথ্য কি সত্য-সত্য তাহাই ?—তাহা কদাচ সম্ভব নহে। য[দি] তাহাই হইত, তাহা হইলে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ রামচন্দ্র কদাচ তাঁহার ঔর[সে] জন্মগ্রহণ করিতেন না,—ইহা ধ্রুব নিশ্চয়।

একদা রাজা দশরথ দণ্ডককানন দেশে কোন ঘোর সমরে সর্ব্বা[ঙ্গ] ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সাংঘাতিকরূপে আহত ও হতচেতন হইলে, কৈকে[য়ী] তৎকালে অকুতোভয়ে তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে আনয়ন করিয়া র[ক্ষা] করেন, এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অমানুষিক ধৈর্য্য সহকারে প্রাণ-প[ণে] সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার আরোগ্য সম্পাদন করেন ; তাহাতে দশর[থ] পরম তুষ্ট হইয়া কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।* ইহ[া]

---

* বাল্মীকি রামায়ণে এই রূপই বর্ণিত আছে। গ্রন্থান্তরে দেখা যায় [যে] এই ঘটনায় দশরথ কৈকেয়ীকে একটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন এবং [ঐ] ঘটনার কিছুকাল পরে দৈবযোগে রাজার আঙ্গুলের নখের ভিতরে একটি মর্ম্মান্তি[ক] যাতনাপ্রদ দুষ্ট-ব্রণ হওয়ায় বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। পরে, ধন্বন্তরি-গু[রু] পদ্মকরের ব্যবস্থাপিত নির্দ্দেশে, অপর সকলে অসম্মত হইলে, কৈকেয়ী ঘৃণা[দি] পরিহার করিয়া অম্লানবদনে, হৃষ্টচিত্তে ঐ ফোড়ার পুঁজ-রক্তাদি শুষিয়া বাহি[র] করিয়া দেন, তাহাতে দশরথ তৎক্ষণাৎ বেদনামুক্ত হইয়া নিজকে সম্পূর্ণ সু[স্থ] অনুভব করেন এবং বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। কৈকেয়ী, মন্থরার পরামর্শ ম[ত] উহাও যথাসময়ে প্রয়োজন মত মাগিয়া লইবেন বলিয়া দশরথের সন্তোষ উৎপাদ[ন] করেন।

সদাচার-সম্পন্ন সরলপ্রকৃতি দশরথের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই হইয়াছিল। ইহা তাঁহার কিছুমাত্র নিন্দনীয় আচরণ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নহে। তিনি যোগ্য বরই দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তবে সরল, উদারপ্রকৃতি দশরথের, কুটীল, মায়াবী, নারীচরিত্রের সেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। এইরূপ অতীব প্রশংসনীয় সেবাপরায়ণা, প্রাণপ্রিয়া প্রেয়সী হইয়া, তাঁহার প্রতি কদাচ যে ঐরূপ নিদারুণ নির্ম্মম হইতে পারিবেন, এবং রামবনবাসরূপ বর কখনও প্রার্থনা করিবেন, তাহা তাঁহার সরল বুদ্ধির অগম্য ছিল, একারণেই তিনি নিষ্কপটে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিয়া পরম তৃপ্তিই অনুভব করিয়াছিলেন। নিজ প্রিয় সহধর্ম্মিণীর কদাপি এইরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিবে এবং তাঁহার উপর দুষ্টা-সরস্বতীর ঈদৃশ অধিষ্ঠান হইবে, ইহা তাঁহার ধারণারই অতীত ছিল। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে যেরূপ সঙ্কট অবস্থার উদ্ভব হইল, তাহাতে তাঁহার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা করা ভিন্ন আর কি গত্যন্তর ছিল? আদর্শ মানবের পক্ষে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ সত্য-ভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা আর কি গুরুতর অপকাজ হইতে পারে! বিশেষতঃ সাক্ষাৎ 'সত্য-নারায়ণ' ভগবানের পিতা হইয়া, কিরূপে তিনি সত্যের অমর্য্যাদা করিতে পারেন এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই বা কিরূপে তাহা অনুমোদন করিতে পারেন! অতএব এক্ষেত্রে যাহা অপরিহার্য্য তাহাই ঘটিল। দশরথের পক্ষে উহা কদাচ দোষাবহ বিবেচিত হইতে পারে না। যখনই তাঁহার মোহ-ঘোর কাটিয়া গেল এবং কৈকেয়ীকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া কিরূপ গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল বুঝিতে পারিলেন, তৎদণ্ডেই তিনি, তৎকালোচিত যাহা প্রতিবিধান, তাহাই করিলেন,—কৈকেয়ীকে চিরদিনের তরে বর্জ্জন করিয়া কৌশল্যার আবাসে গমন করিলেন। তথায় পুত্র-বিরহে অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন,—তথাপি সত্যভ্রষ্ট হইলেন না! ইহা তাঁহার একান্ত সত্যানুরাগেরই পরিচায়ক,—উহা কদাচ তাঁহার স্ত্রৈণতা বা কাপুরুষতার নিদর্শন নহে।

সীতার বনবাস

(১২) প্রশ্ন :—শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতাদেবীর বনবাস দেওয়া যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর :—স্থূল দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্রের একার্য্য অতীব গর্হিত ও নৃশংস বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। বিনা অপরাধে সীতাকে বনবা দেওয়া যেন তাঁহার কাপুরুষতা, নির্ম্মমতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অধার্ম্মিকতারই পরিচায়ক। সীতা যে সতী তাহাতে শ্রীরামের সম্পূ বিশ্বাস ছিল। সমস্ত দেবতা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। অগ্নি পরীক্ষাতেও তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথাচ তিনি একমাত্র লোকাপবাদ ভয়ে ঐরূপ নৃশংস আচরণ করিলেন কেন, স্থূল দৃষ্টিতে ঐরূপ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব কি ?

সীতাতে রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ অনুরাগ ছিল। সেকালে রাজাগণ বহু বিবাহ করিতেন ; কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীক। পত্নী না হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা হয় না, একারণ যজ্ঞ-স্থানে স্বর্ণ-সীতা। ইহাতে সুস্পষ্টই বোঝা যায় এর ভিতর বেশ একটু গূঢ় রহস্য রহিয়াছে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

> "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" গীতা—৩।২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের আচরণ দেখিয়া জনসাধারণ তাহার অনুবর্ত্তী হয়, এজন্য জনসাধারণের নিকট আদর্শ রক্ষার জন্য মহৎব্যক্তিদিগকে নিজ আচরণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। নতুবা যোগ্য আদর্শ অভাবে লোক 'উৎসন্ন' যায়। এ কারণ আদর্শ মহাপুরুষ বা মহাত্মাদিগকে, কঠোর ব্রত অবলম্বনে চলিতে হয়।

বাহ্য দৃষ্টিতে সীতাদেবীর রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক অঙ্গস্পর্শরূপ

ঘটনা বিসদৃশ মনে হইলেও, ইহার ভিতরে নিগূঢ় রহস্য বর্ত্তমান। কূর্ম্ম-পুরাণে, তুলসীদাসের রামায়ণে এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উহা ব্যক্ত হইয়াছে। কথাটি এই যে, যখন রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিতে উদ্যত, তখন সীতাদেবী অগ্নিদেবের শরণ গ্রহণ করেন; অগ্নিদেব তাঁহাকে সংগোপনে রাখিয়া, 'মায়া-সীতা' প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকেই রাবণ হরণ করেন। পরে রাবণ বধান্তে সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা কালে ঐ মায়া-সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন; এবং সাক্ষাৎ সীতাদেবী তাহা হইতে বহির্গত হয়েন ও রামচন্দ্রের নিকট গমন করেন। নতুবা সাধ্য কি যে রাক্ষসরাজ রাবণ সতীকুলশিরোমণি স্বয়ং লক্ষ্মীর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে? তাঁহাকে স্পর্শ করাত দূরের কথা, তাঁহাকে দর্শন করাও রাবণের পক্ষে সুদুর্লভ।

যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

(বিপ্রকহে,) "জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥
এশরীর ধরিবার কভু না জুয়ায়।
এ দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়॥"

(প্রভুকহে,) "এ ভাবনা না করিও আর।
পণ্ডিত হইয়া কেন না কর বিচার॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা, চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া, হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণে এই কহে নিরন্তর॥"

তথাহি, কূর্ম্মপুরাণে—

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাতুদনীনয়ৎ॥"
'রাবণ দেখি সীতা লইল অগ্নির শরণ।
রাবণ হইতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥
সীতা লইয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়া-সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
'রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নি পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥
তবে মায়া-সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান॥'

(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৯ম পরিচ্ছেদ)

ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। তাহা হইলেও সীতাদেবী যেভাবে অপহৃত হইয়াছিলেন ও যেরূপ সুদীর্ঘকাল রাক্ষসপ্রকৃতি রাবণের পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে সীতাদেবীর পাতিব্রত্য সম্বন্ধে জন-সাধারণের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র, প্রতাপশালী, স্বতন্ত্র, স্বাধীন, রাজা বলিয়া নির্ব্বিবাদে সীতাদেবীকে সাদরে ঘরে তুলিয়া লইলেও, সাধারণ লোকচক্ষে ইহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। প্রজা-রঞ্জন রাজার ধর্ম্ম। এক্ষেত্রে আদর্শরাজা, 'মর্য্যাদাপুরুষোত্তম', শ্রীরামচন্দ্র কি করিতে পারেন? আদর্শ রাজার কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠোর। অনেক কিছু স্বার্থত্যাগ, আত্মসংযম ও দূরদর্শিতার সহিত কাজ না করিলে আদর্শচ্যুত হইতে হয়। ভূপতির আসনে বসিয়া, প্রজাদের কল্যাণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, স্বীয় সুখ-স্বচ্ছন্দতায় মগ্ন থাকিলে কর্ত্তব্যের

ত্রুটি হয়। এতদর্থে যদি কখনও তাঁহার চরম আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন হয়, তাহাও করিতে সামান্য মাত্র কুণ্ঠা প্রকাশেও নিন্দনীয় হইতে হয়।

এক্ষণে বিচার্য্য, শ্রীরামচন্দ্র যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা যথার্থই প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ নিজ স্বার্থত্যাগেরই নিদর্শন কিনা? নিজ প্রেয়সী, নিরপরাধিনী, সহধর্ম্মিণীকে এভাবে বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থের বলিদানই সম্পন্ন করিলেন, তাহাতে অনুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। পতিপ্রাণা, পরম-সাধ্বী, সীতাকে নিরপরাধে ঐরূপ নির্ম্মমভাবে বনে পাঠাইয়া, তিনি স্বয়ং সীতাদেবী অপেক্ষা যে অধিকতর ক্লেশ অনুভব করিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীরামচন্দ্রের কুসুম-কোমল হৃদয় আজ কর্ত্তব্যানুরোধে বজ্রসদৃশ কঠিন হইল,—ইহার তুলনা জগতে মিলে না। একমাত্র জগতের কল্যাণের জন্য, নিরপরাধিনীর কঠোর শাস্তি বিধান করিবার অধিকার, নিজ বা একান্ত নিজজন ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি সম্ভবপর নহে। সীতাদেবী তাঁহার একান্ত নিজজন বলিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি ঐরূপ নির্ম্মম আচরণ করিতে পারিলেন। তিনি বেশ জানিতেন, সীতাদেবী তাঁহার প্রাণের বেদনা বুঝিবেন এবং নিষ্কপটে তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। সীতাদেবী পূর্ব্বেই সকল রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পরিশেষে যখন পরিজন-বর্গের শত অনুরোধ সত্ত্বেও, শ্রীরামচন্দ্র দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ না করিয়া, পার্শ্বে স্বর্ণসীতা রাখিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন এবং সেই বার্ত্তা যখন সীতাদেবীর কর্ণে পৌঁছিল, তখন তাঁহার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ঐকান্তিক অনুরাগ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না; এবং তাঁহার অন্তরের সকল ক্ষোভ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল।

সীতাদেবীকে কষ্ট দেওয়া, আর তাঁর নিজেকে কষ্ট দেওয়া, ইহাতে কিছুই ভেদ নাই; বরং ইহাতে তাঁহার নিজের অধিকতর ক্লেশ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সীতাদেবী তাঁহার কাছে সত্য-সত্যই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,—কেবল কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধেই তাঁহাকে এরূপ দুঃসহ কার্য্যে

ব্রতী হইতে হইয়াছিল ; এবং নিজেদের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, প্রজাদের কল্যাণার্থে অকাতরে এতটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, 'রাম-রাজত্বে বাস', কত সৌভাগ্যের কথা তাহা অদ্যাবধি জনসমাজে প্রবাদরূপে প্রচলিত আছে। শ্রীরামচন্দ্রের এই আদর্শ আচরণ কদাচ নিন্দনীয় হইবার যোগ্য নহে ; পরন্তু ইহা পরম শ্লাঘনীয়। উহা নরাকার পরব্রহ্ম, আদর্শ মহাপুরুষের যোগ্য আচরণই হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু এ সম্বন্ধে মৌনবস্থাকলীন প্রশ্নের উত্তরে এক স্থানে লিখিয়াছেন ঃ—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—'ভূমা', অর্থাৎ যাহার জন্ম মৃত্যু নাই,—তাহাতেই সুখ। অন্তবিশিষ্ট বস্তুতে সুখ নাই। যাহার অন্ত আছে, একদিন তাহা থাকিবে না ; সুতরাং তাহাতে আসক্ত হইলে, নিশ্চয়ই দুঃখ পাইবে। ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র সত্যনিষ্ঠার আদর্শ। পিতৃসত্য পালনের জন্য ১৪ বৎসর বনে বাস করিলেন। রাজধর্ম্ম,প্রজারঞ্জনের জন্য,সীতাকে ত্যাগ করিলেন। সত্যরক্ষার জন্য লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিলেন। একি মনুষ্যের সাধ্য! সীতাতে সম্পূর্ণ অনুরাগ ; তখন রাজারা হাজার-হাজার বিবাহ করিতেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীক,—যজ্ঞস্থানে স্বর্ণসীতা! সীতা যে সতী, তাঁহাতে রামের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সমস্ত দেবতা তাহার সাক্ষী দিয়াছিলেন। এই সত্য যখন জাতীয় ধর্ম্ম হয়, তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ গৃহে-গৃহে বিরাজ করে।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৫ম খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ

এই প্রসঙ্গে আর একটি, গূঢ় তথ্য প্রণিধানযোগ্য। ভগবান 'সমর্থ'—সর্ব্বশক্তিমান, 'কৃপালু', 'ভক্তবৎসল' ও 'বদান্য' হইয়াও, নিজ অন্তরঙ্গ জনগণকে এইরূপ বিচ্ছেদ যাতনা দিয়া কাঁদান কেন?

লৌকিক জগতেইত দেখিতে পাই, জীবমাত্রই নিজ প্রিয়জনের ক্লেশমোচন করিবার জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুক। তবে সকল সময়ে, সকল

ক্লেশমোচন তাঁহাদের সামর্থ্যে কুলায় না, সে কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু ভগবান্ সম্বন্ধে ত সে কথা প্রযোজ্য নহে, যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান। ইহাতে ইহাই মনে হয় যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই যেন অন্তরঙ্গগণকে তীব্র বিরহানলে জ্বালাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহা বাহ্যতঃ অসহ্য ক্লেশকর বোধ হইলেও, চরমে উহাই পরম কল্যাণে পর্য্যবসিত হয়। নতুবা তিনি কদাচ নিজ প্রাণাধিক প্রিয়জনকে এভাবে বৃথা কাঁদাইতেন না। ভাগবতে ও অপরাপর গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্ররূপে সীতার, শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীরাধার, বুদ্ধদেবরূপে তৎপত্নী গোপার এবং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই স্বেচ্ছাকৃত মর্ম্মন্তুদ বিচ্ছেদ ঘটাইলেন, ইহার কি কিছুই তাৎপর্য্য নাই !—অবশ্যই আছে। স্থূল-শরীর সন্নিকর্ষ অতীন্দ্রিয় মিলনের প্রতিবন্ধক, তাহাতে আত্মিক মিলনানন্দ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। পরন্তু, প্রগাঢ় ভালবাসা উদ্বুদ্ধ হইবার পর,—যে ভালবাসা আনন্দস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মার ধর্ম্ম,—সুদীর্ঘ বিরহ ঘটিলে সর্ব্বদা প্রাণে-প্রাণে, বা আত্মায়-আত্মায়, সংযোগ ঘটিবার তীব্র লালসা জাগে এবং সেই বিরহানলে স্থূল দেহেন্দ্রিয় সংঘটিত কামনা-বাসনা ভস্মীভুত হইয়া যায় এবং ক্রমেই এইভাবে বাহ্য অনুসন্ধান বিলুপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত সেবাযোগ্য সিদ্ধ-দেহ গঠিত হইয়া আত্মায়-আত্মায় নিত্যমিলনের পন্থা সুগম হয়। যেমন কোন সুবর্ণে ‘খাদ’ থাকিলে, বহু মাজা-ঘষা করিলেও তাহার ভিতরের ‘খাদ’ দূর হয় না, এতদর্থে অগ্নিতাপে গলান একান্ত প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ আমাদের চিত্তের কামনা-বাসনারূপ মালিন্য দূর করিতে হৃদয়টি দ্রবীভূত করা একান্ত প্রয়োজন ;—এতদর্থে তীব্র বিরহ-তাপই প্রকৃষ্ট মহৌষধ। আম্রাদি অপক্কঅবস্থায় অম্লতাপ্রযুক্ত, ভগবদ্‌সেবায় উপযুক্ত নহে। তাহা রবিতাপাদিতে সুপক্ক ও সুমিষ্ট হইলে, তাঁহার সেবার যথার্থ উপযোগী। তদ্রূপ চিত্তে যতদিন কিঞ্চিন্মাত্রও

মালিন্য থাকে ততদিন তাহাতে ভগবদ্‌স্ফুর্ত্তি হয় না ; বিরহ তা
সন্তাপিত হইয়া চিত্ত সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইলে, সেই বিশুদ্ধচিত্তে ভগবা
প্রকাশ হয়। এই হেতু এরূপ বিরহবেদনা প্রদান নিজজনের প্র
তাঁহার অপার করুণারই নিদর্শন। তিনি যে 'স্বজন-প্রেম-বিবর্দ্ধন-চতু
'রসিকশেখর' ও 'পরমকরুণ' ভগবান। আবার ইঁহার ভিতর আ
একটি গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। ভগবদ্‌বিরহে, বাহ্যতঃ, হা-হুতাশ
আর্ত্তনাদ, মুখ-ঘর্ষণ, ভূমে গড়াগড়ি, অনর্গল অশ্রুপাত প্রভৃতি মর্মপীড়
দায়ক কষ্ট দৃষ্টিগোচর হইলেও, ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত;—
ভিতরে যুগপৎ প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত! এই বিপ্রলম্ভ র
রাধাভাবে-বিভোর মহাপ্রভু, প্রকটলীলায় শেষ দ্বাদশ বৎসর, গম্ভীরা
আস্বাদন করিয়া স্বয়ং পূর্ণ-মনোরথ হইলেন এবং জগৎকে ভগব
প্রাপ্তির পথ দেখাইলেন।

জীবমাত্রই ভগবানের অংশ,—স্বরূপতঃ জীব ভগবানের দাস
মোহান্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটায় এবং অনিত্য বিষয়ে আসক্ত
হওয়ায় তৎপ্রাপ্তিতেই তাহার আনন্দ ; অপ্রাপ্তি বা বিয়োগে,—শোক
তাপ ভোগ। এইভাবে বহু জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে, সৌভা
ক্রমে কোন মহতের কৃপালাভ ঘটিলে, জীবের স্বরূপানুবন্ধী ভক্তির উদ
হয় এবং তখন জীব ভগবদ্‌ভজন পরায়ণ হয় ও ক্রমে হৃদয়ে ভগবদ্
বিরহানুভব জাগিতে থাকে। সেই সময় ভগবৎপরিকরগণের মর্ত্ত্যলীলা
বিরহ দশার আচরণই উহাদের পথপ্রদর্শক হয়। এই কারণে তাঁহা
বিভিন্ন স্বরূপের, বিভিন্ন নিত্য প্রিয়াগণ, জীবের লাগি করুণা পর
হইয়া বিভিন্ন বিরহ-চেষ্টা, তাঁহাদের অপার করুণারই নিদর্শন মাত্র।
তাঁহারা নিত্য ধামে, নিত্যলীলায়, নিত্যদেহে, নিত্য বিরাজমান
তাঁহাদের ত আর সাধন করিয়া সিদ্ধ দেহ লাভ করিতে হয় না। এ
সকল কেবল করুণার নিদর্শন।

সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি গৌরলীলায় আবার স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন

রাধাভাবকান্তি ধারণ করিয়া মহাভাবস্বরূপিণী রাধার প্রেমের চমৎকারিত্ব স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ও জগৎকে করাইয়া এক নিরুপম কারুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ভক্ত কবি তাই পুলকভরে গাহিয়াছেন—

"যদি গৌরাঙ্গ না হত, কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা,
জগতে জানাত কে ?"

"আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমের আখ্যান।" (চৈঃ চঃ—২।৮।৩৮০) এই প্রেমের বাহ্য প্রকাশ, যতই দুঃখপ্রদ মনে হউক না কেন, উহাই জীবের চরম ও পরম আস্বাদ্য বস্তু। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন—

"বাহে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমা যার মনে, তাঁর বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥" চৈঃ চৈঃ—২।৩।১৮৩

শ্রীরাধার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, যখন কৃষ্ণ কাছে থাকেন তখন কেবল কৃষ্ণকেই দেখেন ; পরন্তু, যখন তীব্র বিরহ বিচ্ছেদ জাগে তখন সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়—জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, সর্ব্বত্রই কেবল কৃষ্ণ দেখেন। তমাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিতে যান, —কৃষ্ণ ভ্রমে মেঘের সহিত কথা ক'ন। এই ভাবে বাহ্য অনু-সন্ধান ক্রমেই লুপ্ত হইয়া, পরিশেষে অপ্রাকৃত নিত্যধামে নিত্যমিলন সংসাধিত হয়। অবশ্য ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ভগবৎ-প্রেয়সী গণের আমাদের মত মায়িক বা গুণময়, দেহ কদাচ থাকা সম্ভবপর নহে ; ভগবানের অনুরূপ তাঁহার পার্ষদগণও সচ্চিদা-নন্দময়—তাঁহাদের দেহ চিন্ময়, তথাপি লৌকিক অনুকরণে, সাধারণ লোক শিক্ষার জন্য, এইরূপ আচরণ প্রদর্শন করা কিছুই বিচিত্র নহে।

ভক্তদের অনুগ্রহ করিবার জন্যইত তিনি সপার্ষদ এইরূপ নরলী[illegible] করিয়া থাকেন ; যথা, ভাগবতে—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥" ভাঃ—১০।৩৩।[illegible]

অর্থাৎ, 'ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তিনি মনুষ্য-দেহ ধা[illegible] করেন, এবং তাদৃশীলীলা করেন, যাহা শুনিয়া জনসাধারণ তাহা[illegible] তৎপর হয়।'

ভগবান রাসলীলায় তাঁহার অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"[illegible] সখীগণ! দরিদ্র ব্যক্তি দৈবলব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে, যেমন সেই ধনচি[illegible] নিমগ্ন হইয়া অন্য কিছুই জানিতে পারে না, আমার ভক্ত যাহা[illegible] সেইরূপ নিরন্তর আমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জগৎ বিস্মৃত হইতে পা[illegible] সেই নিমিত্তই আমি ভক্তকেও ভজনা করি না—অর্থাৎ দর্শন দি[illegible] অন্তর্হিত হই।"

"হে অবলাগণ, তোমরা আমারই নিমিত্ত লোকাচার, বেদাচার [illegible] আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ। আমিও তোমাদিগকে পরিত্যা[illegible] করিয়া কোথাও যাই নাই, কেবল আমার প্রতি তোমাদের অনুরা[illegible] বৃদ্ধির নিমিত্ত অদৃশ্য ভাবে ছিলাম ; তোমাদিগকে দেখিতেছিলাম এ[illegible] তোমাদের বিলাপবাক্য শুনিতেছিলাম, তোমরা আমার প্রিয়তমা এ[illegible] আমিও তোমাদের পরম হিতৈষী, অতএব আমার প্রতি দোষারোপ ক[illegible] তোমাদের উচিত নয়।" ভাঃ—১০।৩২।[illegible]

গোপীদের হিতের জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া গিয়াছিলে[illegible] তাহা তিনি পরে উদ্ধবের দ্বারা গোপীদিগকে সুস্পষ্ট জানাইলেন।— "আমি তোমাদের প্রিয়, আমি যে তোমাদের নয়নের দূরে বসতি করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমাকে নিরন্তর ধ্যা[illegible] করিয়া মানস-সন্নিকর্ষ লাভ করিবে। প্রিয়তম ব্যক্তি দূরে থাকিলে স্ত্রীলোকের চিত্ত যেমন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে,

নিকটে নেত্রগোচরে অবস্থান করিলে সেরূপ কখনই হয় না। তাই বলিতেছি, তোমরা অপর সমস্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই মনঃসন্নিবেশ করতঃ নিরন্তর আমাকে ধ্যান করিতে থাক; এইরূপ করিলেই অচিরাৎ আমায় প্রাপ্ত হইবে।” ভাঃ—১০।৪৭।৩৪,৩৬

তৎপরে বহুকাল বিচ্ছেদের পর, কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ-মিলনে মধুর সান্ত্বনা বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় বিরহ বিহ্বলা রাধিকাকে বলিলেন,—

“ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥” ভাঃ—১০।৮২।৪৪

‘আমার প্রতি ভক্তিই প্রাণীগণের অমৃতত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়। আমার প্রতি তোমাদের যে মদাকর্ষক প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিয়াছে উহা অতিশয় মঙ্গলের বিষয়।’

বুদ্ধদেবও নিদ্রিত প্রিয়াকে ছাড়িয়া যাইবার সময় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে—

“প্রিয়ে, আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়াই আজ তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি, যদি কখন তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিবার মত কোন উপযুক্ত বস্তুর সন্ধান পাই, তবেই আবার আসিব।”

(*Arnold's 'Light of Asia'—Chap. IV*)

বুদ্ধদেব তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি বর্ণে-বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি বোধিদ্রুমতলে কঠোর তপস্যানিরত থাকিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবৃত হয়েন এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিজনাদি সকল আত্মীয় স্বজনকেই নিজ পথের পথিক করিয়া নির্ব্বাণ, বা পরামুক্তির পথ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে চির-কৃতার্থ করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বিষ্ণুপ্রিয়ার পারমার্থিক কল্যাণের জন্যই যে তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিত আমরা বহু স্থানে পাইয়া থাকি। যথা,—

"যেদিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে তুমি আমা দেখিবারে পাবে॥"
"করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ।
বিচ্ছেদ হৃদয়ে যেন বাড়ে তার ভাব॥" (শ্রীচৈতন্যমঙ্গ

সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও যে সেই একই মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

সীতাদেবী, শ্রীরাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, ইহাদের কেহই, নিজ প্রিয়ত সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিলে, ঐরূপ তীব্র তপস্যায় নিমগ্ন হইতেন ন এবং পরিণামেও এইরূপ পরম ফললাভ করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃ বিরহে শ্রীরাধার উদ্‌ভ্রান্ত দিব্যোন্মাদের অবস্থা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বর্ণি হইয়াছে। বনবাসে মহর্ষি বাল্মিকী-আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র-বির সীতাদেবী যেরূপ কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিবার সুদীর্ঘ অবক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীরামসহ অযোধ্যায় রাজঅন্তঃপুরে অবস্থা করিলে কদাচ তাহা সম্ভবপর হইত না বলাই বাহুল্য। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণান্তে কঠোর হইতে কঠোরতর বৈরাগ অবলম্বন করেন এবং শচীদেবীর পরলোক গমনান্তে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিরন্তর কঠোর ভজনে নিমগ্না থাকেন। প্রত্যূষ হইতে জপকালে তারকব্রহ্ম ১৬নাম একবার জপ হইলে, ১টী আতপ তণ্ডু মৃৎভাণ্ডে রাখিয়া, এই ভাবে দ্বিপ্রহরে যাহা তণ্ডুল সংগ্রহ হ তাহাই স্বয়ং পাক করিয়া ইষ্টদেবে ভোগ দিয়া তাহা আপনি অনুপকরণে প্রসাদ পায়েন এবং উহার অর্দ্ধাংশ-প্রসাদ ভক্তগণকে বিতরণ করেন।" অবশিষ্ট সময় ভূমিশয্যায় নিরন্তর উদ্‌ভ্রান্ত পাগলিনীর ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান ও ধ্যানে অতিবাহিত করেন। মহাপ্রভু গৃহে থাকিলে তাঁহার পক্ষে এরূপ কঠোর বৈরাগ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন সাধন-ভজন কদাচ সম্ভবপর হইত না। কয়টা দিন এইরূপ তীব্র তপস্যার ফলে যদি অনন্তকালের পাথেয় সংগ্রহ ও প্রিয়তমের

সঙ্গে চিরমিলনের পথ সুগম হয়, তবে ঐরূপ তপস্যার সুযোগ লাভ যে পরম সৌভাগ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি ;—তাহা অপেক্ষা আর লোভনীয় বস্তু কি আছে। বস্তুতঃ, কাহারও প্রতি প্রকৃত ভালবাসা একবার অন্তরের অন্তঃস্থলে সংজাত হইলে, তৎপরে ঐরূপ বিচ্ছেদ, বা বিরহ, যে আত্মিক-মিলনের বিশেষ অনুকূল, তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায় এবং লৌকিক জগতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শত্রুভাবেও ভগবানে আবিষ্ট হইয়া যখন শিশুপালাদির মোক্ষ লাভ হইল, তখন ভগবৎ-প্রেয়সীদের ঐভাবে প্রেমাবেশে যে পরম সদ্গতি লাভ ঘটিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 'স্বজন-প্রেম-বিবর্দ্ধন-চতুর' ভগবান তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগাইবার উদ্দেশ্যেই এইভাবে এই স্থূল-শরীরের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে নারদঋষির পূর্ব্বজন্ম বর্ণন-প্রসঙ্গে নারদের প্রতি ভগবানের অনুরূপ আচরণের ভঙ্গীই দেখিতে পাই।—

দেবর্ষি নারদ পূর্ব্ব জন্মে দাসীপুত্র ছিলেন। স্নিগ্ধস্বভাব বালক নারদের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া ঋষিগণ তাঁহাকে পরম দুর্লভ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেন এবং তিনি বিশেষ নিষ্ঠাসহকারে ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় ভগবদিচ্ছায় তাঁহার মাতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, নিশ্চিন্ত মনে তিনি বনে গমন করেন এবং কাননে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল তাহা তাঁহার নিজ মুখে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"ভক্তিভাবিতচিত্তে শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে দর্শনোৎকণ্ঠায় আমার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইল। তখন সর্ব্বদুঃখহর হরি, ক্রমে আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হইলেন।

(ভাঃ—১।৬।১৭)

"হে মুনে, তখন প্রেমাতিশয্যে আমার সর্ব্বশরীর পুল...
হইল, পরমানন্দলাভে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম—আত্মজ্ঞান ও ভগব...
লোপ হইয়া গেল! সেই মনোরম তাপনাশন অনির্ব্বচনীয় শ্রী...
দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইলে, আমি অতিশয় দুঃখিত ও বিমনা হ...
আসন হইতে উঠিলাম। আবার সেই রূপ-দর্শন আশায় হৃদয়ক...
মনঃস্থির করিয়াও আর দেখিতে পাইলাম না; বাসনা পূর্ণ হইল না...
অতিশয় ব্যাকুল হইলাম। এইরূপে সেই নির্জ্জন বনে আমি শ্রীভগ...
দর্শনলাভার্থ পুনঃ-পুনঃ চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় অবাঙ্মনসগো...
শ্রীভগবান আমাকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—...
নারদ! তুমি এই সাধকদেহে আমাকে আর দেখিতে পাই...
না। যাহাদের মনোমল সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই, তাহারা আমা...
দেখিতে পায় না। হে নিষ্পাপ! তোমাকে যে একবার আমার মূ...
দেখাইলাম, তাহা কেবল তোমার দর্শনলালসা বৃদ্ধি করিবার জন্য...
আমাকে দেখিতে ও সেবা করিতে লালসা হইলে সর্ব্ববিধ বিষ...
বাসনা দূর হইয়া যায়।

"চিত্তবৃত্তি একবার আমাতে আবিষ্ট হইলে, আর কখন...
স্খলিত হয় না। অতএব তোমারও চিত্তবৃত্তি আমা হইতে স্খলি...
হইবে না। আমার কৃপায় তোমার এই সাধকদেহের স্মৃতিও সর্ব্ব...
জাগ্রত থাকিবে।' এই কথা বলিয়া সেই মহাদ্ভুত আকাশবাণীদ্বা...
অনুমিত অলক্ষিত-বিগ্রহ সর্ব্বেশ্বর বিরত হইলে, আমি তাঁহার কৃপায়...
সেই মহৎ হইতেও মহত্তম শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করিলাম।

"অনন্তর আমি লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বদাই...
শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম এবং বেদগোপ্য পরম মঙ্গলময়...
মধুর লীলাবাণী স্মরণ করিয়া এবং সর্ব্ববিধ ভোগলালসাশূন্য, নিরহঙ্কার...
ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া,—'কবে আমি সে অধিকার পাইব', এই অপেক্ষায়...
তীর্থে-তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। হে ব্যাসদেব! এই প্রকারে...

কৃষ্ণ কৃপায় বিষয়াসক্তিরহিত শুদ্ধ এবং কৃষ্ণগতচিত্তে কিছুকাল যাপন করিলে, যেমন বিদ্যুৎ সকাশে অপর বিদ্যুৎ বিকাশ হয়, সেইরূপ আমারও নশ্বরদেহ ত্যাগকালে পার্ষদদেহ প্রাপ্তিকাল উপস্থিত হইল। শ্রীভগবান আমাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত পার্ষদদেহ দান করিতে ইচ্ছুক হইলে, আমার প্রারব্ধকর্ম্মের অবসানে পাঞ্চভৌতিক দেহপাত হইল।"

ভাঃ—১।৬।১৮—২৯

এখানে ভগবান স্পষ্ট বলিলেন,—"নারদ তুমি এই সাধকদেহে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।…কেবল যে একবার আমার মূর্ত্তি দেখাইলাম তাহা কেবল তোমার দর্শন লালসা বৃদ্ধির জন্য। …চিত্তবৃত্তি একবার আমাতে আবিষ্ট হইলে আর স্খলিত হয় না।"—কার্য্যত ঘটিলও তাহাই। তাঁর আকুল ক্রন্দনে যথা সময়ে 'মনোমল সম্পূর্ণ বিদূরিত' হইল, এবং স্থূল-দেহের পতন হইয়া পার্ষদ-দেহ প্রাপ্তি হইল।

নিজজনকে দূরে-দূরে রাখিয়া তীব্র বিরহ-তাপে সন্তপ্ত করিবার ইহাই নিগূঢ় রহস্য। অনিত্য স্থূল শরীরের মিলনানন্দে মুগ্ধ না হইয়া আত্মায়-আত্মায় চিরমিলনের জন্যই ভগবানের এইভাবে স্বেচ্ছাকৃত বিরহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা। শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু একস্থলে মৌনাবস্থায় লিখিয়াছেন—

"কাম শারীরিক গুণের সামিল। বহির্ম্মুখ থাকিলেই কাম। শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া পড়িলেই প্রেম। তখন তাহা আত্মার অঙ্গ।" আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"শোক, মোহ এ দৈহিক সম্বন্ধজনিত। দৈহিক জন্য, শোক, মোহ অস্থায়ী, অনিত্য। আত্মিকসম্বন্ধে শোক নাই,—বিরহ। সে বিরহ আশাজনক ও নিত্যকাল স্থায়ী। এরূপ আত্মিকসম্বন্ধ হইলে মিলন হয়। দূরে থাকিলেও উভয়ের মধ্যে একটি সূত্রে-বন্ধন থাকে; তাহাতে সর্ব্বদা মিলিত মনে হয়।

করুণাকণা—৮৭ পৃঃ

অন্যায় সমরে নিধন

(কুরুক্ষেত্রে)

প্রশ্ন :—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অধিনায় হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, জয়দ্রথ প্রভৃতি রথী মহারথীদিগকে অন্যায় সমরে নিধনের ব্যবস্থা করিলেন কেন?

উত্তর :—এই রথী-মহারথিগণ সকলেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সময় ঐ রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা কেহই ঐ পৈশাচি বীভৎস কাণ্ডের প্রতিবাদ, বা প্রতিকার করেন নাই ; পরন্তু, কেহ কে ইহাতে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া বেশ একটা বিকট আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ! তৎপরে কুরুক্ষেত্র-সমরে সপ্তরথীতে ঘিরিয়া বাল অভিমন্যুকে যৎপরোনাস্তি নৃশংসরূপে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করেন। ভী ভিন্ন উহারা সকলেই এই অতীব গর্হিত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন এতদ্ব্যতীত ভীষ্ম, দ্রোণ পর্য্যন্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পাণ্ডবদিগে প্রতি আজীবন জঘন্য দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়াও, তাহার কোন প্রতি বিধান না করিয়া, কুরুক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বর তাহাদের পাপের যথেষ্ট প্রশ্রয়ই দিয়াছিলেন।* এইরূপে দেখা যা দুর্য্যোধন অনুষ্ঠিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনেক গর্হিত কার্য্যে তাঁহারা সাক্ষা যোগদান করিয়াছিলেন, কেহবা প্রকারান্তরে অনুমোদন করিয়াছিলেন একারণ কর্ম্মফলদাতা বিধাতার বিধানে তাঁহাদেরও ঐরূপ অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যুই যুক্তিযুক্ত ও উহা তাঁহাদের চৈতন্য-সম্পাদক।†

---

* এ সম্বন্ধে পর-প্রবন্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদি চরিত্র বিশ্লেষণে বিস্তৃত আলোচনা হইবে।

† *"Every action has equal and contrary reaction"*—'প্রত্যেক ক্রিয়ায় সমান ও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয়',—এই সিদ্ধান্ত-বাক্য বৈজ্ঞানিক জগতে যেমন সত্য, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি তুল্যরূপে প্রযোজ্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণের রথচক্র গ্রাসকালে যুদ্ধরত অর্জ্জুনের অন্যায় আচরণের সমর্থনে ঐ কথাই স্পষ্ট বলিয়াছেন—

অর্জ্জুনের সহিত ভীষণ সংগ্রামে কর্ণের রথচক্র বসুমতী দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলে,—ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, যতক্ষণ না রথচক্র উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন, ততক্ষণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, কর্ণ অর্জ্জুনকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন,—"হে সূতপুত্র, তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে, আপনাদের দুষ্কর্ম্মের দিকে কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ,—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আবার যখন শকুনি দুরভিসন্ধিপরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল; যখন তোমার মতানুযায়ী দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল; যখন বারণাবত নগরে জতুগৃহ মধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার জন্য অগ্নি প্রদান করাইয়াছিলে; যখন রজস্বলা দ্রৌপদীকে, 'অন্যপতি বরণ কর', বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তিরা নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলে; আবার যখন মহারথিগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অন্যায়রূপে বিনাশ করিয়াছিলে; —সে সকল সময়ে তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ, তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন এ সময়, আর ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না।... তোমরা ও ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।"

মহাভারত—কর্ণ, ৯২ অঃ

মহাবীর সূতনন্দন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অতিহিত হইয়া লজ্জ
অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হ
না। তখন মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন,—"হে পার্থ, কর্ণ র
আরোহণ করিতে না করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর।" মহা
অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে তাহাই করিলেন।

যুদ্ধাবসানে, অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদিকে নিধন করায় সকলে লজ্জি
ও বিশেষ বিমর্ষ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করি
বলিলেন,—"এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শত্রু-সংখ্যা অধিক হই
তাহাদিগকে কূট-যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূট-যুদ্ধে
অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুস
সকলেরই কর্ত্তব্য।

"তোমরা কদাচ তাহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হই
না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠান উদ্দেশ্যে অনেক উপ
উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের নিপাত করিয়াছি। আ
যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম তাহা হইলে তোমাদের জয়লা
রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না।" মহাভারত—শল্য, ৬১

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও, বলাৎকারে কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূগামী, অধর্ম্মচারী
রাজদ্রোহী বালীকে গুপ্তশরে, একপ্রকার অন্যায় ভাবে সংহার করি
তাহা ন্যায্য ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া তাঁহার এই আচরণ সমর্থন করিয়াছে
তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। রাজদ্রোহী,
চোর ডাকাতকে, অন্যায় ভাবে নিধন করা আদৌ দোষাবহ নহে
মোহিনীমূর্ত্তিতে ভগবান অসুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া দেবতাদিগকে সুধা
বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, ও ছলে-বলে-কৌশলে অন্যায়যুদ্ধে
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদির সংহার-সাধন জন্য শ্রীকৃষ্ণকে তীব্র কটূক্তি করায়
শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনবাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"দুর্য্যোধন, তুমি অসৎপথ

অবলম্বন পূর্ব্বক, ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, রাজন্য ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে; তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসৎচরিত্র সুতপুত্র নিহত হইয়াছে। প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া ভীমসেনকে বিষ-প্রয়োগ, জতুগৃহ-দাহ, ধর্ম্মরাজকে ছলে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ, জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান, সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যুর বিনাশ-সাধন প্রভৃতি বহু গুরুতর অন্যায় ও অপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ,—এক্ষণে তাহারই পরিণত ফলভোগ কর।" মহাভাঃ—শল্য, ৬২ অঃ (সংক্ষিপ্ত)

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গরূপ অধর্ম্মাচরণে বলরাম ক্রুদ্ধ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইলেন,—

"দেখুন, বিপক্ষেরা ইহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল; আরও দেখুন, প্রতিজ্ঞা-পালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। মহাবীর বৃকোদর,—'আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিব', বলিয়া সভাস্থলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ী,—'দুর্য্যোধন! ভীমের গদাঘাতে তোমার উরুভঙ্গ হইবে', বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এইরূপ অনুষ্ঠানে অণুমাত্রও দোষ লক্ষিত হইতেছে না,—আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন।"

(মহাভাঃ—শল্য, ৬১ অঃ)

ধর্ম্মপরায়ণ হলধর শ্রীকৃষ্ণের মুখে এরূপ কূট-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কোনরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; পরন্তু, অপ্রসন্নমনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে বোঝা যায় এ সকল স্থলে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মানুশাসন প্রতিপালন না করিয়া, 'আপদ্ধর্ম্ম' হিসাবে, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে,—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ", নীতি-শাস্ত্রের অনুসরণই যেন শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত। কণ্টক-দ্বারা-কণ্টক উন্মোচনের ন্যায়, ইহা দ্বারা ভগবানের ভূভারহরণ কার্য্য সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

দুর্য্যোধনের উরুভগ্নান্তে, ভীমসেন তাহার মুখে বারম্বার পদাঘাত করিলেও, যুধিষ্ঠির তাহা উপেক্ষা করায়, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ হইলেন; তাহাতে যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! বৃকোদর রোষপরায়ণ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে; কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা নিত্য শঠতাচরণ ও নানা প্রকার পৌরুষ-বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল; সেই সমস্ত দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; আমি এই কারণবশতঃ আমার ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্মানুসারেই হউক আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভ-পরতন্ত্র দুর্য্যোধনের বিনাশ করিয়া অভীষ্টসাধন করুক, এই মনে করিয়া, জ্ঞাতি-বিনাশ ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত উপেক্ষা করিতেছি।"

(মহাভাঃ—শল্য, ৬১ অ)

তাহা হইলেও আর একটা কথাও প্রণিধান যোগ্য যে, ঐরূপ অন্যায়-যুদ্ধে উহাদিগকে এভাবে নিহত করিয়া পাণ্ডবগণও পরিণামে বিশেষ লাভবান হইতে সমর্থ হয়েন নাই। ভগবদিচ্ছা ও তাঁর প্রেরণাতেই,—প্রকারান্তরে তাঁহারই প্রদত্ত ভীষণ রুদ্র-অস্ত্রে,—তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে, অশ্বত্থমা অতীব নৃসংশভাবে যুদ্ধাবশিষ্ট পাণ্ডবপক্ষীয় সকলকেই এবং তৎসঙ্গে নিদ্রিত পঞ্চ-পাণ্ডব-পুত্রকে, অতি জঘন্যভাবে—পশুবৎ নিধন করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরকে অতীব শোকাকুলচিত্তে স্পষ্টই বলিতে হইল,—"দৈব প্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায়, এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের এই জয়লাভ পরাজয়-তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয় দ্বারা বিপদ্গ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে,—উহা পরাজয় স্বরূপ।"

(মহাভাঃ—সৌপ্তিক, ১০ অ)

কালচক্রের গতিই এইরূপ। ধর্ম্ম বড় বিষম জিনিষ,—সে আপনার প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় ঠিকমত বুঝিয়া লইবেই। তবে আত্মাভিমানশূন্য একান্ত ভগবৎচরণে-শরণাগত ভক্তদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রে

কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফল তাঁহাদিকে আর ভোগ করিতে হয় না। ভগবান গীতায় উপসংহারে ইহাই বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য,—মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥" গীতা—১৮।৬৬

সে যাহা হউক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহা বলিলেন, বাহ্য-দৃষ্টিতে ঐরূপ প্রতিপন্ন হইলেও প্রকৃত তথ্য কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহার ভিতর বেশ একটা নিগূঢ় রহস্য বর্ত্তমান। ভগবান স্বয়ং অধিনায়ক হইয়া কেবল খাম-খেয়ালীর বশে, এরূপ একটা বিরাট ধ্বংসলীলার অবতারণা করিলেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভেই অর্জ্জুনকে যাহা বলিলেন তাহার কোনই সার্থকতা থাকে না। তিনি জলদগম্ভীরস্বরে জগতে ঘোষণা করিলেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" গীতা—৪।৭, ৮

'হে ভারত, যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কর্ম্মকারী-দিগের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

তৎপরে আবার কালরূপী অদ্ভুত বিশ্বরূপ প্রদর্শন দ্বারা রুদ্রবাণীতে জগতের আসল সত্য কি তাহা গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিলেন,—

"কালোস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।" গীতা—১১।৩২

'আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল ;—লোক সকলের সংহারার্থ এক্ষণে প্রবৃত্ত আছি।'

"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" গীতা—১১।৩৩

'উহাদের সকলেই আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ; হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।'

এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টই বোঝা যাইতেছে অসুরভাবাপন্ন ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসরূপ ভূভারহরণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি পাণ্ডব দিগকে, বিশেষতঃ অর্জ্জুনকে, 'নিমিত্ত-মাত্র' করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি স্বয়ং দৌত্য কার্য্যে ব্রতী হইয়া দুর্য্যোধনকে মাত্র পাঁচ খানি গ্রাম পাণ্ডব দিগের জন্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ধি করিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না, ইহা কি কদাচ বিশ্বাসযোগ্য ? বন্ধন-করিতে-উদ্যত কৌরবদিগকে যিনি এতাদৃশ মহাঐশ্বর্য্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিলেন, যাঁহার প্রেরণায় জগৎ চলিতেছে, তিনি প্রেরণা দিলে দুর্য্যোধন কি ঐরূপ বিসদৃশ আচরণ করিতে পারিত ! ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁহার প্রেরণাতেই দম্ভের-প্রকট-মূর্ত্তি দুর্য্যোধন তাহার নিজ স্বরূপ প্রকট করিয়া জগৎকে দেখাইলেন, তমোভাবাপন্ন স্বার্থান্ধ মানুষের এরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটে যে, জগতে প্রলয়-কাণ্ড ঘটে ঘটুক তথাচ তাহার জেদ বজায় জন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুবর্গের হিতবাণী অনাদর করিয়া পাঁচখানি গ্রাম কেন, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি পর্য্যন্ত দিতে নারাজ হয় —তাহার পরিণামও কি দারুণ ভীষণ তাহাও ভগবান জগৎকে দেখাইলেন। দুর্য্যোধন যে বলিয়াছেন,—

"জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্য ধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

—ইহা তত্ত্বতঃ ঠিকই বলিয়াছেন ; ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" গীতা—১৮।৬১

'হে অর্জ্জুন, অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা শরীর-রূপ-যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণিকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে ভ্রমন করাইতে থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন।'

পুনশ্চ :—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" গীতা—৩।৪

'সকল কর্ম্ম প্রকৃতির গুণ-সকলের দ্বারা সম্পাদিত হয়; তথাপি অহঙ্কারদ্বারা মোহিতান্তঃকরণ পুরুষ, 'আমি কর্ত্তা', এইরূপ মনে করে।' তবে প্রশ্ন এই যে, দুর্য্যোধনের কি উহা ঠিক-ঠিক অনুভব হইয়াছিল,— তাহা হইলে ত দুর্য্যোধন ত্রিগুণাতীত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! কিন্তু তাঁহার আচরণে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। তিনি যাদৃশ,—"দম্ভ, দর্প, অভিমানশ্চ, ক্রোধঃ, পারুষ্যমেব চ।", (গীঃ—১৬।৪) তমোগুণাচ্ছন্ন রাক্ষসী ও আসুরীভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে তাঁহার মুখে কদাচ ঐরূপ বাক্য-প্রয়োগ শোভা পায় না। উহা প্রজ্ঞাভিমানী অসুরস্বভাবসম্পন্ন, 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা', মূঢ়লোকের বৃথা বাকচাতুরী মাত্র। ভগবান তাহাকে নিমিত্ত করিয়া, এইভাবে ঐরূপ অসুর প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচন করিয়া জগৎকে দেখাইলেন। মূল কথা, ভূভারহরণ ও ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশেই তিনি অবতীর্ণ। তবে এক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিয়া, তাঁহার চরণাশ্রিত পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া, সেই কার্য্য সংসাধিত করিলেন মাত্র। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই, পাণ্ডবগণের বৈকুণ্ঠে নিত্যস্থিতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে তাঁহার অনুজ্ঞায়, তাঁহার সহায়স্বরূপ তাঁহারা দেবঅংশে ধরায় জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়গণ যে প্রকৃতই ধরায় ভারস্বরূপ হইয়াছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারতবর্ষের তাৎকালিক প্রধান-প্রধান ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণরূপ বর্ব্বরোচিৎ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান। গুরু, পিতামহ, পিতৃব্য, পতি ও অপরাপর আত্মীয় স্বজন সমক্ষে রাজসভায় প্রকাশ্য দিবালোকে, নিরপরাধা, একবস্ত্রা, রজস্বলা যুবতী কুলবধূর প্রতি কি পৈশাচিক অমানুষিক অত্যাচার!! ঐরূপ বর্ব্বর ভাবাপন্ন

ক্ষত্রিয়শক্তির ধ্বংস ও নূতন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন জন্যই ঐ ... জগৎব্যাপী বিরাট কুরুক্ষেত্র সমরানল প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা। ভগবা... লীলার একটি ধারা যেমন সুন্দর, যেমন মধুর—অপর একটি ... আবার তেমনি ভীষণ, তেমনি কঠোর !*

এই প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার অবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অশ্ব... মেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করাইয়া, তাঁহার সুমহান যশ মহীতলে প্রকা...

---

* দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালেই জঘন্য অত্যাচারীগণের প্রতি যথোচিৎ শা... ব্যবস্থা হইত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন শুধু তাহারাই দণ্ডার্হ নহে। সমগ্র ... তৎকালে ঐরূপ অসুর স্বভাবাপন্ন। ভূভারহরণের জন্য তাহাদের সকলকে ... সমবেত করিয়া ধ্বংসের জন্য এই বস্ত্রহরণরূপ বীভৎস কাণ্ডের দ্বারা কুরুক্ষে... সমরানলের বীজ-রোপন ব্যবস্থা।

আবার ইহার মধ্যে, ইহা হইতেও গভীরতর রহস্য নিহিত। ভাগব... (ভাঃ—১০।৭৫) দেখি, যখন রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে মাল্য-কিরীটভূষ... দুঃশাসন প্রভৃতি পরিবৃত, অসূয়াপরায়ণ, মদগর্ব্বিত দুর্য্যোধন খড়্গ ধারণপূর্ব্ব... রোষভাবে দ্বারস্থিত জনগণকে তিরস্কার করিতে করিতে ময়দানবনির্মি... সভায়, শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় মায়াবিমোহিত হইয়া, স্থলে বস্ত্র উত্তোলন করি... কোথাও বা স্থলে জল ও জলে স্থল মনে করিয়া পতিত হইল। তখন ভীম... অট্টহাস্য করিয়া উঠিল এবং স্ত্রীগণ ও নরপতিগণ, যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিবারি... হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আকারে-ইঙ্গিতে অনুমোদিত হইয়া, হাসিতে লাগিল।

তখন দুর্যোধন দারুণ মর্ম্মাহত, লজ্জিত ও অধমুখ হইয়া অতিশয় ক্রোধভরে কোন কথা না বলিয়াই, হস্তিনাপুরে গমন করিল। উহাতে ভাবী গুরুতর অমঙ্গল আশঙ্কায় সভাস্থ সাধু-সজ্জনগণ সকলেই হা হা শব্দ করিয়া উঠিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতীব ক্ষুন্ন হইলেন; পরন্তু, ভূভারহরণেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণ কোন কথা না বলিয়া, তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির যোগ্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইল দেখিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই, এ সমস্তই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট-প্রায় সংঘটিত হইল।

অতঃপর, কুরুক্ষেত্র ধ্বংসলীলা সমাপন ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক ধর্মরাজ্য সংস্থাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, (ভাঃ—১১।১) অতীব দুর্দ্ধর্ষ যদুবংশীয়গণ বর্ত্ত...

করতঃ এরূপ এক মহাশক্তিসমন্বিত আদর্শ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া গেলেন, যাহার বিচিত্র প্রভাব কয়েক সহস্র বৎসর যাবৎ অটুট থাকিয়া ভারতের গৌরব সমুজ্জ্বল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরে কালবশে তাহা ম্লান হইলে বিদেশীয়গণের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। পুনরায় এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভীষণ ধ্বংসলীলার তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভের সূচনা হইয়াছে, ইহাও সেই ইহ-ভোগ-সর্ব্বস্ব, জড়াসক্ত-চিত্ত আসুরিক সভ্যতারই অলঙ্ঘনীয় দারুণ পরিণতি! এই সভ্যতার বুনিয়াদে ফাটল ধরিয়াছে, ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য। এরূপ আস্তিক্যবুদ্ধিশূন্য জড়বাদীদের মধ্যে প্রকৃত স্থায়ী শান্তি কোন কালে সংস্থাপন অসম্ভব। ইহার সমূলে ধ্বংসের পর ভগবদ্‌বিধানে জগতে আবার এক নূতন সভ্যতার

উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া,তাহারাও ধরার ভারস্বরূপ হইয়াছে, অথচ তাঁহাদিগকে সংহার করিতে কেহই সমর্থ নহে; এহেতু ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতরূপ উপায় অবলম্বন করতঃ, যাদবগণের মধ্যেই পরস্পর কলহ-সৃষ্টি করিয়া যদুবংশ ধ্বংসেরও ব্যবস্থা করিলেন।

তাঁহারা কিরূপ মদগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা জাম্বুবতীতনয় সাম্বকে গর্ভবতী নারীবেশে মহাতেজস্বী মুনিগণের নিকট উপস্থিত করাইয়া, তাহার কি সন্তান হইবে ছল-প্রশ্ন করিবার দুঃসাহসেই অনুমান করা যায় এবং তাঁহারা এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে প্রভাসক্ষেত্রে সকলেই মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নিষেধও উপেক্ষা করিয়া, পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন;—এমন কি শত্রুজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে পর্য্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন! (ভাঃ—১১।৩০।২১)—পরিশেষে এইভাবে পরস্পর কর্ত্তৃক আঘাতে নিঃশেষে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার মধ্যে রহস্য এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বথা সমর্থ হইয়াও সেই বিপ্রশাপের কোন প্রতিবিধানই করিলেন না; পরন্তু, কালরূপী-কৃষ্ণ ভূভার-হরণার্থ যদুবংশ ধ্বংসের জন্য ইহা অন্তরে অনুমোদনই করিলেন। (ভাঃ ১১।১।২৪) —অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি সেই লীলাময়ের নিগূঢ় লীলারহস্য ক্ষুদ্র-কীট মানব কি বুঝিবে!

অভ্যুত্থান হইয়া যথার্থ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। সাধু-মহাত্ম তাঁহার পূর্ব্ব-সূচনা দেখিতেছেন। শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুও ইহার পূর্ব্বাভা দিয়া গিয়াছেন।*

কুরুক্ষেত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ

(১৪) প্রশ্ন—কুরুক্ষেত্রের বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আ চরিত্র কাহার?

উত্তর—কুরুক্ষেত্রের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণের মধ্যে অনেকেই এ বা ততোধিক, নিরুপম গুণগরিমায় জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সত্যনিষ্ঠায় ও জিতেন্দ্রিয়তায়, মহাত্মা ভীষ্ম 'অদ্বিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা,—'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞ আখ্যায় প্রবাদরূপে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অযোনিসম্ভব আচার্য্যা দ্রোণ একাধারে ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যায় তুল্য পারদর্শিতা দেখাই জগতে এক অভিনব আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আবার পরশুরাম-শি রণবীর ও দানবীর কর্ণ, শৌর্য্য-বীর্য্যের আধার হইয়া,অসাধারণ বদান্যত গুণে ধরার দানবীরগণের অগ্রগণ্য,—'দাতা কর্ণ' নামে অভিহিত হই আছেন। এদিকে অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধৈর্য্য, ক্ষমা, ঔদার্য্যাদি

---

* ঢাকায় অবস্থিতিকালে একদিন অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্র গদগদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন :—"এক মহালীলা হইবে, এক আশ্চর্য্য ঘট ঘটিবে। বেশীদিন বাকী নাই। মহাত্মারা সব বের হ'য়েছেন। গয়া, কাশী বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি স্থানে এক মহা কাণ্ড হইবে। আবার সেই সত্যকাল,— প্রায় সত্য-কালই হইবে। গঙ্গা-যমুনা সহিত সমস্ত দেশটিকে ভাসাবে,— প্রায় সকল ভারতবাসীকেই ভাসাবে। শুধু ভারতবাসী নয়, অনেক ইংরেজ ভেসে যাবে। এ স্রোত—মহাস্রোত, সকলকেই ভাসাবে।..."

শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ—১ম, ৯৩ পৃ

গুণে এবং অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় জগতে—'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং বীরভক্ত; মহাবল ভীমসেন অমিত-পরাক্রম ও অনুপম জ্যেষ্ঠানুগত্যে,—'ভীমের, দাদা ও গদা' এই চমৎকার প্রীতি-বীরত্ব-ব্যঞ্জক, সম্মান লাভ করিয়াছেন। এইরূপ ইঁহাদের প্রত্যেকে এক-একটি নিরুপম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'নারায়ণ' শ্রীকৃষ্ণের, প্রিয়সখা,—'নর'-রূপী গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনেই একাধারে সমগ্র সদ্‌গুণের যেরূপ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জগতে দুর্লভ। একারণ কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনই সর্ব্বপ্রকারে উহাদের শীর্ষস্থান পাইবার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বোপরি তাঁহার ঐকান্তিক ভগবৎ-নিষ্ঠা ও আনুগত্য, জগতে অতুলনীয়। প্রত্যুত, ভগবৎচরণে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিই তাঁহার এতাদৃশ অনুপম গুণালঙ্কৃত হইবার নিগূঢ় কারণ—

'যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈগু´ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।' ভাঃ—৫।১৮।১২

'কৃষ্ণ ভক্তে, কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।' চৈঃ চঃ—২।২২।২০৬

এক্ষণে আমরা ঐ মহাপুরুষগণের প্রত্যেকের চরিত্র বিশদভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব—

ভীষ্ম—বীরাগ্রগণ্য, মহাধীসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্মদেব নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ রোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রামে মহাপরাক্রমশালী, ভগবানের আবেশ-অবতার, দুর্জ্জেয়, গুরু পরশুরামের পর্য্যন্ত দর্প খর্ব্ব করিয়া, পরাজয় স্বীকার করাইয়া এবং কুরুক্ষেত্র সমরে অস্ত্র-ধারণে একান্ত বিমুখ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও, অদ্ভুত পরাক্রম বলে, অস্ত্র ধারণে বাধ্য করাইয়া, দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার কুমারকালেই তিনি পিতৃ-প্রীতি সম্পাদনার্থ চিরকুমার-ব্রত অঙ্গীকার করিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ সকল কারণে তাঁহাকে আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া গন্য করাই যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি কয়েকটী ক্ষেত্রে তাঁহার বিসদৃশ আচরণ দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। উহা

তাঁহার মত আদর্শ মহাপুরুষের কদাচ যোগ্য নহে, এবং উহা সম
করাও কোন প্রকারে সমীচীন নহে।

কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে তাঁহার এক প্রকার ঔদাসী
ন্যের ভাবই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারই সাক্ষাতে যখন নিরাপরাধ
যুবতী কুলবধূর উপর রজস্বলা অবস্থায়, রাজ-সভায়, সকলে
সমক্ষে, দিবাভাগে বিবস্ত্রীকরণরূপ পৈশাচিক নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠি
হইল এবং এতাদৃশ সঙ্কটাবস্থায় বিপন্না দ্রৌপদী যখন কাতরপ্রাণে তাঁহা
আশ্রয় প্রার্থিনী হইলেন, তখন তাঁহার এভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা কদাচ উচি
হয় নাই; নিশ্চয়ই প্রাণপণে উহার প্রতিরোধ, বা প্রতিকার, ক
উচিত ছিল, এবং তাহাতে একান্ত অশক্ত হইলে, তদ্দণ্ডেই দুর্য্যোধনাদি
সহিত সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করা উচিৎ ছিল।*

তাছাড়া, দুর্য্যোধন প্রভৃতির কুটিল চক্রান্তে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠি
প্রভৃতির এত লাঞ্ছনা ও তাঁহাদের দ্বারা জতুগৃহদাহ আদি অতি গর্হি
ও নৃশংস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেও সেরূপ কোন প্রতিবাদ, বা প্রতিকা
না করা, তাঁহার মত আদর্শ পুরুষের কদাচ উপযুক্ত নহে। দুর্য্যোধ
যখন, ভীমসেনকে বিষ-প্রয়োগ, জতুগৃহ-দাহ, ছল-পাশা-ক্রীড়া
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণাদি বহু গুরুতর গর্হিত কার্য্য করিতেছিলেন এবং গুরু
জনের কোন হিতবাণীতেই কর্ণপাত করিতে ছিলেন না, তখন মহা

* এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, অসহায়া নিরপরাধা, কুলস্ত্রীর প্রতি এ
অমানুষিক অত্যাচার ও ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ বীরপুরুষগণের এতাদৃশ ঔদাসী
ভাব লক্ষ্য করিয়া, ক্ষত্রিয় শক্তির জঘন্য অপব্যবহারে, তত্র সমাগত ঋষিগণ মর্ম
ন্তিক বেদনা অনুভব করেন এবং তীব্র রোষভরে,—'ভারত হইতে ক্ষত্রিয়শক্তি
সমূলে ধ্বংস হউক!' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। ঋষিগণের রোষানলে
প্রলয়ঙ্করী কুরুক্ষেত্র সমর প্রজ্বলিত হয় এবং ক্ষত্রিয়শক্তি ভারত হইতে বিলুপ্ত
হয়। এক নারীজাতির প্রতি এইরূপ অমানুষিক অবমাননা হইতে আম
অদ্যাপি তাহার উৎকট বিষময় ফল ভোগ করিতেছি! জানি না কতদিনে, কি
উপায়ে, ও কোন প্রায়শ্চিত্তে, ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

ভীষ্মের কদাচ দুর্য্যোধনকে এভাবে পাপাচরণে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ, যখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অনুরোধেও, মাত্র পাঁচ খানি গ্রাম প্রদান করিয়া, দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না, এবং মাতা, পিতা, বিদুর প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন ভীষ্মের কদাচ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করা উচিৎ হয় নাই। তাঁহার প্রশ্রয় পাইয়াইত দুর্য্যোধন এতবড় একটা প্রলয়ঙ্করী অনর্থ ঘটাইতে সাহস পাইলেন, এবং কুরুবংশ পালন ও রক্ষা করিতে গিয়া, তিনি এইভাবে প্রকারান্তরে তাঁহার ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করিয়া দিলেন! দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়াই যদি তাঁহাকে এইসব অতীব লোকবিগর্হিত কার্য্যে প্রশ্রয় দিতে হয়, তবে উহাদের পাপ-অন্নে এতকাল প্রতিপালিত হওয়া ভীষ্মদেবের ন্যায় আদর্শ ব্যক্তির অতীব ঘৃণ্য বোধ হওয়াই স্বাভাবিক—এমত অবস্থায় তৎকালে তাঁহার অপর কোন প্রকার সাধুজনানুমোদিত জীবিকা উপায়ের ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য ছিল। পরমভাগবত বিদুর এই সকল অতীব গর্হিত আচরণের কোনও প্রতিকার করিতে সমর্থ না হওয়ায়, তাঁহার মত অনাসক্ত ভক্ত, বর্ণোচিৎ ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিলেন, তথাচ দুর্য্যোধনের পাপ-অন্ন গ্রহণ করিলেন না। সন্ধিপ্রস্তাব কালে শ্রীকৃষ্ণ, দুর্য্যোধন প্রদত্ত রাজভোগ ত্যাগ করিয়া, ঐ ভিক্ষান্নই অতীব পবিত্রজ্ঞানে মাগিয়া খাইয়াছিলেন। ভীষ্মদেবের ঐ ভাবে দুর্য্যোধনের পাপ-অন্ন-ভোজন করিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে অন্যায়-পক্ষ অবলম্বন করা, কদাচ সমর্থনযোগ্য নহে। উহা আদর্শ-পুরুষের উপযুক্ত আচরণ বলিয়া কদাচ গণ্য হইবার যোগ্য নহে।*

* অক্ষক্রীড়া কালে ভীষ্মের যে অতি গুরুতর কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং সে জন্য তিনি যে গুরুতর দণ্ডার্হ, একথা কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বধোদ্যত হইয়া নিজমুখে, ভৎর্সনাপূর্ব্বক, সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছিলেন— ভীষ্মের গৌরবানুরোধে তীক্ষ্ণশরে একান্ত আহত হইয়াও, অর্জ্জুন যৎকালে

দ্রোণাচার্য্য—অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যুকে হত্যা করা অতীব গর্হিত কার্য্যই হইয়াছিল। তাহাতে দ্রোণের মত বীরের কদাচ যোগদান করা সঙ্গত হয় নাই। মৃত্যুর অনতি-কাল-পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মাস্ত্রের অপপ্রয়োগে অযথা লোকক্ষয় করেন, এবং তিনি তৎকালে দেবতা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট তিরস্কৃত হয়েন। এই সব গুরুতর কারণে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, অর্জ্জুন ও ভীষ্মের প্রায় সমতুল্য হইলেও তিনি তাহাদের সমান আসন পাইবার যোগ্য নহেন।

তারপর আর একটা কথা, দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ; যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁহার স্বধর্ম্ম নহে। তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আজীবন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন, উহা কদাচ সমর্থন যোগ্য নহে। ব্রাহ্মণেরা 'আপদ-ধর্ম্ম' হিসাবে সাময়িক সঙ্কট-কালে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে পারেন, ইহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা; কিন্তু আজীবন ক্ষত্রিয়-অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অবলম্বন করা, কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভীষ্মের ন্যায়, দ্রোণাচার্য্যের দুর্য্যোধনের পাপ-অন্ন ভোজন করিয়া, এতকাল তাহার জঘন্য কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া, কদাচ উচিৎ হয় নাই এবং এই বাধ্য-বাধকতা প্রযুক্ত অন্যায় পক্ষে যোগদান করাও সঙ্গত হয় নাই।

আর এক কথা, একলব্যের অপূর্ব্ব গুরুনিষ্ঠার সুযোগ লইয়া যদি

আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া, ক্ষুরধার চক্র উদ্‌ভ্রামণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদভরে ধরা কম্পিত করতঃ ভীষ্মকে বধ করিতে ধাবিত হইলেন। তখন ভীষ্ম তাঁহার স্তব করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ রোষভরে বলিতে লাগিলেন,— 'হে ভীষ্ম, তুমিই এই মহাক্ষয়ের মূলীভূত কারণ; তোমার নিমিত্তই আজ দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুতনয়, দ্যূতাসক্ত নৃপতিকে নিবারণ করাই ধর্ম্মপথাবলম্বী মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি রাজা কালবিপাক-বশতঃ ঐ উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিৎ।"

ভীষ্মপর্ব্ব—৫৯ম অধ্যায়

তাহার ধনুর্বিদ্যা খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে, গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাহার অঙ্গুষ্ঠ-ছেদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার অতিবড় নীচাশয়তা ও নৃশংসতার পরিচায়ক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তিনি এতাদৃশ নীচ ও ক্রূর প্রকৃতির লোক ছিলেন না ; এ কারণ অনুমান হয়, তমোভাবাপন্ন শূদ্র একলব্যের, 'ওজনের' অতিরিক্ত শক্তি সংহরণ উদ্দেশ্যেই, তাহার প্রকৃত কল্যাণকামী হইয়াই বাহ্যিক এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

কর্ণ—অর্জ্জুনের প্রায় সমতুল্য বীর এবং নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও অক্ষয়-কবচ-দান ও অতিথি প্রীত্যর্থে নিজ পুত্রকে পর্য্যন্ত হাসি মুখে বলিদান, তাহার নিরুপম বদান্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন। তাহা হইলেও তাঁহার চরিত্রে অনেককিছু ত্রুটি, বিচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি দুর্য্যোধনকে সকল সময়ে পাণ্ডবদিগের প্রতি অযথা অত্যাচারের প্ররোচনা দিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং তাহাতে অগ্রণীও হইয়াছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ কালে বীরোচিত প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, দ্রৌপদীকে এই সুযোগে বেশ একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া এবং বিপন্ন পাণ্ডবদিগের প্রতিও অতীব মর্ম্মান্তিক কটু বাক্য বলিয়া যথেষ্ট নীচাশয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অভিমন্যুকে যে-সপ্তরথীতে ঘেরিয়া অন্যায় যুদ্ধে নিধন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কর্ণ অন্যতম। তিনি গুরু পরশুরামের নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিয়া অস্ত্র শিক্ষা করেন এবং এজন্য তাঁহার অভিসম্পাতও ভোগ করেন। বলা বাহুল্য ইহার কোনটিও আদর্শ পুরুষের উপযুক্ত নহে।

যুধিষ্ঠির—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অমানুষিক ধৈর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি অশেষ গুণালঙ্কৃত হইলেও, ক্ষত্রিয়ের যেটি প্রধান গুণ—যুদ্ধে বীরত্ব, পূর্ব্বোক্তদিগের অপেক্ষা তাহাতে তাঁহার অনেক ন্যূনতা পরিদৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া, যাহা লইয়া তাঁহার এত গৌরব, সেই নিরুপম

ধর্ম্মনিষ্ঠা হইতেও,—"অশ্বত্থামা হত (ইতি গজঃ)", ঘটনায় তাঁহার বিশেষরূপই বিচ্যুতি ঘটে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে।—ইহাতে তাঁহার যুগপৎ মিথ্যাভাষণ, বিশ্বাসঘাতকতা ও গুরুদ্রোহিতারূপ অতীব গর্হিত আচরণই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এজন্য তাঁহার নরকদর্শনও ঘটিয়াছিল। ইহা যে তাঁহার মত আদর্শ মহাপুরুষের পক্ষে এক অতীব গুরুতর বিচ্যুতি, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তারপর, অক্ষক্রীড়াতে রত থাকাইতো অতীব দোষাবহ, তাহার উপর, উহা তৎকালীন-প্রচলিত প্রথা হইলেও, উহাতে এতদূর আবিষ্ট যে মোহবশে নিজ সহধর্মিনী দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া বসিলেন! উহা কদাচিৎ সাধুজনোচিত আচরণ নহে—পরন্তু মূঢ়তা। বিশেষতঃ, দ্রৌপদী যখন তাঁহার একার স্ত্রী নহেন, তখন তাঁহাকে ঐভাবে পণ রাখা কদাচ সমর্থন যোগ্য নহে।

কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণকর্ত্তৃক পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধারণের অযোগ্য বলিয়া রোষভরে অযথা কাপুরুষোচিত তীব্র ভৎসনা করাও অতীব অন্যায় কার্য্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ, ঐরূপ নিন্দাকারীর প্রাণ সংহার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্জ্জুনকে এভাবে বিপন্ন করা কিরূপ গুরুতর গর্হিত কার্য্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভীম—মহাবীর ভীমসেন বাহ্যতঃ রুক্ষভাব ধারণ করিলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তিমন্দাকিনী চিরপ্রবাহিত। বাহুবলেও তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। কিন্তু রণনৈপুণ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও অর্জ্জুন অপেক্ষা তিনি অনেক ন্যূন ছিলেন। অধিকন্তু, তাঁহার ইন্দ্রিয় যথাযথ সংযত না থাকায়, সময়ে সময় একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, ক্রোধবশে অনেক অবাচ্য-বচন বলিয়া ফেলিতেন এবং অনেক গর্হিত আচরণও করিয়া ফেলিতেন। এমন কি তখন তাঁহার পরম শ্রদ্ধাভাজন

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না! তবে তিনি স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, সরল, শরণাগতপালক, পরোপকারী ও জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুবর্ত্তী ছিলেন।

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ কালে কৌরবদের গূঢ় উদ্দেশ্যই ছিল, ছলে-বলে-কৌশলে, পাণ্ডবদিগকে তীব্রতর অপমান করতঃ ক্রোধান্ধ করিয়া তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া, রাজসূয় যজ্ঞের দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লওয়া। শত্রুদের এই দূরভিসন্ধি ভীমের ক্রোধোন্মত্ততা-প্রযুক্ত সুসিদ্ধই হইয়াছিল। অধিকন্তু ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া অতীব গর্হিত প্রতিজ্ঞা করায়, অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিলেন!

ভীমসেন বাল্যকাল হইতেই কৌরবদের, বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের প্রতি, অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতেন। খেলিবার সময় এবং স্নানাদির সময় তাঁহাদিগকে 'অতিষ্ঠ' করিয়া তুলিতেন। একারণ তখন হইতেই তাহাদের হৃদয়ে পাণ্ডবদের প্রতি বৈরীভাব ও ঈর্ষানল স্বভাবতঃই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। ইহার বিষময় ফল পাণ্ডবদিগকেও আজীবন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ময়দানব-নির্ম্মিত বিচিত্র সভাগৃহে দুর্য্যোধনের জলকে স্থল এবং স্থলকে জল ভ্রম হওয়ায়, তাঁহাকে ঐরূপ উৎকট ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া সকলের সমক্ষে, এতাদৃশ লাঞ্ছিত ও হতমান করা, ভীমসেনের পক্ষে অতীব গর্হিত কার্য্যই হইয়াছিল। ইহারই ফলে ছল-দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের এতদূর জঘন্য লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইয়াছিল।

'অশ্বত্থামা হত (ইতি গজঃ)' ঘটনায় ভীমসেন আচার্য্যদেব দ্রোণকে অম্লানবদনে মিথ্যা বলিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও বলিবার জন্য প্ররোচিত করিলেন। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ জানিয়া-শুনিয়াও, পঞ্চপুত্র-হন্তা অশ্বত্থামাকে বধ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে বারম্বার প্রোৎসাহিত করিলেন। অন্যায়-সমরে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া, মুমূর্ষু অবস্থায়,

তাঁহার মস্তকে বারম্বার নির্ম্মম পদাঘাত করিলেন! এই সকল অতীব নৃশংস কার্য্যই তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ সকল কারণে তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণ থাকিলেও, তাঁহাকে কদাচ আদর্শ পুরুষ মধ্যে গণ্য করা সঙ্গত নহে।

অর্জ্জুন—শৌর্য্যে, বীর্য্যে অর্জ্জুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কয়েকটী ঘটনাতে অতীব সুস্পষ্ট। তিনি স্বয়ং শূলপানি মহাদেবকে সম্মুখ সমরে সন্তুষ্ট করিয়া অত্যদ্ভুত, দেবতারও সুদুর্ল্লভ, অমোঘবীর্য্য পাশুপতঅস্ত্র লাভ করেন। অমরালয়ে দেবরাজের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দিব্যাস্ত্র সমুদয় লাভ করেন এবং ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে দেবতারও অবধ্য নিবাতকবচ নামক অতিবড় দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যগণকে বিনাশ করেন। বিরাট-নগরে অবস্থিতিকালে, কৌরবকর্ত্তৃক গোধন অপহৃত হইলে, তিনি একাই, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণপ্রমুখ সমগ্র কৌরবসেনাকে পরাজয় ও সম্মোহন-অস্ত্রে মোহিত করিয়া তাঁহাদের গাত্রবসন ও শিরস্ত্রানাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কাহারও প্রতি কোন প্রকার অস্ত্রাঘাত করেন নাই বলাই বাহুল্য। আবার দ্বৈতবনে নিজ ঔদার্য্যাদিগুণে, চিত্রসেন-গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক-আবদ্ধ, চিরশত্রু কর্ণ, দুর্য্যোধনাদির উদ্ধার সাধন করেন;—এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ উপস্থিত ছিলেন না। এই কয়টি ঘটনা হইতেই তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যাদির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব যথেষ্ট প্রতিপাদন হয়।*

ইহা ছাড়া আর একটি ঘটনায় তিনি যে কোন্ স্তরের বীর তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা হয়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্‌কালে দুর্য্যোধনের প্রশ্নে ভীষ্মদেব বলেন, তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া এক মাসে কুরুক্ষেত্রে, সমবেত বিপক্ষের সমগ্র সৈন্যকে সংহার করিতে সমর্থ। আচার্য্য দ্রোণও ঐরূপই বলিলেন। পরে পাণ্ডব শিবিরে ঐ প্রসঙ্গ

* এতবড় শক্তির আধার হইয়াও, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অমর্য্যাদা হইবার ভয়ে ধর্ম্মভীরু অর্জ্জুন কিরূপ ধীর, স্থির, সংযত!

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রসন্ন বদনে, অর্জ্জুন বলিলেন, '...আমি এক্ষণে সত্য বলিতেছি বাসুদেবের সাহায্যে আমি এক মাত্র রথে আরোহণ করিয়া, নিমেষমধ্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-ত্রিলোক ও ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমুদয় বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। ...শূলপাণি প্রদত্ত সর্ব্বসংহারক পাশুপত-অস্ত্র প্রয়োগ, কর্ণের কথা দূরে থাকুক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামাও তাহা জ্ঞাত নহেন। হে মহারাজ, দিব্য-অস্ত্র দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনাশ করা বিধেয় নহে; সুতরাং আর্জ্জব যুদ্ধ দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিব।' —এই খানেই তাঁহার অপূর্ব্ব মহত্ব ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে, ভীষ্মই আদর্শ পুরুষ বলিয়া সাধারণে চিরপ্রসিদ্ধি, তাঁহার পরিবর্ত্তে অর্জ্জুনকে আদর্শ বলিবার হেতু কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, ভীষ্মদেবকে যে আদর্শ-পুরুষ বলা হয় তাহার প্রধান কারণ, তিনি অসাধারণ জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া প্রখ্যাত; এমন অপর একটি দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অর্জ্জুন কি কোন অংশে তাঁহা হইতে কম জিতেন্দ্রিয়, বা কম সত্যপ্রতিজ্ঞ? তাঁহার কখন কোথাও অজিতেন্দ্রিয়তা ঘটিয়াছে, বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? যিনি ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র নহেন, পরন্তু ইন্দ্রিয়গুলিই যাঁহার সম্পূর্ণ অধীন, তিনিই জিতেন্দ্রিয়। অতএব স্ত্রীসঙ্গ না করিলেই যে কেহ জিতেন্দ্রিয়, নতুবা অজিতেন্দ্রিয়, এমন নহে। যদি তাই হইত তবে, লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসী, যাঁহারা জীবনে কখনও স্ত্রীসঙ্গ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই জিতেন্দ্রিয় হইতেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে কদাচ, কেহ (কোটিতে গোটিক,) প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন,—

"বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।" গীতা—২।৫৯

'নিরাহারীজনের ইন্দ্রিয় বিষয়-নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৃষ্ণা থাকিয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ পরামাত্মার দর্শন লাভ করেন বলিয়া ইঁহার বিষয়-তৃষ্ণা পর্য্যন্ত থাকে না।'

অনেক প্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত অনেকের হয়ত স্ত্রীসঙ্গ হয় নাই, আবার অনেকে বা আকুমার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা সকলেই জিতকাম হইয়াছেন, তাহা কদাপি নহে।

অপর পক্ষে, পরাশর মুনি মৎস্যগন্ধাকে এবং বেদব্যাস, মাতৃ-আজ্ঞায় ভ্রাতৃবধূতে উপগত হইলেও, তাঁহাদের জিতেন্দ্রিয়তার কোন হানি হয় নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কোটি-কোটি ব্রজাঙ্গনাসহ রাসবিহারাদি করিলেও এবং তাঁহার ষোড়শসহস্র মহিষী থাকা সত্ত্বেও, তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। গোপালতাপিনী শ্রুতিতে আছে—

গোপীগণ যখন দুর্ব্বাসামুনির জন্য যমুনার অপরপারে আহার্য্য লইয়া যাইতেছেন, তখন যমুনা-পারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন,—"যমুনা সন্নিধানে যাইয়া বলিবে,—'শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রহ্মচারী হন, তাহা হইলে আমাদিগকে পথ দাও॥' "—এই কথা শুনিয়া গোপীরা বিদ্রূপ করিলেও, তাঁহার নির্দ্দেশ মত গোপীগণ তাহা বলিতেই, যমুনা দুফাল হইয়া গোপীদিগকে পথ দিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের ব্যাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিলেন।

অর্জ্জুন স্ত্রীসঙ্গ করিলেও ভীষ্ম অপেক্ষা কোন অংশে যে কম জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তাহার কুত্রাপি প্রমাণ নাই। পরন্তু, ঘোর নিশীথে শয়নকক্ষে সমাগতা রতিপ্রার্থিনী নিরুপমা সুন্দরী, স্বর্গের অপ্সরা, উর্ব্বশী-প্রত্যাখ্যানাদি বহু ক্ষেত্রেই তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভীষ্মের নিকট এরূপ কঠোর পরীক্ষার উদ্ভব কখন হয় নাই, হইলে কি ঘটিত নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পরন্তু চিরকুমার ব্রত-ধারণ করায় ভীষ্মের বাৎসল্য ও মধুর-রসের স্ফূর্ত্তি হয় নাই,—হইলে তাহার

কিরূপ অভিব্যক্তি হইত তাহা কাহার পরিজ্ঞাত নহে, একারণ তিনি এ বিষয়ে আদর্শ-স্থানীয় নহেন।

আবার দেখিতে পাই, সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন অনেক ক্ষেত্রে অতীব কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া পরিশেষে তাহা পালনে অসমর্থ হইবার উপক্রম হইলেই, যাঁহার ভরসায় অসাধ্য-সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া ছিলেন, সেই প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ সেই সঙ্কট কালে আবির্ভূত হইয়া, তাহার অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া, শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের প্রতিজ্ঞা-বাক্য রক্ষা করতঃ, জগতে ভক্তবাৎসল্যের নিরুপম নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

একদা জনৈক দ্বারকাবাসী ব্রাহ্মণের উপর্য্যুপরি নয়টি সন্তান, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, দশম পুত্রটি মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে 'জগৎপতিরও দুষ্কর' প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহাতে অসমর্থ হওয়ায়, যোগ-প্রভাবে স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল, যমালয় প্রভৃতি সর্ব্বত্র খোজ করিয়া কুত্রাপি ঐ পুত্রের সন্ধান না পাইয়া, অগ্নি-প্রবেশে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য বদনে তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং সখাসহ ঘনঘোর-অন্ধকার ভেদ করিয়া, পরপারগত, পরম জ্যোতির্ম্ময় ধামে গমন করিয়া, পরমেষ্টিপতি ভূমা-পুরুষ অনন্তদেবের নিকট হইতে ঐ বিপ্রের দশটি পুত্রই আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। এই সকল অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া-শুনিয়া অর্জ্জুন আশ্চর্য্য সহকারে বলিলেন,—"পুরুষের নিখিল পুরুষকারই শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ"।—এই সময় ঐ ভূমাপুরুষ,—'তোমরা নর-নারায়ণ; ধর্ম্ম রক্ষার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ', এই বলিয়া সম্বোধন করায়, কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুন যে সাধারণ-মানব-পর্য্যায়ভুক্ত নহেন, তাহাই সুস্পষ্টরূপে জগতে ঘোষিত হইল। আবার জয়দ্রথ-বধ ব্যাপারেও মহাযোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যোগপ্রভাবে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া, তিনি যে কিরূপ শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। অতএব, জিতেন্দ্রিয়তায় ও সত্যপ্রতিজ্ঞতায়, অর্জ্জুন কদাপি ভীষ্ম হইতে ন্যূন

নহেন। এতদ্ব্যতীত শৌর্য্য-বীর্য্যাদি-গুণে তিনি যে ভীষ্ম অপেক্ষা শ্রে তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

যথাশাস্ত্র ঋতুরক্ষার্থে স্ত্রীগমনে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না,—"ঋতুগমন ব্রহ্মচর্য্যং।" অর্জ্জুন যে যথার্থই আজীবন ব্রহ্মচারী ও সত্যব্রতপরায় ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহাভারতকারের বর্ণিত নিম্নের ঘটনা সুস্পষ্ট—

"পঞ্চ-পুত্র-হন্তা অশ্বত্থামা প্রাণভয়ে অর্জ্জুনের প্রতি দুর্ব্বার ব্রহ্মশির-অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানু-সারে উহা নিরাকৃত করিবার জন্য তিনিও ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাহাতে প্রলয়ঙ্করী ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্রম হইলে, নারদ ও ব্যাসদেবের অনুরোধে অর্জ্জুন অতীব বিনয় সহকারে তৎক্ষণাৎ ঐ দিব্য-অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা নির্মিত—ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতি-সংহারে চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয়, 'সত্যব্রতপরায়ণ ব্রহ্মচারী' ও 'গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ' ছিলেন বলিয়াই সে অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।"

মহাঃ—শৌপ্তিক, ১৫ অঃ

তিনি যে কিরূপ আর্ত্তবন্ধু ও সত্যনিষ্ঠ তাহা নিম্নের ঘটনাটিতে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে—

একদা দৈবযোগে দস্যুগণ-কর্ত্তৃক কোন ব্রাহ্মণের গোধন অপহৃত হয়। ঐ বিপন্ন ব্রাহ্মণ গোধন রক্ষায় অসমর্থ হইয়া অর্জ্জুনের সাহায্য-প্রার্থী হইলে, নিয়মবিরুদ্ধ, এবং দ্বাদশ বৎসর বনবাস ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে জানিয়াও, অর্জ্জুন, দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরের নিভৃত অবস্থিতি কালে, নিরুপায় হইয়া ব্রতভঙ্গ করতঃ, ঐ নিভৃত কক্ষপথে

অস্ত্রাগারে গমন করেন। ছোট ভায়ের তাহাতে কোন দোষ নাই, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ নানা যুক্তি উত্থাপন করিলেও তাহা অনাদর করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থিত অভিসন্ধিকেই বড়জ্ঞানে সত্যপালানার্থ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বনবাসে গমন করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন,—"মহারাজ আপনি বলিয়াছেন ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। আপনি স্নেহবশতঃ আমাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। সত্য রক্ষা সম্বন্ধে প্রকারান্তর করাও অসত্য, এজন্য অধর্ম্ম।" মহাঃ—আদি, ২১৩ অঃ

তারপর, দেবতারও একান্ত দুর্ল্লভ এতাদৃশ অশেষ সৎগুণে বিভূষিত হইয়াও গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন কিরূপ নিরুপম বিনয়ের আধার, এবং ঐ সমুদয় গুণের মূল উৎস হইয়াও, কিরূপ অপূর্ব্ব তাঁর ভগবদ্‌নিষ্ঠা, কুরুক্ষেত্র-সমরে সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তিনি যখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সমাগত হন, তখন তাহা চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে।— উভয়পক্ষ হইতে অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন, একই দিনে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত। দম্ভের প্রকট-মূর্ত্তি দুর্য্যোধন শয়ন-কক্ষে অগ্রে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন! ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ সসম্ভ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক, বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতল সমীপে সমাসীন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইয়া স্বভাবতঃ চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে অর্জ্জুনকে দর্শন করলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন অগ্রে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, উভয়কেই সাহায্য করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। তখন, এক পক্ষে অস্ত্রধারণে-পরাঙ্মুখ একা শ্রীকৃষ্ণ, এবং অপরপক্ষে অতিবড় দুর্দ্ধর্ষ এক-অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা,—ইহা জ্ঞাত হইয়া, অর্জ্জুন হৃষ্টচিত্তে নিজপক্ষে নিরস্ত্র একা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াই পরম কৃতার্থ হইলেন। এদিকে আবার মদগর্ব্বিত, মোহাচ্ছন্ন দুর্য্যোধন ক্ষাত্র-বলের-প্রতীক ঐ নারায়ণী সেনা পাইয়া, এবং কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিবেন না জানিয়া, পরম

উল্লাসভরে নিজ পক্ষের জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রতিগমন করি... এই সামান্য ঘটনাটি হইতেই অর্জ্জুনের কিরূপ অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও প্র... ভগবৎ-অনুরাগ তাহা অতি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া স্বয়ং ভগ... শ্রীকৃষ্ণ অশ্বের রশ্মি ধারণ করতঃ সারথীর কার্য্যে ব্রতী হইয়া, যাঁহা... নির্দ্দেশানুসারে অশ্ব পরিচালন করেন, এবং যাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বো... করিতে শ্রীভগবানও শ্লাঘা জ্ঞান করেন, সেই পার্থের সহিত কাহা... তুলনা! শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন যে গাণ্ডীব-ধার... অসমর্থ, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে;—'নর'রূপে অর্জ্জুন যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান 'নারায়ণ' শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিচ্ছবি!

দুর্য্যোধন চরিত্র

(১৫) প্রশ্ন :—গিরিমহারাজ লিখিত "দুর্য্যোধন চরিত্র" প্রবন্ধে- 'মহাভারতে মহারাজ দুর্য্যোধনের চরিত্রের উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয়। এবং 'অসৎকে (পাণ্ডবগণকে) সমুচিত শিক্ষাদান রাজা (দুর্য্যোধনের) কর্ত্তব্য।'—এই উক্তিগুলি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি?

উত্তর :—গত ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'মন্দিরে' দুর্য্যোধনের চরিত্র বিশ্লেষণে, পূজ্যপাদ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিমহারাজ 'মন্দিরে' প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দুটি পাঠ করিয়া, লেখনী ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহ সহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম; কিন্তু পাঠ করিয়া আশানুরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। অদোষদর্শী, পরমহংস-স্বভাব-সম্পন্ন গিরি-মহারাজজীর পক্ষে কাহারও দোষাংশ বাদ দিয়া কেবল গুণাংশ গ্রহণ করা কিছু বিচিত্র না হইলেও, উহা লৌকিক জগতে অনুকরণ যোগ্য বলিয়া গ্রহণ

করিলে মহাভ্রমে পতিত হইতে হইবে এবং তাহাতে বহু উৎপাতের সৃষ্টি হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা রহিয়াছে। আদর্শের উপরেই জাতির ভাবী কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করে; এ কারণ জাতীয়-আদর্শকে কদাচিৎ খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাওয়া সমীচীন নহে। ঋষি-প্রদর্শিত আদর্শকে ধরিয়াই এজাতি এত বড়-বড় ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে আজও হিমালয়ের ন্যায় অটল-অচল হইয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া, বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। আদর্শ বিলুপ্ত হইলে জাতির জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যও বিলুপ্ত হইয়া যায়; একারণ দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই এদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

মহারাজজীর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক, তাঁহার প্রবন্ধের যথাজ্ঞান আলোচনা করিব,—ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন,—"মহাভারতে মহারাজ দুর্য্যোধনের চরিত্রের উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয়।" এবং উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"অসৎকে (পাণ্ডবগণকে) সমুচিৎ শিক্ষাদান রাজার কর্ত্তব্য।"—একথাগুলি বলার তাৎপর্য্য কি সম্যক অনুধাবন করিতে পারিলাম না। যে দুর্য্যোধনের নামের সহিত 'দুরাত্মা' এই বিশেষণটি,—যুধিষ্ঠির নামের সহিত 'ধর্ম্মরাজ' বিশেষণটির ন্যায়,—নিত্যযুক্তরূপে পরিদৃষ্ট হয়, সেই দুর্য্যোধন চরিত্রেরই যদি উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কাহার চরিত্রে যে অপকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা সমগ্র মহাভারতের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে কি?

স্বয়ং মহাভারতকার বেদব্যাস, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ মহানুভবগণ পদে-পদে যাহাকে 'দুরাত্মা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এমন কি পুত্রস্নেহে একান্তমুগ্ধ ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বহুস্থানে, বহুবার, যাঁহাকে 'দুরাত্মা' বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; সত্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে কতবার 'দুরাত্মা' বলিয়াছেন; এমন কি যাঁহার একান্ত প্রিয়চিকীর্ষু বলরাম, যাঁহার নৃশংস, পৈশাচিক

দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া যাঁহাকে 'দুরাত্মা' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; ব্যাসদেব, নারদ, কণ্ব, মৈত্রেয়, পরশুরাম প্রভৃতি মুনি-ঋষিগণও এক বাক্যে যাঁহার কুৎসিৎ আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের হিতবাণী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভরে "প্রলাপ-বাক্য" বলিয়া উপহাস করায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রোষভরে অভিসম্পাতও করিয়াছেন;— সেই অসুর-প্রকৃতি দুর্য্যোধনের চরিত্রে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে যাওয়া কোনমতেই সমীচীন কি?

কালকূট বিষও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যথাযথ অনুপানসহ প্রযুক্ত হইলেও, বিষ—বিষই; তাহাকে কুত্রাপি অমৃতপর্য্যায় ভুক্ত করা যে বিষম দুঃসাহসের কার্য্য, তাহা বলাই বাহুল্য;—তাহাতে অনেক অসন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা। তদ্রূপ ঐ জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন কদাচারী ব্যক্তির, কোন অংশে উৎকর্ষ বর্ত্তমান থাকিলেও, এভাবে তাঁহার গুণের স্তুতি করিলে, তাঁহাকে আদর্শজ্ঞানে সরলচিত্ত জনসাধারণের, তাঁহার সমগ্র আচরণ অনুকরণের স্পৃহা জাগ্রত হওয়া, ও তদ্দ্বারা অনর্থের সৃষ্টি করা, কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

মানুষ মাত্রই দোষ-গুণে পূর্ণ; বিশেষতঃ, যিনি বিখ্যাত কুরুবংশের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে সমারূঢ় থাকিয়া প্রজারঞ্জন করতঃ সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ এবং সুপ্রসিদ্ধ রাজন্যবর্গের সহিত সদ্ভাব রক্ষা এবং অমাত্য, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন,—এমন কি মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকেও, নিজ আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং যিনি একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য সংগ্রহ ও তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ, তাঁহাতে যে ভগবানের বিশেষ কিছু বিভূতির প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণ সকলেই অশেষ গুণে অলঙ্কৃত থাকিলেও, তাঁহারা, অসুর বা রাক্ষস-স্বভাব-প্রযুক্ত, কুত্রাপি অনুকরণীয় আদর্শ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন নাই এবং ভগবৎ-দ্বেষী বলিয়া,

সাধারণের চক্ষে চিরদিন হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন আছেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ অসুর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন,—

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥" গীতা—১৬।৪

আদর্শ ক্ষত্রিয়ের, যথাযথ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াও এই সকল আসুরিক গুণ হইতে বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। বিনয়ের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণসখা গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল; একারণ অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া ভগবান তদ্দণ্ডেই বলিলেন, —

"দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোসি পাণ্ডব॥" গীতা—১৬।৫

শ্রীগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে, দৈব সম্পদ পর্য্যায়ে, যে সকল গুণের উল্লেখ আছে সে সমুদয়ই কেমন অর্জ্জুনে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং দুর্য্যোধনে প্রত্যেক আসুরী সম্পদটী কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ধীর চিত্তে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে পুলকিত হইতে হয়।

অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিদের উৎসাহ-উদ্যম, শৌর্য্য-বীর্য্য, চিরদিনই প্রশংসনীয়; তাঁহারা মন্ত্রবলে ও তপোবলে দৃঢ় আস্থাবান; কঠোর তপশ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট করিয়া অভীষ্ট বর গ্রহণে সমর্থ এবং শৌর্য্যে-বীর্য্যে দেবতাদেরও ত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকেন; তবে কেবল স্বভাবের দোষে তাঁহাদের একটি গুরুতর অমার্জ্জনীয় ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়,—তাঁহারা ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করিতে রাজী নহেন,—এই "বিশ মোল্লায় গলদ" (যাহা ইহ-সর্ব্বস্ব আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত,) থাকায়, তাঁহাদের চরম-পরিণাম অতীব ভয়াবহ ও শোচনীয়। দুর্য্যোধন সুস্পষ্টই এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন,—"বিশাললোচন কৃষ্ণ যে ত্রিভুবনের পূজ্য, তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু যখন তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে উপস্থিত যুদ্ধ শান্ত হইবে না, তখন তাঁহাকে পূজা করা আমার মতে

রীতিবহির্ভূত কার্য্য।" (উদ্যোগ, ৮৭ অঃ)—ইহাই অসুর প্রকৃতি লোকের বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির, বা ঐশীশক্তির প্রভাবে বা দৈববলে, আস্থাশূন্য এবং পুরুষকারে একান্ত নির্ভরশীল। দৈববাণী হইল, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান কর্ত্তৃক কংস বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অমনি তিনি ঐ অলঙ্ঘনীয় বাণী খণ্ডন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবকীর শিরচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। তৎপরে বসুদেবের আশ্বাসবাক্যে তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া, তাঁহার সদ্যজাত পুত্রগুলি হত্যা করিয়াও যখন তাহাতে সফল মনোরথ হইলেন না, তখন শিশু-মাত্রই হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন! হিরণ্যকশিপুও অমর-বর না পাইয়া, (—অনর্থের আশঙ্কায় অসুরদিগকে অমর-বর দিতে নিষেধ।) নিজ-বুদ্ধি বলে যথাসাধ্য চাতুর্য্য দেখাইয়া, কৌশলে অমর-বর পাইলেন, যাহাতে তাঁহার হিসাব মত তাঁহার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব; কিন্তু ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি যে তাঁহার প্রাকৃত জ্ঞানের বহির্ভূত, তাহা তাঁহার ধারণার অতীত! দুর্য্যোধনও ভগবৎপ্রসন্নতায় সকল অভীষ্ট যে সিদ্ধ হইতে পারে তাহা ধারনাই করিতে অক্ষম, সেজন্য তাঁহার হিতবাণী সকল এভাবে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন! আবার দেখি, তিনি পশুবলে এত আস্থাবান যে, যখন শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিবেন না, তখন তাঁহাকে না পাইয়া কিছুমাত্র দুঃখিত তো হইলেনই না; বরং তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রদত্ত এক অর্ব্বুদ দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণী সেনা পাইয়া পরম-উল্লাসভরে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন! ইহাই অসুর স্বভাবের মূঢ়তা। আর অর্জ্জুনকে কি দেখি,—তিনি পশুবলের দিকে একবারও দৃষ্টি না করিয়া; শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র জানিয়াও, শুধু তিনি তাঁহাদের পক্ষে থাকিবেন জানিয়াই, পরম পরিতৃপ্ত ও একেবারে নিশ্চিন্ত। অসুর প্রকৃতির স্বভাব এই যে, তাঁহারা যাঁহার বলে বলীয়ান, সেই শ্রীভগবানেও প্রপন্ন হইতে একান্ত নারাজ! আবার, স্থলবিশেষে, যাঁহার প্রসন্নতায় সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটিল, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তাঁহারও

সর্ব্বনাশ করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন না! মহাদেব প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাব পরীক্ষার জন্য বৃকাসুর, তাঁহারই মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া তাঁহাকে ভস্ম করিতে উদ্যত! এখানেও দেখি নিজ কার্য্য সাধনের অন্তরায় ভাবিয়া দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে 'ত্রিভুবন পূজ্য', জানিয়াও পশুবল দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতে উদ্যত! এইরূপ প্রকৃতির মনুষ্যকে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলিতে হয়—

"সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন।" চৈঃ চঃ—১।৮

এইরূপ দুর্ব্বিনীত স্বভাবের হেতু, ভগবান শ্রীগীতায় সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" গীঃ—৭।১৫

'পাপপরায়ণ, মূঢ় নরাধমগণ মায়া দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া অসুরস্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজনা করে না।' ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ও বলী—দানব; বিভীষণ—রাক্ষস; এবং পিঙ্গলা—বেশ্যা হইলেও, ইহারা সকলেই ভগবৎচরণে একান্ত শরণাগত হওয়ায়, ইহাদের কথা স্বতন্ত্র। ইহারা পরম ভাগবত, ও পূজ্য বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন —

"মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥" গীঃ—৯।৩২

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥" গীতা—৯।৩০

দুর্য্যোধনের দানবের অংশে,—অধিনায়করূপে; এবং তাঁহার ভ্রাতাদের যে রাক্ষসাংশে জন্ম তাহাতো মহাভারতে স্পষ্টই বর্ণিত আছে; (স্বর্গ—৫অঃ) আর পাণ্ডবদের যে দেবাংশে জন্ম ইহা সর্ব্বজনবিদিত, অতএব ইহা আদি-মধ্য-অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবাসুরেরই সংগ্রাম মাত্র। বনপর্ব্বে দেখি পাতালবাসী দৈত্যগণ বলিতেছেন,—

"মহারাজ, আমরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া মহেশ্বর-প্রসাদে আপনাকে লাভ করিয়াছি।...কেবল আপনার সহায়তা করিবার নিমিত্তই দানবেরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।...পাণ্ডবেরা যেমন দেবগণের, তদ্রূপ আপনি আমাদের একমাত্র গতি।" (বন—২৪৮, ২৪৯অঃ)

এইবার আমরা দুর্য্যোধনের কয়েকটি আচরণ,—যে সম্বন্ধে মহারাজজী উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব—

(১) হস্তিনার সিংহাসনের দাবী লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, মহাভারতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে মহাভারতকার ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, প্রভৃতির মধ্যে কেহই, কোন দিন, পাণ্ডবগণের ঐ সিংহাসনে অধিকার নাই তাহা বলেন নাই; পরন্তু, উহাতে উঁহাদের অধিকতর দাবী আছে এই ভাবই সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। এমতং অবস্থায় দুর্য্যোধনের দাবীই সঙ্গত ইহা সপ্রমাণের জন্য এত কষ্ট-কল্পনা কেন? যাহা হউক, যখন প্রশ্ন উঠিয়াছে তখন একটু আলোচনা প্রয়োজন।

গর্ভবতী-অবস্থায় গান্ধারী শুনিলেন কুন্তীর সুন্দর এক পুত্র হইয়াছে, তাহাতে সাতিশয় ঈর্ষান্বিত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আপনার গর্ভপাত করিলেন ও এক মাংসপেশী প্রসব করিলে, উহা হইতেই ব্যাসদেবের প্রসাদে, দুই বৎসর অতীত হইলে, একশত পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি করিতে লাগিল এবং অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ও গুণবান, অতএব এরাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য, আমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্য পাইবে কি না?" তাঁহারা সকলে একবাক্যে কহিলেন,—"এই পুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল;

অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে এই 'দুরাত্মা' হইতে কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য,—রাখিলে মহান অনর্থ ঘটিবে।" (আদি—১১৫ অঃ)

তারপর জতুগৃহ দাহান্তে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পর, পাণ্ডবদিগের আত্মপ্রকাশ হইলে, তাঁহাদিগকে হস্তিনায় আনয়ন করিবার প্রস্তাবে চিরসত্যবাদী, মহাত্মা ভীষ্ম কহিলেন,—"বৎস দুর্য্যোধন, তুমি যেমন মনে করিয়াছ, ইহা তোমার পৈত্রিক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি মহাযশা পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে।...অতএব যদি ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়...তবে পাণ্ডব দিগকে অৰ্দ্ধ-রাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।" (আদি—২০৩ অঃ)

তদন্তর, দ্রোণাচার্য্য ও বিদুর তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—"মৎপুত্রগণ্ যেমন এরাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী ইহাতে সংশয় কি? বিদুর! যাও, সৎকার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে আনয়ন কর।"

(আদি—২০৬ অঃ)

পাণ্ডবেরা হস্তিনায় আগমন করিলে, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,— "তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করতঃ খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর।"

(আদি—২০৭ অঃ)

তারপর, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে, সন্ধি-প্রস্তাব-কালে ভূপতিগণ সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন,—"হে পুত্র, হীনাঙ্গ হইলে রাজ্য লাভ করিতে পারে না বলিয়া মতিমান পাণ্ডু, কনিষ্ঠ হইয়াও আমার প্রাপ্য রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণই এই রাজ্যের যথার্থ অধিকারী। হে দুর্য্যোধন, যখন আমি রাজ্য প্রাপ্ত হই নাই, তখন তুমি কি বলিয়া রাজ্য গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছ। তুমি রাজপুত্র বা রাজা নও, এক্ষণে এই রাজ্য গ্রহণে

অভিলাষী হইয়া পরস্ব-হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ।”—ইহার উপর টিপ্পনি অনাবশ্যক।

(উদ্যোগ—১২৭ অঃ)

আর এক কথা, পাণ্ডু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, তাহা বলা অনুচিত, কারণ সস্ত্রীক এভাবে (আদি—১১৯ অঃ) কখন সন্ন্যাস গ্রহণ হয় না এবং তিনি কোনদিনই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখলের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য দান করেন নাই ; এমত অবস্থায় পাণ্ডব দিগের “দত্তাপহারিত্ব” কিরূপে ঘটিল বুঝিলাম না। তাহা ছাড়া দুর্য্যোধনের জন্মের সময়, বা পরে কোন দিনই, কেহই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান নাই। কুরুবংশের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠরই সিংহাসন প্রাপ্য যদি এই রীতিই হয়, তাহা হইলেও, যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া, রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য।

যাহা হউক হস্তিনার সিংহাসন-দাবীর কূট-তর্কের আলোচনায় এক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রয়োজনই দেখি না, যে হেতু পরিশেষে তো একপ্রকার সুমীমাংসাই হইয়া গেল এবং উভয়পক্ষ সম্মত হইয়া,—কৌরবরা হস্তিনায় এবং পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে,—রাজধানী স্থাপন করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হস্তিনার সিংহাসনের দাবী লইয়াও কুরুক্ষেত্র সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় নাই ; বিশেষতঃ, পাণ্ডবেরা যখন পাঁচ খানি গ্রাম লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মত ছিলেন,তখন তো আর কোন বিবাদই রহিল না। এই ভীষণ যুদ্ধ ময়দানব-নির্ম্মিত সভাগৃহে দুর্য্যোধনের অপমানের প্রতিশোধেরই (যুধিষ্ঠির এই অপমানসূচক আচরণের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন) চরম পরিণাম মাত্র। ঐ অপমানের বীরপুরুষোচিত প্রতিশোধ লইলে,সে পৌরুষের সকলেই প্রশংসা করিত; তৎপরিবর্ত্তে অক্ষক্রীড়ার ষড়যন্ত্র দ্বারা নিরপরাধ, অজাতশত্রু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব অপহরণ-রূপ বিগর্হিত আচরণ, সাধু সমাজে নিন্দনীয় হইলেও, তাহা তদ্রূপ জঘন্য আচরণ বলিয়া সাধারণ্যে গণ্য নাও হইতে পারিত ; কিন্তু প্রকাশ্য রাজসভায় আপনাদের কুলবধূকে উরু-প্রদর্শন,

ও কেশাকর্ষণ করতঃ; উলঙ্গ করিবার জঘন্য পৈশাচিক কাণ্ডের নিদর্শন দেখাইয়া, দুর্য্যোধন জগতে এক দুরপনেয় কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন।— এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন অসুরপ্রকৃতি লোকের চরিত্রের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবার প্রয়াসও ঘোর অপরাধজনক বলিয়া আমরা মনে করি।

(২) জতুগৃহদাহ ঘটনায় দুর্য্যোধনকে যেভাবে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, উহা বস্তুতঃই কৌতুকপ্রদ। দুর্য্যোধনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে, এই এতবড় নৃশংস কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হইল,—আর তিনি নির্দোষ! মহাভারতে এইভাবে বর্ণিত আছে,—(কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবকে দগ্ধ করিতে মনস্থকরতঃ পিতা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণসহ দুষ্টমন্ত্রণা পূর্ব্বক ছলে-বলে-কৌশলে পাণ্ডবদিগকে বারাণাবত নগরে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া,) 'দুরাত্মা' দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পুরোচন-নামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিলেন এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"হে পুরোচন, ধন-সম্পত্তি-সম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমার নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে! অতএব ইহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।...তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করা হইতেছে তুমি কখনও ইহা প্রকাশ করিও না।" (আদি—৪৪ অঃ) এইরূপ নানা মধুরবাক্যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া, কিভাবে ঐ জতুগৃহ দাহ্যপদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে এবং কিরূপে উৎকৃষ্ট পানভোজনদ্বারা পাণ্ডবদের বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ, সুযোগ মত, ঐ জতুগৃহ-দ্বারে অগ্নি প্রদান করিয়া পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিতে হইবে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখাইয়া দিলেন, এবং কিছু কাল পরে, কোন দিন ঐ পৈশাচিক নৃশংস কার্য্যটিঅনুষ্ঠিত হইবে তাহারও দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন। মহাত্মা বিদুর, উহাদের দুরভিসন্ধি সবিশেষ অবগত হওয়ায়, যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিতে সতর্ক করিয়া দেন এবং তিনি আত্মরক্ষার্থ, এবং দুর্য্যোধনের ভ্রম উৎপাদনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ভীমসেন কর্ত্তৃক ঐ গৃহ দাহ করাইয়া

সুরঙ্গ-দ্বার দিয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণসহ গোপনে পলায়ন করেন। আদিপর্ব্বেরই ৪১ অধ্যায়ে কিন্তু বর্ণিত আছে;—'সেই রজনীতে পূর্ব্বাপর সবিশেষ অবগত হইয়া পাণ্ডবগণ নিজেরাই আত্মরক্ষার্থ ঐ জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন।'—তাহা হইলেই কি দুর্য্যোধনের সমস্ত অপরাধ স্খালন হইবে! দুর্য্যোধনের চরিত্রের উৎকর্ষ প্রদর্শন জন্য তাহার এরূপ জঘন্য কার্য্যের এভাবে সমর্থন, কিরূপ রীতি বুঝিতে পারিলাম না!

(৩) ঐরূপ আবার, ভীমসেনকে ছলপূর্ব্বক বিষ-প্রয়োগ দুর্য্যোধনের আর এক নৃশংস কাণ্ড! দুর্য্যোধন প্রীতির ভান করিয়া, স্বহস্তে ভীমসেনের মুখে বিষাক্ত মিষ্টান্ন প্রদান করেন এবং তাহাতে অচৈতন্য মৃতকল্প হইলে,—সেই অবস্থায় হস্তপদ বন্ধন করিয়া, নদীর জলে নিক্ষেপ করেন!

(৪) এই জঘন্য কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া আর একবার নিদ্রিত অবস্থায় ভীমসেনকে কাল-ভুজঙ্গ দ্বারা উপর্য্যুপরি দংশন করাইয়াছিলেন!! এই শ্রেণীর জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে কোন দিন পাওয়া গিয়াছে কি?

(৫) অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিশীথ-রাত্রে গোপনে পাণ্ডব শিবির প্রবেশ ও সজ্জনবিগর্হিত উপায়ে নৃশংসভাবে নিদ্রিত অবস্থায় পঞ্চ-পাণ্ডব হত্যার সংবাদ পাইয়া দুর্য্যোধন পরম পুলকিতঅন্তরে হর্ষ প্রকাশ করিলেন! উহাও তাহার জঘন্য মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।—পরে উহারা পঞ্চ-পাণ্ডব নহে, তাঁহাদেরই পুত্র জ্ঞাত হইয়া, কুরুবংশ লোপ হইল ভাবিয়া হর্ষ-বিষাদ অবস্থায় দেহত্যাগ করিলেন।

(৬) কাম্যকবনে অবস্থিতি কালে পাণ্ডবদিগকে মহা-সঙ্কটে ফেলিবার দুরভিসন্ধিতে দশ সহস্র শিষ্যসহ দুর্ব্বাসাকে অসময়ে পাণ্ডব আবাসে প্রেরণও উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে। তাঁহাদের অতুল বৈভব ও সুখ-সম্পদ প্রদর্শন ও পাণ্ডবদিগের দুরবস্থা দর্শনে আনন্দ উপভোগের বাসনায় ঘোষযাত্রাও উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে;

তথাচ তাঁহারা গন্ধর্ব্বসহ যুদ্ধে বিপন্ন হইলে, যুধিষ্ঠির কিরূপ মহানুভবতার পরিচয় দিলেন, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। আবার কপট-অক্ষক্রীড়ায় দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিত, লাঞ্ছিত ও মর্ম্মাহত হইয়াও বনবাসে গমন কালে, পাছে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে দুর্য্যোধনের কোন অনিষ্ট ঘটে এই আশঙ্কায়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বসন দ্বারা নিজ বদন আচ্ছাদন করিয়া বনগমন করিলেন! এইখানেই দেব ও দানবের পার্থক্য।

দুর্য্যোধনাদি সপ্তরথিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐরূপ অন্যায় সমরে অভিমন্যুকে বধের ব্যবস্থা অতীব বিগর্হিত আচরণ বলিয়া চিরদিন লোকসমাজে ঘোষিত থাকিবে। এই সকল এবং এতাদৃশ আরও বহু কদাচারণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্য্যোধনের আসন, আদর্শ ক্ষত্রিয় বীরগণের আসনের কত নিম্নে। তাঁহার মতো জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে উচ্চস্থান দিবার,—দানবকে দেবতার আসনে বসাইবার,—প্রয়াস কদাচ সমীচীন নহে।

(৮) জলস্তম্ভে অবস্থিতিকালে, পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে যে-কাহারও সহিত গদাযুদ্ধে আহূত হইলে, দুর্য্যোধন যে বাছিয়া-বাছিয়া ভীমের সহিতই গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা তাঁহার মহানুভবতার বা বীরত্বের পরিচায়ক নহে, উহা আত্মম্ভরিতাপূর্ণ দাম্ভিক অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাবেরই পরিচায়ক। অনুরূপ-স্বভাব-সম্পন্ন রাজা জরাসন্ধকে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন গদাযুদ্ধে আহ্বান করিলে, জরাসন্ধও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে নগণ্যজ্ঞানে, তুল্য-বলবিক্রমশালী ভীমসেনকেই সমকক্ষ দেখিয়া গদাযুদ্ধে মনোনীত করিয়াছিলেন। আত্মম্ভরিতাপূর্ণ অসুরদের স্বভাবই এই যে, তাহাদের সর্ব্বদা আশঙ্কা পাছে তাহাদের মান খর্ব্ব হয়। ভস্ম হইয়া যাইবে, তথাচ কাহারও নিকট নত হইবে না! এই বৈশিষ্টের জন্যই, তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের নিকটও শরণাগত হইয়া বর লইতে একান্ত নারাজ; পরন্তু, নিজেই

ভগবানকে বর দিতে উদ্যত! মধুকৈটভ, গয়াসুর, প্রভৃতি তাহ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

দুর্য্যোধনের বীরত্বের প্রশংসা কিছুই বিচিত্র নহে। অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্য-কশিপু, রাবণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল ইহারা সকলেই মহাপরাক্রমশালী বীর। পশুবলে অসুররা চিরদিনই দেবতাদের ত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে, 'ইহার তুল্য বীর আর কেহ নাই', প্রভৃতি যে সকল উক্তি মহাভারতে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা কাব্যে অতিস্তুতি মাত্র। মহাভারতে স্থানে স্থানে অনেকের সম্বন্ধেই এইরূপ তৎসময়োচিত অতিস্তুতি দৃষ্ট হয়। ইহা যে অতিস্তুতি তাহার প্রমাণ—(১) দুর্য্যোধন পত্নীগণসহ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইলে, অর্জ্জুনের পরাক্রমে তাঁহারা মুক্ত হন। (২) বিরাটনগরে গোধন-হরণ সময় অর্জ্জুন একাই তাঁহাদের সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তাঁহাদের মুকুটাদি সংগ্রহ করেন। (৩) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে লক্ষ্য-ভেদ ও তৎপরবর্ত্তী সংগ্রামে কৌরবদের পরাভব। (৪) অভিমন্যুর নিকট পরাভূত হইয়া, সপ্তরথী কর্ত্তৃক অন্যায় সমরে তাঁহাকে নিধন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণাদি অপেক্ষা বীরত্বে দুর্য্যোধন চিরদিনই ন্যূন। কিন্তু তিনি একজন অপরাঙ্মুখ, নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন, একারণে তাঁহার স্বর্গলাভ ঘটিল। তবে স্বর্গে গমন, এমন কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার নহে। সকলেই অল্প-বিস্তর পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, একারণ সকলেরই তদনুরূপ-সময় স্বর্গ বাস হয় এবং ঐ পুণ্য ক্ষয় হইলেই মর্ত্ত্য লোকে প্রত্যাবর্তন করে—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" (গীতা—৯।২১)

দুর্য্যোধনের স্বর্গবাস এবং নিজ ভ্রাতাগণের নরকবাস ও আপনার নরক-দর্শন ঘটায়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত ও ক্ষুব্ধ হইলে, স্নেহভরে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, দেবরাজ কহিলেন,—

"মনুষ্য মাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাছে।" যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্প মাত্র পুণ্য সঞ্চয়

করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে ; আর যে সকল ব্যক্তি অধিক পুণ্য-সঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপ অনুষ্ঠান করে, তাহারা প্রথমে নরক-ভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গ-ভোগ করে।…এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী এই নরক হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।" (স্বর্গ—৩ অঃ)

তারপর বলা হইয়াছে, বিষবৃক্ষ কেহ স্বয়ং রোপন করিয়া তাহা ছেদন করিতে পারে না, একারণ ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখন প্রশ্ন এই, যখন বিষবৃক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম এবং তাহাতে সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে জানিতে পারিলাম, তখন মোহপ্রযুক্ত উহা ছেদন না করা অবিমৃষ্যকারিতা ও মূঢ়তার পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি। কোন সুধী ব্যক্তিই তাঁহার আচরণের অনুমোদন করিতে পারেন না এবং তাঁহাকেও পরিণামে এজন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয় সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রেও, ভীষ্ম-দেবও একারণ কুলপাংশুল, প্রকট-কলি, দেবদ্বিজ-দ্বেষী, পাপ দুর্য্যোধনকে প্রশ্রয় দিয়া কুরুকুল ধ্বংসের পথই উন্মুক্ত করিলেন। (উদ্যোগ—৫৮ অঃ দ্রষ্টব্য) এসম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে।

সজ্জন-মহানুভবগণের দুর্য্যোধন-চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপ অভিমত তাহাই এক্ষণে আলোচ্য—

(১) অজাতশত্রু, দুর্য্যোধনের চির-হিতাকাঙ্ক্ষী, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াই বলিয়াছেন,—"দুর্য্যোধন মাননাশক, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্রূরস্বভাব, ধর্ম্মার্থবর্জ্জিত, কটুভাষী, কামুক, মিত্রদ্রোহী, নিতান্ত পাপবুদ্ধি ও দুরাত্মা।" (ঐ—২৫ অঃ)—ইহার কোনটি অতি-রঞ্জিত কি?

(২) পরম-ভাগবত, মহাধীসম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী, কৌরব বংশের একান্ত-হিতৈষী বান্ধব, মহাত্মা বিদুরও ঠিকই বলিয়াছেন,—"দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মার্থ বিবর্জ্জিত, কামক্রোধ-পরায়ণ, মাননাশী, মানাভিলাষী, মূঢ়, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী, মিত্রদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মহীন,

মিথ্যাপ্রিয়, স্বেচ্ছাচারী ও কর্ত্তব্য বিষয়ে অকৃতনিশ্চয়। ঐ দুরা... বৃদ্ধগণের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন পালন করেনা।" (ঐ—৯১ অ...)

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"তোমার হৃদয় এমন জঘন্য ও দু... এমন পাপাত্মা কুলনাশক যে, ইহারা তোমায় উৎপাদন করিয়া হতমি... ও হতামাত্য হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন।"

(ঐ—১২৪ অ...)

(৩) একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতা ধৃতরাষ্ট্রও বলিয়াছেন,—"দুর্য্যোধ... তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়, এই নিমিত্তই সাধুগর্হিত পাপাচর... সমুৎসুক হইয়াছ।" (ঐ—১২৯ অঃ)—তাঁহার এইরূপ উক্তি বহু স্থানে দৃষ্ট হয়।

(৪) মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"যে দুরাত্মা ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়, সে অচিরাৎ বাসনাপন্ন হইয়া অরাতিকুলের হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। ঐ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন উপায়-অনভিজ্ঞ, বৃথা রাজ্যাভিমানী ও ক্রোধ-লোভের একান্ত বশীভুত।" (ঐ—১২০ অঃ)—দ্রোণাচার্য্যও ভীষ্মের বাক্য সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। এইরূপ বহু স্থানেই দৃষ্ট হয়।

(৫) পুত্রবৎসলা যশস্বিনী গান্ধারী ব্যথিত অন্তরেই বলিলেন,—"হে রাজন্, তুমি দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা অবগত হইয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং তুমি আজ বলদ্বারা উহাকে প্রতি... নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। (ঐ—১২৮অঃ)—দুর্য্যোধনের প্রতি তাহার স্নেহময়ী জননীর এতাদৃশ কটূক্তি বহুস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যায়।

(৭) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"...হে মূঢ়, ভরতকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন! তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, এই তিন জনে অনার্য্য ও নৃশংস পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে বারম্বার বহুবিধ কটূক্তি করিয়াছ।" (ঐ—২২৭ অঃ)—

দুর্য্যোধনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ ও তাঁহার কদাচারের তীব্র প্রতিবাদে মহাভারত পূর্ণ।

(৭) বলরাম চিরদিন দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু ও তাঁহার প্রতি একান্ত স্নেহ পরায়ণ; তিনি পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের অমানুষিক দুর্ব্যবহারে ব্যথিত অন্তরে বলিয়াছেন,—"অতঃপর নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মকেই গুরুতর ও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিবে।…অধার্ম্মিক দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদি কি নিমিত্ত অভ্যুদয় লাভ করিতেছে বলিতে পারি না। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; হায়! সশৈল ধরা এখনও কেন রসাতলে প্রবিষ্ট হইল না!" (বন—১১৯ অঃ)

(৮) মহাভারতকার একস্থানে বলিয়াছেন,—"দুর্ম্মতি, নির্লজ্জ, মর্য্যাদাঘাতক, অহঙ্কার-পরবশ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ইত্যাদি" (উদ্যোগ—১২৭ অঃ)।—দুর্য্যোধনের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বিশেষণ-প্রয়োগ মহাভারতের সর্ব্বত্র।

আর বিস্তারের প্রয়োজন আছে কি? এতাদৃশ দুর্নীতিপরায়ণ অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তির ঐভাবে চরিত্রের উৎকর্ষ প্রদর্শন করা কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য তাহা মহারাজজী অনুগ্রহ করিয়া একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

আর একটি বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে, সমধিক শক্তি-প্রাপ্ত হইলে তমোভাবাচ্ছন্ন ব্যক্তি ঐ শক্তির অপব্যবহার করতঃ জগতের উৎপাতের কারণ হইয়া উঠে; একারণ ঘোর-অসুর-প্রকৃতি, সজ্জন কর্ত্তৃক "দুরাত্মা" বলিয়া নিন্দিত, দুর্য্যোধনের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য যে যে সদ্‌গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ গুণগুলি তাঁহার না থাকিলে, তিনি এত সহায়-সম্বল পাইতেন না, এবং তাহা হইলে এত বড় একটা প্রলয়ঙ্করী কাণ্ডও ঘটাইতে পারিতেন না। ঐ গুণগুলি না থাকিলে জগতের, ও তাঁহার নিজের, সমূহ কল্যাণই সাধিত হইত। যে হেতু ক্রূরকর্ম্মাদিগের গতি ভগবান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মমাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু" গীতা—১৬।১৮,১৯

অতিবড় নৃশংস, কামক্রোধোন্মত্ত, নরপিশাচ, দস্যুদের সর্দ্দারও কখন-কখন নির্ভীক বীর যোদ্ধা হইয়া থাকে; দলভুক্ত দস্যুদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন ও রক্ষণ করিয়া থাকে এবং কোন বিপাকে ধরা পড়িলে প্রাণান্তেও তাঁহার উদ্দেশ বলিয়া দেয় না;—লুণ্ঠিত ধনরত্নাদি দীন-দুঃখীকে বিতরণ করিয়া থাকে, যথাশক্তি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে; নিজেদের দলের মধ্যে কখন মিথ্যা কথা বা কোন প্রকার প্রবঞ্চনা করে না এবং ডাকাতির সময় গৃহস্থ স্ত্রীলোকের প্রতি যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া থাকে;—এই প্রকার নানা গুণে অলঙ্কৃত হইলেও, দস্যু—দস্যুই; সাধু নহে। একারণে তাহার কদাচরণ-গুলি আচ্ছাদন করিয়া চরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে যাওয়া কখনই নিরাপদ নহে। তাহাতে ফল বিপরীতই হয় এবং জনসাধারণ আদর্শভ্রষ্ট হয়।

আধুনিক যুগে দেখিতে পাই, কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক বারবনিতা শ্রেণীর পরিচারিকাকে আদর্শ সতী-সাধ্বী কুলকামিনীর পর্য্যায়ে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন! আবার কোথাও দেখি, বারবিলাসিনীর গর্ভজাতকন্যা, সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া, সমাজের শীর্ষস্থানীয় উদার শিক্ষিত যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত! এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইলে শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু যে সারগর্ভ সতর্ক বাণী বলিয়াছেন তাহা সকলের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—

"বেশ্যার মেয়ে সমাজে নেওয়া কখনও উচিৎ নয়। ইহাতে সমাজ কলুষিত হয়। যদিও প্রথমে খুব ভাল এবং সচ্চরিত্রা দেখা যায়, সময়ে ভিতরের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সব প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ,—২য়, ১২২ পৃঃ

অধুনা শিক্ষিতাভিমানী নব্য যুবকগণ পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি পরম-হিতৈষী বিজ্ঞ গুরুবর্গের পছন্দ ও হিতবাণী অনাদর করিয়া নিজেরাই পাত্রী পছন্দ করিতে আগ্রহান্বিত এবং, অপ্রয়োজন বোধে, পাত্রীর কুলশীল বংশ পরিচয় না লইয়া, তাহার বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যে ও নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় পারদর্শিতাতেই আকৃষ্ট হয়েন ও অচিরে এই অপরিণামদর্শিতার বিষময় ফলও ভোগ করিয়া থাকেন।

আবার দেখি, স্বামীকে মর্ম্মান্তিক রূঢ় বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করা এবং তাঁহার প্রতি ভীষণ, নৃশংস ব্যবহার করার জন্য, কেহবা কৈকেয়ীর তেজস্বিতার প্রশংসা করিয়া 'বীরাঙ্গনা' আখ্যা দিয়া চপলমতি জনসাধারণের হর্ষোৎফুল্ল করতালি অর্জ্জন করিতেছেন।* এইরূপ ক্রোধ-লোভোন্মত্তা, পতি-প্রাণনাশের হেতুভূতা, কুল কামিনীর জঘন্য আচরণ একান্ত বর্জ্জনীয়। এরূপ বিসদৃশ আচরণের সমর্থন ও সমাদর আমাদের আর্য্য-রীতি বিরুদ্ধ।

আবার, মেঘনাদ-বধ-কাব্যে দেখি, রাক্ষস-স্বভাবসম্পন্ন মেঘনাদ ঐ কাব্যের নায়ক রূপে গৃহীত হওয়ায়, ও তাঁহার গুণগরিমা ও শৌর্য্য-বীর্য্য যশঃশৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উত্তোলন করিয়া, উৎকর্ষ দেখাইবার প্রয়োজন হওয়ায়, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্য অনুজ ও তাঁহার সমতুল্য মহাবীর, মহাত্মা লক্ষ্মণকে, নিতান্ত ভীরু, কাপুরুষ, তস্করের ন্যায় প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিভৃত যজ্ঞাগারে সমাগত হইয়া, পূজায়-রত মেঘনাদের কোষার আঘাতে মূর্চ্ছিত! পরে দেখি, সেই বীরাগ্রগণ্য মহানুভব লক্ষণ, মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, অতিনীচ বর্ব্বরোচিৎ নৃশংসতার আশ্রয় লইয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে জঘন্যভাবে হত্যা করিতেছেন!!

এইরূপ কদর্য্য ভাবে, সাধারণ নভেল-নাটকের নায়ক-নায়িকার

---

* মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে এই অলক্ষ্মীস্বরূপিনী পতিঘাতিনী কৈকেয়ীকে বীরাঙ্গনাগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন!

চরিত্রের ন্যায়, আমাদের জাতীয় আদর্শ মহাপুরুষ-গণের চরিত্র বিকৃ করিয়া দেখান হইয়াছে, ও জন-সমাজে তাহাই সমাদৃত হইতেছে।

আমাদের দেশে যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতিকে সতী-সাধ্বী লক্ষ্মীস্বরূপিনী এবং কৈকেয়ী প্রভৃতিকে অলক্ষ্মী-স্বরূপিনী বলিয়া দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিরা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে এবং ঐ আদর্শই এখনও আমাদের দেশ শ্রদ্ধা সহকারে ধরিয়া রহিয়াছে বলিয়াই, অদ্যাপি হিন্দুসমাজে বৈদেশিক সভ্যতা বিপ্লব ঘটাইতে পারে নাই। সেইরূপ আবার 'নারায়ণ' (শ্রীকৃষ্ণ)-সখা 'নর'-রূপী অর্জ্জুন; সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম; স্বয়ংধর্ম্ম বিদুর; ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির; পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র; এবং জ্যেষ্ঠগতপ্রাণ মহাবীর লক্ষ্মণ; বা ভক্তবীর, ধর্ম্মপ্রাণ ভরতাদিকে আদর্শ-মানব রূপে এবং দুর্য্যোধনাদিকে প্রকট-কলি বা দানবরূপে সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণই প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাহার ব্যতিক্রম বা বিপর্য্যয় ঘটাইবার, বা দানবকে দেবতা পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার প্রয়াস, অতীব গর্হিতকার্য্য তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাজজী উপসংহারে আবার লিখিয়াছেন,—"অসৎকে (পাণ্ডবদিগকে) সমুচিৎ শিক্ষাদান রাজার (দুর্য্যোধনের) কর্ত্তব্য"।—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ তবে অসৎ! আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইলে অসতের পৃষ্ঠপোষক ও প্রশ্রয়দাতা !!—নূতন কথা বটে।

রামায়ণ, মহাভারত আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম-পুস্তক। ভুলিলে চলিবে না,—এই রামায়ণ সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাকবি মহর্ষি বাল্মিকীর রচিত। যে গীতা গ্রন্থখানি সর্ব্বোপনিষদ্‌সার, আধ্যাত্মিক জগতের দ্বারস্বরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত, এবং যাহার চমৎকারিত্ব সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে,—ভুলিল চলিবে না, সেই গীতা মহাভারতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র;—ভুলিলে চলিবে না, যিনি এই গীতার রচনা করিয়াছেন, সেই ভগবানের অংশাবতার বেদব্যাসই এই সমগ্র মহভারতের

রচয়িতা এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত আদর্শই জাতীয় আদর্শ রূপে সমাদৃত ও পূজিত। তাঁহাদের লেখনীর উপর লেখনী চালনা করিবার প্রয়াস—দুঃসাহস মাত্র।

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিষ্কপটে জ্ঞাপন করিতেছি শ্রীশ্রীমহারাজজীর মত জগৎমান্য মহৎব্যক্তির পদধূলি গ্রহণ করিবারই আমার যোগ্যতা নাই; এমত অবস্থায় তাঁহার অভিমতের উপর আমারমত নগণ্য ব্যক্তির সমালোচনা করিতে যাওয়া অতীব ধৃষ্টতা ও চপলতা; এ কারণ করজোড়ে তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করি। তিনি তাঁহার নিজ ঔদার্য্যগুণে যেন আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার মস্তকে স্নেহাশীর্ব্বাদপূর্ণ পদধূলি দানে আমাকে ধন্য করেন, এই ভিক্ষা।*

* এই প্রবন্ধটি ১৩৫০ সালের পৌষ সংখ্যায় 'মন্দিরে' বাহির হয়।

অজামিল উদ্ধার

(১৬) প্রশ্ন :—মহাপাপী অজামিল মৃত্যু সময়ে নামাভাসেই বৈকু যাইতে সমর্থ হইল, আর সাধারণ মানব কত পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠান করি এবং কৃত লক্ষ লক্ষ ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াও মোক্ষ-লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর :—পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোভিন্নাত্মা নাম-নামিনোঃ ॥"

'নাম', 'নামীর' ভেদ না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় চৈতন্যরসবিগ্রহ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যমান্, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণিবৎ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।'—শ্রীনামের এতাদৃশ অবিচিন্ত্য মাহাত্ম্য।

'বৃহদ্বৈষ্ণব' গ্রন্থে উক্ত আছে—

"নাম্নোস্ত যাবতী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে হরেঃ।
তাবৎকর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ ॥"

অর্থাৎ, 'শ্রীহরিনামের যে পরিমাণ পাপ নষ্ট করিবার শক্তি আছে, সে পরিমাণের পাপ কোন পাপীর করিবার সামর্থ্য নাই।' এজন্য উক্ত আছে—

"একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
মহাপাপী, তত পাপ করিতে না পারে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই অজামিল উপাখ্যানেই উক্ত আছে—

"সাংকেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥" ভাঃ—৬।২।১৪

'সঙ্কেতে, পরিহাসচ্ছলে, গানের পাদপুরণার্থ, কিম্বা অবহেলাক্রমে,— যে ভাবেই হউক, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই সকল পাপ

দূর হয়।' তবে চিত্তশোধনান্তে প্রেমপ্রাপ্তি পরম স্বতন্ত্রবস্তু,—উহা সুদুর্লভ; এ কারণ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" চৈ ঃচঃ ১।৮।৩১

"এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব-পাপ-নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥" ঐ—১।৮।৫৫

"হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥" ঐ—১।৮।৬১

অন্যত্র নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥" চৈঃ চঃ—৩।২০।৪০

"তৃণ হতে নীচ হৈয়ে সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥" ঐ—৩।৮।৫

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানীনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" ঐ—৩।২০।৪৫

'তৃণ হইতেও নীচু হইয়া, তরুর মত সহিষ্ণু হইয়া এবং অমানী, মানদ হইয়া, সদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।'

এক্ষণে বিচার এই যে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র মানব সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়; কিন্তু যাহার জন্য ঐ সকল পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই চিত্তের মালিন্য—ঐ পাপের বীজ, তখনও বর্ত্তমান থাকে। তাহা দূর করিতে নিরন্তর ভগবানের নামগ্রহণ, বা তাঁহার গুণকীর্ত্তন, বিধেয়; তাহা হইলে নূতন পাপ সঞ্চয়ের আর অবসর না থাকায়, ক্রমে অপরাধ শূন্য হওয়ায়, যথাযথ নামগ্রহণে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং তখন

ভগবৎ-কৃপায় প্রেমলাভ হয়। নতুবা উহা কেবল 'কুঞ্জর শৌচবৎ'-হস্তিস্নানের মত, (হস্তী স্নান করিয়াই পুনরায় গায়ে ধূলা মাখে, তদ্রূপ) সাধারণ মানব গঙ্গাস্নানে, 'সদ্য পাতকমুক্ত' হইলেও, উহাতে তাহা চিত্তশুদ্ধি ঘটে না, চিত্তের মালিন্য থাকিয়া যায়। তাহা হইলেও 'সদ্যপাতকমুক্ত' অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটিলে, তখন কোন পাপ চিন্তা বা পাপ কর্ম্ম করিবার অবসর না থাকায়, সদ্গতি লাভ হয়। এ কারণ সজ্ঞানে গঙ্গাজলে দেহত্যাগ শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা। অজামিলের ঠিক মৃত্যু সময়েই পুত্রের উদ্দেশে ভগবান নারায়ণের নাম উচ্চারিত হইয়াছিল। ঐ নামাভাসেই অজামিলের সর্ব্ববিধ পাপ তিরোহিত হইল এবং বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণের আবির্ভাব হইল ;—"নহি বস্তুশক্তিঃ বুদ্ধিমপেক্ষতে"—অর্থাৎ 'বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না'। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও শ্রীমুখে ঘোষণা করিয়াছেন—

> "দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
> জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥"
>
> (চৈঃ চঃ—১।১৫।২০৬)

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এত-বড়-মহাপাপী অজামিলের মৃত্যুকালে,—ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে, শ্রীভগবানের ঐরূপ নাম-গ্রহণ-করিবার সৌভাগ্যের উদয় হইবার কারণ কি? ঐরূপ সৌভাগ্য-লাভ যে সাক্ষাৎ, বা পরম্পরায়, ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবৎকৃপা অপ্রাকৃত বস্তু, তাহা প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির শত সহস্র চেষ্টায় কদাচ লভ্য নহে। ঐ অপ্রাকৃত কৃপা, অপ্রাকৃত সাধনলভ্য বস্তু। ভগবান স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও, তিনি ভক্তাধীন—প্রেমাধীন; ভক্তিতে তিনি বশ হয়েন ইহা তাঁহার স্বভাব। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

> "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ—১১।২১)
> "অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" (ভাঃ—৯।৬৩)

কিন্তু ভক্তি তো অপ্রাকৃত বস্তু,—তাহা কিরূপে লাভ করা যায় শাস্ত্রে তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন :—"তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং" —'ভক্তিরস-ভাবিতা-মতি লাভ করিতে হইলে 'লৌল্য' বা কেবল মাত্র আকুলতা,—তীব্র লালসা বা লোভের, প্রয়োজন।' কোন অনির্ব্বচনীয় সুকৃতি বলে সাধু-সঙ্গে এই সৌভাগ্য লাভ হয়—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ'॥ (চৈঃ চঃ—২।১৯।২০৫)
'কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে, তবে কৃষ্ণে, রতি উপজয়'॥ (ঐ—২।২২।১১৮)

—ইত্যাদি অশেষ শাস্ত্র-প্রমাণ রহিয়াছে যে,—কি কারণে এই সৌভাগ্য উদয় হয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ;—উহা অনির্ব্বচনীয়, উহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, বা সাধন-লভ্য, বস্তু নহে। তথাপি ইহাও অনুধাবন যোগ্য যে, আমরা সকল সময়ে কারণ নিরূপণ করিতে না পারিলেও, ঐ ব্যক্তির একটা না একটা কিছু সুকৃতি ছিল, যাহা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপর ভগবানের কৃপাবর্ষণ হইল ;—আমরা তাহা ধরিতে পারি আর নাই পারি। নতুবা তাঁহার একজনের প্রতি কৃপা হয়, আবার একজনের প্রতি বা হয় না কেন ? তাহা ছাড়া, তিনি পরম ন্যায়বান,—খামখেয়ালী-ভাবে যদি তিনি কিছু করেন, তবে আমাদের উপায় কি ;—আমাদের ভজনের আগ্রহই বা বৃদ্ধি পাইবে কি প্রকারে ? সিদ্ধভক্ত মহাজন, বা শাস্ত্র, প্রদর্শিত-পথে যথাযথভাবে চলিলে, নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা পাইব,—ঠিক পথে চলিতে পারিতেছি না বলিয়া, বা কোন ত্রুটি ঘটিতেছে বলিয়াই, কৃপা পাইতেছি না,—এইরূপ ধারণাই সাধক-জীবনের প্রাণ ;—উহা না থাকিলে সাধক বাঁচিবে কি লইয়া ? কিন্তু একথাও স্থির যে, তিনি 'অবাঙ্‌মনসগোচর'—নিজ পুরুষকার, বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারিব এরূপ মনে করাও ধৃষ্টতা বা বাতুলতা মাত্র ;—

তবে তিনি করুণাময়, তাঁহার করুণার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, কদাচ তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না,—নিশ্চয়ই উহা একদিন ফলবতী হইবেই হইবে, এভরসা সর্ব্বদা বুকে রাখিতে পারি। কখন কখন ক্ষেত্র-বিশেষে, এবিষয়ে বেশ একটু সন্দেহ উপস্থিত হয় সত্য; কিন্তু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার একটা সুমীমাংসায় পৌঁছাইতে পারা যায়।

অজামিলের প্রতি, ও পুতনার প্রতি, ভগবানের অদ্ভুত কৃপা দেখিয়া প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। পুতনা—'লোকবালঘ্নী', 'রুধিরাশনা' 'রাক্ষসী' হইয়াও, শুধু ধাত্র্যচিত বেশ করায়, ধাত্রী-গতি লাভ করিল; ইহা আপাত-দৃষ্টিতে অতি অসম্ভব ব্যাপার মনে হইলেও, পুতনার পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না।—পুতনা পূর্ব্বজন্মে পরমভাগবত বলীরাজার রত্নাবলী নামে কন্যা ছিলেন। বামনরূপে ভগবান বলীর সকাশে ভিক্ষার্থ গমন করিলে, তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও কমণীয়কান্তি দর্শনে বলীরাজ-কন্যার তাঁহার প্রতি সাতিশয় বাৎসল্যের উদ্রেক হয়, এবং মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেন,—"আহা! এই ছেলেটি যদি আমার হইত, তবে বুকে ক'রে স্তন্যপান করাইয়া কৃতার্থ হইতাম।"—অতঃপর যখন আবার শ্রীবামনদেব বলীর নিকট ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন, এবং তাঁহার দ্বিপাদেই স্বর্গ মর্ত্ত্য অধিকৃত হইলে, তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান দিতে অশক্ত হওয়ায় বলীকে বন্ধন করিলেন, তখন তাঁহার সেই নির্ম্মম আচরণে বলীকন্যার ব্যথিত-অন্তরে স্বতঃই স্ফুরিত হইল, —"এই ছেলেটি যদি আমার হইত তবে নিশ্চয়ই আমি ইহাকে বিষ প্রয়োগ করিতাম।" অন্তর্য্যামী, 'কুতুকী', ভগবান, পরমভাগবত বলীর কন্যার উভয় মনোবাসনাই অবগত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় তাহা পূরণ করিলেন।—ঐ রত্নাবলীই পুতনা হইয়া মাতৃবেশে বাৎসল্য ভাবানুকরণে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া বিষসিক্ত স্তন্য দান করায়, ভগবানের

লীলা-শক্তি ঐ ভক্ত-কন্যার দ্বারা, ঐ ভাবে তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করাইয়া, তাঁহাকে অপূর্ব্ব সদ্গতি দান করিলেন। বহু সুকৃতির ফলে যে পরমভাগবত দান-বীর বলীর কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি। সেই অনির্ব্বচনীয় সুকৃতির ফলেই তাঁহার বাৎসল্যময়ী মাতৃবেশে ধারণ করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল এবং ঐ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বুকে তুলিয়া স্তন্য দিবারও সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তাহাতে 'বস্তুশক্তি'-বলে, শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণায়, তাঁহার ঐরূপ ধাত্রী-গতি-লাভ কিছুই বিচিত্র নহে।

অজামিলের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, অজামিল পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-বলে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ সদ্ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম-জীবনে সদাচারনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎস্বভাবসম্পন্ন, সংযমী, বিনয়ী, সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, পিতৃমাতৃভক্ত প্রভৃতি বহু সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন। (ভাঃ ৬।১ ৫৬,৫৭) পরে দৈব-বিপাকে, কোন অজ্ঞাত দুষ্কৃতি-ফলে, এক বেশ্যার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অধঃপতন ঘটে, এবং যতপ্রকার ঘৃণিত পাপ কার্য্যে রত থাকিয়া জীবন যাপন করেন। তৎপরে কোন অনির্ব্বচনীয় সুকৃতির ফলে এক মহাভাগবত সাধুর সঙ্গ ঘটে এবং তাঁহার কৃপাদেশে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের 'নারায়ণ' নাম রাখেন। আসন্ন মৃত্যুকালে সেই সুকৃতি-বলেই আবার পুত্রের নামের আভাসে 'নারায়ণকে' ডাকিতে সমর্থ হয়েন। একথা শুকদেব গোস্বামীপাদও অজামিলের মুখ দিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—

অজামিল যখন ভীষণাকৃতি যমদূত ভয়ে বিবশ-অবস্থায়, পুত্রের উদ্দেশ্যে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিলেন, অমনি দেখিলেন চারিজন বিষ্ণুদূত তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করতঃ ঐ যমদূতগণকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক জানাইলেন, অজামিল যখন সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত, তখন তাঁহাকে যমপুরীতে লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত (এবং যেহেতু তাঁহার চিত্ত তখনও অবিশুদ্ধ, এ কারণ মোক্ষেরও অযোগ্য) ; এই হেতু তাঁহাদের

পাশ হইতে মুক্ত করতঃ, মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া, তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নিরুপম নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। অজামিল এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া যেই কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, অমনি তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন।

এই সমস্ত ঘটনা অনুধাবন করিয়া, তিনি তখন একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখে ভগবানের অপূর্ব্ব নাম-মাহাত্ম্য ও তাঁহার গুণগরিমা শ্রবণ করায়, সেই ক্ষণেই তাঁহার ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন। পূর্ব্বকৃত অপকর্ম্মের জন্য তখন তাঁহার অশেষ আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায়, অনুশোচনা করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন :—

"আমি এজন্মে যদিও মহাপাতকী হইয়াছি, তথাপি মনে হয় সেই শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগের সাক্ষাৎ পাইবার নিমিত্ত, জন্মান্তরীয় বিশেষ পুণ্যকর্ম্ম সঞ্চিত ছিল। সেই দেবতাগণের দর্শনে আমার অন্তঃকরণ বড়ই প্রসন্ন হইয়াছে। প্রাক্তন পুণ্যবল না থাকিলে মাদৃশ অপবিত্রস্বভাব কুলটা-সঙ্গকারী ব্যক্তির জিহ্বা মুমূর্ষু-অবস্থায়, কিছুতেই ভগবানের নাম-রূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিত না। ধূর্ত্ত, অধর্ম্মাচারী, স্বীয় ব্রাহ্মণত্বনাশক, নির্লজ্জ আমিই বা কোথায়, আর পরম মঙ্গলময় ভগবানের 'নারায়ণ', এই নামই বা কোথায়? যাহা হউক, আমি প্রাণায়ামাদি দ্বারা বায়ু, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গ সংযত করিয়া এরূপ ভাবে যত্ন করিব, যাহাতে আর কখনও ঘোর পাপান্ধকারে নিমগ্ন না হই। নিতান্ত অধম ব্যক্তি রমণীর মোহে যেমন ক্রীড়নক-পশুর ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। এক্ষণে এই নারীর-মায়ায়-মুগ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিতে যত্নবান হইব। দেহাদির প্রতি 'আমার' কিংবা 'আমি', বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা পরিত্যাগ

করিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানের ধ্যান পূর্ব্বক, আমি তাঁহারই নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে মন পবিত্র করিয়া, তাহা সেই ভগবানের প্রতি একাগ্রভাবে স্থাপন করিব।"

পরমভাগবত বিষ্ণুদূতগণের সহিত ক্ষণকাল সংসর্গ হওয়াতে, অজামিলের এইরূপ প্রবল নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; এহেতু তিনি সংসারের সকল বন্ধন উপেক্ষা করিয়া হরিদ্বারে গমন করিলেন এবং তথায় কোন দেবমন্দিরে উপবেশন করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে মন সংস্থাপিত করিলেন। (ভাগবত—৬।২।৩২—৪০)

এই সাধনের সিদ্ধ-অবস্থায়, বিষ্ণুদূতদিগকে যথাসময়ে পুনরাগত দেখিয়া অজামিল তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন ও প্রণামান্তে দেহ-ত্যাগ করিয়া ভগবানের পার্ষদগণের অনুরূপ দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহাদের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

এইখানে একটি কথা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে, ভগবানের ঐ পবিত্র নাম বিবশ অবস্থায় উচ্চারণ করিবার সৌভাগ্য ও সামর্থ্য লাভের হেতু,—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতিরই ফল ইহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত। আরও একটা কথা, এই নামকরামাত্রই তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাওয়া হয় নাই। ঐ নামাভাসে তাঁহার সমুদয় পাপ ক্ষয় হয় ও পতিত-পাবন বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গ ঘটে এবং তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে ও তাঁহাদের মুখে ভগবানের অশ্রুতপূর্ব্ব নাম-মাহাত্ম্য ও অপূর্ব্ব গুণাবলী শ্রবণান্তে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়ার পর, সকল মায়া-মমতা ত্যাগকরতঃ নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, হরিদ্বারে গিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েন এবং চিত্ত-শোধনান্তে ঐ সাধনের সিদ্ধাবস্থায় বিষ্ণুদূতগণ পুনরায় আগমন করেন। তখন তিনি সেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করতঃ, দিব্যদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিবরণের মধ্যে কোথাও অযৌক্তিকতা দৃষ্ট হয় না।

ঠিক মৃত্যু সময়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে পারিলে, বা সজ্ঞানে গঙ্গা-সলিলে দেহত্যাগ করিতে পারিলে; যে নিষ্পাপ হয় শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি 'নামের', বা 'সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী' দ্রবময়ী-ব্রহ্মের, ঐ শক্তি থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; তবে ঐরূপ যোগাযোগ হওয়া যে বহু সুকৃতি-সাপেক্ষ তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অজামিল-উদ্ধার-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এইরূপ বর্ণনা আছে—

একটি বৈষ্ণব-গোস্বামী বলিলেন,—"অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই যা সে করে নাই; কিন্তু মর্‌বার সময় 'নারায়ণ' বলে ডাকাতে উদ্ধার হয়ে গেল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন,—"হয়ত অজামিলের পূর্ব্ব জন্মে অনেক কর্ম্ম করা ছিল। আরও আছে, সে পরে তপস্যা করেছিল।

এ রকমও বলা যায় তার তখন অন্তিমকাল। হাতী নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধূলা-কাদা মেখে, যেকে সেই। তবে হাতীশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধূল ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয়, তা হলে গা পরিষ্কার থাকে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—দ্বিতীয় ভাগ, ২০ পৃ

এখানে আর একটা কথাও বিবেচ্য যে, যদি কেহ চিরদিন ভগবৎ-ভজন-নিষ্ঠ থাকে, কিন্তু কোন দৈব-বিপাকে, বা অনির্ব্বচনীয় দুষ্কৃতি-ফলে, ঠিক মৃত্যুকালে ভগবৎ-চিন্তা তাঁহার চিত্তে উদয় নাই হয়, বা কোন অসৎ-চিন্তারই উদয় হয়, তাহা হইলেই কি তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদয় সুকৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে? তাহা কদাচ বিশ্ববিধাতার বিচারে সম্ভবপর নহে। এক্ষেত্রে ঐ দুষ্কৃতিটুকুর ভোগ শেষ হইলেই তিনি তৎপরে 'সুকৃতির ফলভোগ' করিবেন। ভগবান গীতাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥" গীতা—৬।৪০

'হে তাত, শুভঙ্কারী ব্যক্তির কদাচ দুর্গতি লাভ হয় না।'—ইহা পরম সুসঙ্গত অশ্বাস বাণী।

কঠোর ভজনানুরাগী রাজা ভরতের, প্রতিপালিত হরিণের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রযুক্ত মৃত্যুকালে হরিণটীকে চিন্তা করায়, হরিণ-দেহ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল সত্য।—সসাগরা ধরণী ও পুত্র-কলত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরিশেষে একটা হরিণের প্রতি ঐরূপ অত্যাসক্তি খুবই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি,—এজন্য পশুযোনিপ্রাপ্তি ঘটিল; কিন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে ঐ হরিণ-জন্ম-গ্রহণ সত্ত্বেও, পূর্ব্ব জন্মের কঠোর ভজনানুষ্ঠানের ফল-স্বরূপ, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই; একারণ ঐ হরিণে আসক্তির বিষময় ফল মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়া আর স্বজাতি হরিণ, বা কাহারও, সঙ্গ করেন নাই। ঋষিদিগের আশ্রমে নিঃসঙ্গ হইয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণাদিতে জীবন অতিবাহিত করিয়া, পরজন্মে পরমতত্ত্বজ্ঞানী জড়ভরত হইলেন এবং সে জন্মেও একান্ত নিঃসঙ্গ, মূকবৎ আচরণ করিয়া, ঐকান্তিক ভগবৎ-ভজনান্তর মোক্ষলাভ করিলেন। ইহার মধ্যেও অযৌক্তিক ব্যাপার কিছুই নাই।—গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলাতেও দেখি, কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, একান্ত নিরুপায় অবস্থায়, অন্তিমকালে ঐ গজরাজের ভগবানকে আকুলপ্রাণে স্মরণ একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্ব-জন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজর্ষি ছিলেন। মহাতেজা অগস্ত্যমুনির অভিশাপে হস্তি-যোনি প্রাপ্ত হইলেও, সাধনপ্রভাবে তিনি জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণ একান্ত বিপন্ন অবস্থায়, যথার্থ শরণাগতি-ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়, এবং তদবস্থায়, তাঁহার আকুল প্রার্থনায়, ভগবান প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

বৃত্রাসুরেও দেখিতে পাই অসুরস্বভাবের চূড়ান্ত। দেবতাদিগকে স্বর্গচ্যুত করিয়া, তাঁহাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করাইলেন। পরিশেষে,

দধীচিমুনির বৃত্রবধার্থ-উৎসর্গীকৃত দেহের অস্থি হইতে বজ্র নির্ম্মিত হইলে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ সম্ভব হইল। ঐ দুর্বৃত্ত অসুর বজ্রাহত হইয়া ঠিক মৃত্যু সময়ে, ভগবৎ-চরণে ঐকান্তিকভাবে প্রপন্ন হইলেন এবং পরম সদ্গতি লাভ করিলেন। এই ঘটনায় দেবরাজ বিস্মিত হইলেন এবং জানিলেন ঐ বৃত্রাসুর সামান্য ব্যক্তি নহে,—উনিই পূর্ব্বজন্মে পরমভাগবত, সঙ্কর্ষণ-ভক্ত, চিত্রকেতু ছিলেন।—

একদা শ্রীশঙ্কর, দেবীকে ক্রোড়ে বসাইয়া, ঋষিগণকে তন্ত্র উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া, চিত্রকেতু বিমান হইতে অবতরণ করতঃ, তথায় সমাগত হইয়া মহাদেবকে এজন্য কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করেন। তাহাতে দেবী রুষ্ট হইয়া,—"কি, এত দম্ভ! তুমি অসুর-যোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই তাঁহার বৃত্রাসুররূপে জন্ম হয়। কিন্তু মৃত্যু সময়ে, পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ, তিনি ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণ করেন ও পরম-পদ লাভ করেন।

অহল্যার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাও আকস্মিক নহে। গৌতম ঋষির অভিশাপ-প্রভাবে, তিনি বাহ্যতঃ প্রস্তরবৎ হইলেও, ভিতরে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ছিল; —স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য বহুকাল তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইবার পর শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শ ঘটিল।

এইরূপ তথ্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই প্রকার সকল আকস্মিক ব্যাপারেই ভগবানের করুণার, একটা না একটা, হেতু রহিয়াছে।*

---

* পরবর্ত্তী 'দৈব ও পুরুষকার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দৈব ও পুরুষকার

(১৭) প্রশ্ন ঃ—দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? মানুষ কি একেবারে দৈবাধীন,—না, তাহার কোন স্বাধীনতা আছে?

উত্তর ঃ—দৈববাদী বা ভাগ্যবাদীর মতে, ক্রিয়মান কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে মানুষের কোনরূপ স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই। অপর পক্ষে, পুরুষকার বাদীদের মতে, মানুষের সর্ব্ব-কার্য্যেই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা আছে।

এই দুইটি মতের কোনটিই যুক্তিসহ নহে। দৈববাদ সত্য হইলে, মানুষের আর দায়িত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকে না, বা সুকৃতি-দুষ্কৃতি বলিয়া কিছু থাকে না। তাহা হইলে মনুষ্য-জীবন হইতে সর্ব্ববিধ উদ্যম ও প্রযত্নের বিলোপ করিতে হয়; কারণ দৈবই যদি একমাত্র সত্য হইল তাহা হইলে মানুষ ইচ্ছাহীন জড়-পদার্থ মাত্র,—যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকা মাত্র। সমস্ত কর্ম্মই যদি দৈবাধীন হইল, তাহা হইলে ক্রিয়মান কর্ম্ম রহিল কোথায়? তখন জন্মান্তর ঘটাইবে এরূপ কার্য্যের আর জের রহিল কোথায়?

পক্ষান্তরে, পুরুষকার-মত সত্য হইলে, তুল্য উদ্যমে সকল সময়ে সমান ফল পাইতাম, কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু তাহা হয় না; দেখা যায় একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, সমান পুরুষকারে, কর্ম্মের ফলবৈষম্য হয়। কোন শক্তিশালী যোগ্য ব্যক্তি প্রাণপণ প্রযত্ন করিয়া বিফল হইতেছে; আবার অধম, অযোগ্য ব্যক্তি স্বল্প-প্রযত্নে সাফল্য মণ্ডিত হইতেছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, একা পুরুষকার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহার সঙ্গে জন্মান্তরের সুকৃতি চাই—কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে দৈবেরও প্রয়োজন। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—"দৈবঞ্চবাত্র পঞ্চমং" (গীতা - ১৮.১৪)

দেখা যায় এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই রাজ্য-ভোগের অধিকারী, অপর চির-দরিদ্র; একজন সুস্থ সুন্দর, অপর চিররোগী

কদাকার ; একজন চক্ষুষ্মান, অপর জন্মান্ধ ; একব্যক্তি বিদ্বান তীক্ষ্ণবু অপর ক্ষীণ-বুদ্ধি। এই সব বৈষম্যের হেতু কি ? মানুষ যখন এ হেতুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখনি পুরুষকারের পশ্চাতে একটি শক্তি প্রভাব অনুভব করিতে থাকে ; এই শক্তিই দৈব।*

আরও এককথা, যদি ক্রিয়মান কর্ম্মে আমাদের কোন প্রকার স্বাধীনতা না থাকিল, তবে বিধাতা আমাদের মনোগুহায় বিবেক-বা প্রদান করিয়াছেন কেন ?—অবশ্যই তাহার সার্থকতা আছে। এ বিবেক উচ্চারিত অনুজ্ঞা দৃষ্টে বোঝা যায়, ক্রিয়মান কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদে

* এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান (১৩৫১) বর্ষের ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা 'ব্রহ্মবিদ্যায়' বন্ধুব শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর (Late President B. T. S.) কর্ত্তৃক আলোচি প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত নিম্নের অংশগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—

"প্রেতচক্রে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার গবেষণা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাক্‌দৃষ্টি (Prevision, Precognition, Premonition) বিশেষ ভাবে প্রমাণিত।

যাহা এখনও ঘটে নাই, তাহার সুদূর ভবিষ্যতের কোনরূপ লিপি বর্ত্তমানে থাকিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঘটনা বর্ত্তমানে জানা যায়, তাহা প্রমাণিত। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা প্রেতচক্রের পুস্তকে দেখিতে পাই। অতএব ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা এখন হইতে স্থির হইয়া রহিয়াছে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ব্যক্তিগত পুরুষকারের স্থান কোথায় ? তবে কি সৃষ্টি সময়েই সর্ব্বকালের ও সর্ব্বস্থানের ঘটনাবলী স্থির হইয়া গিয়াছে ?

বৈজ্ঞানিক জীন্‌স্ সমর্থন করেন যে,—অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্ত ঘটনা বর্ত্তমানেই রহিয়াছে ; সবই বিশ্ব-চৈতন্যে চির-বর্ত্তমান। ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করিবার স্বাধীনতা কেবল মোহ বশত ; বাস্তবিক ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলির এখনই অস্তিত্ব রহিয়াছে ; ইহাকেই থিয়সফি-গ্রন্থে চির-বর্ত্তমান ('Eternal now') বলা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক সোপেন হাউয়ার (Schoupenhauer) বলিয়াছেন— 'Man can do what he wills ; but he can not will, what he

স্বাধীনতা আছে। অন্যথা বিবেকের এই অমোঘ আদেশবাণী প্রচারিত হয় কেন? তাহা কদাচ নিরর্থক নহে, শাস্ত্র কখন প্রলাপ বাক্য বলেন না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি," 'কিন্তু যদি অহঙ্কার বশতঃ তুমি আমার কথা না শুন তবে বিনষ্ট হইবে।' (গীতা—১৮।৫৮) "বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু"—'ইহা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর' (গীতা—১৮।৬৩); ইত্যাদি উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা, শোনা না শোনা, করা না করা, অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; নতুবা ঐরূপ কথা বলার কোনই সার্থকতা থাকে না।*

---

wills'—অর্থাৎ, 'মানুষ তাহার বাসনা অনুসারে কাজ করিতে পারে; কিন্তু তাহার বাসনাই নিয়ন্ত্রিত, স্বাধীন নহে।'

বিশ্বের সমস্ত পরিবর্ত্তনই যে অক্ষর-পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহার সমর্থন আমরা উপনিষদ হইতে পাই—

"হে গার্গি, অক্ষর-পুরুষের শাসনেই চন্দ্র ও সূর্য্য যথাস্থানে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি"। "অক্ষর-পুরুষের ভয়েই ইন্দ্র, বায়ু, যম নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিতেছে এবং অগ্নি দহন করিতেছে ও সূর্য্য তাপ দিতেছে।"

ভগবদ্-ইচ্ছা স্বাধীন; বিশ্বে আর কোন ইচ্ছা নাই, কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও সত্তা নাই।

ভবিষ্যৎ ঘটনা কি তবে বর্ত্তমানে স্থির হইয়া রহিয়াছে? ভগবৎ-চৈতন্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকাল নাই; তিনি দেশকালের অতীত, সেখানে চির-বর্ত্তমান (Eternal now)। কল্পের প্রারম্ভে তাঁহার একবার কল্পনা করা হয়, —ঈক্ষা হয় এবং তাহা অমোঘ। সমস্ত কল্প-ব্যাপিয়া তাঁহার ঈক্ষা প্রতিভাবিক জগতে,—কালে, ক্রমশঃ প্রকটিত হয়। আত্যন্তিক ভবিতব্যতাই বিধি—Absolute determination is the law.

* এইখানে কিন্তু একটি গুরুতর সূক্ষ্ম তত্ত্ব সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। যদি মানবের প্রকৃতই অণুপরিমাণেও কিছু স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর ধারা, কিরূপ কি হইবে সঠিক কেহই,—এমন কি সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং

অদৃষ্টবাদে দৈব ও পুরুষকারের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। অদৃষ্টবাদী কর্ম্মাতিরিক্ত কোন দৈব মানেন না। বস্তুতঃ বুঝিয়া দেখিলে যাহাকে দৈব বলা হয় তাহাতো পৌরুষেরই নামান্তর। চেষ্টা,—প্রাক্তন বা পূর্ব্ব জন্মকৃত পৌরুষ, তাহাই ইহ জন্মে দৈবরূপে প্রকাশিত হয়। দৈব অর্থে ভাগ্য নহে—দৈব অর্থাৎ জন্মান্তর-কৃত সুকৃতি-বা-দুষ্কৃতি-জনিত অদৃষ্ট।

ভগবানও বলিতে পারিবেন না, এবং পারা কদাচ সম্ভবপরও নহে। আবার অপর পক্ষে, ভগবান সর্বজ্ঞ, ইহাতেও বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। তাহা হইলে এই জটিল সমস্যার যথাযথ সমাধান কি? জগতের যাবতীয় ভবিষ্যৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যদি নির্দ্দিষ্ট থাকে (কেননা, তাহা না হইলে পূর্ব্ব হইতে কেহই, এমন কি স্বয়ং ভগবানও, তাহা বলিতে সমর্থ নহেন;—কিন্তু তাহা অসম্ভব), তাহা হইলে তো ভবিষ্যতের 'ছক' সমস্তই একেবারে পাতা আছে। তাহার কোন প্রকারে, একটুও এদিক ওদিক করিবার কাহারও শক্তি নাই এবং কাহারও নূতন করিয়া কিছু করণীয় বা অকরণীয় নাই;—সমগ্র জগৎটাই যন্ত্রারূঢ়ের মত চলেছে—ইহার একটুও নড়-চড় করিবার উপায় নাই। এও অদ্ভুত রহস্য! শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুও মৌনাবস্থায় একস্থানে লিখিয়াছেন—"যতদিন পুরুষকার থাকে, ইচ্ছা না করিয়া পারে না; কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইবেই।" অন্য দিকে আবার, তাহা হইলে কাহারও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই থাকে না এবং কেহ ভাল কাজ করিলে, বা মন্দ কাজ করিলে তাহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবার কিছুই থাকে না—কোন বিধি-নিষেধের কিছুই সার্থকতা থাকে না!

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সমস্তই যদি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তবে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে অনর্থক এত কথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাহাতে বক্তব্য এইযে ইহাও, অর্থাৎ এত কথা বলাও, নির্দ্দিষ্ট ছিল।—শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত বলিবেন এবং "বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু"—'ইহা সমস্ত বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।'—ইহাও ভগবান বলিবেন এবং তৎপরে অর্জ্জুনও—"নষ্টোমোহঃ স্মৃতি লব্ধা...করিষ্যে বচনং তব" 'হে

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বের প্রথমেই এই প্রসঙ্গে সুন্দর একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের-অধীন-আত্মা, যে পাপ-পুণ্যের কারণ হইতে পারে না—আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না, এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ নিমিত্তই ভীষ্মদেব কর্তৃক এই আখ্যায়িকার অবতারণা—

এক শান্তি-পরায়না বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী গৌতমীর একমাত্র পুত্রের সর্প-দংশনে মৃত্যু ঘটে। তখন ক্রোধাবিষ্টচিত্ত অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ঐ সর্পকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, গৌতমী তাহাতে বাধা প্রদান করেন এবং বিতর্কের পর ইহাই স্থির হয় যে, সর্প তাঁহার পুত্রকে দংশনের জন্য দায়ী নহে,—সর্প প্রযোজ্য কর্ত্তা, সে স্বাধীন নহে; প্রত্যুত 'মৃত্যুই' প্রয়োজক 'কর্ত্তা ;—মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই সে বালককে দংশন করিয়াছে। পরে বিচারে দেখা যায় মৃত্যুও 'কাল' কর্ত্তৃক প্রেরিত

অচ্যুত, আমার সমস্ত মোহ নষ্ট হইয়াছে···এখন আমি তোমার আদেশ পালন করিব'—বলিয়া,যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইবেন,—ইহা সমস্তই নির্দ্দিষ্ট ছিল।—ইহা দ্বারা অর্জ্জুনের মোহ বিগত হইবে এবং তাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া জগবাসী নরনারী সকলেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মোহ বিমোচন হইবে।—এ সমস্তই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট!—ইহা এক অতীব অদ্ভুত রহস্য!!

এই সঙ্গে আরও একটি গভীর চিন্তার বিষয় এই যে. লৌকিক জগতে দেখা যায়, বাৎসল্যময়ী জননী কখনই সন্তানের কোনরূপ অকল্যাণ করেন না,—সন্তান তাহা বুঝুক, আর না বুঝুক; তবে নিজ বুদ্ধির দোষে, ভ্রমবশতঃ কল্যাণ করিতে গিয়া হয়ত অকল্যাণ করিয়া বসেন, সে কথা স্বতন্ত্র। এখানে ইহা বিবেচ্য এই যে ঐ জননী এতাদৃশ স্নেহ পাইলেন কোথা হইতে?—সেই জগজ্জননীর স্নেহের এক কণিকা স্নেহ লাভ করিয়াই তো তাঁহার সন্তানের প্রতি ঈদৃশ কল্যাণাকাঙ্ক্ষা। এমত অবস্থায় সেই মূল স্নেহের পারাবার জগজ্জননীর ক্রোড়ে আমরা সকলেই সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছি এবং তিনি চিন্ময়ী—পূর্ণ জ্ঞানের আধার; এমত ক্ষেত্রে তিনি যাহার যেরূপ বিধিব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই

হইয়াই ঐরূপ আচরণ করিয়াছে। পরিশেষে আবার, ইহাই স্থির-সিদ্ধান্ত হয় যে,উহারা কেহই বালকের মৃত্যুর কারণ নহে। উহারা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজক কর্ত্তা মাত্র; পরন্তু, ঐ বালকের পূর্ব্বানুষ্ঠিত 'কর্ম্ম' উহাদিগকে উহার বিনাশ সাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ঐ বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃ অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মকেই উহার বিনাশের প্রকৃত কারণ বলিতে হইবে। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটাদি নির্ম্মান করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে।...ঐ শিশু স্বয়ংই উহার বিনাশের কারণ, অপর কেহই নহে।

মহাঃ অনুশাসন—১ম অ

চরম পরম কল্যাণকর; তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব দুঃখভোগের সময় ম্রিয়মান হওয়া মূঢ়তার কার্য্য—এ সমস্তই করুণাময়ীর কৃপাবর্ষণ-জ্ঞানে মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লওয়াই সুবিবেচকের কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই পরম শান্তি।

আপাতদৃষ্টিতে জীবের মৃত্যু জগজ্জননীর নিষ্ঠুরতার কার্য্য বলিয়াই প্রতীতি হইলেও, প্রত্যুত উহা তাহা নহে। উহা তাঁহার জীবের প্রতি করুণারই নিদর্শন মাত্র। স্নেহময়ী মাতা স্তনপানরত শিশুর মুখ হইতে স্তন ছাড়াইয়া লইলে, শিশু রুষ্ট হইয়া ক্রন্দন করে এবং মাতাকে নিষ্ঠুর মনে করে—অবোধ শিশু বোঝে না যে ঐ স্তনের দুগ্ধ নিঃশেষ হওয়ায়, দুগ্ধে পূর্ণ অপর স্তনটিতে মুখটিকে লাগাইয়া দিবার জন্যই বাহ্যতঃ এই নিষ্ঠুরবৎ আচরন। তদ্রূপ মৃত্যুর ব্যবস্থাও জীর্ণ (অথবা, বৃদ্ধ না হইলেও কর্ম্মফলে জীর্ণ) দেহকে নবকলেবর প্রদানের জন্যই স্নেহময়ী জগজ্জননীর এই নিষ্করুণবৎ আচরণ।

দেবতা ও অসুর উভয়েই জগজ্জননীর সন্তান। অসুরগণের প্রতি তাঁর যে নির্ম্মম ব্যবহার, উহা তাহাদের অসুর স্বভাব দূর করিবার জন্যই মায়ের করুণার নিদর্শণ মাত্র। বাহ্যদৃষ্টিতে অসুর সংহার; পরন্তু, মায়ের দিব্যদৃষ্টিতে দণ্ডদ্বারা অসুর স্বভাব ঘুচাইয়া বিশুদ্ধ-নবকলেবর প্রদানের ব্যবস্থা মাত্র। তাহারা এমনি বিকৃত স্বভাবসম্পন্ন যে বলাৎকারে মাকেই বিবাহ করিতে উদ্যত! মাতৃঅনুগত দেবতাদের প্রতি তিনি চিরপ্রসন্ন—'বরাভয়করা'।

দৈবের যে নিগড় তাহা আমাদেরই স্বরচিত এবং ঐ আত্মকৃত বন্ধন আমরা উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা ছেদন করিতে পারি। সেই জন্য বলা হয়,—কার্য্য সিদ্ধির জন্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই যোজনা আবশ্যক। যেমন দুই চক্র নহিলে রথ চলে না, বা দুখানা দাঁড় নহিলে নৌকা চলে না, বা দুটি পাখা নইলে পাখী উড়িতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ। প্রত্যুত, যেমন অন্ধ ও খঞ্জ উভয়ের মিলনে কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই সংযোজন প্রয়োজন।

এই ক্রিয়মান কর্ম্মের অনুষ্ঠান-সামর্থ্যকে পুরুষকার বলে—'পুরুষ-কার', অর্থাৎ পুরুষের কৃতি বা প্রচেষ্টা। সাধারণ জীবে এই পুরুষকার বড়ই দুর্ব্বল; বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুরুষকার সমষ্টিই এই জন্মে দৈবরূপে ক্রিয়া করে; এই এক জন্মের পুরুষকার দ্বারা তাহা বিশেষভাবে খণ্ডন করা সাধারণ জীবের সাধ্যাতীত; একারণ 'ভবিতব্যতাই বিধি', এ রূপেই প্রতীয়মান হয়। এ সম্বন্ধে আমাদেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বহুকাল পূর্ব্বে স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি তাহা তৎকালে অসম্ভব মনে হইলেও, যথা সময়ে তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ "ভৃগু-সংহিতা" প্রভৃতির কোষ্ঠি-গণনার ফল এবং কোন কোন বিশিষ্ট গণকের কর-কোষ্ঠির গণনার ফল, বহুকাল ধরিয়া বর্ণে বর্ণে ফলিতে দেখা যায়; আবার রামায়ণ, মহা-ভারতাদিতে—পরশুরামের দর্পচূর্ণ হওয়ার সময়ে, দুর্য্যোধনের জন্মকালে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সময়ে, বা কুরুক্ষেত্র-সমরপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুরুতর দুর্ঘটনার পূর্ব্বাভাস স্বরূপ যে সকল দুর্নিমিত্ত দর্শনের উল্লেখ আছে দেখি, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। আমারাও ব্যক্তিগত জীবনে ঐরূপ দুর্নিমিত্ত যে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস তাহা বহুক্ষেত্রে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছি। এ কারণে এসকল অনেক সময়েই অখণ্ডনীয় বিধি বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু প্রত্যুত তাহা নহে। তাহা হইলে গ্রহ-বৈগুণ্যাদি-প্রযুক্ত দুরারোগ্য ব্যাধি, প্রাণ-হানিকর-যোগ (ফাঁড়া) প্রভৃতি দূর

করিবার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কবচ-ধারণ, পুরশ্চরণ, দেব-দেবীর নি
ধর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞাদি প্রভৃতির, শাস্ত্রে ব্যবস্থা কেন? তাহা সমস্তই
তাহা হইলে নিরর্থক হইয়া যায়। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ কদাচ নি
স্তোক বাক্য প্রয়োগ করেন না। কঠোর তপস্যা দ্বারা সাবিত্রী ক
বিধি-লিপি খণ্ডন-বিবরণ কদাচ উপেক্ষনীয় নহে। ইহাতে এই সিদ্ধা
হয় যে, বহু জন্মের পুরুষকার-সমষ্টিরূপ-দৈব এক জন্মের পুরুষকা
দ্বারা বিশেষ খণ্ডন করা সাধারণ জীবের সাধ্যাতীত হইলেও, তা
একেবারে অখণ্ডনীয় নহে। যথাযোগ্য পুরুষকার প্রযুক্ত হইলে তা
পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে তাহা হইয়াছে, তাহার যথে
প্রমাণ রহিয়াছে। জীব যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহা
পুরুষকারের পরিমান বৃদ্ধি হয়, ততই সে অদৃষ্টের বশ্যতা হইতে মু
হইতে থাকে। এই জন্যই দেখা যায়, যোগীদিগের কোষ্ঠীফল প্রা
মেলে না। তাঁহাদের অনেকেরই আয়ু শতাধিক, অর্থাৎ কোষ্ঠী
গণনার অধিক।

এই জন্মের পুরুষকার পর জন্মের অদৃষ্ট, এইরূপে তাহার কর্ম্মপ্রবা
অনাদিকাল হইতে চলিয়াছে। আমরা দেখিলাম পুরুষকার ও দৈ
মূলতঃ একই পদার্থ। দৈবের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বত্ত্বাধিকার স্বীকা
করিবার প্রয়োজন হয় না, দুইটিরই মূল কর্ম্ম; এই কর্ম্ম তিন প্রকার—
প্রারব্ধ, প্রাক্তন, ও ক্রিয়মান। যে কর্ম্মফলের ভোগ ইহজীবনে
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা যে কর্ম্মফলের ভোগোপযোগী বর্তমান দে
ও পারিপার্শিক অবস্থাদির প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। ইহ
জীবনের ভোগ ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহার ভোগ অবশ্যম্ভাবী, অন্যথা
হইবার নহে। তূণীর হইতে যে শরটি নিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা
আর ফিরাইবার উপায় নাই। কিন্তু যে শরটি হাতে রহিয়াছে তাহার
উপর আমার কর্তৃত্ব রহিয়াছে। প্রারব্ধ ভোগ করিতে যে কর্ম্ম করা
হয় তাহা ক্রিয়মান কর্ম্ম। এই কর্ম্ম-প্রসূত সংস্কারই পরজন্মের

অদৃষ্ট এবং এই অদৃষ্টই—"প্রাক্তন"। ইহার উপর জীবের কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং এই কর্ম্ম সম্বন্ধেই পুরুষকার প্রযোজ্য। অদৃষ্টচক্রে ঘূর্ণমান জীব অদৃষ্টবশেই পুনঃপুনঃ সংসার গতি লাভ করে, বা পুনঃ-পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না, একারণ মানুষ অদৃষ্টের অত্যাধিক নির্ভরশীল হইয়া কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে,—এই আশঙ্কায়, 'দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি'; "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরষমাত্মশক্ত্যা", ইত্যাদি নীতি-শাস্ত্রের প্রচলন রহিয়াছে। অদৃষ্টবাদ হইতে জন্মান্তরবাদ; জন্মান্তরে বিশ্বাস হইলে অদৃষ্টবাদ মানিতেই হয়। সুতরাং এই সকল নীতি বা শাস্ত্র বাক্যের কোনটিই অদৃষ্টবাদ নিরসন করিবার অভিপ্রায়ে প্রয়োগ হয় নাই বুঝিতে হইবে।

যোগবাশিষ্ঠের মতে, ক্রিয়মান-কর্ম্মের দ্বারা প্রারব্ধ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; জন্মান্তরীণ দুষ্কৃত-জনিত-দুর্ভাগ্য ইহজন্মকৃত সুকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। বিশ্বামিত্র, সাবিত্রী, ধ্রুব প্রভৃতি যথোচিৎ উপায় অবলম্বন করিয়া অদৃষ্টের বিধানকে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। এই তিন জনই ক্রিয়মান কর্ম্মদ্বারা যথাক্রমে প্রারব্ধ জনিত জাতির, আয়ুর, ও ভোগের পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন।

এই দৃষ্টান্তগুলি অতি সারগর্ভ, ইহার মধ্যে দৈববাদ ও পুরুষকারের সম্পূর্ণ সমন্বয় দৃষ্ট হয়। মানুষের অবস্থা জন্মান্তরীণ সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল; কিন্তু পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টের নিরসন করা যায়।

ধ্রুবের জননী উপদেশ দিলেন—'পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নশীল হও, তবে অভীষ্টলাভ করিবে।' মানুষের ক্রিয়মান কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণ অদৃষ্টাধীন হইত, মানুষের সঞ্চিত কর্ম্ম যদি ক্রিয়মান কর্ম্মের অবশ্য নিয়ামক হইত, তবে ঐ উপদেশকে অসার বলিতে হইত; পরন্তু, ঐ উপদেশের অনুসরণ করিয়া ধ্রুব অতি ত্বরায় সিদ্ধিলাভ করিল। প্রারব্ধের ফলে জীবের জাতি, আয়ু ও ভোগ নিয়মিত হয়, একথা সত্য বটে কিন্তু আমরা

দেখিলাম প্রযত্ন ও পৌরুষ দ্বারা প্রারব্ধজনিত ঐ জাতি, আয়ু, ভোগ সমস্তই পরিবর্ত্তন করা যায়; এবং করা যায় বলিয়াই মা[illegible] অদৃষ্টের ক্রীড়া-পুতুল নহে; সে ভাগ্যের নিয়ামক।

আপাতদৃষ্টিতে 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণে'র নিম্নোক্ত শ্রুতি দেখিলে মানুষের কর্ম্মস্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিতে হয়। শ্রুতিটি এই,—"ঈশ্বর যাহাকে ইহলোক হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধুকর্ম করান।" শ্রীশঙ্করাচার্য্য কিন্তু ঐ শ্রুতির ভিন্ন অর্থ বুঝিয়াছেন। তাঁহার অভিমত-অর্থই সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন,—"ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া জীবের পাপ-পু[illegible] অনুসারে উত্তম, মধ্যম, ও অধম, এই ত্রিবিধ অবস্থার ব্যবস্থা করেন।" তিনি ঐ মতের সমর্থন জন্যই উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএ[illegible] স্বীকার করিতেই হইবে যে ক্রিয়মান কর্ম্মে আমাদের স্বাধীনতা আছে, সেইজন্যই বিবেকের বাণী ও শাস্ত্রকারের বিধি।

আমরা ব্রহ্ম-সিন্ধুর বিন্দু,—সেই চিন্ময়ের চিৎকণ; তিনি বি[illegible] চৈতন্য—জীব অনুচৈতন্য। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন :—

"মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন।" গীতা—১৫।৭

অতএব জীবাত্মা যখন সেই পরমাত্মারই অংশ, তখন সে স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। Freewill বা স্বাধীন ইচ্ছায় তাহার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। এমত অবস্থায় যুক্তিহীন দৈববাদ স্বীকার করিয়া কে[illegible] আবার সেই অধিকারের সঙ্কোচ করিব এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঐ মতবাদের প্রচারে সমাজের যে অকর্ম্মন্যতা, নিশ্চেষ্টতা ও উদাসীনতার সম্ভবনা, তাহার প্রশ্রয় দিব?

এশিয়া সম্মেলনে (তাং—১৯।১২।৫৩) মহাত্মা গান্ধীজী তাঁহার ভাষণে বলেন,—"আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা উচিত এবং কর্ম্মফল মানুষের হাতে অর্পণ না করিয়া ভগবানের হাতে অর্পণ করা উচিৎ। লোকে মনে করে

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা ; কিন্তু তাহা আংশিক সত্য মাত্র। সেই মহাশক্তি আমাদের সমস্ত ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া আপনার পরিকল্পিত পথে মানুষকে লইয়া যায়। তাঁহারই অনুগ্রহে মানুষ ভাগ্য রচনা করে। আমি সেই শক্তিকে আল্লা, খোদা বা ভগবান বলিয়া অভিহিত করিতে চাই না,—তাঁহাকে বলিতে চাই—'সত্যং'।

(২)

বিচিত্র কর্ম্মের বিচিত্র গতি, শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফলের উল্লেখ আছে। কর্ম্মই জীবের যাবতীয় সুখ-দুঃখ স্বর্গ-নরকাদি-ভোগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কর্ম্মবাদী দার্শনিকদের মতে বেদবিহিত কর্ম্মই জীবকে চরম সুখ দানে সমর্থ; সুতরাং সর্ব্বোতভাবে কর্ম্মই ঈশ্বর। কিন্তু কর্ম্মপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা মানিয়া লইলে 'নির্মোক্ষবাদ' আসিয়া পড়ে। এজন্য অপর দার্শনিকগণ আরও একস্তর উপরে উঠিয়া বলিলেন—এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ন্তা ভগবান ; তাঁহার চরণ আশ্রয়ে এই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব ; নতুবা, জীবের সাধ্য নাই যে, কর্ম্ম-বিপাক হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন—'যমৈবৈষবৃণুতে তেন লভ্য,তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।' (কঠ—১।২।২৩) অর্থাৎ, 'যাহাকে এই পরমাত্মা কৃপা করিয়া বরণ করেন, তাহার নিকট তিনি স্বকীয় তনু, অর্থাৎ স্বরূপ, প্রকাশ করেন।' পুনশ্চ—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥" গীতা—৭।১৪

কর্ম্মবাদীদের দৈব-পুরুষকারের সাধারণ নিয়ম ভগবদ্ভক্তদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। যাহারা একমাত্র নিজ পুরুষকারের উপরই সম্পূর্ণ আস্থাবান—ভগবানের অনুগ্রহ-নিগ্রহের অপেক্ষা রাখে না, তাঁহাদের নিকট জগন্নাথ সত্যসত্যই হস্তপদহীন। তাঁহাদের মতে জীবের সুখ-

দুঃখাদি ভোগে ভগবান সম্পূর্ণ উদাসীন ; তাহাদের দৃষ্টিতে ত্রি 'সকলের কাছেই সম' ;—'তাঁহার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই', "সমোহং সর্ব্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ" ; কিন্তু একান্ত শরণাগত ভক্তের নিকট তিনি 'ভক্তাধীন'—'প্রেমাধীন', 'ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু' 'করুণাসিন্ধু'। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের করুণাকটাক্ষে কোটি-কোটি জন্মের প্রারব্ধ মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষয় হইয়া যায়।

গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'কর্ম্ম শেষ না কর্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না'—একথা ঠিক নয়। কর্ম্ম শেষ হতে আর কি লাগে; তাঁর কৃপা হলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ শেষ হয়ে যায়।

ভগবদ্ভক্তির সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেণৈব প্রলীয়তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মণাং ॥"

অর্থাৎ, 'যাঁহাদিগের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত তাঁহাদিগের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ, এই পাপচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।'

"অনিমিত্তা ভাগবতীভক্তিঃ সিদ্ধে র্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলোযথা ॥" ভাঃ—৩।২৫।৩৩

কপিলদেব বলিলেন,—'মাত! জঠরানল যেমন স্বল্পক্ষণে (মানবের অজ্ঞাতসারে ও নিজ প্রযত্ন বিনা) ভুক্তান্ন জীর্ণ করিয়া ফেলে, ঐ স্বাভাবিকী (অহৈতুকী) ভক্তিবৃত্তিও সেই (হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইলেই) মানবের অতীত বহুজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও বাসনাজনিত সংসার-প্রবর্ত্তক সূক্ষ্ম-শরীরকে দেখিতে দেখিতে ক্ষয় করিয়া ফেলে।'

ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন :—

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥" ভাঃ—১১।১৪।১৯

'হে উদ্ধব, সুপ্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি (মানবের সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান কর্ম্ম জনিত) নিখিল পাপরাশিকে বিনাশ করিয়া থাকে।' আরও বলিয়াছেন,—

"ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।" ভাঃ—১১।১৪।২১

'হে উদ্ধব, যে ভক্তি আমাতে নিষ্ঠাদশাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ভক্তি শ্বপাককেও জাতি-দোষ হইতে শোধন করিয়া থাকে।' এস্থলে নিষ্ঠাভক্তির দুর্জ্জাতি-দোষ হরণ-শক্তি থাকায়, প্রারব্ধ-হারিত্বের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। কর্ম্মবাদীগণের হিসাব এখানে আর খাটে না। ভক্তের নিকট কদাচ তিনি "সম" থাকিতে পারেন না; এজন্য তিনি,— "সমোহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ।" বলিয়াই তৎসঙ্গে-সঙ্গে বলিলেন,—"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা, ময়িতে তেষ্ চাপ্যহং॥" (গীতা—৯।২৯) 'সকল-ভূতে আমি সম, আমার কেহ প্রিয় বা কেহ অপ্রিয় নাই; পরন্তু, যে ভক্তগণ আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রকট হই।'—আমার গৃহের ইন্দুর, আরশুলা, পিপীলিকা প্রভৃতি, আমার গৃহে প্রতিপালিত হইলেও, সাক্ষাৎ ভাবে আমার তাহাদের সহিত,—তাহাদের সুখ-দুঃখের সহিত, কোন সম্বন্ধ নাই; কিন্তু আমার গৃহে প্রতিপালিত আমার আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখে বিচলিত হই এবং প্রতিকারে সচেষ্ট হই। জগৎ-পালক জগন্নাথও তদ্রূপ কর্ম্মপরতন্ত্র সাধারণের সুখ-দুঃখে উদাসীন থাকিলেও, শরণাগত ভক্তের প্রতি কদাচ উদাসীন থাকিতে পারেন না,— সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করেন। ভগবান রাজ-বিদ্যা, রাজ-গুহ্য-যোগ প্রসঙ্গে সাধারণ-বুদ্ধির-অগম্য অতি গুহ্য কথাই বলিয়াছেন,—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥" গীতা—৯।৩০

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" গীতা—৯।

ভগবৎ-কৃপায় অতীব কদাচারী পাপী-তাপীর প্রারব্ধ-ক্ষয়ে অচি[রে] উদ্ধারের ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের ও অপরাপর জাতির ধর্ম্মশা[স্ত্রে] বর্ত্তমান রহিয়াছে। শক্তিধর মহাপুরুষদিগের কৃপাশক্তিতেই কত উৎক[ট] দুরারোগ্য ব্যাধির, বিকলাঙ্গ প্রভৃতির, উপশান্তি ঘটিয়া থাকে, তখ[ন] সর্ব্বশক্তিমান সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপায় যে সকল অনর্থের উপশা[ন্তি] হইবে, বা প্রারব্ধ ক্ষয় হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? শ্রীকৃ[ষ্ণ] কর্ত্তৃক গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ, যমালয় হইতে সন্দীপনি-মুনির মৃতপু[ত্র] আনয়ন, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখন কথা এই যে, ঐ কৃপাশ[ক্তি] লাভ করিতে আমাদিগের দিক হইতেও যথাবিধি প্রচেষ্টা বা সা[ধনা] প্রয়োজন,—তাহা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কর্ম্ম দ্বারাও নিষ্পন্ন হইত[ে] পারে—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥" গীতা—৭।

ভগবৎপ্রীত্যর্থ-কর্ম্মদ্বারা পাপ বিমুক্ত হইয়া চিত্ত-শুদ্ধ হইলেই দৃ[ঢ়] ব্রতদ্বারা ভগবানের ভজনা করিতে পারে এবং ভজনের তীব্রতা অনুসারে কৃপারও তারতম্য ঘটে। অথবা, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাক্ষাৎ বিশুদ্ধভক্তি অঙ্গের সাধন দ্বারা আরও সহজে তাঁর কৃপা আকর্ষণ হয়। ভক্তের ঐ যে প্রচেষ্টা তাহা পুরুষকার পদবাচ্য না হইলেও, উহা কোন অংশে ক[ম] পুরুসকার নহে। অসুরভাবাপন্ন অহঙ্কারী জীবের ভগবদ্-চরণে শরণাগত হওয়া সহজসাধ্য নহে, উহাতে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন। ভগবান বলিয়াছেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" গীতা—৭।১৫

যে বশীকরণ মন্ত্রে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং-ভগবান বশীভূত হয়েন তাহাতে

সিদ্ধিলাভ করা সামান্য কথা নহে, তাঁহা অতীব কঠোর সাধনা বা প্রচেষ্টা হইতেই সম্ভবে।—পরন্তু তাহাই চরম-পরম পুরুষকার। দেবদেবীর নিকট প্রাণপণ করিয়া 'হত্যা' দিয়া অতিশয় উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধি প্রভৃতির উপশান্তি,—ইহাতো আমার নিজের পরীক্ষিত প্রত্যক্ষানুভূত ঘটনা; তবে যদি দম্ভভরে ইহাতে অনাস্থা প্রকাশ করি, সে কথা স্বতন্ত্র।

মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার প্রবল প্রয়াস (সাধনোত্থ পরিশ্রম), ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার আবির্ভাব ও বন্ধন দশা প্রাপ্তি; অথবা, রাজসভায় বস্ত্রহরণ কালে, দ্রৌপদীর আকুল আর্ত্তনাদে দয়ার্দ্র-হৃদয়ে ভগবানের বস্ত্ররূপে আবির্ভাব; অথবা, গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলায়,—ঐ হস্তি ও তাহার পত্নীদের সকল প্রকার বাহ্য প্রচেষ্টা বিফল হইলে, অনন্যোপায় গজরাজের আর্ত্তনাদে সুদর্শন-চক্রসহ ভগবানের আবির্ভাব; —উহার কোনটিই কম পুরুষকার বলিবার যোগ্য নহে। পরন্তু, উহাই পুরুষকারের বা আত্মশক্তির প্রকৃষ্ট প্রকাশ; আর এ সকল ক্ষেত্রে আত্মিক-শক্তির প্রকাশ যথাযথরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলে আত্মিক-শক্তি যে কোটিগুণে অধিক ফলপ্রসূ তাহা বলাই বাহুল্য।

অজামিল-উদ্ধার প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি,—অজামিল, পুতনা, অহল্যা প্রভৃতির কৃপালাভ আকস্মিক নহে, উহার মূলে যথেষ্ট ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তির অনুকূল প্রচেষ্টা বর্ত্তমান ছিল। অধিকন্তু, ভক্তি-অঙ্গের যাজন বিঘ্ন-শূন্য, আদ্যন্ত-সুখকর ও অমোঘ। একারণ কলির জীবের পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। তবে যাহাদিগের ভগবানের প্রতি আস্থা নাই, বা তাঁর কৃপা শক্তিতে বিশ্বাস নাই, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের পক্ষে কর্ম্মবাদীদিগের পন্থা অবলম্বন করাই বিধেয়। পরে কোন সুকৃতিবলে, সৌভাগ্যক্রমে, ভগবৎ-কৃপায় শ্রদ্ধা হইলে, তাঁর কৃপা-প্রাপ্তির জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে সে পথে চলিবার জন্য প্রয়াস পাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য হইবে।

ভক্তি ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ-শক্তি। উহা আত্মিক-শক্তি (*soul force*) নামে অভিহিত হয়। আমরা যাহাকে পুরুষকার বলিয়া থাকি তাহা প্রাকৃত বা জড়শক্তি ; তাহা ঐ আত্মিক-শক্তির তুলনায় অতীব অকিঞ্চিৎকর। ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রহিয়াছে হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ সংবাদে—

ত্রিলোক-বিজয়ী হিরণ্যকশিপু পুরুষকারের প্রকট-মূর্ত্তি। নিজ পৌরুষবলে যতদূর সিদ্ধিলাভ সম্ভবে, তাহার কিছুই তাঁর অভাব ছিল না; কিন্তু তিনি ভগবদ্ভক্তি বা তাঁহার কৃপাশক্তিতে শুধু যে সম্পূর্ণ আস্থাহীন তাহা নহে,—পরন্তু তাঁহার ভীষণ বিদ্রোহী! অপর পক্ষে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, পঞ্চম বৎসরের অসহায় বালক প্রহ্লাদ,—কোন প্রকার সহায়-সম্বলহীন, ভগবৎ-চরণে একান্ত শরণাগত। পুরুষকার ও শরণাগত ভক্তের ভক্তি-শক্তির এই রোমহর্ষণ দ্বন্দ্বে (ইহাই দেবাসুরের সংগ্রাম) অতি-বড়-দুর্দ্ধর্ষ দানবরাজের সকল প্রকার পৌরুষ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং ভক্তরাজ প্রহ্লাদের একান্ত শরণাগতিই চরমে জয়যুক্ত হইল। সুধীগণের চরম সিদ্ধির জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় ইহা হইতে আর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে?

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু মৌনাবস্থায় লিখিয়াছেন—

"পুরুষকার কৃষিকার্য্যের কৃষকের কার্য্যের ন্যায়। কৃষকের ভূমি প্রস্তুত, শস্য-রোপণ; এই পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য ; তাহার পর ক্ষমতা নাই। আকাশ হইতে জল বর্ষণ না হইলে, সে জল-সেচন করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। আন্তরিক উদ্যম—তপস্যা ; ইহা প্রযুক্ত হইলে, মেঘ হইতে জল বর্ষণের ন্যায় কৃপা বর্ষণ হয়।"

শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ—৫ম, ১২৭ পৃ

তবে যে ভগবানের অহৈতুকী-কৃপা বলা হয়, ইহা কি অলীক?— তাহা কদাচ নহে ; সাধারণতঃ, তিনি কোন্ সূত্রে, কাহাকে কি ভাবে কৃপা করেন তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য এবং ঐ কৃপা প্রাকৃত কোন

সাধন দ্বারা লভ্য নহে বলিয়া কোন বাহ্যিক হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, এজন্য 'অহৈতুকী' বলা হয়। কিন্তু তিনি কোন কিছুরই সূত্র অনুসন্ধান না করিয়াও যে কাহাকে কৃপা করিতে পারেন না, বা কখন করেন না, একথা বলা ধৃষ্টতামাত্র,—তিনি পরম স্বতন্ত্র পুরুষ। পক্ষান্তরে, তিনি খামখেয়ালির বশে কাহাকেও কখন কৃপা করিলেন, আবার কেহ প্রকৃত কৃপার যোগ্য পাত্র হইয়াও সেরূপ কৃপা পাইলেন না, একথা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তিনি করুণাময়, তাঁহার করুণার অবধি নাই; এবং আমাদের মত হিসাব-নিকাশ করিয়া করুণা না করিতে পারেন সত্য,—তাঁহার করুণার সূক্ষ্মধারা আমাদের ধারণার অতীত হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার করুণা বিতরণের একটা প্রণালী নাই, একথা বুঝিব কেন? তাহা হইলে আমরা দাঁড়াইব কোথায়, কোন পথে চলিব? সেই অনন্তদেব, অধরচাঁদকে ধরিবার অনন্ত পথ থাকিতে পারে। তাই বলিয়া, ঐ পথ গুলির কোনও একটা শৃঙ্খলা নাই বলিলে চলিবে কেন? তাঁর খেয়াল মত কখন্ উদ্ধার করিবেন বলিয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া না থাকিয়া, ভব-সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তির মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদ করাই চতুরতার কার্য্য। তাহাতে অবশ্যই তিনি কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিয়া, তাহা ধরিবার সামর্থ্য দিয়া, চরণতরীতে আশ্রয় দিবেন।

একটু স্থির চিত্তে অনুধাবন করিলে এই সূক্ষ্মতত্ত্বের একটা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে এবং তাহাতে সকল সংশয়ের একটা সমাধানও হইতে পারে। সাধক যখন কঠোর সাধনার পথে, সাধনার একটা চরম ভূমিতে পৌছায়,—প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের সাহায্যে যখন আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় না, তখন অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ইষ্টবস্তু লাভের প্রতি নিরাশ হইয়া বাহ্য প্রচেষ্টার প্রতি অনাস্থা প্রযুক্ত, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সেই সর্ব্বশক্তির আধার, বিভূশক্তির প্রতি স্বতঃই যথার্থ শরণাগতির ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে। সাধকের তখনকার

মর্ম্মভেদী কাতর ডাক তাঁহার নিকট পৌছায় এবং তাহার প্রতি তাঁ
করুণার উদ্রেক হয়। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ কালে দেখি,—পূর্ব্বে দ্রৌপদীর মনে ম
বড় গর্ব্ব ছিল দিকপালসদৃশ পঞ্চ-পাণ্ডব তাঁহার স্বামী, পিতামহ ভী
এবং গুরু দ্রোণাচার্য্যাদি তাঁহার সহায়; কিন্তু দারুণ বিপন্ন অবস্থায়, বি
হইবার অশঙ্কায়, যখন তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন এবং একে এ
সকলকেই যখন নীরব দেখিলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল এবং সক
অভিমান বিচূর্ণ হইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিজশক্তি
যথাসাধ্য একহস্তে বস্ত্রধারণ করিয়া, অপর হস্তে কাতর-প্রাণে 'লজ্জা
নিবারণ'-হরিকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেও যখন নিরাশ হইলে
তখন একান্ত হতাশ-প্রাণে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আকুল ক্রন্দনে
রোল উত্থিত হইল এবং বাহ্যিক সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া, ক
একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, ভগবৎচরণে একান্তপ্রাণে শরণাগত হইলে
তখন তাঁহার মর্ম্মভেদী আকুল-ক্রন্দন (অপ্রাকৃত ডাক) ভগবৎ সমীপে
পৌছিল, অমনি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন!

(২) গজেন্দ্র-মোক্ষণ-লীলায় দেখি,—অমিত বিক্রমশালী, পশুবল
দৃপ্ত গজরাজ, মহাবল কুম্ভীরের গ্রাস হইতে যখন কোন প্রকারে
রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখিতে পাইল না—নিজ সামর্থ্য ও
আত্মীয়স্বজনের শক্তি-সমষ্টি সহযোগেও যখন কোন কুলকিনারা
পাইল না—ক্রমেই ক্ষীণবল হইতে লাগিল, তখন তাহার সকল গর্ব্ব
বিচূর্ণ হইল। তৎকালে একান্ত নিরুপায় হইয়া হতাশপ্রাণে পূর্ব্বজন্মের
সংস্কার বশে অচিন্ত্য মহাশক্তিমান পুরুষের কথা মানস পটে উদয়
হওয়ায়, নিরতিশয় কাতর প্রাণে তাঁহার চরণে সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন
হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উদ্ধার
করিলেন।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন-লীলায় দেখি,—গোপালকে শাসন

করিবার উদ্দেশে, অভিমানভরে মা যশোদা স্তূপীকৃত রজ্জু সংযোগ করিয়াও শিশুপুত্র গোপালের কটিদেশটুকু কোন প্রকারেই বন্ধন করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে তাঁহার বসন-ভূষণ স্থানভ্রষ্ট হইতে লাগিল এবং তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলেন। তাহা দেখিয়া সমুপস্থিত গোপীগণ হাস্য করিতে থাকিলে, অপ্রতিভ হইয়া, অতি অনিচ্ছা সত্ত্বে তিনিও হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু, অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ অন্তরে, এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন! (ভাঃ—১০।৯।১৭) তখন তাঁহার মনে হইল,—'কি লজ্জার কথা, আমি মা হ'য়েও বুঝিবা এই ক্ষুদ্র শিশুকে কোন মতে বন্ধন করিতে পারিলাম না ;—কি আশ্চর্য্য !' —এইরূপে তাঁহার সকল গর্ব্ব বিচূর্ণ হইলে আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থা-শূন্য হওয়ায় তখন তাঁহার অন্তর অবিচিন্ত্যশক্তি বিভুপদে কাতর শরণা-গতি জ্ঞাপন করিল।—অমনি একান্ত পরিশ্রান্তা বাৎসল্যময়ী জননীর প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়িল এবং কৃপাপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন। (ভাঃ—১০।৯।১৮)

(৪) রাস-লীলাতেও দেখি,—রাসে সমাগত গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখান করিলে, তাঁহাদের অশ্রুপূর্ণ কাতর প্রার্থনায়, তিনি দয়াপরবশ হইয়াতাঁহাদের সহিত রাসনৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের মনে, তাঁহারা পরম ভাগ্যবতী বলিয়া গর্ব্বের উদয় হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ সেই রাসস্থলীতেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন বিরহে উদ্ভ্রান্ত পাগলিনীর মত সেই অগণিত গোপী, বনভূমি তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও, তাঁহার কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তাঁহাদের সকল গর্ব্ব বিচূর্ণ হইল। এমতাবস্থায় যখন তাঁহারা একান্ত নিরুপায় হইয়া, সকলে মিলিয়া যমুনা তটে বসিয়া হতাশ-প্রাণে মর্ম্মভেদী-কাতর, 'সুস্বরে', শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতঃ তাঁহার আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহাদের আকুল ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া তিনি হাসিমুখে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

মূলকথা, যখনই জানিলাম সাধন-রাজ্যে 'মহতের'—মহাপুরুষের বা

সদ্‌গুরুর, কৃপা না হইলে সিদ্ধিলাভের কোনই উপায় নাই, অতএব মহতের সন্ধান, মহতের সঙ্গ ও তাঁহার সেবার দ্বারা, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃপালাভের জন্য যথাযোগ্য পুরুষকার প্রয়োগ আমাদেরই প্রচেষ্টাধীন।—এতদর্থে, অলক্ষিতে মহাপুরুষের বিষ্ঠামুত্রের-স্থান নিজ হাতে পরিষ্কার করিতে থাকায়, ঠাকুর নরোত্তমের প্রতি শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিরুপম কৃপার কথা সকলেই অবগত আছেন। আমাদের শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুতেও ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে, উন্মত্তের মত নানা দুর্গম স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া হতাশ-অন্তরে যখন তিনি ভগবৎ-চরণে একান্ত প্রপন্ন হইলেন, তখনই সদ্‌গুরুরূপী ভগবান, কৃপাপরবশ হইয়া সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিলেন। 'মৌনী-বাবা'তেও দেখি,('গুরুর প্রয়োজনীয়তা'প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য) নিজ-পুরুষকার বলে সাধন-রাজ্যের চরমাবস্থায়, যখনইআত্মশক্তিতেনিরাশ হইয়া একান্ত প্রপন্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইলেন, অমনি তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সূক্ষ্মশরীরে তাঁহাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিলেন। এইরূপ সর্বত্রই যথাসময়ে একান্তশরণাগত যোগ্যপাত্রে মহতের কৃপাবর্ষণ হইয়া থাকে। ইহার কিছুই অহৈতুকী নহে।

এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই যে, সাধকের যখন সকল প্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন আত্মশক্তিতে বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় অভিমান বিচূর্ণ হয়। তখন চিত্ত অন্তর্মুখী হইয়া ঐকান্তিক কাতর প্রাণে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের, কৃপাপ্রার্থী হইলে এবং যথার্থ শরণাগতিভাব হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, তাহার মর্ম্মভেদী কাতর-ক্রন্দনের অপ্রাকৃত-ধ্বনি তাঁহার নিকট পৌঁছায় এবং তাঁহার দয়ার উদ্রেক হয়। মূল কথা,—তাঁহার বাঁশী নিরন্তরই বাজিতেছে। স্বভাবতঃ আমাদের হৃদয়তন্ত্রী বেসুরা, সেকারণ ঐ অপ্রাকৃত ধ্বনি আমাদের অন্তঃস্থলে পৌঁছায় না। কোন ভাগ্যে, কেহ হয়ত মহাবিপদে

বা জীবনসঙ্কটে, নিপতিত হওয়ায়, কোনদিকে কোন কুলকিনারা না পাইয়া, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উঠায়, ঐ হৃদয়-তন্ত্রীর সুর, বা অপ্রাকৃত স্পন্দন, ঐ বাঁশীর সুরের সহিত মিল হইয়া যাওয়ায়,—(পাশ্চাত্য *Mystic*-দের ভাষায়,) '*In tune with the Infinite*' হইয়া যাওয়ায়, তাহা 'ভৃত্যানুগ্রহ-কাতর' ভগবানের নিকট পৌঁছায় এবং সাধক তাঁহার আবির্ভাব অন্তরাত্মায় অনুভব করেন ;—কখন বা প্রাকৃত জগতেও তাঁহার শক্তির প্রকাশ হয়।

এই বিষয়টি শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"ভগবানের কৃপাই সার। আর কিছুই কিছু হয় না। সাধন-ভজন শুধু জেগে থাকবার জন্য—যেন তাঁর কৃপা এলে ধরতে পারি। সাধন-ভজন ক'রে কার সাধ্য তাঁহাকে লাভ করে? সাধন-ভজন করে তাঁকে লাভ করতে হয় একথা কিছু নয়, তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁর কৃপা হলেই তাঁকে পাওয়া যায়! তীব্র তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য ও প্রাণপণ সাধন-ভজন ক'রেও যে যথার্থ কিছুই লাভ হয় না, তাঁর কৃপা বিনা যে কিছুই হবে না, এটি পরিষ্কাররূপে বুঝবার জন্যই সাধন-ভজন। আত্মশক্তি অসার হ'তেও অসার, একমাত্র 'ভগবৎশক্তিই সার' বুঝলে, তখন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করে এবং ভগবানের কৃপায় তখন তার হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্বও প্রকাশ হ'তে থাকে।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৪ খণ্ড, ৭৮ পৃঃ

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"নিজের জায়গায় একবার গিয়ে দাঁড়ালেই নিজকে অতিশয় হীন, পতিত, কাঙ্গাল বলে মনে হবে। ঐ সময় দীনবন্ধু, পতিতপাবন, কাঙ্গালের-ঠাকুর বলে ভগবানকে ডাকা একটা কথার কথা, শেখা কথা হবে না। নিজের দুরবস্থা অনুভব করে ভগবানকে ডাকলে, উহা প্রাণের সহিত ডাকা হবে। তখন ভগবানও দয়া করবেন। নিরাশ হইবার কিছুই নাই।" ঐ, ৩য় খণ্ড—সর্ব্বশেষ উপদেশ

প্রশ্ন :—সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্ম কাহাকে বলে? কি উপা এই সকল কর্ম্ম কাটাইয়া জীব উদ্ধার হয়?

উত্তর :—"চৌরাশিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিয়া একবার মনুষ্য হ সেইজন্মে যে কর্ম্ম করা হয় তাহাকে প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান বলে। এ ত্রিবিধ কর্ম্ম শেষ করিতে অনেকবার জন্ম মৃত্যু; তাহা মানবজন ঘটনামাত্র। এইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কার এই ত্রিবিধ দেহ নষ্ট হইয়া কায়া হইতে মুক্ত হয়। মনুষ্যজন্ম পাই যদি ভগবানের ভজনপূজন না করে—তবে পুনর্ব্বার অধোগতি আর হইয়া পুনঃ চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। মনুষ্যজ পাইয়া যদি একবার ভগবানের নাম শুনার মত শুনে ও বলার ম বলে, ডাকার মত ডাকে,—অর্থাৎ যেমন শিশু মা শব্দ শুনে, বলিয়া ডাকে, তাহাতে মা শিশুর নিকট দৌড়িয়া আসেন।"

[শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৫ম, ও ২৩ পৃ

পরলোক, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান

(১৮) প্রশ্ন :—মৃত্যু, পরলোক, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্ম ভোজন ইত্যাদি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর :—এ সকল সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নে উত্তরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু যাহা যাহা বলিয়াছেন, বা স্বহস্তে লিখিয়া ছেন, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল—

প্রশ্ন :—ঠাকুরমা দেহত্যাগের পর কি করিলেন? সাধারণ লোকের দেহত্যাগের পর কি হয়?

উত্তর :—(লিখিলেন) মাতার মৃত্যুতে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হয়। মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া ঘরের মধ্যে অতিকষ্টে ঘুরিতে থাকেন, দেহ ঘর হইতে বাহিরে আনিলে প্রশান্ত

আকাশে আত্মা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করেন। তখন তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। যদি পুণ্যাত্মা হয় তবে পিতৃলোকে অথবা মাতৃলোকে লইয়া যান, এবং তাঁহাকে লইয়া একবৎসরকাল আনন্দ করেন। একবৎসর পরে যাঁহার যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। এই একবৎসর শ্রাদ্ধের ফলভোগ করেন। পাপাত্মা হইলে একবৎসর উৎকট পাপ-যন্ত্রণা ভোগ করেন ;—এই প্রকার অনেক ঘটনা গাতা জানাইয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে আনন্দজনক ঘটনা।" (শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ, ৫ম খণ্ড—৭৭ পৃঃ)

প্রশ্ন :—পরলোকগত জীবাত্মা কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ করে? শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা কেন?

উত্তর :—(লিখিলেন) "জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ দেহতেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। স্থূল-দেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইলে তাহা স্থূল দেহ গ্রহণ করে।—উত্তম পদার্থ হইলে প্রতি গ্রাসেই তৃপ্তি, ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম-দেহে কেবল আহারের বস্তু দর্শন মাত্র তৃপ্তি, ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। কারণ-শরীরে নিজে কিছু করিতে পারে না, কোন ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ যদি খাদ্যবস্তু দ্বারা স্বীয় জঠরাগ্নিতে হোম করেন, তদ্দারা পরলোকবাসীর কারণ-দেহের তৃপ্তি হয়—ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টি হয়। এইজন্যই শ্রাদ্ধ-পাত্র, ঘৃত-পায়স, ব্রাহ্মণকে দেওয়ার প্রথা আছে।*" ঐ—ঐ

* জীবের স্থূল শরীরের মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম অবয়ব আছে, যাহাকে সূক্ষ্ম-দেহ বলে, সেইরূপ স্থূল পদার্থের মধ্যে তাহার সূক্ষ্ম অবয়ব—সূক্ষ্ম অংশ আছে। অন্ন-জলের সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা, সূক্ষ্ম দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় ও পিপাসার শান্তি হয়। বস্ত্রের সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা শীত নিবারণ হয়। এইরূপ ছত্র, চামর, তালবৃন্ত প্রভৃতি পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা পরলোকবাসী জীবের সূক্ষ্ম দেহের তৃপ্তি ও আরাম সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে অন্ন, জল, বস্ত্র, শয্যা, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে দান করিলে এবং তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিলে, তাহাতে ঐ প্রেতাত্মার তৃপ্তি ও সদ্গতি হয়।

প্রশ্ন :—যাঁহারা মুক্ত হন তাঁহারা আবার সংসারে আসেন কি
উত্তর :—(লিখিলেন) "মুক্তি অনেক প্রকার। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে কারণ-দেহ। বাসনা লয় হইলে স্থূল দেহের লয় হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণ-দেহ থাকে। সূক্ষ্ম-দেহ যে বাসনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা লয় হইলেও কারণ-দেহ থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিবৃত্তি না হইলে কারণ-দেহের লয় হয় না। এই কারণ-দেহের লয়েই সম্পূর্ণ মুক্তি। কারণ-দেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পঁহুছায় না। দুটী একটী বাসনার আতিশয্যেও সূক্ষ্মদেহ ধারণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ হইতে পারে। কারণ-দেহ গেলেই সে সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দের আনন্দসাগরে ডুবিয়া যায়। সেখানে সর্ব্বদাই তাহার ভগবানের লীলাদর্শন হইয়া থাকে। ইহাকে গোলকধাম, কৈলাস বলে। নাম করিতে করিতে প্রকৃতই এসব অবস্থা লাভ হয়।

"শাস্ত্রকর্ত্তারা মুক্তিলাভ বিষয়ে কি সুন্দর নিয়মই করিয়া গিয়াছেন। গয়ায় পিণ্ডদানে লোকের উপকার হয়। যাহার এ সম্বন্ধে কোন সংস্কার নাই, তাহার উপকার না হইতে পারে। বিশ্বাস অনুরূপ কার্য্যই উপকারী, পিণ্ড দিলে উপকার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। চেহারা পর্য্যন্ত বদল হইয়া যায়। সূক্ষ্ম-দেহের দর্শনে পুষ্টি হয়; স্থূল দেহের আহারে পুষ্টি হয়; কারণ-দেহ কেবল লোকের শুভইচ্ছায় পুষ্টিসাধন করেন। এখানে পুষ্টি শব্দে, সন্তোষ বুঝিতে হইবে। গয়ায় পিণ্ড দেখিয়া সূক্ষ্ম দেহের বাসনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল মনের শুভ ইচ্ছা হইতে কারণ-দেহের নাশ হইয়া থাকে।"

(ঐ—৮৮ পৃঃ)

অপর সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"যাহাদের কর্ম্ম আছে, তাহাদেরই পিতৃলোক যাইতে হয়।"

"যাহাদের গয়াতে পিণ্ডদান যথাবিধি হইয়াছে তাহাদের পুনরায় শ্রাদ্ধ, মাটীতে জল ঢালার ন্যায়।"

(ঐ—৮৯ পৃঃ)

"নিত্য-তর্পনের কথা বিভিন্ন; উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বংশে একজনকরে পিতৃদেবতা আছেন, এই তর্পণ করাতে তাঁহাদের তৃপ্তি হয়। সকলেরই তর্পণ করা বিশেষ প্রয়োজন।"

"অনেক দিন রোগে ভুগিতে ভুগিতে একটি অবিশ্বাস জন্মে, সাধারণতঃ তাহারাই ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়।" (ঐ—ঐ)

প্রশ্ন :—গয়াতে পিণ্ড দিলেও পিণ্ড পায় না, এমন হয় না কি ?

উত্তর :—"একজনের পিণ্ড পুত্র গিয়া দিলেও, পৌত্র প্রপৌত্রাদিরও আবার পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। যদি কারো পিণ্ড, প্রেতাত্মা না পায়, এজন্য বংশের যে কেহ গয়ায় যাবে, তারই পূর্ব্বপুরুষগণের ও জ্ঞাতি-স্বজনের পিণ্ড দেওয়ার নিয়ম।

যথাবিধি পিণ্ড দিলে নিশ্চয়ই তাহাতে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়; কিন্তু সেমত তো দেওয়া হয় না।—যিনি পিণ্ড দিবেন, তিনি যান আরোহন করিবেন না, পদব্রজে গয়া পৌঁছিবেন। পরে একাহার হবিষ্যি করিয়া শুচি-শুদ্ধ-ভাবে সংযত হইয়া ভজন-সাধনে এক মাস কাল গয়ায় বাস করিবেন। মৃত্তিকায় বাহু-উপাধানে শয়ন করিবেন। তৎপরে শাস্ত্র-ব্যবস্থা মত পিণ্ড দান করিবেন। এই ভাবে পিণ্ড দান হইলে, নিশ্চয়ই তাহা প্রেতাত্মা পায় ও উদ্ধার হয়; ইহার অন্যথা হইতে পারে না—ঋষিবাক্য; কিন্তু সে ভাবেতো পিণ্ড দেওয়া হয় না। তবে গদাধর বড়ই দয়াল; তাই যিনি যে ভাবে দেন না কেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন—তাই, প্রেতাত্মা উদ্ধার হয়। বিশেষ কোন অনিয়ম অনাচার হইলে গদাধর যদি তাহা গ্রহণ না করেন, এই জন্যই বারম্বার দিতে হয়; দিতে দিতে যদি কোন বার কারো লেগে যায়।"

(ঐ—১৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন :—শাস্ত্র পুরাণাদিতে যে নরকের বর্ণনা রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহা আছে কি না,—যমদূত কি ?

উত্তর :—"শাস্ত্রে যেরূপ নরকের বর্ণনা আছে, নরক প্রকৃতই

তদ্রূপ। যমদূত, বিষ্ণুদূত, সকলি সত্য; মৃত্যুর পর ইহাদের সহিত বিচার হয়। পিতৃপুরুষগণ তাহাকে সান্ত্বনা দেন। পিতৃপুরুষগণ একেবারে মায়ার অতীত নহেন। তাঁহারাও ত্রিগুণের অধীন।

পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা মুক্ত, কেবল তাঁহারা উপস্থিত হইয়া মৃত আত্মাকে পিতৃলোকে লইয়া যান। যাহাদের অল্প কর্ম্ম থাকে তাহারা শৈশবে দেহ ত্যাগ করে। যাহারা নরহত্যাকারী, মনুষ্যদ্রোহী এইরূপ পাতকী,—তাহারা জন্মে, আর মরে—পুনঃ পুনঃ গর্ভ-যাতনা শাস্তি। যেমন এই পৃথিবী, সেইরূপ গ্রহ উপগ্রহ আছে—সেখানে স্বর্গ নরক ভোগ হয়।"

(ঐ—১৪৮ পৃঃ)

প্রশ্ন :—মৃত্যুর পর আবার কখন জন্ম হয়?

উত্তর :—"মৃত্যুর পরেই সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে। তথায় ক্রমে ক্রমে তাহার বাসনা বৃদ্ধি হয়। পিতৃলোকে প্রত্যেক বংশেরই একজন পিতৃপুরুষ থাকেন। লোকের মৃত্যুর পরে, তিনি যাহার যে অবস্থা, তাহা তাহাকে বলিয়া দেন। বাসনার অত্যন্তবৃদ্ধি হইতে জন্মের ইচ্ছা হয়। জন্ম যে কেবল এই পৃথিবীতে হইবে, এমন নহে। সৌর-জগৎ বলিয়া আমরা যাহাকে জানি, ঐরূপ অসংখ্য সৌর-জগৎ আছে, বিষ্ণুলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থান আছে, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে জন্মের অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে, পিতৃ-পুরুষ কোন্ স্থানে তাহার জন্ম হইবে বলিয়া দেন। সে তদনুযায়ী প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, অবস্থা অনুসারে নানা গ্রহে তাহার জন্ম হয়। এই পৃথিবীতে জন্ম না হইলে যে একজন মুক্ত হইল তাহা নহে। অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহে থাকিবার বাসস্থান আছে; স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক এরূপ নহে। কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন; সেখানেও বাসনা আছে। এইরূপ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্মগ্রহণ করে। অবস্থানুসারে জন্ম হইলেও সকলের বাসনা

একরকম নহে। সেই বাসনার তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয় সকলেরতো এক গ্রহে হয় না।"

(ঐ—১৪৯ পৃঃ)

প্রশ্ন—লালতো (উচ্চ স্তরের সাধক—শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর শিষ্য) বিষ খেয়ে মরে ছিল,—অপমৃত্যু ঘটাতে কি তা'কে দণ্ড পেতে হয় নাই?

উত্তর—"লাল বিষ খেয়েছিল বটে, কিন্তু উহার দেহত্যাগের মুহূর্ত্তেই মহাপুরুষরা মৃত্যুকে আহ্বান ক'রে ওর জীবাত্মাকে গ্রহণ করতে বলেন, তাতেই ওর অপমৃত্যু ঘটে নাই, কোন অপরাধেও পড়ে নাই, দণ্ডও হয় নাই।

প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মৃত্যু এসে জীবাত্মাকে গ্রহণ করলেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; আর অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনায় জীবাত্মা দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রাণবায়ু বহির্গত হ'য়ে গেলে, ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক হয়, উহাই অপমৃত্যু, ওরূপ হ'লেই অসদ্গতি হয়ে থাকে।"

(ঐ—৩য় খণ্ড, ৫৮ পৃঃ)

প্রশ্ন:—শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইলে কি কোনও অনিষ্ট হয়?

উত্তর:—"শ্রাদ্ধে আহার করিলে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে,—ভক্তিভাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করলে সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই তাহা দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে।—

কিছুদিন হইল একটী ভাল সন্ন্যাসী এই পথে চন্দ্রনাথ যেতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মুন্সিগঞ্জ পৌঁছে একটী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নেন, ব্রাহ্মণ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, নিজে ঠাকুর ঘরের বারান্দায় তাঁকে থাকার স্থান ক'রে দিলেন। সন্ন্যাসী স্বপাকে রান্না ক'রে ভোজনান্তে বিশ্রাম করলেন। ব্রাহ্মণের বাটীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সেই ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন। অনেক সোণার গয়না দিয়ে সাজায়ে রাখতেন। সন্ন্যাসী সন্ধ্যা আরতির সময় সে সকল দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। শেষ রাত্রিতে তিনি সেই সকল গয়না

ঠাকুরের অঙ্গ হইতে খুলে নিয়ে চম্পট দিলেন। সকালে ব্রাহ্মণ উ
দেখলেন সন্ন্যাসী নাই। ভাব্‌লেন,—উদাসীন সন্ন্যাসী, ওদের ত কে
লোক-লৌকিকতা নাই। ইচ্ছে হয়েছে, চলে গিয়েছেন। ব্রা
স্নানান্তে ঠাকুর পূজা কর্‌তে ঠাকুর ঘরেযেমনি প্রবেশ কর্‌লেন, দেখ্‌লে
ঠাকুরের গায়ে সোণার গয়না নাই! দেখেতো একেবারে অবা
তখন সন্ন্যাসীরই এই কর্ম্ম বুঝে গ্রামের সকলকে খবর দিলেন, সক
চারিদিকে চোরের অনুসন্ধানে লোক পাঠাল। এদিকে সন্ন্যাসী গয়
নিয়ে শেষ রাত্রি থেকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে বেলা অপরাহ্
একটী স্থানে বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে বস্‌লেন। একটু পরে স্থি
হ'তেই হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—'ভাল! একি কর্‌লাম!' তক
মাথা কপাল চাপ্‌ড়ে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌লেন। তৎক্ষণাৎ অ
বিলম্ব না ক'রে আবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে দৌড়ি
লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী তথায় পৌঁছিবামাত্রই সকলে নানাপ্রকার গালি
গালাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী গয়নার পুঁটুলি সম্মুখে রে
বল্‌লেন, 'আপনারা একটু আমাকে স্থির হ'তে দিন, আপনাদের সমস্ত
গয়নাই আমার কাছে পাবেন। পাড়ার দশটী ভদ্রলোককে এখানে
ডেকে নিয়ে আসুন, আমার কিছু বল্‌বার আছে। সকলের সাক্ষাতে
গয়না দিব।' ব্রাহ্মণ তাই কর্‌লেন। গ্রামের দশটী ভদ্রলোক এলে
সন্ন্যাসী সকলকে বল্‌লেন,—'দেখুন! আপনাদের সকলের সাক্ষাতে
এই ব্রাহ্মণকে আমি ক'টি কথা জিজ্ঞাসা করছি, ইনি আমার
যথার্থ উত্তর দিবেন।—ছেলে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, এই বৃদ্ধ বয়স
পর্য্যন্ত আমি দেশে দেশে পর্য্যটন ক'রে কাটাচ্ছি, এরূপ দুর্ম্মতি তো
আমার কখনও হয় নাই। এত কাল ভজন-সাধন ক'রে, আমার
সে সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, আমি জীবনে কখনও কারো এক কপর্দ্দক
চুরি করি নাই। আপনার অন্ন গ্রহণের পর, অকস্মাৎ আমার ঐ
দুর্ম্মতি হ'ল কেন? ভাল! জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা

রান্না করতে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংশ্রব আছে? একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখুন দেখি?'

ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ ক'রে অনুসন্ধানে জান্‌লেন,—চাল, ডাল, ঘৃতাদি, যা তিনি যজমানের বাড়ী হ'তে পেয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাসীর সেবাতে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ ঐরূপ বলাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন,—'আপনি যজমানের বাড়ী কি কার্য্য ক'রে ঐসকল জিনিষ পেয়েছিলেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'কেন! শ্রাদ্ধ করিয়ে পেয়েছিলাম। তাহাই আপনাকে দেওয়া হয়েছিল।' সন্ন্যাসী চম্‌কে উঠে বল্‌লেন,—'শ্রাদ্ধান্ন দিয়েছিলেন! আচ্ছা, যার শ্রাদ্ধ করেছিলেন, সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল?'—তখন গ্রামের সকল লোকই বল্‌লেন,—'বাবাজি! তার কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব'লে আমরা কখনও শুনি নাই। এ দেশের লোক তার নামে কাঁপ্‌তো, সে কয়েকবার জেলও খেটেছিল।'

সাধু বলিলেন,—'দেখুন, সেই চোরের শ্রাদ্ধের অন্ন গ্রহণেই আমার এই সর্ব্বনাশ। এই আপনাদের গয়না নিন্, এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না, আমার সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, একমাসকাল আমাকে চান্দ্রায়ণ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।' গ্রামের সকলে তখন তাঁকে যত্ন করে রেখে, চান্দ্রায়ণের যোগাড় করে দিলেন। সাধু মুন্সিগঞ্জে থেকে চান্দ্রায়ণ ক'রে চ'লে গেলেন। শ্রাদ্ধান্ন অতি বিষম জিনিষ। খেলে আর রক্ষা নাই। ভক্তির দিক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।"

প্রশ্ন—শ্রাদ্ধান্নতো, শ্রাদ্ধ সময়ে যাহা কিছু প্রেতকে দেওয়া হয়, এই জানি। ঐ শ্রাদ্ধ-বাড়ীর চাল, ডাল দূষিত হয় কেন?

উত্তর—"শ্রাদ্ধ সময়ে প্রেতকে আহ্বান করা হয়। ঐ প্রেতের দৃষ্টি যে সকল বস্তুতে পড়ে, সে বস্তুই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্য শ্রাদ্ধ-বাড়ীর কোন বস্তুই খেতে নাই,—খেলে ঐ প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়।"

প্রশ্ন—তাহ'লে আমরা যজমানের বাড়ী শ্রাদ্ধ করাইয়া কিছু নিব না? শ্রাদ্ধের ভোজ্য গ্রহণ এই নিয়মতো চিরকাল পুরোহিতদের ভিতর চলিয়া আসিতেছে?

উত্তর—"ভোজ্য নিবেন না কেন? তবে উহার ব্যবহার নিজের করতে নাই, বিক্রি ক'রে ফেলতে হয়।"

প্রশ্ন—যিনি খরিদ ক'রে নিবেন, তাঁরতো উচ্ছিষ্ট বস্তুই গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর—"না, যিনি মূল্য দিয়ে নিবেন, তিনি পবিত্র বস্তুই নিবেন। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি।' মূল্যদিয়ে নিলে ও সব জিনিষ পবিত্র হয়, কোন দোষই থাকে না। যিনি বিক্রি করেন, এবং যিনি গ্রহণ করেন কারও ক্ষতি হয় না।"

প্রশ্ন:—শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করান, ইহাতো সকল সমাজে আছে। শাস্ত্রেরও ব্যবস্থা শুনিয়াছি। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে সকলেতো নিমন্ত্রণ খায়।

উত্তর:—"শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ, খাবেন না কেন? শ্রাদ্ধ-দিনে শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কিছুই খেতে নাই,—ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ঐ দিনেতো হয় না। শ্রাদ্ধ দিনে প্রেতকে আহ্বান করাতে প্রেতের দৃষ্টিতে ঐ বাড়ীর যাবতীয় বস্তুই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হয় বলিয়াই, শ্রাদ্ধ বাড়ীতে ভোজন নিষেধ। প্রেতের কল্যাণার্থে ব্রাহ্মণাদির ভোজন যে সময়ান্তরে হয়, তাহাতে প্রেতের আহ্বান নাই, উচ্ছিষ্ট সম্ভাবনাও নাই।"

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ,—৩য় খণ্ড, ১০৫-১০৮ পৃঃ)

প্রশ্ন:—"অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতিতে যাহাদের পরলোকে অসদ্‌গতি ঘটে; বংশধরদের কিরূপ কার্য্য দ্বারা তাহাদের সদ্‌গতি লাভ হয়?

উত্তর:—"শাস্ত্রে আছে গয়াতে যথাযথ পিণ্ডদান ক'রলেই, তাদের সদ্‌গতি হয়ে থাকে।"

প্রশ্ন:—গয়াতে পিণ্ড দিলে সত্যই কি প্রেত তাহা গ্রহণ করে?

উত্তর:—"হাঁ, ব্যবস্থা মত দিলে, পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ

করে।—আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করতে গিয়াছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাকতেম। ঐ সময়ে একবার একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে ছিল।—আমার একটী ব্রাহ্ম-বন্ধু, বিলাত-ফেরত ডাক্তার, সেই সময়ে গয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা তাঁকে একদিন স্বপ্নে বলিলেন,—'বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমাকে একটা পিণ্ড দাও, আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি।'—তিনি ব্রাহ্ম, ওসব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন। পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্‌লেন, পিতা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্‌ছেন,—'বাবা, তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে এবার একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।' দুবার স্বপ্ন দেখেও তিনি তা-গ্রাহ্য করলেন না। আমাকে এ বিষয় এসে বল্‌লেন। আমি তাঁকে বল্লাম,—

'পুনঃ পুনঃ যখন এরূপ দেখ্‌ছেন তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত।' তিনি আমার উপর বিরক্ত হইয়া বল্‌লেন,—'আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হ'য়ে এরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন ?' আমি তাঁকে বল্‌লাম,—'আপনি তো আর আপনার বিশ্বাস মত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাস মত দিবেন তাতে বাধা কি ?' তিনি তাতেও সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে,—দেখ্‌লেন পিতা যোড়হাত ক'রে বল্‌ছেন,—'বাপু, আমাকে একটী পিণ্ড দিলে না ?' বন্ধুটী তখন আমাকে এসে বল্‌লেন,—"মশায়, আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি করজোড়ে কাতর হ'য়ে বল্‌ছেন,—'বাপু, আমাকে একটী পিণ্ড দিলে না ? আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি।'—শুনে আমার কান্না পে'ল।"—আমি তখন বল্‌লাম,—'আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধি দ্বারাও ত দেওয়াইতে পারেন ?' তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি দুটী টাকা নিয়ে একটি পাণ্ডাকে তাঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা করে দিলাম। এই পিণ্ড দানের দিন বন্ধুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ড

দান কর্‌লেন, তখন দেখ্‌লাম, বন্ধুটির চোখ দিয়ে দর-দর ধারে অ পড়ছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হয়ে পড়্‌লেন, পরে দি জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন,—'মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন দ পরিষ্কার দেখলাম, আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত দুই হাত পে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌লেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ ক বল্‌লেন,—'বাপু, আমার যথার্থ উপকার কর্‌লে, তুমি সুখে থাক, ঠা তোমার কল্যাণ করুন।' আহা! আগে যদি আমি জান্‌তাম, পি এভাবে এ'সে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌বেন, তা হলে আমি নিজেই খুব যত্ন ক পিণ্ড দিতাম।'—এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায়?"

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ,—৩য় খণ্ড, ১১০-১১২ পৃ)

প্রশ্ন :—শ্রাদ্ধে কি যথার্থ ই প্রেতাত্মার ক্লেশের শান্তি হয়?

উত্তর :—"একদিন আমি যমুনার তীরে কালীদহের নিকটে উপস্থি হইতেই, একটি প্রেত এসে আমার সম্মুখে প'ড়ে বিষম ছট্‌ফট্‌ কর লাগ্‌লেন ; আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—'ও রকম কর্‌ছেন কেন?' প্রেত বল্‌লেন,—"প্রভু, রক্ষা করুন, আর এ ক্লেশ সহ্য কর্‌তে পারি না। শত-সহস্র বৃশ্চিক আমাকে সর্ব্বদা দংশন কর্‌ছে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে দিনরাত আমি দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছি, মুহূর্ত্তের জন্য আমি নিস্তার পাচ্ছি না। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' আমি তাঁকে বল্‌লাম,—'আপনার কোন্‌ পাপে এই দণ্ড?' প্রেত চীৎকার ক'রে কেঁদে বল্‌লেন,—'প্রভু, এখানে আমি * * * মন্দিরে পূজারী ছিলাম। ঠাকুর সেবায় যে সমস্ত অর্থাদি পেতাম, সেবাতে না লাগায়ে তাহা আমি ভোগবিলাসে ও বদ্‌মাইসীতে উড়াতাম। এইটিই আমার গুরুতর অপরাধ।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—'কিসে আপনার এই ভোগের শান্তি হবে?' প্রেতাত্মা বল্‌লেন,—'আমার শ্রাদ্ধ হয় নাই ; শ্রাদ্ধ হ'লেই এই ক্লেশের শান্তি হবে। আপনি দয়া ক'রে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'রে দিন।' আমি বল্‌লাম,—'কি প্রকারে ব্যবস্থা করব?' প্রেত বল্‌লেন,—

'আমার শ্রাদ্ধের জন্য দেড় হাজার টাকা আমার ভাইপোর হাতে দিয়েছিলাম ; কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত আমার শ্রাদ্ধ করে নাই। আপনি দয়া করে ঐ অর্থ আনায়ে, কতক ঠাকুর সেবায় দিয়ে দিন ; বাকি টাকা দ্বারা আমার কল্যাণার্থে শ্রাদ্ধ ক'রে মহোৎসব ক্‌র্‌লেই আমি এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচি।' প্রেতের কথা শুনে আমি সেই মন্দিরের বর্ত্তমান পূজারীর নিকটে গিয়ে সমস্ত বল্‌লাম। পরে এ সব ব্যাপার সেই প্রেতের ভাইপোকেও বিস্তারিত রূপে জানান হ'ল। তিনি ভেবেছিলেন ঐ অর্থের আর কেহ খোঁজই নিবে না। যা হোক্, তিনি সমস্ত গুলি টাকা দিয়ে রীতিমত শ্রাদ্ধাদি কর্‌লেন। মহোৎসবাদিও হ'ল। পরে সেই প্রেতের ঐ যন্ত্রণার শান্তি হয়েছে। কয়েক দিন হয়, এখানে এই ঘটনা হ'য়ে গেছে।'* (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ,—২য় খণ্ড, ৭৭ পৃঃ)

* অনেকে পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহাদের সম্বন্ধে মাত্র একটি বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহাদের বিচারে পরকাল না থাকাই সাব্যস্ত হয়,—যদি মানবের মৃত্যুর সহিত তাহার সমস্তই চিতাভস্মে পরিসমাপ্তি ঘটে,—তাহার আর অন্য কোন প্রকার অস্তিত্ব না থাকে ; তাহা হইলে এই দুদিনের অতি অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া মূঢ়তার কার্য্য। অপর পক্ষে, যদি শাস্ত্র ও মহাজনদিগের বাক্য প্রকৃতই সত্য হয় এবং প্রকৃতই যদি পরকাল থাকে (যাহার অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান আছে) এবং পাপপুণ্যাদির বিচার থাকে, তাহা হইলে মহাপুরুষগণের হিতবাণীতে কর্ণপাত করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যদি এই দেব-দুর্লভ মানব জনমের দু'দশ বছর সাধন-ভজন-তপস্যার দ্বারা অনন্তকালের পথ পরিষ্কার হয়—রিপুগণের তাড়না হইতে ত্রাণ পাইয়া চিরশান্তির সন্ধান মেলে, তাহা হইলে তাহা করাই যথার্থ চতুর লোকের কার্য্য ; নতুবা, তাহাতে ও ভোগবিলাসরত-পশুতে বিশেষ কিছুই পার্থক্য থাকে না,—"ধর্ম্মেনহীনাঃ—পশুভিঃ সমানাঃ।" তাহারা প্রকৃতই দয়ার পাত্র--তাহাদের জন্যই ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—"অঘায়ু রিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।" (গীতা—৩।১৬) 'হে পার্থ, পাপময়জীবন, ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ সেই বক্তি বৃথা জীবিত থাকে।'

জন্মান্তরের অস্তিত্ব

প্রশ্ন :—জন্মান্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কি ?

উত্তর :—জন্মান্তরবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আগম বা আপ্তবা[ক্য] অতিরিক্ত কয়েকটি সাধারণ ও দার্শনিক যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দি[ওয়া] হইতেছে—

(১) **জগৎ বৈষম্যপূর্ণ**—কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ ধনী, কে[হ] দরিদ্র; কেহ জন্মাবধি সম্পদের ক্রোড়ে লালিত, কেহ মৃত্যু পর্য[ন্ত] দারিদ্র্যের পেষণে নিপীড়িত; কেহ জন্মসিদ্ধ হরিভক্ত, কেহ নাস্তি[ক]; কেহ আজন্ম পুণ্যাত্মা, কেহ পাতকী;—এরূপ হয় কেন? ন্যায়বা[ন] সর্ব্বশক্তিমান, করুণাময়, ভগবানের রাজ্যে এরূপ বৈষম্যের ব্যব[স্থা] কেন? ইহার মীমাংসা কি?—আর্য্যঋষিগণ এই প্রশ্নের মীমা[ংসা] করিয়াছেন,—আত্মা অজর, অমর;—সনাতন বস্তু। আত্মা জীবরূ[পে] পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেছে;—যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে সে তে[মনি] ফল পাইতেছে। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত বা করুণার অভা[ব] নাই। জীব পূর্ব্বজন্ম হইতে ভাবনা, বা বাসনা, বা চেষ্টনা দ্বারা ইহজন্ম নিয়মিত করে। জগতের এই সকল বৈষম্য বুঝাইবার পক্ষে জন্মান্তর-বাদের মত এরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা আর দ্বিতীয় নাই। এই খানে একটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপন হয়,—সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ বৈষম্যের সৃষ্টি হয় কেন? ঋষিরা ইহার উত্তর দিয়াছেন,—যেমন ঈশ্বর অনাদি, তদ্রূপ জীব অনাদি এবং কর্ম্মও অনাদি। অনাদিতত্ত্বের তথ্য নিরূপণ কর[া] মায়াবদ্ধ মানবের বুদ্ধির অসাধ্য।

(২) **পরমেশ্বর ন্যায়বান**—সুতরাং পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের দণ্ড-দাতা। যদি দণ্ড ও পুরস্কারের ফল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ না হয়, তবে অবশ্যই তৎপরে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। মৃত্যুর পর আত্মা

বর্ত্তমান না থাকিলে কর্ম্মফল কে ভোগ করিবে? সুতরাং আত্মার বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। অতএব পরকাল আছে।

(৩) মানুষের অনন্ত কাল বাঁচিবার ইচ্ছা রহিয়াছে—পরমেশ্বর যে ইচ্ছা দিয়াছেন তাহার চরিতার্থতারও বিধান করিয়াছেন। পিপাসা, ক্ষুধা দিয়াছেন,—পানীয়, আহার্য্য-বস্তুর ব্যবস্থাও আছে। অনন্ত-জীবনের ইচ্ছাও যখন দিয়াছেন, তখন অনন্তকাল বাঁচিবার ব্যবস্থা থাকাও সঙ্গত। সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকিবে।

(৪) মানুষের অন্তরে কতকগুলি স্বাভাবিক সত্য আছে—বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরকালের অস্তিত্বের ভাবও একটি। সুতরাং পরকাল আছে।

(৫) প্রাণীমাত্রেরই মরণ-ত্রাস বর্ত্তমান—ঐ প্রাণী নিশ্চয়ই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মে মরণ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিল। পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেরই মরণ-দুঃখ-অনুভবের জন্য এই সংস্কার।

(৬) নিম্নশ্রেণী-প্রাণীর সহজাত সংস্কার, বা Instinct, এর নিদান কি?—ন্যায়দর্শন বলেন,—ইহা জন্মান্তরের অনুভূত বিষয়ের অভ্যাস জনিত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার। গোবৎসাদির ভূমিষ্ঠ হইয়াই স্তনের অনু-সন্ধান ও স্তন্যপান,—ইহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মে স্তন্যপানের অভ্যাসই সংস্কার রূপে সঞ্চিত। যদি জন্মান্তর থাকে তবেই ইহা সম্ভবপর, নতুবা নহে।

(৭) বিবর্ত্তন-(Evolution) বাদ বিচার করিলে প্রতিপন্ন হয় —বিবর্ত্তন, দেহগত নয়—জীবগত। বিবর্ত্তনের প্রকৃত তাৎপর্য্য, ক্রম-বিকাশ—জীবের প্রচ্ছন্ন অব্যক্ত অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমাভিব্যক্তি। ঐ ক্রমবিকাশ সিদ্ধ করিবার প্রাকৃতিক বা স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী—জন্মান্তর।

(৮) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি—অসাধারণ মনীষা (Genius), বা প্রতিভার, বা ধর্ম্মবীরের উদ্ভব—জন্মগত, চেষ্টা-প্রসূত নহে। সময় সময় আমরা 'আজব' (Prodigy) মানবের সাক্ষাৎ পাই, তাঁহাদের

মধ্যে কাহার কাহার অতি শৈশবেই অদ্ভুত স্মরণশক্তির,* অদ্ভুত দা... শক্তির, অদ্ভুত সঙ্গীত প্রতিভা প্রভৃতির বিকাশ দেখিতে পাই, ইহাদের শক্তি যদি জন্মান্তরীন সংস্কারের ফল না হয়, তবে ইহা কি... আমরা বলিতে চাই, এই মনীষা বা আজব শক্তির সম্বন্ধে যে ... কথা উত্থাপন করিলাম, তদ্দ্বারা জন্মান্তর-বাদ সমর্থিত হইতেছে।

* আমাদের দেশের অদ্ভুত মেধা-সম্পন্ন সোমেশ বসু মহাশয়ের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। প্রবন্ধটি লিখিবার সময় কৌতূহল হওয়ায় সম্প্রতি (২৮।৫।৬০) শাঁখারী টোলা লেনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মুখে তাঁহার অত্যদ্ভুত স্মৃতি শক্তির কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।—এক্ষণে তিনি স্থবির হই... পড়িয়াছেন। যুবাকালে দুইবারে পাঁচ বৎসর তিনি আমেরিকায় অবস্থিতি করেন এবং প্রায় ৫০০ শিষ্য হয়। ঐ সময়ে তথায় যে সকল অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই ধারণার অতীত। কোন সংখ্যা, পর্য্যায়ক্রমে ... সংখ্যা দ্বারা, ১৫।২০ বার মনে মনে গুণ করিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার গুণফল বলিয়া দিতেন; এমন কি, এক ক্ষেত্রে ঐরূপ উপর্য্যুপরি ১০৯ বার ঐ... গুণ করিয়া তাহার গুণফল বলিয়া দিয়া,—এবং, বিপরীতক্রমে, শেষ গুণফল বলিয়া দিলে, মূল প্রথম সংখ্যাটি বলিয়া দিয়া,—সকলের নিরতিশয় বিস্ময় উৎপাদন করেন! শুধু তাহাই নহে, পরে একবার উপরের পংক্তিতে একশত অঙ্ক ও নিম্নে একশত অঙ্ক, মনে মনে গুণ করিয়া, এক ঘণ্টার মধ্যে উহার গুণফল বলিয়া দেন!! এবং, ইহা হইতেও আশ্চর্য্যের কথা,—এই ঘটনার দুই মাস পরে বিলাত গমন করেন এবং সেখানের সাংবাদিকের প্রশ্নে ঐ অঙ্কটির (ইতিমধ্যে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ঐ গুণণের খাতাটি বিলাতে আনা হয়।) গুণনীয়, গুণক ও গুণফল সংখ্যাগুলি মুখে মুখে বলিয়া দেন এবং তৎপরে তাঁহাদের প্রশ্নে উহার একশত-পংক্তি গুণনের গুণফলেরও যে কোন পংক্তির, যে কোন অঙ্কটি, জিজ্ঞাসা মাত্র বলিয়া দেন এবং বলেন,—দুই মাস পরে কেন, এক বৎসর পর্য্যন্ত উহার প্রত্যেক অঙ্কটি তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে!! —ইহা কি মানুষ ধারণা করিতে পারে? বলা বাহুল্য, ইঁহার পিতা ও পুত্র উভয়েই সাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানব মাত্র।—ইহকে জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত যোগ-সংস্কার ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?

(৯) **বহু-ব্যক্তিত্বাগম (Multiple personality)**—সময় সময় দেখা যায়, অভাবনীয়, অচিন্তনীয়ভাবে (অনেক স্থলে বিনা কারণে), এক মানুষ আর এক মানুষ হইয়া গেল। কোন ব্যক্তি অফিস হইতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইল যে, সে আর এক ব্যক্তি। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে হারাইয়া ফেলিল। কয়েক বৎসর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পরে খোঁজ করিয়া নিজগৃহে আনিলে আত্মীয়স্বজনদিগকে চিনিতে পারিল না। ইহা উহার জন্মান্তরের সংস্কার ভিন্ন আর কি?

(১০) বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষায় কেহ কেহ কৃত্রিম উপায়ে নিদ্রাচ্ছন্ন (Hypnotised) হইলে, বা Trance-দশাগ্রস্ত হইলে, তাহার সম্বিৎ সেই অর্দ্ধসমাধি অবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই সকল সমস্যার সমাধানে আমরা জন্মান্তরের আশ্রয় লইতে চাই। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে আমাদের যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছিল তাহা নষ্ট হয় না,—আমাদের 'কারণ-শরীরে' উহার সংস্কার সঞ্চিত হইয়া থাকে। যথাযোগ্য সমর্থ কারণ উপস্থিত হইলে, ঐ সকল সংস্কার ব্যক্ত বা উদ্বুদ্ধ হয়।

(১১) **জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ**—অনেক জাতিস্মর বালক-বালিকার কাহিনী আমরা অনেকেই অল্পবিস্তর শ্রবণ করিয়াছি। এই সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ব্বজন্মবর্ণিত স্থান ও ঘটনাবলী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল ঘটনাকে জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে কি অসঙ্গত হয়? আমাদের শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর, গয়ায় একটি স্থানে বটবৃক্ষে খোদিত প্রণব-যুক্ত গ্রাম নাম দেখিয়া, পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং তিনি ঐ স্থানে রামাইত সন্ন্যাসী ছিলেন ও উহা তাঁহার স্বহস্ত-খোদিত ইহা মনে পড়ে। ঐরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

(১২) দেবদেবীর নিকট ধর্ণা দিয়া অনেকের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি

জাগরিত হয় এবং তৎপরে তাহার পূর্ব্বজন্মের মাতা পিতা বা আত্মীয় স্বজনের উচ্ছিষ্ট খাইয়া বা সেবা-পূজায় তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া উৎকট ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের ঘটনা আঁদৌ বিরল নহে।

(১৩) কয়েক বৎসর হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় সাইকোমেট্রি (Psychometry) নামক এক নূতন বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে। সাইকোমেট্রি শব্দের অর্থ—বস্তুনিহিত সংস্কারের ধ্যানলব্ধ উদ্বোধন। এই শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি আমার একগুচ্ছ কেশ পায়, অথবা আমার ব্যবহৃত আংটি, ঘড়ি, চশমা প্রভৃতি কোন বস্তু পায়, তবে সেই বস্তু বা কেশ, তাহার ভ্রূমধ্যে বা ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর সংস্থাপিত করিলে, সে আমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে এবং সেই বস্তুর সন্নিকটে যদি আমি কোন বক্তৃতা করিয়া থাকি, বা কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকি, বা অন্য কোন কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তবে সে সেই বাক্য ও কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে ও সেই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পাইবে!—ইহার নিদান কি? ইহার নিদান এই যে—প্রত্যেক বস্তু তাহার সমীপস্থ সংস্কার রক্ষা করিতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুই ফটোগ্রাফ ও ফনোগ্রাফ!—শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু একদা অদ্বৈত প্রভুর ভজন-স্থানে,—শান্তিপুর উপকণ্ঠে অবস্থিত বাবলায়, মন্দির-প্রাঙ্গণে শিষ্যগণ-সহ স্থির হইয়া নাম করিতে বসিলে, শিষ্যগণ মহা-সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুনিতে পান, তাহাতে তিনি বলিলেন,—"এ সংকীর্ত্তন সাধারণ সংকীর্ত্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনেছ।"

শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ—৩য় খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা

—ইহাও ঐ সাইকোমেট্রি। অদ্বৈত প্রভুর আমলের সংকীর্ত্তনের সংস্কার যাহা ইষ্টকস্তূপ, মৃত্তিকাখণ্ড বা বৃক্ষাদিতে (গ্রামোফোন রেকর্ডের মত) নিহিত ছিল, তাহাই উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রুতিগোচর হইল।

এই সাইকোমেট্রি-ব্যাপার লক্ষ্য করিলে জাতিস্মর হওয়ার প্রণালী বুঝিতে পারা যায়। পাতঞ্জলি যোগসূত্রে আছে,—সংস্কার সাক্ষাৎকার

হইলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। ঐ সংস্কার, 'কারণ-শরীরে' রক্ষিত, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মে অনুভূত ও অনুষ্ঠিত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টার সংস্কার। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণ উহা প্রত্যক্ষ করিয়া জাতিস্মর হয়েন। সাধন-বলে যোগী এই ভাবে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। অনেক স্থলে কাহার কাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দিব্য-দৃষ্টি-শক্তি, হিপ্‌নটিক (আমাদের দেশে সাধারণ লোক মধ্যে দেব-দেবী স্থানে কাহার উপর 'আবেশ' হওয়া কতকটা ইহার অনুরূপ) নিদ্রাবস্থায় প্রকটিত হইতে দেখা যায়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজের "Survival of man" নামক বৃহৎ গ্রন্থে এইরূপ মিডিয়ামদের সাহায্যে বহু পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা জন্মান্তর-অস্তিত্বের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

স্থূল-দেহ ছাড়া জীবের যে সূক্ষ্ম-দেহ আছে তাহার প্রমাণ,—যাহাদের ক্লায়ারভয়েনস্ (*Clairvoyance,—clear vision*) বা দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়াছে, তাহারা জীবের স্থূলদেহ ছাড়া জীবের ঐ সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম দেহ প্রত্যক্ষ করেন। কখনও কখনও মৃত ব্যক্তির (যাহাকে আমরা প্রেত বলি) প্রেত মূর্ত্তি আমাদের নয়ন গোচর হয়। মৃত ব্যক্তিরতো আর স্থূল দেহ থাকে না; অতএব আমরা যে প্রেত-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি, উহা নিশ্চয়ই তাহার সূক্ষ্ম শরীর। এ ঘটনাও একেবারে বিরল নয় যে, কখনও কখনও ক্যামেরা দ্বারা প্রেতমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ গৃহীত হয়। অনেকে ইহাও অবগত আছেন যে, বৈজ্ঞানিকগণ জীবিত মানুষের সূক্ষ্মদেহ (Human Aura) দর্শন করিয়াছেন।

(১৪) **পরীক্ষা-গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ**—সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ফরাসি মন-স্তত্ত্ববিৎ লান্‌সেনিন্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হিপ্‌নটিজিম্ বিদ্যার আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েন এবং অনেক পরীক্ষা-সমীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করেন। তাহার ফলে এখন হিপ্‌নটিজিম্ বৈজ্ঞানিক সমাজে একটা সমাদৃত আসন লাভ করিয়াছে।

যে কারণেই হউক, ইহা নিশ্চিত যে হিপ্‌নটিজিম্ অবস্থায় স্মৃতি-

শক্তি তীব্রতর হয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কর্ণেল ডি রোসা, ১১... সালে, একটি মধ্যবয়সী রমণীকে লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করি... ছিলেন। তিনি তাহাকে হিপ্‌নটিক্ নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া আদেশ করিলেন,— 'তোমার স্মৃতিশক্তি ক্রমশঃ পিছাইয়া লইয়া যাও।' সে তাহাই করি... কিছুক্ষণ পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তোমার বয়স এখন কত... সে বলিল,—'আঠার বৎসর।'—পরে পিছাইয়া তাহাকে দশ বৎসর... উপনীত করা হইল। তখন তার পারিপার্শ্বিক ঘটনা সকল বলিতে লাগিল। পরে চার বৎসর, দুই বৎসর, এক বৎসর করিয়া অবশেষে জন্মক্ষণে উপনীত হইল এবং তাহার মনে শৈশবের স্মৃতি জাগরূ... হইল। এই অবলম্বিত প্রণালীর নাম—প্রতিস্মরণ (Regression o... Memory.) এই প্রণালীতে অনেকেরই স্মৃতি জননীজঠর অতিক্র... করিয়া তাহার পশ্চাতে যাইতে পারিল না; কিন্তু, কাহার কাহার স্মৃতিকে ইহ-জন্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া জন্মান্তরে উপনীত হইতে দেখা গেল, এবং কেহ কেহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুই তিন জন্মের নাম-ধামাদি ও বিভিন্ন ভাষাদির কথা বলিল এবং দুই একজন ৬।৭ জন্মের কথা বলিল! পরে অনুসন্ধানে তাহাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইল! এই সকল পরীক্ষার বিশেষত্ব এই যে, উহাদের দ্বারা জন্মান্তর-বা... অপ্রত্যাশিতভাবে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

মোটকথা বর্ত্তমানে জগতে যিনি সত্য সত্যই অনুসন্ধিৎসু, তিনি এই প্রকার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণের সন্ধান পাইবেন। তবে, 'যিনি জাগিয়া ঘুমাইবেন তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে এমন সাধ্য কাহার?'—তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

জাতিভেদ

প্রশ্ন :—জাতিভেদ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ?

উত্তর :—শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥" গীতা—৪।১৩

গুণ ও কর্ম্মবিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ ভগবানেরই সৃষ্ট ;—মানুষের সৃষ্ট ইহা নহে। বিভিন্ন দেশে এগুলির নাম, বা সংজ্ঞা, বিভিন্ন হইলেও সকল দেশেই ইহাদের অস্তিত্ব স্বল্প-বিস্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা অপরিহার্য্যও বটে।

সর্ব্বত্র, সকল সমাজেই, চার শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন—

(১) কতকলোক, যাঁহারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, তাঁহারা নিঃস্বার্থ পরোপকারী, চরিত্রবান এবং সমাজের পরিচালক।

(২) কতক,—রজঃপ্রধান। তাঁহারা শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন ও যুদ্ধাদি দ্বারা দেশ রক্ষনে সমর্থ।

(৩) কতকলোক রজঃপ্রধান হইয়া কৃষিবাণিজ্যাদিতে সুপটু।

(৪) আর কতকলোক—তমঃপ্রধান ; তাহারা অপর তিনশ্রেণীর দাস্যবৃত্তিতেই অনুরক্ত। এই চারশ্রেণীই আমাদের দেশে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত।

ইহাদের মধ্যে শূদ্র ভাবাপন্ন তামসিক-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই অল্পবুদ্ধি ও কদাচারী হইয়া থাকে। তাহাদের আচার-বিচার, আহার-বিহার, অপর তিনবর্ণ হইতে স্বতন্ত্র ও নিকৃষ্ট। এমত অবস্থায় তাহাদের সহিত অপর তিন বর্ণের বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, বা ভোজনাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। তাই বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখা কদাচ উচিত নহে। এ বিষয়ে এদেশে কয়েকটি

কদাচার ও বদ্ধমূল কু-ধারণা প্রচলিত দেখা যায়, তাহা যত শীঘ্র দূরী- হয়, ততই দেশের ও সমাজের কল্যাণ।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা যে ধোপার মুখ দেখিলে, কলুর নাম করিলে, 'যাত্রা' অশুভ। এতদর্থে তাহারা খনার ব- পর্য্যন্ত প্রয়োগ করেন। এইরূপ আরও অনেকগুলি কুসংস্কার বর্ত্ত- রহিয়াছে—যেমন, মুচিতে, হাড়িতে, উচ্চশ্রেণীর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করি- তাহা অস্পৃশ্য হইয়া যায়; পরন্তু, ঐভাবে কুকুরে ছুঁইলেও উহা ঐ- অস্পৃশ্য হয় না! মুচি, হাড়ি, বাগ্দী, চণ্ডাল প্রভৃতির কাপড় ধো- কাচিবে না, বা নাপিত তাঁহাদের ক্ষৌরকার্য্য করিবে না; কিন্তু ঐ মু- হাড়ি প্রভৃতি যদি মুসলমান, খৃষ্টান বা বেশ্যাদি হইয়া যায়, তখন আর ঐ সকল ক্ষৌরাদি কার্য্যে কোন প্রকার বাধা বা আপত্তি দৃষ্ট হয় না!

এই সকল বিসদৃশ ব্যবহারের জন্যই অনেক সময় আমাদের নিম্ন- শ্রেণীর লোকেরা এত অবজ্ঞা, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যায়। আমাদের বাঙ্গলা- অধিকাংশ মুসলমানই এই শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের দৈহিক গঠন, চাল-চলন দেখিলেই তাহা সহজে অনুমিত হয়। গ্রামকে-গ্রাম এইরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের আরও প্রমাণ, গ্রামগুলির নাম শুনিলেই বোঝা যায়। আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান গ্রামগুলির নাম—'কুঞ্জনগর', 'কেশবপুর', 'গোবিন্দপুর' ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয় এত অবজ্ঞা নির্য্যাতনেও নিম্নশ্রেণীর লোক, সকলেই যে অদ্যাপি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে নাই, ইহাই বরং আশ্চর্য্যের বিষয়!

শোনা যায়, পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে বিধর্ম্মীরা হিন্দুদের দেব-দেবীর বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিতে আসিলে তত্রস্থ নমঃশূদ্র জাতি; (যাহারা পূর্ব্ববাঙ্গলা দেশে সংখ্যায় খুব বেশী ও মুসলমানদিগের একমাত্র সমকক্ষ) উহার প্রতিবিধান কল্পে সাহায্য দান করিতে তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাহারা বলিয়া থাকে,—"ঐ দেবদেবীর নিকট

যাইবারই যখন আমাদের অধিকার নাই, তখন কি কারণে আমরা ঐ জন্য আমাদের 'জান' দিতে যাইব?"—ইহা একেবারে অযৌক্তিক বা উড়াইয়া দিবার ব্যাপার নহে।

যুগধর্ম্মপালক মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে যেরূপ পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেশ, সুন্দরই মনে হয়। তিনি নিম্নস্তরের সকলকেই বৈষ্ণব হইবার সুযোগ দিয়াছেন, এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কোন প্রকার জাতি বিচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যিনি যে পরিমান ভক্তিমান্ ও শুদ্ধাচারী, তাঁর তত অধিক সম্মান ও মর্য্যাদা। উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা বা কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব রাখা খুবই গর্হিত বলিয়া পরিগণিত। অধিকন্তু কীর্ত্তনাদির সময় সকলেই একত্রে সংকীর্ত্তন ও পরস্পর আলিঙ্গন, এবং পদধূলি ও হরিলুট গ্রহণাদির প্রথা প্রচলন। মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের পাকান্ন কখনও গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু ভক্ত চণ্ডালদিগকে প্রেমালিঙ্গনাদি করিতে কখনও কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। যবন হরিদাসকে তিনি কিরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহা সকলেরই বিদিত। তিনি প্রীতিভরে হরিদাসের মৃত দেহ বুকে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; এবং অনেকে ঐ সময় তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিলেন। দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে, এ ক্ষেত্রে, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এই পন্থাই বেশ সমীচীন ও উপদ্রব-শূন্য মনে হয়।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবও এ্রকস্থলে বলিয়াছেন,—

"এক উপায়ে জাতি-ভেদ উঠে যেতে পারে—সে উপায়,—ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হ'লেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর নিতাই হরিনাম দিতে লাগ্‌লেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাক্‌লে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়; ভক্তি থাক্‌লে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি, ভক্তি থাক্‌লে—শুদ্ধ, পবিত্র হয়।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত,—৫ম ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ

জাতিবিচার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু বিভিন্ন সময়ে বি[illegible] ব্যক্তিকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ; এই তিনটি প্রকৃত জাতি। এই তিনগুণ ত্যাগ না করিলে, জাতি পরিত্যাগ করা যায় না। [illegible] কথায় বলিতে গেলে অভিমানই জাতি। এই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে, জাতি পরিত্যাগ হয় না। যাহার-তাহার অন্ন ভোজন করিলেই জাতিভেদ যায় না। এইরূপ আচরণ জাতিভেদ ত্যাগের উপায় নয়। অভিমান পরিত্যাগ কর, সমদর্শী হও, জাতিভেদ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যিনি যে সম্প্রদায়ে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের আচার-পদ্ধতি অনুসারে চলিবেন।"

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ,—২য় খণ্ড, ১২[illegible]

"জাতিভেদ প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সেতো সর্বত্র র'য়েছে।...বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ প্রথা এদেশে প্রচলিত র'য়েছে তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা ব্যবসাগত, আবার কোথাও বা মর্য্যাদাগত, বা অবস্থাগত, দেখতে পাওয়া যায়।...কিন্তু ঋষিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ করে গিয়াছেন, তাহা গুণগত। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ-ভেদে যে জাতিভেদ, তাই ঋষিরা স্বীকার ক'রেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। এ হিসাবে এখন শূদ্র জাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শূদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি একপ্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি আর একপ্রকার। উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বুদ্ধি থাক্‌লেই, সেখানে জাতি বুদ্ধি থাক্‌বে।...যার তার হাতে খেলেই জাতি-বুদ্ধি যায় না; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন-আহার করা যায়, তার শারীরিক, মানসিক সমস্ত ভাব, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তাহা দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য, এ সকল এক বিষম সমস্যা।"

"...পরমহংস অবস্থা লাভ না হ'লে যতকাল ভেদবুদ্ধি আছে, ততকাল মুচি, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ একাকার ক'রে, যার তার হাতে খেলেই জাতিভেদ যায় না। ভিতর হ'তে জাতিভেদ যাওয়া সহজ কথা নয়, বড়ই কঠিন।"

ঐ—৩য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা

গোঁসাইজী মৌন অবস্থায় স্বহস্তে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ শূদ্র-প্রকৃতি এবং শূদ্র কুলজাত হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি হইতে পারেন। কিন্তু এ সমস্ত বুঝিবার শক্তি সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ ভিন্ন অপরের নাই। এজন্য প্রাকৃত-জীবের পক্ষে সমাজগত জাতিভেদ মানিয়া চলাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-বংশে শতকরা হয়ত ৩০টী শূদ্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু শূদ্রবংশে ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি জীবের সংখ্যা হয়ত শতকরা ২০জনও হইবে না। এইজন্য ধর্ম্ম রক্ষার্থে, এবং বিশুদ্ধি রক্ষার অভিপ্রায়ে জন্মগত প্রকৃতি অধিকারের ভেদ মানিয়া লওয়াই নিরাপদ।"

"...যাহার তাহার খাওয়ায় জাতিভেদ নাই, তাহা নহে। জাতিভেদ যাওয়া সমবুদ্ধি।"

ঐ—৫ম খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা

এখন প্রশ্ন এই যে, তবে কি যোগ্যাযোগ্যের বিচার না করিয়া, আচার-ভ্রষ্ট হইলেও, ব্রাহ্মণ হইলেই তাঁহাকে সদ্‌ব্রাহ্মণোচিত মর্য্যাদা দান করিতে হইবে ?—এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর কি অভিমত তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাতে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে—

"১৩০৬ সালের, ২রা বৈশাখ, পুরীতে অবস্থিতি কালে, ঢাকার জমিদার রাধাবল্লভ বাবুর নিকট হইতে উপর্য্যুপরি তিনবার টেলিগ্রাম আসিল,—তাহার স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হইতেছে না; প্রসূতির সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। শেষ 'তার' রাত্রি সাড়ে ১০ টায় পাইয়া, উত্তরে গোস্বামীপ্রভু জানাইলেন—

'যদি হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাওয়াইতে পার, তবে জীবিতাবস্থায় ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবে এবং প্রসূতিও সুস্থ হইবে।'

'তার' পাঠাইবার পর বলিলেন—

"শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই আদেশ। কিন্তু ইহারা বিশ্বাস করিবে, মনে হয় না।"

রাত্রিতে ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে বলিল,—'হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক এক রাত্রির ভিতর, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কি প্রকারে যোগাড় হইবে?' ঠাকুর বলিলেন—

'কেন? তাঁহারা বড়লোক—অনেক কর্ম্মচারী আছে। ছেলেদের মেসে লোক পাঠাইয়া তো অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন।'

তাহাতে ব্রহ্মচারী বলিল,—'তারা কি আর ব্রাহ্মণ; সন্ধ্যা-পূজা কোনকালেও করে না, অনাচারের একশেষ।' ঠাকুর বলিলেন—

'হাঁ; তোমার মত বুদ্ধি হইলেই হয়েছে, তা হ'লেই ওতে গোল বাধিবে। যার গলায় পৈতা দেখিবে, তারেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানে পাদোদক আনিবে।'"

("আচার্য্য প্রসঙ্গ"—৩৬৫ পৃষ্ঠা)

আচার-ভ্রষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা মহাপ্রভুও অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। পিতৃ-পিণ্ড প্রদানার্থে গয়াক্ষেত্রে গমন পথে পশ্চিমদেশীয় অনাচারী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিজ সঙ্গীদের অশ্রদ্ধার ভাব দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশমত তথাকার ঐ ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়াই তিনি রোগমুক্ত হয়েন ও এই ভাবে সকলের চৈতন্য উৎপাদন করেন। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নির্বিচারে সকল ব্রাহ্মণেরই পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া জগৎকে ঐ একরূপই শিক্ষা দিয়াছেন। মহাভারত ও

ভাগবত আমাদের এই উভয় প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের এই আচরণের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও পরম শিক্ষাপ্রদ। আমরাও নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া; তাঁহাদিগকে প্রণাম, তাঁহাদের পাদোদক ও পদধূলি গ্রহণ, এবং পাদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা, বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে যথাযথ মর্য্যাদা দানের ফলে; ক্রমেই তাঁহারা কদাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছেন। এই বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।*

জাতিভেদ সম্বন্ধে একটা কথা বিবেচ্য যে, চতুর্বর্ণের মধ্যে সামাজিক আচার-বিচারের যতই মেলা-মেশা করা হউক না কেন, উহাদের ভিতর হইতে একদল ধর্ম্ম-যাজক শ্রেণীর লোক থাকা সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ও বিশেষ কল্যাণপ্রদ। তাঁহাদের আচরণ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্ধারিত আচরণেরই অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, যথা—

* (১) এসম্বন্ধে আমার নিজেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে একটি ঘটনার কথা বলি।— বহুদিন হইল আমাদের গ্রামের একটি বাল্যবন্ধু একদিন আমাকে একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া আমার হাত ধরিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে বলিল,—"ভাই, তুমি আমাদের পাদোদক পান কর, পথে ঘাটে দেখলেই পদধূলি গ্রহণ কর এবং আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের সম্মান বৃদ্ধির জন্য কত প্রকারে চেষ্টা করিতেছ; আর আমি, আজ পর্য্যন্ত আমার কদভ্যাস (পানাসক্তি) কোন প্রকারে ছাড়িতে পারিলাম না! যাহা হউক, আজ তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আর একমাস মধ্যে আমি ইহা ত্যাগ করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।"—যথোচিৎ মর্য্যাদা-দান ও শ্রদ্ধার ফলে গ্রামের এইরূপ অনেকেরই আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টা জাগ্রত হইয়াছে এবং অনেকের মধ্যে বেশ একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। তবে ইঁহাদের উন্নয়ন-কল্পে সরকারের তদ্রূপ দৃষ্টি না পড়ায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না।— এতদর্থে ব্রাহ্মণগণের যথাযথ সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ও শাস্ত্রালোচনার প্রচলন প্রয়োজন।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। এই পদ মর্য্যাদা জাতিগত না হইয়া গুণগত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও, এখন আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, তাহাতে উহার এখন আর অধিক বিপর্য্যয় না ঘটাইয়া, উপস্থিত উহা জন্মগত রাখাই নিরাপদ। ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত গুণগত জাতিভেদই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তদভাবে জন্মগত বা সমাজগত জাতি বিভাগ যে, অপরাপর দেশের প্রচলিত ঐশ্বর্য্যগত জাতি বিভাগ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা পৃথিবীর সকল জাতির চিন্তাশীল মনীষিগণ মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করেন। এখন দেশে এইরূপ ব্যবস্থাই নিরাপদ। তারপর ভগবৎ ইচ্ছায় যখন আবার সে শুভদিন আসিবে, যেদিন আবার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরাজার (বা কোনরূপ অনুকূল অবস্থার) অভ্যুদয় হইবে এবং তিনি কোন ঋষিকল্প সমদর্শী মহাপুরুষ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া আমাদের সমাজ সংস্কার সাধিত

---

(২) এই প্রসঙ্গে পরলোকগত ভূতপূর্ব্ব Sub-Judge, পরম শ্রদ্ধেয়, কিশোরী লাল সেন মহাশয় একটি ঘটনা বলিয়াছেন—"গোঁসাইজীর পুরীতে অবস্থিতি কালে আমি একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছি। পথে আমার বিপরীত দিক হইতে জগন্নাথ মন্দিরের Superintendent (কার্য্যাধ্যক্ষ) আসিতেছিলেন। তাঁকে দূর হইতে দেখিয়া আমার মনে হইল তিনি একে জগন্নাথ মন্দিরের Superintendent তাহাতে ব্রাহ্মণ,—নিকটস্থ হইলেই প্রণাম করিব। কিন্তু নিকটস্থ হইতে তাঁর কয়েকটি মন্দকার্য্যের কথা মনে উদয় হওয়াতে, তাঁকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল না এবং প্রণাম করিলাম না। তার পরেই গোঁসাই-জীর কাছে উপস্থিত হইয়া উক্ত ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। তিনি তাহাতে বলিলেন,—'ব্রাহ্মণ মাত্রই প্রণম্য। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে,—যাঁর হৃদয়ে নারায়ণ বাস করেন, এরূপ একজনের চরণে যদি প্রণাম পড়ে তাহলে আপনার বিশেষ ভাগ্য জানিবেন। মনুষ্যমাত্রই প্রণম্য;—পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতাদি সকলই প্রণম্য। নীচু না হলে (তাঁর কৃপা) আসে না।"

(শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর কৃপাপাত্র শ্রদ্ধেয় Advocate শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় নিকট হইতে সংগৃহীত।)

করিবেন, তখন আবার বর্ণাশ্রমের যথাযথ পুনঃ প্রবর্ত্তন হইবে এবং আবার ঘরে ঘরে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিরাজ করিতে থাকিবে। তখন আমরা আবার প্রকৃত আর্য্য-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার সৌভাগ্য লাভ করিব।

এখন দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায়, সমাজের প্রকৃত কল্যাণকামীর কর্ত্তব্য, যাহাতে উপস্থিত ধর্ম্মযাজক পদে প্রতিষ্ঠিত আমাদের ব্রাহ্মণগণ এ কার্য্যে যথাযথ উপযুক্ত হন, সে বিষয়ে আন্তরিক যত্নবান হওয়া এবং এতদর্থে টোল, চতুষ্পাঠী, এবং যজন-যাজন, ত্রিসন্ধ্যাদি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান হওয়া। সমাজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিকে যত্নবান না হইয়া, একাকার করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। একেত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও পাশ্চাত্য ভাবের সংঘর্ষে আমাদের সনাতন ধর্ম্মভাব প্রায় বিলুপ্ত হইতেই বসিয়াছে এবং আমাদের জাতির মজ্জাগত দেবভাবের পরিবর্ত্তে, "দম্ভ, দর্প, অভিমান, পারুষ্য" প্রভৃতি অসুরভাব ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এই অবস্থায় ঐ ধর্ম্মযাজকদের উৎকর্ষের প্রতি আন্তরিক লক্ষ্য না রাখিয়া যদি তাহাদের বিলোপেরই সহায়তা করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের 'নিজস্ব' বলিতে যাহা বুঝি তাহা হারাইয়া ফেলিব এবং আমাদের ঘরে যেটুকু সুখ, শান্তি, পরস্পর শ্রদ্ধা, আত্মীয়তা ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাও অচিরে বিনষ্ট হইবে এবং হৃদয়ের স্নিগ্ধ, সরস, সশ্রদ্ধ, ধর্ম্মভাবগুলি বিলুপ্ত হইয়া, তাহা কেবল কৃত্রিম, নীরস-আত্মীয়তার অভিনয়ে পরিণত হইবে এবং পাশ্চাত্যের ভোগ-বিলাসের তাণ্ডব-নৃত্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে। ঐ ভীষণ দিন সমাগত প্রায়, অতএব সময় থাকিতে অচিরে আমাদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ক্ষত্রিয়-ভাব সংরক্ষণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষাত্র-শক্তি যথাযথ

নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার জন্য সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, ত্যাগী, সমদর্শী ধর্ম্মযাজকেরও একান্ত প্রয়োজন ; নতুবা, সকল প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সকল দিকে দেশ-হিতৈষী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীরামচন্দ্র, বশিষ্ঠদেব ও বিশ্বামিত্র ঋষির নিকট এবং শ্রীকৃষ্ণ, সান্দীপনি মুনির নিকট, যথাযথ শিক্ষা লাভ করিয়া, তৎপরে তাঁহাদের নেতৃত্বে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেন।

এক্ষণে ব্রাহ্মণেতর অপরাপর জাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের যে সকল শ্রেণীবিভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেগুলির উপস্থিত যথা সম্ভব মর্য্যাদা দান করিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়। তবে ইহার ভিতর আবার প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ক্রমে তিরোহিত হইলেই সমাজের কল্যাণ। উপস্থিত সমাজের ভিতর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির মধ্যেই কতইনা বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ রহিয়াছে! কায়স্থদের মধ্যে দক্ষিণ-রাঢ়ী, উত্তর-রাঢ়ী, বঙ্গজ, কুলিন, মৌলিক, ৮ ঘরে, ৭২ ঘরে, প্রভৃতি নানা বিভাগ ও স্তর ভেদ দৃষ্ট হয় এবং তাহাদের বিবাহাদির আদান প্রদান ব্যাপার ঐ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন দেশ-দেশান্তরে চলাফেরার ও মেলা-মেশার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ঘটায়, বিভিন্ন দেশের আচার-বিচারের বৈষম্য ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে ; এক্ষেত্রে এখন সকল কায়স্থদের মধ্যেই পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলন হইলেই সমাজের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় এবং তাহাই বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ, অপরাপর জাতির ভিতরও শাখা-প্রশাখা গুলি বিলুপ্ত হইলেই মঙ্গল। তাহাতে সমাজের শক্তি ও পরস্পর হৃদ্যতা বৃদ্ধি হয়। বাগ্দী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর জাতিদের মধ্যেও কতই শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়! এগুলি সমাজের দুর্ব্বলতা ও সমাজদেহে ক্ষতেরই পরিচায়ক। এগুলির অচিরে যথা সম্ভব বিলোপ সাধনই বাঞ্ছনীয়।

এদিকে আবার রুইদাসদিগকে ঐভাবে সমাজে ঢুকাইয়া লইতে হইলে, তাহাদের আহার-বিহারের বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং তাহাদের মধ্যে মৃত গরুর মাংস ভক্ষণ-প্রথা একেবারে দূর হওয়া প্রয়োজন ; নতুবা তাহাদের সহিত অপরাপর নিম্নবর্ণের মেলামেশা কখনই সম্ভবপর হইবে না এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নহে। অপরদিকে আবার তাহাদিগকে এভাবে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দূরে-দূরে ঠেলিয়া রাখিলে, বিধর্ম্মীদের প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। উহা সমাজের পক্ষে অতীব অনিষ্টকর, বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে যাহাতে সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

আর একটি কথা, যাহাদিগকে আমরা অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে বর্জ্জন করি, তাহাদিগকে অসঙ্কোচে আমাদের ব্যবহারিক জগতে মেলামেশার জন্য গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাদের শিক্ষা ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য ; নতুবা তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করিলে নিজেদেরও অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা। একারণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থাই নিরাপদ এবং সকলেরই কল্যাণপ্রদ ও সর্ব্বতোভাবে উপযোগী বলিয়াই মনে হয়। তিনি আচণ্ডাল—এমনকি যবনাদিকেও, একই প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজনের অধিকার দিয়াছেন। সংকীর্ত্তনাদিতে একত্রে নৃত্য ও আলিঙ্গনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন,—যথা,—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ ?"—এবং স্থল বিশেষে তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বাসি মহাপ্রসাদ কায়স্থ রঘুনাথদাসের হাত হইতেও কাড়িয়া খাইয়াছেন ; অথচ সমাজের বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন নাই, বা ব্রাহ্মণ ব্যতীত যার তার হাতে, কখন কুত্রাপি খান নাই।

আমাদেরও মনে হয় নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে বৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া, তাহাদের ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া, তাহাদের

আচার-বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিবার প্রয়াস পাইলে, ক্রমে তাহারা উচ্চবর্ণের সহিত কীর্ত্তনাদিতে মেলামেশার সুযোগ পাইবে এবং চরিত্র ও আচার-শুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে জল চলনাদির প্রচলন হইবে এবং অস্পৃশ্যতার ভাব চলিয়া যাইবে।

পরিশেষে, এই একটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত দেশ-হিতৈষিগণের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি, ধী বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়াই, যে-শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু একদিন প্রচলিত বর্ণাশ্রমে অনাদর করতঃ সকল প্রকার নির্য্যাতনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, বর্ণাশ্রমের প্রতীক উপবীত ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং আত্মীয়স্বজনের অনুনয় বিনয় ও পরম আরাধ্য মাতাঠাকুরাণীর কাতর ক্রন্দনেও বিচলিত না হইয়া, উহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন ; আবার সেই নিষ্কপট, সত্যানুরাগী, তেজস্বী মহাপুরুষই, মানসসরোবরবাসী পরমহংসজীর অলৌকিক দীক্ষা প্রভাবে, যখনই শাস্ত্র-সদাচারের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম এবং বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিলেন, তখনই বজ্রনির্ঘোষে তাহা জনসমাজে প্রচার করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিলেন না! এই চিরসত্যনিষ্ঠ, ঋষিকল্প মহামানবের, চরম সিদ্ধাবস্থায়, দিব্য-দৃষ্টিতে প্রতিভাত, দেশের পরম হিতকর মর্ম্মবাণীতে সকল চিন্তাশীল দেশহিতৈষীরই যথাযথ মর্য্যাদা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু, তাঁহার মহা-প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে, এই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে পত্র যোগে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বর্ণাশ্রম সংরক্ষণের প্রতি তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তাহাই দেখাইয়া উপস্থিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।—ঐ চিঠিখানির সর্ব্বশেষে আবেগভরে তিনি লিখিয়াছেন—

"নমস্ত নিত্যানন্দ-বংশধর চরণসরোজেষু—

...আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষায় জন্য চেষ্টা না করিলে আর কাহারা করিবে? এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম না দাঁড়াইলে সর্ব্বসাধারণের কখন মঙ্গল হইবে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই যথার্থই সকলের কল্যাণ হইবে। পরিশেষে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবি করেন ও অধিকদিন তাঁর সত্য ধর্ম্ম এইরূপে রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন।

৺শ্রীক্ষেত্রধাম
৪ঠা জৈষ্ঠ
১৩০৬

শাস্ত্র ও সদাচার রক্ষাকারী সর্ব্বসজ্জনগণের
দাসানুদাস
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(আচার্য্য প্রসঙ্গ—৪০৪ পৃঃ)

এক্ষণে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-(সনাতন-ধর্ম্ম) রক্ষণাকাঙ্ক্ষী শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।*

(২)

পরমপূজ্যপাদ বিশ্ববরেণ্য, কবীন্দ্র, ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ' পুস্তকে যে গভীর তত্ত্ব-সম্বলিত 'ব্রাহ্মণ'-শীর্ষক পরম উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

(কালের প্রভাবে বিধাতার ইচ্ছায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও আনুষঙ্গিক ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে আমাদের দেশে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল।) "সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবার ও বিধি বিধান স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ

* ১৩৫১ সালের মন্দির পত্রিকাতে এইখানেই প্রবন্ধটি শেষ করা হইয়াছিল অবশিষ্ট অংশ পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই বৃহৎ সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। এই কার্য্য সাধনের উপযোগী সম্পদও তাঁহার ছিল।

আমাদের সমাজ যেভাবে গঠিত তাহাতে সমাজের পক্ষেও ব্রাহ্মণের প্রেষ্টিজ (Prestige) আবশ্যক আছে। আবশ্যক আছে বলিয়াই সমাজ এত সম্মান ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ যখন আপনার কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন কেবল গায়ের জোরে পরলোকের ভয় দেখাইয়া, সমাজের উচ্চতম আসনে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। কোনো সম্মান বিনামূল্যের নহে—যথেচ্ছ কাজ করিয়া সম্মান রক্ষা করা যায় না।

যে সমাজের একদল লোক ধনবানকে অবহেলা করিতে জানেন, বিলাসকে ঘৃণা করেন, যাঁহাদের আচার নির্ম্মল, ধর্ম্ম দৃঢ়, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান অর্জ্জন ও নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান বিতরণে রত—পরাধীনতা বা দারিদ্র্যে সে সমাজের কোন অবমাননা নাই। সমাজ তাঁহাকে যথার্থভাবে সম্মাননীয় করে গেলে, সমাজ তাঁহার দ্বারাই সম্মানিত হয়।

এই ব্রাহ্মণই যথার্থ স্বাধীন। ইহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিন্যের সহিত, পালন করিয়া, সমাজের রক্ষা করেন। সমাজ ইহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ্য, সেই সম্মান দেয়।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে। এ সম্ভবনাকে আমি সুদুরপরাহত মনে করি না এবং এই আশাকে আমি লঘুভাবে মন হইতে অপসারিত করিতে পারি না। ভারতবর্ষের চিরকালের প্রকৃতি, তাহার ক্ষণকালের বিকৃতিকে সংশোধন করিয়া লইবে। এই পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণসমাজে অব্রাহ্মণও অনেকে যোগ দিবেন। প্রাচীন ভারতেও ব্রাহ্মণেতর অনেকে ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা ও উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণও তাঁহাদের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।
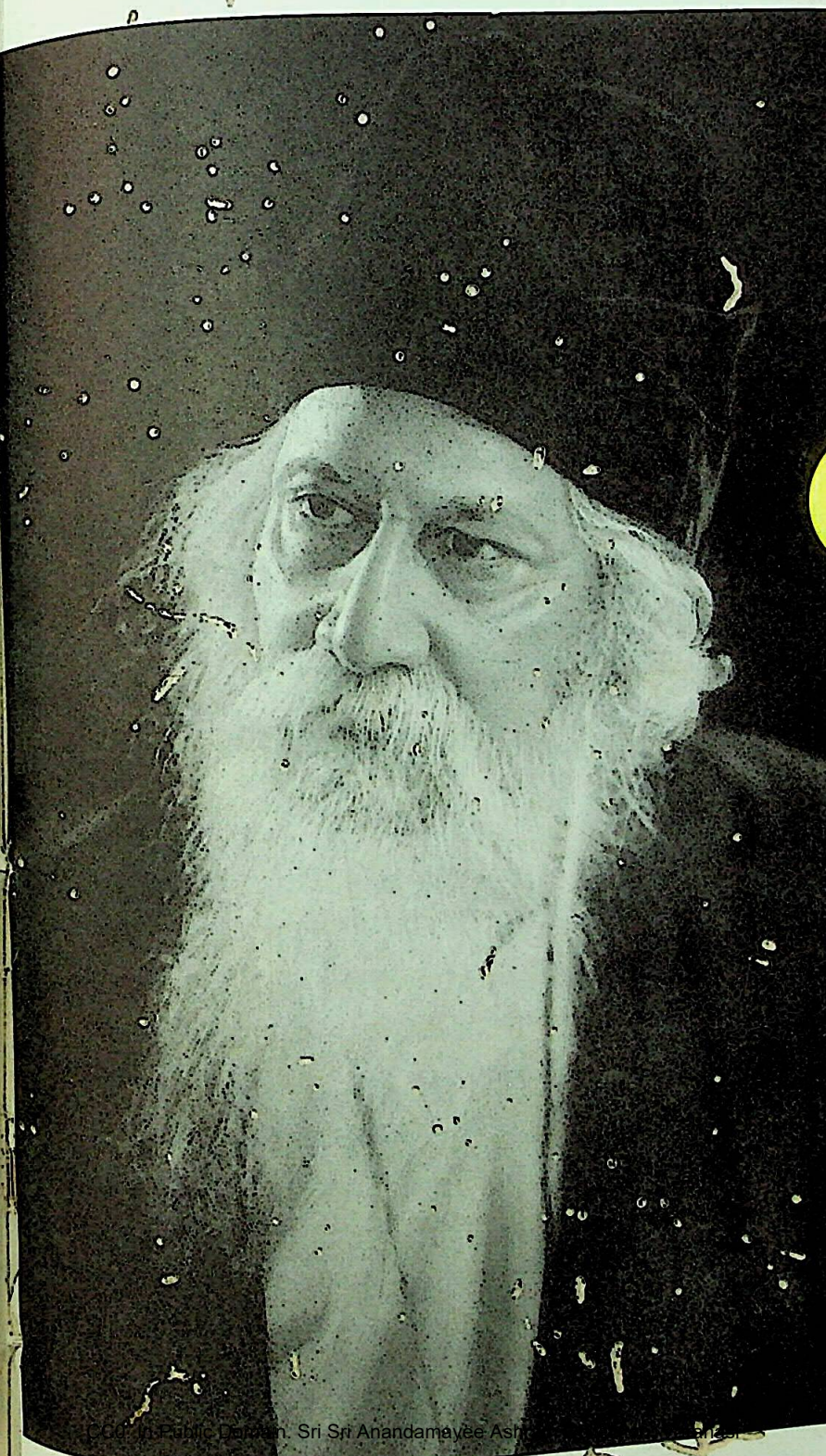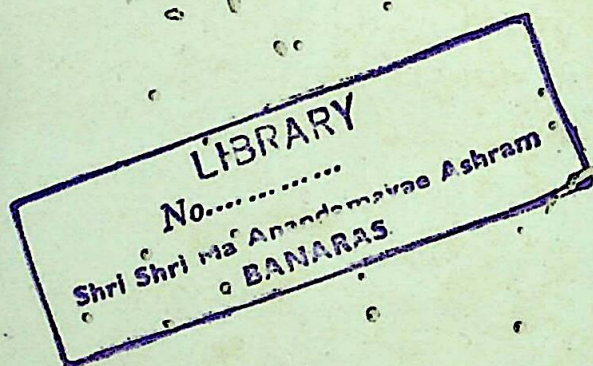
প্রাচীনকালে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র 'দ্বিজ' ছিলেন না,—ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও দ্বিজ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; যখন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা লাভের দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উপনয়ন হইত, তখনই এ দেশের ব্রাহ্মণের আসন উজ্জ্বল ছিল। কারণ, চারিদিকের সমাজ যখন অবনত, তখন কোন বিশেষ সমাজ আপনাকে উন্নত রাখিতে পারে না; ক্রমেই নিম্নের আকর্ষণ তাহাকে নীচের স্তরে লইয়া আসে।

ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র 'দ্বিজ' অবশিষ্ট রহিল, যখন তাঁহার আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, তাঁহার নিকট দাবী করিবার জন্য চারিদিকে আর কেহই রহিল না, তখন তাঁহার দ্বিজত্বের কঠিন আদর্শ দ্রুত-বেগে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তখন সে, জ্ঞানে, বিশ্বাসে, রুচিতে, ক্রমশঃ নিকৃষ্ট অধিকারীর দলে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। চারিদিকে যেখানে গোলপাতার কুঁড়ে, সেখানের নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে একটা আটচালা বাঁধিলেই যথেষ্ট—সেখানে সাতমহল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিবার ব্যয় ও চেষ্টা স্বীকার করিতে সহজেই অপ্রবৃত্তি জন্মে।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ভদ্রসম্প্রদায়,—অর্থাৎ বৈদ্য, কায়স্থ ও বণিক সম্প্রদায়। সমাজ যদি উহাদিগকে 'দ্বিজ' বলিয়া গণ্য না করে, তবে ব্রাহ্মণের উত্থানের আর আশা নাই। এক পায়ে দাঁড়ায়ে সমাজ বকবৃত্তি করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণদিগকে নিজের যথার্থ গৌরব লাভ করিবার জন্য যেমন প্রাচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে, সমস্ত সমাজকেও তেমনি যাইতে হইবে।

আমাদের সমস্ত সমাজ প্রধানতই 'দ্বিজ'। সমাজ ইহা যদি না হয়, সমাজ যদি শূদ্র-সমাজ হয়, তবে কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্মণকে লইয়া এ সমাজ ইয়োরোপীয় আদর্শেও খর্ব্ব হইবে, ভারতবর্ষীয় আদর্শেও খর্ব্ব হইবে।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন খাইব কী?—যদি কালিয়া পোলাও না খাইলেও চলে, তবে নিশ্চয়ই সমাজ আপনি আসিয়া যাচিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। তাঁহাদের নহিলে সমাজের চলিবে না। পায়ে ধরিয়া সমাজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য 'দ্বিজ' ছিল,—অর্থাৎ সমস্ত আর্য্য সমাজই 'দ্বিজ' ছিল। শূদ্র বলিতে যে সকল লোককে বুঝাইত, তাহারা সাঁওতাল-ভিল-কোল-ধাঙ্গরের দলে ছিল। আর্য্য-সমাজের সঙ্গে তাহাদের শিক্ষা, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের ঐক্য স্থাপন একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ সমস্ত আর্য্য সমাজই 'দ্বিজ' ছিল,—অর্থাৎ আর্য্য সমাজের শিক্ষা একরূপ ছিল। প্রভেদ ছিল কেবল কর্ম্মে। শিক্ষা একই থাকায়, পরস্পর পরস্পরকে আদর্শের ভঙ্গী রক্ষা করার সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিতে পারিত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণ হইতে সাহায্য করিত এবং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হইতে সাহায্য করিত। সমস্ত সমাজের শিক্ষার আদর্শ সমান উন্নত না হইলে এরূপ কখন ঘটিতে পারে না।

বর্ত্তমান সমাজেও যদি একটা মাথার দরকার থাকে।—সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হয় এবং সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে তাহার স্কন্ধ ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না এবং সমাজকে সর্ব্ব প্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ।

বৈদ্যরাও উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কায়স্থরা বলিতেছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, বণিকেরা বলিতেছেন তাঁহারা বৈশ্য;—এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ দেখি না। আকার প্রকার, বুদ্ধি ও ক্ষমতা—অর্থাৎ আর্য্যত্বের লক্ষণে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদের সহিত ইহাদের প্রভেদ নাই। বঙ্গদেশে যে কোন সভায়, পৈতা না দেখিলে ব্রাহ্মণের

সহিত কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক প্রভৃতিদের তফাৎ করা অসম্ভব। বিশুদ্ধ আর্য্য-রক্তের সহিত অনার্য্য-রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছে।...তথাপি এই মিশ্রণ এবং বৌদ্ধযুগের সামাজিক অরাজকতার পরেও, সমাজ ব্রাহ্মণকে একটা বিশেষ গণ্ডি দিয়া রাখিয়াছে। কারণ, আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন তাহাতে ব্রাহ্মণ নহিলে তাহার সকল দিকেই বাধে। আত্মরক্ষার জন্য যেমন-তেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে সংগ্রহ করিয়া রাখা চাই।...স্থান বিশেষে রাজা পৈতা দিয়া একদল ব্রাহ্মণ তৈরি করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে রাজা বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া সমাজের কাজ চালাইতে বাধ্য হইয়াছেন।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী—৪র্থ খণ্ড, ৩৮৭ পৃঃ)

এই জটিল জাতিভেদ সমস্যা সমাধানে নব্যভারতের যোগ্য অন্যতম পথপ্রদর্শক স্বামীজী, "ভারতের ভবিষ্যৎ" বক্তৃতা প্রসঙ্গে কবিবরের নির্দ্দেশিত পন্থারই ইঙ্গিত করিযাছেন।—

"ভারতের জাতিভেদ সমস্যায় মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছে,—উচ্চবর্ণকে হীনতর করিতে হইবে না; নিম্ন-বর্ণকে উন্নত করিতে হইবে; —ব্রাহ্মণ জাতির লোপ-সাধন করিতে হইবে না। ভারতের ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের জাতিভেদ সমস্যায় মীমাংসা—নীচজাতিকে ক্রমশঃ উন্নত করা,—অর্থাৎ, তাহাদিগকে ক্রমশঃ শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচার সম্পন্ন করা। স্মৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাই—'যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার অনুসরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান কর্ত্তব্য'।...এখন একচেটিয়া অধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণজাতির কর্ত্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন,—এবং যতদিন ইহা করেন, তত দিনই তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ, তিনি সাংসারিক কোন কার্য্য করেন না। সাংসারিক কার্য্য অপর জাতির জন্য,—ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতিকে উন্নত হইতে হইলে, সংস্কৃত-শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

ধর্ম্মই আমাদের শোণিত স্বরূপ। যদি এই রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। ধর্ম্মে আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা ইহা ছাড়াইতে পার না। যদি ইহা পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাই আমাদের জাতির জীবন স্বরূপ, ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে।”

(ভারতে বিবেকানন্দ)

বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের অন্যতম কবিবর ও স্বামীজীর বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে গভীর চিন্তা-প্রসূত অভিমত উল্লিখিত হইল, তাহা হাল্‌কাভাবে উড়াইয়া দিবার, বা উপেক্ষা করিবার, বস্তু নহে; পরন্তু, জাতির যথার্থ কল্যাণকামী মাত্রেরই উহা অতি ধীরভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।’

ইহা খুবই সত্য যে বৌদ্ধযুগে এবং তৎপরবর্ত্তী কালে সমাজের দারুণ বিপর্য্যয়ের ফলেই, আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতির উপনয়াদি-সংস্কার ও শাস্ত্রানুশীলনের অভাবে, মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাদের যোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যথাযথ যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। অপর সকল বর্ণ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ও সংস্কারবর্জ্জিত বলিয়া, সামান্য কিছু শিক্ষা সদাচারাদি পালনদ্বারাই তাঁহাদের যাজন-যজনাদির কাজ চলিয়া যাইত। ইহার ফলে ক্রমেই তাঁহাদের শাস্ত্র-সদাচার পালনে শিথিলতা আসায় অধঃপতন ঘটে। পরিশেষে কালের প্রভাবে তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছেন।

এক্ষণে সমাজের নেতামহাশয়গণ সম্যক্ অবহিত হইয়া কবিবরের নির্দ্দেশমত পদ্ধতিতে সংস্কারের পথে অগ্রসর হইলে ইহা অতি অল্পায়াসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এই প্রণালী কাহারও প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ প্রসূত নহে, একারণ এই পন্থা অবলম্বন করিলে ইহা কোন বর্ণেরই মর্ম্ম-পীড়াদায়ক হইবে না। ইহাতে সকল বর্ণেরই তুল্য-উপকার হইবে এবং ইহাতে সমাজের যথার্থ পুষ্টি সাধন করিবে। বিশেষতঃ সমাজের

শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের ইহা স্বার্থের অনুকূলই হইবে। অতএব সমাজের যথার্থ কল্যাণকামী ব্রাহ্মণগণ, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে, হৃষ্ট-চিত্তে, যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের উপনয়নাদি সংস্কারের বিধি-ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অতিসহজেই এই সুমহান উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। এতদর্থে, আনুষঙ্গিক-রূপে, সর্ব্ববর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা প্রচলন বিশেষ প্রয়োজন।

বঙ্গদেশের ক্ষত্রিয়-বর্ণের পৃথক অস্তিত্ব নাই। বহু গবেষণার পর এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে বঙ্গদেশে কায়স্থগণই ক্ষত্রিয় এবং বণিকেরাই বৈশ্য। বহুকাল আচার-ভ্রষ্ট হওয়ার পরিণামে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। যাহা হউক, এই লইয়া বর্ত্তমানে অধিক বাদ-বিতণ্ডায় কোন লাভ নাই; পরন্তু, উপনয়নাদি সংস্কারের ব্যবস্থায় ইহার ফল ভালই হইবে। ইহা দ্বারা দেশ ক্রমেই শাস্ত্রসদাচার-সম্পন্ন হইবে এবং ব্রহ্মণগণ নিজেদের আচার-বিচারের প্রতি যথাযথ সচেতন হইবেন, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। এইভাবে আমাদের সনাতন আর্য্যজাতির পূর্ব্ব-গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে। সাধু-মহাত্মাগণ অচিরে এইরূপ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ

প্রশ্ন :—বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর :—বহুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী বিধবা-বিবাহ প্রচলন জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কাগজে লেখালেখি করেন ও ইহার পোষকতায় একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ঐ সময় এই সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীজীর সহিত আমার দুইবার সুদীর্ঘ পত্রালাপ হইয়াছিল। তখন সর্দ্দা-আইন প্রচলন হয় নাই। আমার বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদ-পত্রের প্রত্যুত্তরে মহাত্মাজী, বাল-বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সহানুভূতি-সম্পন্ন হইলেও, সাধারণভাবে বিধবা-বিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে তিনি তদ্রূপ

আগ্রহান্বিত নহেন এইরূপ ভাবই ব্যক্ত করেন ; তবে বিপত্নীক পুরুষের বৃদ্ধ বয়সেও যেরূপ দ্বিতীয়-দার গ্রহণে আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। এক্ষণে সর্দ্দা-আইনের প্রচলন হওয়ায়, বাল-বিধবা-সমস্যা এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে মহাত্মাজী আমার ভাবেরই একপ্রকার পোষকতা করেন *

The Ashram
Sabarmati, 17. 9. 26.

Dear friend,

I have your letter for which I thank you. Let us not confuse the issue by raising the question of divorce. The question to be considered is, whether a widow should have the same right and free choice, as the widower; and secondly, whether a girl of tender years, even 15, who has been practically forcibly raped and after the rape becomes, according to the present mistaken belief—a widow, should have the right to marry, or if you like, remarry, a properly qualified person or not.

I would like you not to be shocked at the use of the word rape in this connection. I want you to be shocked at what is to-day happening in our society. To-day the chastity which we impute to widows has been discovered to be amiss. Secret vice that is corrupting society and which now and then sees the light of day, should be a sufficient warning to us against taking the name of purity, religion, morality, in connection with the widowhood. What we need to be protected against, is not the absolutely necessary re-marriage of young widows but the inhuman lust of men in Hindu society. Have you studied the case of men who have more than one wife? Or, of old men, almost on the brink of the grave, marrying girls of 11 and 12 years? Such cases only happened the other day in western India and in southern India and I have knowledge of such cases all over India.

yours Sincerely.
M. K. Ghandi.

Sjt B. N. Mazumdar,
Asstt Engineer, P. H. D. Bengal.
3, Charnockplace, Calcutta

মূল কথা এই যে, অল্প বয়সের বাল-বিধবা দেখিলে স্থূল দৃষ্টিতে তাহার দুঃখ মোচনের জন্য তাহাদের পুনর্বিবাহ দেওয়াই আপাততঃ সমচীন ও সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এবিষয়ে যে ব্যবস্থা বা বিধান করিয়াছেন, এই সমস্যার তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সমাধান আজ পর্য্যন্ত কোন দেশে বা জাতির মধ্যে উদ্ভাবিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধি-নিয়ম বাঁধিয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কার্য্যতঃ সেইরূপ বিধি-ব্যবস্থা অধিক দিন প্রচলন থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিধবা-বিবাহ একবার প্রচলন হইলে, অপর দেশেরই মত হিন্দু সমাজেও ক্রমে বিবাহ সম্বন্ধে কোন বয়সাদির বাঁধাবাধি থাকা সম্ভবপর হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। কালক্রমে অপরাপর দেশের মতই সাতসন্তানের মাতা, নির্ব্বিকার-চিত্তে সাতবার বিবাহ করিবে এবং তাহার সতীত্ব ধর্ম্ম বজায় থাকিবে!—ইহার প্রতিরোধ করিতে কেহই সমর্থ হইবেন না। মহাত্মাজী বাল-বিধবার প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছিলেন; এমত অবস্থায় যখন বাল্য-বিবাহ আইনতঃ উঠিয়া গিয়াছে তখন বাল-বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গ তোলাই নিষ্প্রয়োজন।

নিতান্ত বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে, ঐ বালিকা হয়ত স্বামীকে, স্বামী বলিয়া চিনিবার, বা সঙ্গসুখ বুঝিবার, বা প্রাণের সহিত ভালবাসিবার কোন দিন সুযোগই পাইল না, অথচ ঐ পতির মৃত্যুতে ঐ বালিকার প্রতি কঠোর বৈধব্য-আচার প্রতিপালনের ব্যবস্থা, বস্তুতঃই যে অতীব মর্ম্ম-পীড়াদায়ক তাহাতে আর সংশয় কি? পরন্তু, যোগ্য বয়সে বিবাহ হইয়া যদি একদিনের জন্যও প্রাণ-বিনিময় হইয়া, প্রাণে-প্রাণে মিলনের সুযোগ হয়, তাহার পর ঐ পতি-বিয়োগে তাহার জন্য আজীবন বৈধব্য-যাতনা-ভোগ ও স্বেচ্ছায় তদোচিত বিধি নিয়ম পালন করা বরং সম্ভবপর। একারণ ঐ বাল-বিধবা বিবাহের পরিবর্ত্তে, চিরদিনই আমরা যোগ্য বয়সে বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী। যাহা হউক,

এখন যখন সর্দা-আইন দ্বারা ঐ সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে তখন আর কথা কি।

এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা এই যে, যে জন্যই হউক, বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, অগ্নি ও নারায়ণ সাক্ষী করিয়া, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সমক্ষে এবং অনুমোদনে, প্রকাশ্য সভায় বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে, যে মুহূর্ত্তে বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে,সেই ক্ষণ হইতেই জন সাধারণের, বিশেষতঃ বিধবাগণের, চিত্তে এক বিষম বিপর্য্যয় ঘটিবে এবং সতীত্বের গৌরব চিরতরে ম্লান হইয়া যাইবে, ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের ভিতর এই একটা ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকিবে যে, দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণ করা, বা দ্বিচারিণী হওয়া, শাস্ত্রবিগর্হিত পাপ কর্ম্ম নহে এবং উহাতে কাহারও সতীত্বের হানি হয় না।—এই কুৎসিত, আত্মঘাতী ধারণা সমাজের মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে, অসংযমের স্রোত বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে এবং তখন অনেকেই দ্বিধাশূন্যভাবে গোপনে পরপুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছ বিহারাদি করিবে। এখন যদিও কাহারো ঐরূপ পর-পুরুষ সঙ্গরূপ পদস্খলন ঘটে, সে উহা অন্তরে-অন্তরে নিতান্ত পাপ ও সমাজ-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে এবং এজন্য অনুতপ্ত হয় ও ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়। কিন্তু এরূপ দ্বিতীয় পুরুষ গ্রহণে সমাজের ও সাধুসজ্জনগণের প্রকাশ্য অনুমোদন থাকিলে, ঐ পাপজ্ঞানটুকু ও বিবেকটুকু পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। বিবাহ দিয়া দুর্ব্বলচিত্ত বিধবার অভাব মোচন করিতে প্রয়াস পাইলে অসংযমতার প্রশ্রয়ে, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসারই বৃদ্ধি পাইবে মাত্র, তাহাতে সমাজের কদাচ প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না; অধিকন্তু, জগৎ হইতে হিন্দুদের দুর্ল্লভরত্ন সতীত্বের আদর্শ খর্ব্ব ও পরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। হিন্দু নারীর সতীত্ব,হিন্দু সমাজের একটি সুদুর্লভ বৈশিষ্ট; হিন্দুরা সমস্ত জগতের নিকট শ্লাঘা করিবার এই অমূল্য রত্নটি হারাইলে, তাহাদের এরূপ শ্লাঘা করিবার আর কিছুই থাকিবে না। অতএব

ঐ আপাতমধুর পথে অগ্রসর না হইয়া, বিধবাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও সংযমের পথ যাহাতে প্রশস্ত হয় এবং তাঁহাদের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয়, সেই দিকে আন্তরিক যত্নবান হওয়াই কর্ত্তব্য। তাহাতেই তাঁহাদের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। স্বামীতে আন্তরিক অনুরাগ, বা নিবিড় ভালবাসা, হিন্দু নারীর একটি অতুল সম্পদ ও তাহার অশেষ কল্যাণের নিদান। বিধবা-বিবাহ নিষেধ বিধিতেই এই সম্পদ ও কল্যাণের মূল নিহিত রহিয়াছে। আর কিছু না হউক, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দুর দাম্পত্য জীবনের এতাদৃশ বিমল সুখ-শান্তি চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবে ইহা নিশ্চিত। স্বামীকে প্রাণ-ঢালা ভালবাসিয়া যে কি সুখ,—স্বামীতে আত্মহারা আত্ম-নিমজ্জনে যে অতুল স্বর্গীয় সুখের অনুভব, তাহা হিন্দুনারী ভুলিয়া যাইবে!

এক্ষণে কথা এই যে, ঋষিদিগের বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া বিধবা-বিবাহ না দেওয়াই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে ঐ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাদেরই ব্যবস্থামত—বিধবাদের বিলাসিতা বর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও আহারাদির সংযমের ব্যবস্থা প্রচলনও একান্ত প্রয়োজন হইবে। ইহাতে তাঁহাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হইবে। নতুবা যদি কেহ পতি-বিয়োগান্তে বেশ-ভূষাদি করে, থিয়েটার-বায়স্কোপাদি দেখে, নভেল-নাটকাদি পড়ে, পুরুষদের সহিত অবাধ মেলামেশা করে, এবং আহারের সংযম ও উপবাসাদি না করে, তাহা হইলে তাহার ফল কখনো সমাজের কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। ইহাতে তাহার নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল দুর্দ্দমনীয় হওয়া স্বাভাবিক এবং পতনও অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে, ঋষি-ব্যবস্থিত পন্থা যথাযথ অনুসরণ করিলে, বা করিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিলে, তাঁহার এক জীবনেই আত্মোন্নতির বিশেষ সুযোগ ঘটা এবং কাম-ক্রোধাদির (যথা শাস্ত্রানুমোদিত পথে চলিতে চলিতে) সংযম হইয়া পরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া, কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বালবৈধব্য,বিষয়-বৈরাগ্য ও আত্মোন্নতির একটি

সুযোগ, এবং পরম কল্যাণের হেতুভূত সৌভাগ্যও বটে। সুতরাং এই অবস্থাটিকে স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন লোক যতটা অনুকম্পার বিষয় মনে করেন, বস্তুতঃ ইহা তদ্রূপ নহে।

প্রকৃত হিন্দু স্বভাবতঃ পরলোকে আস্থাবান। তাঁহারা মাত্র ঐহিক ভোগবিলাসে রত থাকাই, দুর্লভ মানব জীবনের চরম সার্থকতা জ্ঞান করেন না। তুচ্ছ, অনিত্য, ক্ষণিক-সুখপ্রদ ভোগবিলাসের বিনিময়ে, অনন্তকল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহারা স্বভাবতঃই আগ্রহান্বিত। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী সাধুই তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ঐকারণ হিন্দু বিধবাদের যথাযথ-ভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে, তাঁহারা সৎসঙ্গপ্রভাবে অচিরে বৈধব্য দুঃখের ভার লাঘব করিতে সমর্থ হয়েন, এবং তাঁহাদের পূতচরিত্র ও ধর্ম্মাচরণ দ্বারা সমাজের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও গৌরব সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহাদের ভাগ্যে সংসার-সুখ লেখেন নাই ভাবিয়া, সকল মঙ্গলের আস্পদ, সেই করুণাময়ের বিধান নতশিরে বরণ করতঃ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া,—সদ্‌গুরু-করণ, ব্রহ্মচর্য্যের বিধি-নিয়মাদি যথাযথ পালন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ ও পঠন, তীর্থদর্শন ও দান-ব্রতাদিতে যথাযথ-শ্রদ্ধা-সহকারে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে, তাঁহারা তাঁহাদের বিধবা-জীবনকে ধন্য করিবেন ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। তবে এই পথে তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইলে তাঁহাদের পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণকেও অবশ্য যথাযথ সংযম, সদাচারের পথে চলিতে হইবে। ইহাই আমাদের উচ্চ-বর্ণের জন্য ঋষি-নির্দ্দিষ্ট সনাতন পন্থা। প্রত্যুত, এতাদৃশ বিপর্য্যয় মধ্যে এরূপ ইহ-সর্ব্বস্ব ম্লেচ্ছভাবাপন্ন যুগেও, শুধু ইহার প্রসাদেই, এখনও আমাদের দেশে যাহা কিছু ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ রহিয়াছে।

আর একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, পুরুষদের পক্ষে ৫০।৬০ বৎসরের বৃদ্ধেরও দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরিণয়ের ব্যবস্থা আছে, আর

অপ্রাপ্তবয়স্কা, তুর্ব্বলা অবলাদের জন্যই যত বিধি-ব্যবস্থা। কথাটা এক হিসাবে খুবই সঙ্গত; কিন্তু পরম উদার-প্রকৃতি ঋষি-মহাত্মাগণ কি সত্য সত্যই পুরুষদের স্বার্থ বিষয়ে এরূপ পক্ষপাতী ছিলেন?—তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। এইরূপ অসমঞ্জস বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে যে বেশ একটু রহস্য রহিয়াছে, তাহা অনুধাবন-যোগ্য। অবশ্য এত বৃদ্ধ বয়সে, এভাবে দারপরিগ্রহ, কোন সুধী ব্যক্তিই অনুমোদন করেন না; বরং চিরকালই তাহারা সমাজে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। তাহার ফলে ক্রমেই এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইতেই চলিয়াছে; কিন্তু এইখানে একটা কথা বিশেষ বিবেচ্য এই যে, একটি পুরুষ একাধিক রমণীতে উপগত হইলেও, তাহার "ক্ষেত্র" কলুষিত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। পরন্তু, একটি রমণী দ্বিচারিণী হইলেই, তাহার "ক্ষেত্র" কলুষিত হইবে এবং সেই একই "ক্ষেত্রে" বিভিন্ন জনের ঔরসে বিভিন্ন সন্তান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এমন কি অনেক সময় কে কাহার পিতা তাহা নির্ণয় করাই সুকঠিন হইবে। পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ও অপরাপর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথার প্রচলন দেখা যায়। উহা আপাতঃ দৃষ্টিতে যতটা দোষাবহ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সকল সময়ে তাহা নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইলে, এই বহু-বিবাহ প্রথাদ্বারা তাহা বহুল পরিমাণে নিবারিত হইত এবং ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল বর্ণসঙ্কর বা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইত; অধিকন্তু ইহাতে 'ক্ষেত্র'ও দূষিত হইবার আশঙ্কা থাকিত না। ঐ কারণে অধুনাতন যুগে উদয়পুরের রাণারাও তাঁহাদের মধ্যে এই বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন। এইরূপ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইলে, অপর বর্ণের মধ্যেও বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলন এ কারণে সকল সময়ে তদ্রূপ দূষণীয় নহে। এক্ষণে কথা এই যে, সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, বা গত হইলে, বংশ রক্ষার্থ অথবা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম রক্ষার্থ এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের পিণ্ডার্থ, দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ শাস্ত্রানুমোদিত হওয়া

কদাচ দূষ্য নহে। উহাকে স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় বলা চলে না। উহা অসংযমের পরিচায়ক হইলে, আমাদের আরাধ্য দেবতাদের একাধিক পত্নীর কল্পনাই সম্ভব হইত না ; পরন্তু তাহা কদর্য্য ব্যভিচারের কাণ্ড বলিয়াই পরিগণিত হইত। অধিকন্তু ইহা বিশেষ অনুভব করিবার বিষয় যে কাহারও মাতা, তাহার পিতা ব্যতীত অপর কোন পুরুষের (কোন বিবাহ সূত্রেও) অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, এ কল্পনাও কোন আর্য্য সন্তানের মর্ম্মন্তুদ যাতনাদায়ক। ব্যবহার জগতের সুবিধা-অসুবিধা-বিচার এস্থলে কদাচ স্থান পাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সঙ্গে আর একটা গুরুতর সমস্যার বিষয়ও ভাবিতে হইবে যে, যে সকল সমাজে বিধবা-বিবাহ বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, সেই সকল স্থানেই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনেরও প্রচলন আছে। বস্তুতঃ, তাহা থাকাই বাঞ্ছনীয় ; নতুবা, শুধু বিধবা-বিবাহের প্রচলন হইলে, অনেক সংসারে বর্ত্তমান অশান্তির শতগুণ অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে কোন সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব না থাকিলে, বা নিত্য কলহ হইলে, পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া পরস্পর কোন প্রকারে মিলিয়া মিশিয়া সংসারটির অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে থাকে এবং অনেক স্থলেই সে প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়। কিন্তু পতির মৃত্যুতে দ্বিতীয় পতি গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলে, ঐ অসদ্ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া, এবং স্বামীর কঠিন পীড়াদিতে সেবা শুশ্রূষায় উপেক্ষা করা ও মৃত্যু কামনা করা, বা স্থল বিশেষে মৃত্যুর সহায় হওয়াও, কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এ সকল ক্ষেত্রে যথা সময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিলেই বরং উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। এই ভাবেই ক্রমে সর্ব্বত্রই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, এবং তাহারই ফলে কালে, রাজা-রাজরা ও সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যেও, ২।৩টী স্বামী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও

অতি সমারোহে ঐরূপ "সৎপাত্রীর" সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে তাহা সম্মানার্হ বলিয়াই গণ্য হয়! তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তো চোখের সামনেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহাতেও কি আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে না!

এই ভাবে যে স্থানেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে সেই স্থানেই ক্রমে 'অবৈধ' ব্যভিচার বৃদ্ধিই পাইয়াছে; কুত্রাপি কমে নাই—অসংযমের অবশ্যম্ভাবী যাহা ফল তাহাই হইয়াছে। মোট কথা, এই সকল বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্ত্রী-পুরুষ অবাধ মিলন, প্রভৃতি আমাদের দেশের নিম্ন-শ্রেণীদের মধ্যে যথেষ্টই প্রচলিত আছে; উহার অভিনবত্ব কিছুই নাই এবং উহার ফলাফলও কাহার অপরিজ্ঞাত নহে।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ আমাদের অপেক্ষা কিছু কম বুদ্ধিমান, কম দূরদর্শী বা কম দয়ালু ছিলেন না। তাঁহারা বহু চিন্তা ও বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন তাহা এত হাল্কা ভাবে উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। পরাশর মুনি—"নষ্টে মৃতে" প্রভৃতি, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য যে পুনর্বিবাহের বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও কার্য্যক্ষেত্রে 'মাত্রা' রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর নহে এবং তাহাতে হিতে-বিপরীত হইতে দেখিয়াই কালে তাহা সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। শুধু আমাদের দেশে কেন,—কোন দেশে, কোন কালে, ওসকল বিষয়ে 'মাত্রা' রাখিয়া চলা সম্ভবপর হইয়াছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও কেহ পৃথিবীতে কুত্রাপি দেখাইতে পারেন কি? আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কোন জাতীয়-ধর্ম্ম-পুস্তকে একটিও (তারা বা মন্দোদরী অনার্য্য ছিলেন) বিধবা-বিবাহের উল্লেখ নাই কেন—তাহার কি কিছুই হেতু নাই?

ইহা ছাড়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনে পাশ্চাত্য দেশে আর একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। বয়স্থা অন্য-পূর্ব্বা নারী গৃহস্থালী

কার্য্যাদিতে বিশেষ পটু বলিয়া, এবং সতীত্বের কোনপ্রকার মর্য্যাদা না থাকায়, অনেকে কুমারী অপেক্ষা তাহাদিগকেই বেশী পছন্দ করেন। তাহার ফলে অনেক কুমারীর জীবনে একবারও বিবাহ করিবার সৌভাগ্য ঘটে না। তাহাতে কুমারীদের বিবাহ সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কুমারীর বিবাহ দেওয়াই কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, একারণ এদেশে এ সমস্যা ইহা হইতে অধিকতর জটিল দাঁড়াইবে বলাই বাহুল্য।

ভগিনী নিবেদিতা (Sister Nibedita) স্বামীজীর বিধবা-বিবাহ বিষয়ে অভিমত সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—"ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও, পুনর্বিবাহ দ্বারা ব্রত-ভঙ্গ জিনিসটার উপর তাঁহার ঘৃণা ছিল। তিনি প্রাণে-প্রাণে ইহা অনুভব করিতেন এবং বলিতেন—'আর যাহা হয় হউক, এটি যেন কদাপি না হয়।' বৈধব্যের শ্বেত-বাস তাঁহার নিকট সর্বপ্রকার পবিত্রতার ও সত্যের চিহ্নস্বরূপ ছিল।"

ভারতের নারী—পৃঃ ১০৭

উপসংহারে দেশের উজ্জ্বল-রত্ন, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরলোকগত স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের এ সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। বহু গবেষণার পর তিনি লিখিয়াছেন—"হিন্দু বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম দ্বারা পরিশোধিত দেহ ও মন লইয়া সেই নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণ করেন। সেই সুপথ হইতে ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা,—না তাঁহাদের পক্ষে, না সাধারণ সমাজের পক্ষে, হিতকর। হিন্দু বিধবার দুঃসহ কষ্টের কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়; কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা ও তাঁহার অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে মন যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়। হিন্দু-বিধবাই সংসারে পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ছবি নানা দুঃখ-তমসাচ্ছন্ন হিন্দু-গৃহকে আজও আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার দীপ্তিমান দৃষ্টান্ত হিন্দু নরনারীর জীবনযাত্রার

পথপ্রদর্শক-স্বরূপ রহিয়াছে, তাঁহার পবিত্র জীবন পৃথিবীর দুর্লভ পদার্থ। তাহা যেন কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়। হিন্দু-বিধবার চির-বৈধব্য-প্রথা হিন্দু-সমাজের দেবী-মন্দির। হিন্দু-সমাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছে, সংস্কারকগণের অনেক কার্য্য আছে; —অনেক স্থান বর্ত্তমান কালের ও অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হইবে। কিন্তু বিলাস-ভবন নির্ম্মানার্থে যেন তাঁহারা সেই দেবী-মন্দির ভগ্ন না করেন, ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন।"

"জ্ঞান ও কর্ম্ম"—৩১ পৃ:

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বা স্বামিজী কোথাও কোন ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহের পোষকতা করিয়াছেন দেখি নাই; পরন্তু, তাঁহাদের এবিষয়ে প্রতিকূল ভাবই সুস্পষ্ট। তাহা ছাড়া, পরমহংসদেবের প্রিয়-শিষ্য, ভক্ত-প্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক তৎকালে রচিত—"শান্তি, কি শান্তি?" নাটকাকারে অভিনয় করিয়া, বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধেই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের প্রেরণা থাকাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুও এ সম্বন্ধে মৌন অবস্থায় লিখিয়াছেন—"বিধবা-বিবাহ বিশুদ্ধ অবস্থা নহে। তবে রাশি-রাশি ভ্রূণ হত্যা না করিয়া, সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরাশর এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।"—তন্নিম্নে লিখিয়াছেন—"বিবাহ হইলে পুনঃ বিবাহ হয় না।"

'করুণা কণা'—৫৭ পৃঃ

আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ

(২২) প্রশ্ন:—আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে কি?

উত্তর:—শ্রুতি বলেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।"—অর্থাৎ, 'শুদ্ধ আহার করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে

ভগবানকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারা যায়।' এই খাদ্যাখাদ্য বিচার, ভক্তিমার্গাবলম্বিগণের মতে চিরকালই একটি গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়। সুতরাং আমাদিগের খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আচার্য্য রামানুজ বলেন—খাদ্যদ্রব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটি—

(১) জাতিদোষ—খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ—রসুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতঃ অশুচি দ্রব্যের যে দোষ।

(২) আশ্রয়দোষ—অর্থাৎ পতিত, অভিশপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ।

(৩) নিমিত্তদোষ—অন্য কোন অশুচি বস্তু—যথা, কেশ, ধূলি, কীটাদির সংস্পর্শজনিত দোষ।

এই যে 'আশ্রয়দোষ', ইহা ধর্ম্ম-জীবন লাভের পক্ষে কতদূর যে গুরুতর অন্তরায়, তাহা অনেকেই সম্যক্ অনুধাবন করেন না; একারণে অনেকের ভজন উপযোগী দেহগঠনের নানারূপ বিঘ্ন সমুপস্থিত হইয়া থাকে। একটি সদাচার-নিষ্ঠা, সতী-সাধ্বী কর্ত্তৃক পাককরা অন্ন ও একটি কামাতুরা, ভ্রষ্টা কর্ত্তৃক পাককরা অন্ন ভোজনে, বহু প্রভেদ—একটি আয়ু, বল ও সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক,—অপরটি কামবর্দ্ধক। সাধারণে উহা তেমন ধরিতে না পারিলেও, যাঁহরা সদাচারসম্পন্ন, ভজননিষ্ঠ, তাঁহারা উহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন এবং এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধানে চলেন। এইরূপ, পতিত দুর্জাতি-স্পৃষ্ট অন্ন-ভোজনও বিশেষ অনিষ্টকর। আবার দেখা যায়, উচ্ছিষ্টের যথাযথ বিচার করিয়া না চলার ফলে, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির অতি দ্রুত সম্প্রসারণ হইয়া চলিয়াছে। চায়ের দোকানে অনেক সময় দেখা যায়, একটি বাল্‌তির জলেই সব উচ্ছিষ্ট বাটীগুলি ডুবাইয়া লইয়া পুনরায় তাহা ব্যবহার করা হয়, উহার ফলে চা-পানকারীদের মধ্যে যদি কাহারও যক্ষ্মাদি কোন সংক্রামক রোগ

বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে উহা এই ভাবে অনায়াসে অপরে সংক্রামিত হয়। মিষ্টির দোকানেও (এবং হোটেলাদিতে) জল খাবার গ্লাস, ভোজন পাত্র প্রভৃতি প্রায়ই ভালরূপ ধৌত করা হয় না, উহার ফলেও ঐ সকল রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে ; তবে এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে,—পিতা, মাতা, স্বামী, সাধু, সজ্জনের ভুক্তাবশেষ প্রসাদ-জ্ঞানে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলে তাহাতে পরম উপকারই হয়। মদ্য সেবন যে ধর্ম্ম-জীবনের বিশেষ অন্তরায় তাহা বলাই বাহুল্য। —যাহা পান করিলে মানবের হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় তাহার সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ উহা পান করিলে ব্রাহ্মণত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হয়—ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন।

সত্ত্ব, রজ, তমগুণে এই নরদেহ নির্ম্মিত। উহাদের মধ্যে সত্ত্ব পদার্থের প্রাধান্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। গীতাতে তিন প্রকার আহারের বিষয় বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক আহারে সাত্ত্বিকভাব, রাজসিক আহারে রাজসিকভাব, এবং তামসিক আহারে তামসিক ভাব বৃদ্ধি হয়। কে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহার কিরূপ আহারে অধিকতর রুচি তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতা-রূপ উচ্চ অবস্থা লাভের জন্য বিশেষ আবশ্যক। নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না। স্বামীজী—"হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি সমূহ" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,— "...তারপর আবার ভোজন পানাদি সম্বন্ধীয় গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটী গুরুতর সমস্যা। আমরা সাধারণতঃ ইহা যত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে : আর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আমরা এক্ষণে এই আহারাদির সম্বন্ধে যে বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার, উহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, অর্থাৎ আমরা ভোজন বিষয়ে প্রকৃত

পবিত্রতা রক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াই এই কষ্ট পাইতেছি—আমরা শাস্ত্রানুমোদিত ভোজন প্রথা ভুলিয়া গিয়াছি।”

(ভারতে বিবেকানন্দ—৪৮৫ পৃঃ)

পুরাণে ওই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর শিক্ষাপ্রদ আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে।—পরমভাগবত প্রহ্লাদ অসুরদিগের সিংহাসনে উপবেশন করিলে তাঁহার প্রভাবে রাজ্যে যুদ্ধাদি বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, অসুরদিগের আসুরিক-ভাব চরিতার্থ না হওয়ায়, সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং পরস্পর আলোচনা করিয়া স্থির করিল প্রহ্লাদে সত্ত্বগুণ থাকাতেই সমস্ত রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; একারণ তাহারা তাঁহার মধ্যে তমোভাব জাগাইবার জন্য তাঁহার খাদ্যের সহিত মদ্য-মাংসাদি তমোগুণ বিশিষ্ট বস্তু মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শরীরে তমোভাব প্রবেশ করিলে, তাঁহার মনে 'দেবতাদের মন্দ কার্য্যের কথা উপস্থিত হওয়াতে অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং তিনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। তৎপরে কোথাও তেমন সমকক্ষ না পাইয়া পরিশেষে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বিষ্ণুর অনুপস্থিতি-সুযোগে, তাঁহারই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন লক্ষ্মীদেবী ভক্তের অমঙ্গল আশঙ্কায় তমোগুণাক্রান্ত প্রহ্লাদের নিকট নারদকে, সাধু ও ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদ আত্মদুর্গতি বুঝিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন এবং নিজ অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হইলেন।—খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ এই আখ্যায়িকাটি হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

শ্রাদ্ধান্নে প্রেতগণের দৃষ্টি পড়ে, এ কারণ ঐ অন্নভোজনে চিত্তের মালিন্য ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। চন্দ্রনাথ দর্শনপ্রার্থী এক নিষ্ঠাবান সাধু পরলোকগত এক চোরের শ্রাদ্ধে-প্রদত্ত চাউল রন্ধন করিয়া ভোজন করায় এরূপ চিত্তবিভ্রান্তি ঘটে যে, ঐ অন্নদাতা পুরোহিতের বিগ্রহের গহনা চুরি করিয়া পলায়ন করেন, পরে অনুসন্ধানে ঐ অধঃপতনের

কারণ সম্যক বুঝিতে পারিয়া কিরূপ অনুতপ্ত ও কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা 'পরলোক প্রবন্ধে' সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

দুষ্কৃতিশালী পতিত ব্যক্তির সংসর্গে ও তাহার প্রদত্ত অন্নাদি ভোজনে কিরূপ বিষম অধঃপতন ঘটে তাহা মহাভারতে (শান্তি পর্ব্ব,—১৬৯-১৭৩ অঃ) গৌতম-বক (বা রাজধর্ম্ম) সংবাদে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।—সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ গৌতম, দস্যু-অন্নে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে এমনি মিত্রদ্রোহী, নৃশংস ও কৃতঘ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বিশ্বস্ত-চিত্তে তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রিত, পরম হিতকারী, একান্ত মিত্রবৎসল, মহাত্মা বককে মাংসলোভে অম্লান বদনে নিধন করিলেন। ঐ সময়ে ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক ও জঘন্য তাহা একবারও তাহার মনে উদয়ই হইল না; প্রত্যুত, ইহাতে তাহার যারপরনাই আহ্লাদের সঞ্চার হইতে লাগিল!—এই ঘটনার পর ঐ রাজধর্ম্মের প্রিয়সখা রাক্ষস-রাজ বিরূপাক্ষ কর্ত্তৃক গৌতম ধৃত ও নিহত হইল। তৎপরে বকের মাতা (দাক্ষায়ণী) সুরভি কর্ত্তৃক বক, পুনর্জ্জীবিত হইবামাত্র, সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া সুররাজের নিকট পরমপ্রিয় বন্ধু গৌতমের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। তাহাতে তিনি তখন পুনর্জীবন লাভ করিয়া, তাঁহা কর্ত্তৃক প্রত্যর্পিত সমস্ত ধনরত্নাদি গ্রহণপূর্ব্বক, কিছুমাত্র অনুতপ্ত, বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া, নির্ব্বিকার চিত্তে নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন! পাপ-অন্ন ভোজনে চিত্ত কিরূপ কলুষিত হয়, ইহা তাহার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ঘটনার পুর্ব্বে একদা তাঁহার এক সদাচার সম্পন্ন বাল্যবন্ধু তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন; কিন্তু তাহাকে নিরতিশয় আচারভ্রষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও, তাহার কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করেন নাই। ভজন-নিষ্ঠ ব্যক্তির এইরূপ সতর্কতাই সর্ব্বদা প্রয়োজন।

'আহারের সঙ্গে কি ধর্ম্মের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে?'—প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"হ্যাঁ, খুব আছে, আহার বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অপবিত্র আহারে শরীরে

ব্যাধি জন্মে মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়; সুতরাং ধর্ম্মলাভ কঠিন হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা পবিত্র আহার করিতে হয়।'

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৩য় খণ্ড—১৭৫ পৃঃ)

তিনি মৌনাবস্থায় লিখিয়াছেন,—"ক্রমেই চেষ্টা করিয়া কেবল সাত্ত্বিক আহার করিলে শারীরিক উত্তেজনা হ্রাস হইবে। যাহাতে শরীরের উত্তেজনা হয় এমন বস্তু আহার না করাই ভাল।"

"আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ আছে, কারণ শরীর ও আত্মা একত্র আছে। এই আহার অতি সাবধানে না করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এক ব্যক্তি লঙ্কা খায় না; তাহাকে লঙ্কা দিলে সমস্ত দিন শরীরে জ্বালা হইবে। ধর্ম্ম সাধন রহিত হইবে।"

"মৎস্য, মাংস লঙ্কা, অধিক সর্ষপ, অধিক অম্ল অধিক মিষ্ট, মিঠাই, মধু, ক্ষীর এই সমস্ত আহার ও মশুরীর দাল, মাসকলাই এই সকল কামোদ্দীপক। কাম ক্রোধ মনের কার্য্য, মন শারীরিক পরিণতি।"

(করুণাকণা—৮১, ৮২ পৃঃ)

পুনশ্চ বলিয়াছেন—"মাংসে তমোগুণ বৃদ্ধি হয়, মৎস্যে কাম বৃদ্ধি।"—ইহার পর প্রবন্ধে আমরা মাংসাহার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

মাংসাহার

(২৩) প্রশ্ন :—মংসাহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর :—"অহিংসা পরমোধর্ম্ম"—ইহাই মানবের উচ্চতম লক্ষ্য; তবে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও যুদ্ধাদি ব্যাপারে রাজসিক ভাব সংরক্ষণের জন্য মাংসাহারের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। এজন্য স্বভাব ও স্তরভেদে আহারাদিরও বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে। মনু বলিয়াছেন—

"ন মদ্যভক্ষণে দোষঃ ন মাংসে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

অর্থাৎ, 'মদ্যপান, মাংসাহার ও মৈথুনে মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ইহাতে বিশেষ কোন দোষ নাই; পরন্তু, এগুলি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলে মহাফল।' ইহা সুন্দর কথা, মানুষ তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে চলিলে তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু আদর্শ তাহার সম্মুখে থাকা প্রয়োজন এবং ঐ আদর্শের দিকে ক্রমে ক্রমে পৌঁছিবার জন্য যথাবিধি সংযমেরও প্রয়োজন, তবেই যথাসময়ে আদর্শে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে মানুষের স্বভাবের স্তরভেদে নরবলিরও ব্যবস্থা আছে; আবার উচ্চাধিকারীর পক্ষে একটি বৃক্ষের পত্র ছিঁড়িতে হইলেও—"সহস্রশীর্ষোভব" বলিয়া নতশিরে অতি সন্তর্পণে ছিঁড়িতে হইবে, ইহাও শাস্ত্র অনুশাসন।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন পশু ও মানবে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। পশুরা স্বেচ্ছাচারে চলে, আর মানব দূরদর্শী মহাজনের অনুবর্ত্তী হইয়া এই তিনটীই ক্রমে ক্রমে সংযত করিয়া আনে, এই পার্থক্য। অবৈধ আহারের মত অবৈধ মৈথুনও অতীব দোষাবহ; একারণেই বিধিমত বিবাহের ব্যবস্থা এবং ঋতুস্নাতা ও বিশেষ বিশেষ বার-তিথিতে স্ত্রী গমনের অনুশাসন। এভাবে যথাবিধি চলিতে চলিতে মানব পশুত্ব হইতে ক্রমে দেবত্বে উন্নীত হয়। মাংসাহার সংযমেরও ঋষিদিগের ঐরূপ 'বৃথা-মাংস' ভোজন নিষেধরূপ উপাদেয় ব্যবস্থা। বিধিমত যথাশাস্ত্র ভোগ করিতে করিতে ক্রমে ভোগলালসা কমিয়া যায়, ইহা তাঁহাদের পরীক্ষিত সুসিদ্ধান্ত।

"বৃথা-মাংস"—বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শুধু-শুধু রসনার তৃপ্তির জন্য একটি নিরীহ জন্তুকে হত্যা করা উচিত নহে। তৎপরিবর্ত্তে —"যজ্ঞার্থে পশু হননং", শাস্ত্রে বিধান থাকায় কোন পশুকে যজ্ঞার্থে দেবী প্রভৃতির নিকট যথাবিধি উৎসর্গ করিলে, ঐ পশুটিরও একটা সদ্গতি হয় এবং দেবীর প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলে, যথা-বিধি সংযত

আহার হয়। তাহাতে উভয়েরই যথা-সম্ভব 'অঘমোচন' হয়। দেবী-পূজা-বিধি তন্ত্রে আছে—

"যজ্ঞার্থে পশব সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভূবা ।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাৎ যজ্ঞে বধোবধঃ ॥"

অর্থাৎ,—'ব্রহ্মা, স্বয়ং যজ্ঞের জন্য পশু সৃষ্টি করিয়াছেন; সেইজন্য তোমাকে যজ্ঞে হনন করিব; একারণ তোমায় এই বধ, অবধ বলিয়া গণ্য হইবে।' পুনশ্চ—

"যজ্ঞার্থে পশব সৃষ্টা—যজ্ঞার্থে পশুহননং ।
অথত্ত্বাং ঘাতয়ামাদ্য তস্মাৎ যজ্ঞে বধোবধঃ ॥"

অর্থাৎ—'যজ্ঞের জন্য পশু সকল সৃষ্ট হইয়াছে, যজ্ঞের জন্যই পশু হনন হয়, সেই জন্য তোমাকে অদ্য হনন করিব; একারণ যজ্ঞে তোমার বধ, অবধ বলিয়া গণ্য হইবে।' মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—

"যদি বেদ-বিধি অনুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র দোষ হয় না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে,—পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য উপলক্ষে পশু হিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।" কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাংস ভক্ষণের লোভেই যদি দেবতার নিকট ছাগাদি বলিদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহাও অপরাধজনক। সে কারণ ইহাও উক্ত হইয়াছে যে—"যে মাংসাশী দেব-পূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশু বিনাশ করে তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়।" ..."যাঁরা সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, আয়ু, বুদ্ধি বল ও স্মরণশক্তি চান, তাঁরা হিংসাত্যাগ করেন।...মনু বলিয়াছেন—'যজ্ঞাদি কর্ম্মে ও শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রপুত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হবি স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্যমাংস বৃথামাংস ও অভক্ষ্য'।"..."কৃশ, দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়সেবী ও পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়; কিন্তু যে লোক পর-মাংস দ্বারা নিজ-মাংস

বৃদ্ধি করিতে চায় তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নৃশংসতর কেউ নাই। বেদে আছে,—পশুগণ যজ্ঞের নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে, যজ্ঞ ভিন্ন অন্যকারণে পশুহত্যা রাক্ষসের কার্য্য।" (মহাঃ অনুশাসন—১১৫ অঃ)

আবার শাস্ত্রকারগণ ইহাও নির্দেশ করিয়াছেন যে মৃগয়া-লব্ধ মাংস পবিত্র; উহা দ্বারা শ্রাদ্ধ-যাগ-যজ্ঞাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব উহা যথাবিধি ভক্ষণ করিলে 'বৃথা মাংস' ভোজন জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। শাস্ত্রের এই সকল অনুশাসন যদি না মানি, বা ঐ সকল বাক্যে যদি যথাযথ শ্রদ্ধা না করি, এবং স্বেচ্ছাচারে চলি, সে কথা স্বতন্ত্র।

এই বৃথা-মাংস আহার নিষেধ অনুশাসনের ভিতর বেশ একটু রহস্য রহিয়াছে, তাহা ধীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রথমতঃ, দেব-দেবীর নিকট উৎসর্গ করিতে হইলে পশুটি সুস্থ, সবল ও অঙ্গহীন না হওয়া (বা ক্ষত-বিমুক্ত) প্রয়োজন। তাহা হইলেই ঐ পশুটির যক্ষ্মা, হাপ প্রভৃতি কোন উৎকট ব্যধি না থাকা, বা শৃগাল কুক্কুরাদি কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা। এমত অবস্থায় ঐ পশুর মাংস ভক্ষণ যে অনেকাংশে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর, ঠাকুরকে নিবেদিত মাংস, পবিত্র বা বিশুদ্ধভাবে রন্ধন হওয়াই স্বাভাবিক এবং প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করায়, উহা রসনার অধিকতর তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে।

স্বামীজী—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানিতে মাংসাহারের যৌক্তিকতা লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন —"হিন্দুরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর।" তৎপরে বহু গবেষণার পর সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—"এইতো বাদ-প্রতিবাদ চল্‌ছে! সকল পক্ষে দেখে শুনে আমারও বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিন্দুরাই ঠিক;— অর্থাৎ হিন্দুদের ঐ যে ব্যবস্থা, জন্ম কর্ম্ম ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক,

এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ধর্ম্ম-জীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে-খুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবন-তরণী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ-কি।"

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—৫০ পৃ

এ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন—'যজ্ঞ করিয়া মাংস ভোজন করিবে, অর্থাৎ যজ্ঞীয় মাংস ভোজন করাকে দৈব অনুষ্ঠান বলা যায়; ইহার অন্যথায় আপনার ভোগের জন্য পশু মারিয়া ভোজন-প্রবৃত্তিকে রাক্ষসী বলিয়া জানিবে।'

মনু—৫।৩১

'মাংস-ভক্ষণের দোষগুণ-বিধি—দ্বিজাতি বিপদ কাল না হইলে কোন মতে অবৈধ-মাংস ভক্ষণ করিবে না। অবৈধ-মাংস ভোজন করিলে পর-লোকে, মাংস-ভোজীরা যে সকল জন্তুর মাংস ভোজন করে, সেই অনর্চ্চিত জন্তুরা তাহাকে ভোজন করে।' ['মাং'—আমাকে 'স'-সে (খাইবে)]

মনু—৫।৩৩

'অসংস্কৃত পশু মন্ত্রদ্বারা সংস্কার না করিয়া, দ্বিজাতিরা কখন মাংস ভোজন করিবেন না। কিন্তু নিত্য সিদ্ধ পশু, যাগাদিতে মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত মাংস ভোজন করিতে পারেন, তাহাতে বাধা নাই।' মনু—৫।৩০

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়।' 'যে জন বিধি-বিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথা-মাংস ভোজন করে তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। আর যে জন ব্রাহ্মণের অনুমতি অনুসারে প্রোক্ষিত-মাংস ভোজন করেন তাহার অতি অল্পমাত্র দোষ হয়।'

মহাঃ অনু—১১৫ অঃ

শাস্ত্রে এইরূপ বহু নিষিদ্ধ বচন সত্ত্বেও পারতপক্ষে বৃথা-মাংস

ভোজন করা যে অতীব গর্হিত কার্য্য তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে বেলুড়-মঠে সুন্দর একটি ঘটনা ঘটে। এক সময় ঐ মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে—"বৃথা-মাংস ভক্ষণ নিষেধ", অনুশাসনের তেমন কোন সার্থকতা আছে কিনা. এই লইয়া বহু বাদ-বিতণ্ডা চলিতে থাকে। মঠের তাৎকালিক অধ্যক্ষ সারদানন্দ মহারাজজী নিজ কক্ষে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে ঐ বাদানুবাদ সবই শ্রবণ করেন; পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না দেখিয়া, নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসেন এবং বজ্রগম্ভীরস্বরে—"যজ্ঞার্থে পশুহননং", তিন বার বলিয়া পুনরায় নিজ প্রকোষ্ঠে চলিয়া যান। তাহাতেই সকল বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি হয়। এ সকল মহতের অনুশাসনগুলি উপেক্ষার বস্তু কি ?

মাংসাহার না করিলে কর্ম্মঠ হয় না, এ কোন কথা নহে; পরন্তু, আমাদের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত। প্রায়ই দেখা যায়, আমাদের দেশের নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও বিধবাগণ সকলেই সাধারণ আমিষ-ভোজী লোক অপেক্ষা অধিকতর রোগ মুক্ত, দীর্ঘজীবী, সুস্থকায় ও কর্ম্মঠ।

ভীষ্মদেবও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—'ধর্ম্ম-রাজ, মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফল লাভ হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তি-সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক।' মহাঃ অনু—১১৫

সাধারণ জীব জগতেও দেখা যায়, ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশু মাত্রেই হিংসা-প্রবণ; কোপন-স্বভাব এবং ধৈর্য্যে ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে একান্ত বিমুখ; পরন্তু হস্তী, গবাদি নিরামিষ-ভোজীরা প্রায় সকলেই ধীর, গম্ভীর, শান্ত প্রকৃতি এবং সমধিক পরিশ্রমী। তাহাদের মধ্যে উগ্র,-হিংস্র-প্রকৃতি একান্ত বিরল। উহা নিশ্চয়ই আহারের গুণেই বলিতে হইবে।

মানব সমাজেও দেখা যায় যাহারা বহুল পরিমাণে মাংস ও তদানুষঙ্গিক পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উত্তেজক বস্তু আহার করে, তাহারা প্রায়ই সামান্য উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই, একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিপক্ষের প্রাণ-নাশে সমুদ্যত হইয়া, তাহার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। ইহা ঐ উগ্র খাদ্যেরই প্রভাব বলিতে হইবে।

এই মাংসাহার পোষকতায় একটা প্রশ্ন ওঠে এই যে,—এক গ্লাস জল পান করিলেও যখন কোটি কোটি প্রাণী বিনাশ হয়, কলেরাদি অসুখ আরোগ্য করিতেও যখন কোটি-কোটি কলেরা-জীবাণু বিনষ্ট করিতে হয়,—এইরূপ চলিতে-ফিরিতেও যখন সর্ব্বদা অসংখ্য প্রাণী হত্যা হইতেছে, জীব হিংসা যখন অনিবার্য্য, তখন ছাগ-মেষাদি হত্যার সময়েই এত বিধি নিষেধ কেন? তাহাতে বক্তব্য এই যে, ইষ্টানিষ্টের ইতরবিশেষ চিরদিনই মানিয়া চলিতে হয়। চলিতে-ফিরিতে ক্ষুদ্র জীব মাড়াইয়া ফেলিতেছি, বা প্রাণ রক্ষার জন্য ঔষধ-সেবনে জীবাণু বিনাশ করিতেছি, তাহার কোন উপায় নাই। এই সকল অপরিহার্য্য প্রাণী-হিংসা, বা পঞ্চসূনা-পাপের জন্যই, নিত্য পঞ্চ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান ঋষিদিগেরই ব্যবস্থা; এ কারণ পারত-পক্ষে জীব-হিংসা না করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। তা ছাড়া বিভিন্ন জীবের সুখ-দুঃখ অনুভবের তারতম্য হিসাবে, বিভিন্ন প্রাণী-হিংসার বিভিন্ন অপরাধ, বা পাপ হওয়া, খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত, এবং সে কারণে শাস্ত্রেও গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা, অপেক্ষা সর্প-ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হত্যা, বা পিপীলিকাদি বিনাশ, কম অপরাধ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে, এবং তাহা সাধারণ বিচারেও যুক্তি-যুক্ত বলিয়াই মনে হয়। ঐ সকল কারণেই মৎস্যাদি অপেক্ষা ছাগাদি পশু-হনন গুরুতর পাপ বলিয়াই বিবেচিত হয়, এবং তাহা যথাসম্ভব কমাইবার জন্যই এত বিধি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

মাংসাহার তমোগুণ বৃদ্ধি করে। উহা ভগবদ্‌ভজনের বিশেষ

প্রতিকূল। 'ভক্তিরহস্য' গ্রন্থে স্বামীজীও সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—"মাংস ভক্ষণ কেবল তাহাদেরই চলিতে পারে যাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, আর যাঁহারা ভক্তিযোগ সাধনে প্রবৃত্ত নহে; কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে।" ইহা বড়ই সারগর্ভ উপদেশ—আদর্শটিকে কদাচ খর্ব্ব করা উচিত নহে। পারি, না পারি, সে কথা স্বতন্ত্র। ঐ আদর্শে উপনীত হইবার জন্যই যথাবধি সংযত মাংসাহারের ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মাংসে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে, কাজেই ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়।" "নেশাবস্তু, উচ্ছিষ্ট ও মাংসাহারে সাধনাশক্তি একেবারে চেপে রাখে, প্রকাশ হইতে দেয় না। এ সমস্ত সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবেন।"

শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ—৫র্থ, ১৭ পৃঃ

মাংসাহার পরিত্যাগ না করিলে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু কাহাকেও কদাচ দীক্ষাই দেন নাই। তাঁহার ঐ বিষয়ে এরূপ কঠোর অনুশাসন হইতে সুস্পষ্টই বোঝা যায়, ধর্ম্ম-জীবন লাভের পক্ষে, মাংস ভক্ষণ কিরূপ গুরুতর অনিষ্টকর।

উপসংহারে আমার এই একটী মাত্র বক্তব্য যে, এইভাবে একান্ত শরণাগত নিরীহ, এত বড় একটি জন্তু, অসহায় অবস্থায়, আকুলি-বিকুলি করিয়া, কাতর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আমার তুচ্ছ রসনার তৃপ্তির জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, আর আমি লালসান্বিত হইয়া নির্ম্মমভাবে তাহার ঐপ্রকার কাতর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাচ্ছিল্য ভাবে উপেক্ষা করিব ইহাতে আমার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কতটুকু ফুটিয়াছে তাহা একবার একটু ধীরভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য নহে কি? তখন আমার হৃদয়টী কিরূপ উপাদানে ঘটিত তাহার সম্যক পরিচয় পাইয়া, তাহার পরি-শোধনের নিমিত্ত সাধু-সজ্জনের চরণ-আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য নহে কি? যদি না করি তবে, ইহার দারুণ বিষময় ফলভোগ যে অনিবার্য্য

তাহাতে আর সন্দেহ কি। যতকাল আমার হৃদয় এতাদৃশ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর থাকিবে ততকাল, আমারই কল্যাণের (চিত্তশোধনের) জন্য, আমার প্রতি তাঁরও তদনুরূপ নির্ম্মম ভাব পোষণই স্বাভাবিক। ইহাই বিধাতার বিধান।

ছাত্রদের নীতিশিক্ষা

(২৪) প্রশ্ন :—ছাত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ?

উত্তর :—এ সম্বন্ধে আমি আমাদের গ্রামে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। (ইহা সহরের ছেলেদের অনেক দিকে ঠিকমত উপযোগী হইবে না।)—

শাঁকারী হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণের নিকট—

আবেদন-পত্র

শ্রীশ্রীগৌরহরি

শরণং

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং—

মহাশয়,

আধুনিক ছাত্রদিগের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি যথোচিত দৃষ্টির অভাবে তাহাদিগের এ সব বিষয়ে আশানুরূপ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় না। তাহার উপর ক্রমেই চাকরীর সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং ছেলেদের ভোগবিলাসের প্রতি যেরূপ লালসা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয় তাহাদের মতিগতি অতি সত্বর

এদিক হইতে ফিরাইতে না পারিলে অচিরে একটা সঙ্কট অবস্থার উদ্ভব হইবে। এইকারণে দেশের মনীষিবৃন্দ এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতেছেন, এবং যথোপযোগী উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া, কেবলমাত্র ছাত্রদিগের দৈনন্দিন আচরণগুলি, নিম্নে বর্ণিত কতকগুলি নিয়মে, নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তবে ইহাও স্থির যে দেশের শিক্ষাপ্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ হইবেনা এবং সেকারণ দেশের প্রকৃত কল্যাণও সাধিত হইবে না।*

আমি নিজ জীবনে এই দৈনন্দিন নিয়মগুলি যথাসম্ভব প্রতিপালনে যত্নবান হইয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এগুলি শ্রদ্ধার সহিত যথাসম্ভব পালন করিতে পারিলে ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন হইবে, এবং স্বাবলম্বনের পথে বিশেষ সহায়ক হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করিবে। ভরসা করি, আপনারা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, এবং ইহাতে সহযোগিতা করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। ইতি—

শাঁকারী—
২৫শে বৈশাখ, সন ১৩৪৬ সাল

বিনীত নিবেদক—
শ্রীভবেন্দ্র নাথ মজুমদার
ছাত্রমঙ্গল সমিতির পরিচালক

---

* বর্ত্তমানে উপ-রাষ্ট্রপতি, বিশ্ব-বিশ্রুত দার্শনিক, ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহোদয়ের ইহাই সুচিন্তিত সুস্পষ্ট অভিমত। আজও (১৪।২।৬০) এক বিরাট জনসভায় তিনি এই অভিমতই উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

আদর্শ ছাত্র-জীবন ও তাহার দৈনন্দিন আচরণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥"গীতা—১৭।১৫-১৬

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" ঐ—৪।৪০

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" ঐ—৪।৩৪

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" ঐ—৭।১৫

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥" ঐ—১৬।৪

ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অন্তর্গত এবং পুরাকালে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া গুরুগৃহে বাসেরই ব্যবস্থা ছিল। এখন দেশ, কাল এবং পাত্র উপযোগী যথাসম্ভব তাহারই অনুবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। নিম্নে তাহার দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে :—

(১) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে, মাতা, পিতা ও নিজ নিজ ইষ্টদেব বা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম (ও তৎকালোপযোগী স্তোত্রাদি আবৃত্তি।) তৎপরে মুখ প্রক্ষালন, মলমূত্র ত্যাগ ও নিম বা বাবলা প্রভৃতির শাখাদ্বারা দন্ত ধাবন।

(২) প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া কায়িক শ্রম ; যথা,—ফুল বাগান বা শাকসবজী-ক্ষেত্র খনন, বা জল-সেচনাদি, নিকটস্থ কৃষিক্ষেত্রে কাজ (কিংবা একত্রে রাস্তাঘাট জঙ্গলাদি পরিস্কার কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ,) ইত্যাদি। প্রয়োজন মত, স্নানের সময় কয়েকজন একত্রে মিলিয়া পুকুরের পানাদি পরিস্কার করার ব্যবস্থা।

(৩) সম্ভব হইলে কিছুক্ষণ, গো-সেবা ; যথা,—খইল, ছানি ও তৃণাদি সযত্নে প্রদান, গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, ইত্যাদি।

(৪) প্রত্যহ পিতামাতাকে (তাঁহাদের অবর্ত্তমানে, তাঁদের উদ্দেশ্যে) প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ। অনেক দিন পরে গুরুজনদিগের সহিত প্রথম দর্শনে ঐরূপ প্রণাম অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৫) নিজ নিজ কুলদেবতাকে প্রত্যহ একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম। সম্ভবপর হইলে, সকালে ও সন্ধ্যায় নিকটস্থ দেব-দেবীর আরত্রিকাদি দর্শন।

(৬) সর্ব্বপ্রকার বিলাস বর্জ্জন,—যথা, গন্ধ তৈল, এসেন্সাদি বর্জ্জন ; তেরি কাটা বা ফেসানি চুল ছাঁটা ত্যাগ ; খুব সাদাসিধে পরিচ্ছদ ; স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ; (সাধারণ) থিয়েটার-বায়োস্কোপাদি দর্শন ও (সাধারণ) নভেল-নাটকাদি পাঠ পরিত্যাগ।

(৭) কোন প্রকার মাদক দ্রব্য বা ধূম-পানাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ; চা-পান অভ্যাস না রাখাই শ্রেয়ঃ।

(৮) বাজারের ভেজাল ঘৃত ও তৈলে প্রস্তুত খাবার ও মিষ্টান্নাদি পরিত্যাগ করিয়া, যথাসম্ভব গৃহের প্রস্তুত খাদ্যাদি গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। 'বৃথা-মাংস' না ভক্ষণ করাই কর্ত্তব্য।

(৯) পল্লীগ্রামে জুতা যথাসম্ভব কম ব্যবহার ও স্বল্প অথচ পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে থাকা অভ্যাস।

(১০) সর্ব্ব গাত্রে উত্তম রূপে ভাল সরিষার তৈল মর্দ্দন, বৃহৎ জলাশয়ে স্নান ও সন্তরণ। সাবান যথাসম্ভব কম ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

(১১) অতিথি অভ্যাগত গৃহে আসিলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং ভিক্ষুকগণকে সম্ভব হইলে নিজেই মুষ্টি ভিক্ষাদি দান। কোন সেবা-ব্রত উদ্দেশ্যে, সপ্তাহে, মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ ও যোগ্য পাত্রে তাহা বিতরণ। প্রতিবাসীদের অভাব অভিযোগের অনুসন্ধান লইয়া যথাসম্ভব তাহা মোচনে প্রচেষ্টা।

(১২) স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত, গীতা, (অবসর দিনে, রামায়ণ বা মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ) কিছু সময়ের জন্য প্রাতে নিত্য পাঠ করিয়া তৎপরে পাঠ্য পুস্তকপাঠ আরম্ভ। পুস্তকাদি পাঠ করিবার প্রারম্ভে—"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।" এই স্তোত্রটী আবৃত্তি ও পাঠান্তে বইগুলি প্রণাম করিয়া শ্রদ্ধাসহ যথা স্থানে স্থাপন।

(১৩) শিক্ষক মহাশয়দিগকে শিক্ষাগুরু হিসাবে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ইহাতে নিজ অভীষ্ট লাভের পথ সুগম হয়। তিনি ক্লাসে আগমন করিলে তাঁহার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ দণ্ডায়মান হইয়া জোড় হস্তে নতশিরে প্রণাম এবং তিনি উপবেশন করিলে, বা করিতে বলিলে, তৎপরে উপবেশন। শিক্ষক মহাশয়ের ক্লাস ত্যাগ কালেও ঐরূপে দণ্ডায়মান এবং তিনি ক্লাস ত্যাগ করিলে পর উপবেশন, অপর সময়ে রাস্তাঘাটে বা অন্যত্র পৃথক স্থানে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন। অপরাপর গুরুজন সম্বন্ধেও ঐরূপ আচরণই প্রশংসনীয়—তাঁহারা রাস্তায় যাইতেছেন দেখিলে বিনয়াবনত মস্তকে একপাশে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দেওয়াই শিষ্টাচার অনুমোদিত বিধান।

(১৪) শয়নের পূর্ব্বে পা, হাত, মুখ প্রভৃতি ধুইয়া পিতা, মাতা ও কুলদেবতা উদ্দেশ্যে শয্যাতেই প্রণাম, (তৎকালোপযোগী স্তোত্র আবৃত্তি) ও শয়ন।

(১৫) কতকগুলি নিজ কল্যাণকর নৈতিক উপদেশ পালনে আন্তরিক যত্ন; যথা,—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—ইহা মনে রাখিয়া সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিনয়নম্র ব্যবহার—ইহা এক অমূল্য উপদেশ; মিথ্যাভাষণ বা কপটতা পরিহার; হিংসা বা বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ; ঔদ্ধত্য বা ধৃষ্টতা পরিহার এবং পরনিন্দা ও দুঃসঙ্গ বর্জ্জন; দৃঢ়তার সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন ও মাতৃজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও মাতৃভাবে দর্শন। অপর ধর্ম্ম

ও ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, সহপাঠীর প্রতি প্রীতিভাব পোষণ এবং গৃহের ভৃত্য ও পরিচারিকাদির প্রতি যথাযোগ্য প্রীতি প্রদর্শন।

(১৬) উপরি উক্ত নিয়মগুলি কিরূপ প্রতিপালিত হইতেছে তাহা নিজে নিজে পরীক্ষা করিবার জন্য একটী দৈনন্দিন আচরণ-বিবরণী বা ডায়েরী-পুস্তকে স্মারক-রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া, যে গুলিতে বিশেষরূপ বিচ্যুতি বা ত্রুটি ঘটিতেছে সেই গুলি প্রতিকারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। যথা,—ক্রোধ যদি আশানুরূপ সংযত না হয় তাহা হইলে তদর্থে শাস্ত্র নির্দ্দেশ পালন ও অশ্বিনী বাবুর "ভক্তিযোগ" প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় গুরু-জনের উপদেশবাণী পালনে যত্নবান হওয়া এবং নিজ অভীষ্ট পথে চলিবার যথাযোগ্য শক্তি অর্জ্জনের জন্য ভগবৎচরণে নির্জ্জনে কাতর প্রার্থনা। উপরোক্ত বিষয় গুলিতে যথার্থ কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে এই শেষোক্ত উপায়টি সরল, সুগম ও অমোঘ। সর্ব্বোপরি এই অমৃতময় বাণীটি জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে,—

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।"

শাঁকারী—
২৭শে বৈশাখ, সন ১৩৪৭ সাল

শ্রীভবেন্দ্র নাথ মজুমদার
ছাত্রমঙ্গল সমিতির পরিচালক*

* ছাত্রদের দৈনন্দিন আচরণের এই 'নিয়মাবলী'-সহ 'আবেদন পত্র'খানি ছাত্রদের অভিভাবক দিগের নিকট প্রেরিত হইলে, আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, উচ্চশিক্ষিতাভিমানী, স্নেহভাজন যুবকগণের নিকট হইতে ঘোর প্রতিবাদ পত্র আসায়, দেখিলাম উহার ভাষা ও লেখার ভঙ্গী অতীব ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক ও বিদ্রূপাত্মক ; যথা,—'এরূপ আদর্শ দেশে প্রচার হইলে ছাত্রদের, তথা দেশের, অভূত-পূর্ব্ব অমঙ্গল হইবে ; ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিয়া দেশটা উৎসন্ন গিয়াছে ; অপদার্থ ব্রাহ্মণগণই যত অনর্থের মূল ; যোগ্যাযোগ্য পাত্র বিচার না করিয়া যত্র তত্র, প্রণামের রীতি প্রচলন করা অতীবগর্হিত কার্য্য হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি— অনেক কথাই লেখা হইয়াছে।

চিঠিখানি সংযতভাবে লেখা হয় নাই—আধুনিক ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদী, পাশ্চাত্যভাবে-শিক্ষিত যুবকগণের প্রতিভূ-স্বরূপেই উহা লেখা

সনাতন শিক্ষা

(২৫) প্রশ্ন :—সনাতন গোস্বামীপাদকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কি শিক্ষা দিয়াছিলেন ?

উত্তর :—শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের, গৌড়াধিপতি হুসেন সাহর প্রধান মন্ত্রী থাকা কালীন, তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, রাজকার্য্য করিতে অসম্মত হয়েন ; তাহাতে হুসেন সাহ তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করেন। তখন তিনি কৌশলে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পদব্রজে কাশীধামে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে

হইয়াছে বুঝিয়া, বহু আয়াস-সাপেক্ষ জানিয়াও, দেশের ভাবীকল্যাণ-কামনায়, সেবাবুদ্ধিতে, ধৈর্য্যসহকারে প্রত্যেকটি প্রতিবাদের যথাযথ সদুত্তর দানে ব্রতী হইয়া, আমাদের শাস্ত্র ও আধুনিক দেশ-বরেণ্য মহাজনগণের বাণী উদ্ধৃত করিয়া সমস্ত আপত্তিগুলিরই খণ্ডন করি, এবং তাহা দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষিত অভিভাবকগণের অভিমত-সহ, তাহাদিগকে প্রেরণ করি। তাহার ফলে তাহাদের অনেকগুলি গুরুতর অভিযোগ খণ্ডন হয় ; কিন্তু অবশিষ্টগুলি সম্বন্ধে ঘোর প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয়। তখন আমি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব, স্বামীজী, শ্রীঅরবিন্দ, ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষগণের বাণী বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের নব্য-মতবাদের খণ্ডন করিয়া সুদীর্ঘ প্রত্যুত্তর দান করি ও মৌখিক আলোচনা করি। তাহার ফলে তাহারা সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাহাদের মতবাদ যে Marx, Lenin প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য মনীষিগণের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত তাহা স্বীকার করে,—এইভাবে এই সুদীর্ঘ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই প্রসঙ্গে যে সকল চিঠিপত্র লেখা-লেখি হইয়াছিল, এবং তাহা পাঠ করিয়া দেশের ভদ্রমহোদয়গণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই যত্ন-সহকারে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। যদি তেমন একটা প্রেরণা পাই এবং সাধারণের তেমন আগ্রহ হয়, তাহা হইলে ইহার পর, দেশের সেবা-বুদ্ধিতে, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন মঙ্গলময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

নিপতিত হইয়া, একান্ত দৈন্য-সহকারে, নিরতিশয় প্রপন্ন ভাবে, প্রশ্ন করেন—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥' চৈঃ চঃ ২।২০।৯৬

তিনি পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন—

(১) কে আমি ?—অর্থাৎ, আমার যথার্থ স্বরূপ কি ?

(২) কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?—অর্থাৎ, আমি ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলি কেন ?

(৩) কেমনে হিত হয় ?—অর্থাৎ, কিরূপে এই জ্বালা হইতে ত্রাণ পাই এবং কিসে আমার প্রকৃত কল্যাণ হয় ?

(৪) আমার 'সাধন', কি ?—অর্থাৎ, কি উপায়ে আমার 'সাধ্য' বস্তু লাভ করিব ?

(৫) আমার 'সাধ্য', কি ?—অর্থাৎ, আমার চরম পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, বা যথার্থ 'প্রয়োজন' কি ?

ইহার প্রত্যুত্তরে মহাপ্রভু যাহা যাহা বলিলেন তাহাই 'সনাতন শিক্ষা' নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রশ্নোত্তরগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে—

(১) 'কে আমি ?'—প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন—

'জীবের স্বরূপ হয়,—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥' ঐ—২।২০।১০১

—জীব, স্বরূপতঃ, সর্ব্বদা আনন্দের চেষ্টায় নিয়োজিত ;—আবার আনন্দঘন-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্য-আনন্দ-বস্তু ; সুতরাং জীব নিত্যই সেই আনন্দঘন 'শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব' করিতেছে। যদিও অজ্ঞতা বশতঃ মায়িক জীব মায়িক আনন্দের দাসত্ব করিতেছে, তথাচ এই মায়িক আনন্দের মূলও শ্রীকৃষ্ণ। সেই আনন্দঘন-মূর্ত্তির আনন্দের আভাসই

'গুণে'-প্রতিফলিত 'প্রাকৃত' হইয়া, প্রাকৃত-আনন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাকৃত-গুণ অনিত্য বলিয়া, ঐ আনন্দও অনিত্য হইয়াছে। জীব অজ্ঞতা বশতঃ ঐ ক্ষণিক, মায়িক, আনন্দকেই স্থায়ী আনন্দ ভ্রমে ধরিতে চায় কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হয়। জীব স্বভাবতঃ চায়—নিত্য-আনন্দ ; সেই আনন্দ কিন্তু—'ভূমাপুরুষ' একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ।

জীব শ্রীকৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' ;—শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-অংশ বলিয়া জীব চিৎবস্তু এবং চিৎবস্তু বলিয়া স্বরূপতঃ মায়ার অতীত ; কিন্তু আবার মায়ার গুণ-রাগে-রঞ্জিত হইয়া মায়িক বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ চিৎ ও জড়—চেতন ও অচেতন—এই উভয়-কোটিতে প্রবিষ্ট বলিয়াই জীবকে 'তটস্থ' বলা যায় ; আবার জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' বলে।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তি (তটস্থা শক্তি) নামে একটি শক্তি আছে ; এই শক্তির অংশই জীব। শক্তি ও শক্তিমান, অভেদ-বশতঃ, স্বরূপতঃ জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই ; কিন্তু অভিব্যক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে জীবে ও শ্রীকৃষ্ণে অনেক ভেদ আছে।*—শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। অংশ ও অংশী হিসাবে জীবে ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই ; কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণ নহে এবং কোন সময়ে হইতেও পারিবে না —মোক্ষ দশায়ও জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ বিভু —জীব অণু ; কৃষ্ণ ব্যাপক—জীব ব্যাপ্য ; কৃষ্ণ নিয়ন্তা—জীব নিয়ম্য ; শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র—জীব পরতন্ত্র ; শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর—জীব মায়ার অধীন। ইহাতে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণ ও জীবে ভেদ আছে, অভেদও আছে— এজন্য জীবকে "শ্রীকৃষ্ণের 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' বলা হইয়াছে। (ইহাই মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' তত্ত্ব।)

মহাপ্রভু একস্থানে বলিয়াছেন—

*'যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম। সেই তো পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম।'

চৈঃ চঃ—২।১৮।১০৭

জীব ভগবানের অংশ—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা—১৫।৭

জীব চিৎকন—অনুচৈতন্য, আর ভগবান—বিভুচৈতন্য ;—

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোয়ং সঙ্খ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥" ভাঃ—১০।৮৭।৩০

—'জীবের স্বরূপ কেশাগ্র-শতভাগের একভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম ভগবদংশ ও সংখ্যায় অনন্ত'

"জীব (আর) ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥" চৈঃ চঃ—২।১৮।১০৬

"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ" ঐ—২।৬।১৪৮

জীব ভগবানের তটস্থাশক্তি—পরা-প্রকৃতি। যথা, গীতা—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" গীতা—৭।৫

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে মহাবাহো, পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি—অপরা, অর্থাৎ নিকৃষ্টা ; তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি আমার জীবভূতা প্রকৃতি (শক্তি) আছে, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।'—'কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।—(অন্তরঙ্গা, স্বরূপ শক্তি বা) চিচ্ছক্তি ; (তটস্থা বা) জীবশক্তি ; আর (বহিরঙ্গা বা) মায়াশক্তি॥' চৈঃ চঃ—২।২০।১০৩

(২) এইবার, 'কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?'—প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

'কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥' চৈঃ চঃ—২।২০।১০৪

(৩) তদবস্থায়, 'কেমনে হিত হয় ?' তাহাই বলিতেছেন—

'সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥' ঐ—২।২০।১০৬

তথাহি,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥' গীতা—৭।১৪

অর্থাৎ, 'হে পার্থ, আমার ত্রিগুণময়ী মায়া দুস্তরা হইলেও যাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারা অনায়াসে সেই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।'—

'কৃষ্ণ, সূর্য্যসম—মায়া অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়া অধিকার ॥' চৈঃ চঃ—২।২০।১০৬

শাস্ত্র-দৃষ্টে জানা যায়, জীব অনাদিকাল হইতে ভগবৎ-বহির্মুখী হওয়ায় মায়ার তাড়না ভোগ করে। আবার ভগবৎ চরণে শরণাগত হইলে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়।—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণহৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুখ ॥
সেই-দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে জারি তারে মারে ॥
কাম-ক্রোধের দাস হইয়া, তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণনিকট যায় ॥ চৈঃ চঃ—২।২২।১০-১৫

জীব ভগবৎ-অংশ—নিত্য কৃষ্ণদাস। তাহার একান্ত কর্ত্তব্য কৃষ্ণ ভজন। পিতার অনুগত হইয়া, পিতাকে না সেবা করিলে তাপ অনিবার্য্য।—

'জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥' চৈঃ ভাঃ—২।১।২১৭

'কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥' চৈঃ চঃ—২।২২।১৭

'মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি, স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥' ঐ—২।২০।১০৭

'বেদ-শাস্ত্রে কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন।'
কৃষ্ণ-প্রাপ্য—'সম্বন্ধ', ভক্তি—প্রাপ্তের সাধন॥
'অভিধেয়'-নাম—ভক্তি, প্রেম—'প্রয়োজন'।
পুরুষার্থ শিরোমণি—প্রেম মহাধন॥' ঐ—২।২০।১০৯

অর্থাৎ,—বেদ শাস্ত্রের সার মর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণই 'সম্বন্ধ' (প্রতিপাদ্য বস্তু); কৃষ্ণভক্তিই জীবের 'অভিধেয়' (বিধেয়—কর্ত্তব্য) এবং প্রেমই জীবের মুখ্য 'প্রয়োজন'; সুতরাং এই তিনটি বস্তুই জীবের পক্ষে মহামূল্য ধনতুল্য।

এক্ষণে প্রথমে, সম্বন্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

'কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব—ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥' ঐ—২।২০।১৪১-১৩২

যথা, ব্রহ্ম-সংহিতায়—(৫।১)

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্ব্বকারণ-কারণং॥'
'স্বয়ং ভগবন্ কৃষ্ণ—গোবিন্দ তাঁর নাম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ—যাঁর গোলকে নিত্যধাম॥'

তথা, ভাগবতে—

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে-যুগে ॥' ভাঃ—১।৩।২৮

'ইহাদের মধ্যে কেহ ভগবানের অংশ, কেহ কলা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং-ভগবান। লোকসকল অসুর কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলে ইনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সুখবিধান করেন।'

(৪) তৎপরে, 'অভিধেয়' বা 'সাধনতত্ত্ব' কি, তাহাই মহাপ্রভু বলিতেছেন,—জীবের নিজ স্বরূপ বা সম্বন্ধতত্ত্ব উদ্বুদ্ধ হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুগম ও অমোঘ উপায় ভগবৎ-চরণে ঐকান্তিকী ভক্তি। যথা,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যং শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়সতাং।
"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥"

ভাঃ—১১।১৪।২১

ভগবান কহিলেন,—'হে উদ্ধব! আমি শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত একমাত্র 'কেবলাভক্তি' দ্বারা বশীভূত হই ; যে হেতু আমি সতের আত্মা ও প্রিয়। অধিক কি, আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ভক্তি চণ্ডালকেও জাতি-দোষ হইতে পরিত্রাণ করে।'

"ন সাধয়তি মাং যোগো, ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায় স্তপত্যাগোঃ যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥"

ভাঃ—১১।১৪।২০

ভগবান বলিয়াছেন,—'হে উদ্ধব, মদ্বিষয়ক দৃঢ় ভক্তি যদ্রূপ আমাকে বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও তদ্রূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না।'

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগাদি যাহা কিছু সাধন

সকলেতেই ভক্তির সংযোগ না থাকিলে অভিলষিত ফল লভ্য হয় না। যথা,—

'কৃষ্ণ ভক্তি হয়—'অভিধেয়' প্রধান।
ভক্তি মুখ নিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এ সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥' চৈঃ চঃ—২।২২।২৪

এই কারণ সকল প্রকার সকামী, নিষ্কামী—সাধকেরই ভগবৎ-চরণে ভক্তি করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাই বলিলেন—

'ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে, কৃষ্ণেরে ভজয়॥' ঐ—২।২২।২৩

যথা, ভাগবতে—

"অকামঃ, সর্ব্বকামো বা, মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" ভাঃ—২.৩।১০

'স্বসুখ বাসনাদি শূন্য একান্ত ভক্ত, কিম্বা ধনাদি সর্ব্বকাম কর্ম্মী অথবা মোক্ষকাম জ্ঞানী—যিনিই হউন না কেন, তিনি যদি উদার-বুদ্ধি (অর্থাৎ সুবুদ্ধি) হয়েন, তাহা হইলে তিনি ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত পরমপুরুষ ভগবানকে ভজনা করিবেন।' কেননা,—

'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে—আমায় ভজে, মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥' ঐ—২।২২।২৫

'কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥' ঐ—২।২২।২৭

ভগবৎ-চরণ-সেবার লালসায় ভক্ত যে সর্ব্ব-কামনা অকাতরে ত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়, তাহার ধ্রুবই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, পিতৃসিংহাসন প্রাপ্তির লালসায়, পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ বর দিতে ভগবান আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রেমে গদ-গদ হইয়া, আবেগভরে তিনি বলিলেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোস্মি বরং ন যাচে॥"

হরিভক্তিসুধোদয়ে – ৭।২৮

'হে প্রভো ! লোকে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন লাভ করে, আমিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার জন্য তপস্যায় দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রগণের দুর্লভ তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, আমি আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।'

ভগবানে ভক্তিলাভ হইবার উপায় মহাপ্রভু এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

'সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহো তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥'
'কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥'
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥'
'সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল "প্রেম" হয়—সংসার যায় ক্ষয়॥'
'মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥'

'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥' ঐ—২।২২।২৮ ৩২

যথা, ভাগবতে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা-রতি-র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"
ভাঃ—৩।২৫।২৪

শ্রীভগবান কপিলদেব বলিলেন—'সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হয়; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক। প্রীতি পূর্ব্বক ঐ কথা আস্বাদন করিলে, অপবর্গের বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়।'

তথা, শ্রীগীতায়—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে॥"
গীঃ—১৮।৬৪-৬৫

'হে অর্জ্জুন, সকল গুহ্যের সাতিশয় গুহ্যতম এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি। তুমি আমাতেই অচল-মন-যুক্ত হও, নিরন্তর আমার ভজনকারী এবং পূজনকারী হও এবং আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর,—এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তোমার প্রতি সত্য-প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে হেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়সখা হইতেছ।'—

'পূর্ব্বে আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি, শেষে এই আজ্ঞা বলবান॥

এই-আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি, সে কৃষ্ণ ভজয়॥'

তথা, ভাগবতে—

"তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভাঃ—১১।২০।৯
'শ্রদ্ধা'—শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে—সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥' চৈঃ চঃ—২।২২।৩৭

যখন এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইবে যে, কৃষ্ণভক্তি করিলেই সর্ব্বকর্ম্ম করা হইয়া যাইবে মনে হইবে, তখন সে অবস্থায় আর পৃথক কোন কর্ত্তব্যই থাকিবে না, কেন না ভাগবতে বলিয়াছেন—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" ভাঃ—৪।৩১।১৪

'যেমন তরুমূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, ভুজ ও এবং উপশাখা সকলেরই তৃপ্তি হয়; অথবা, প্রাণকে উপহার দিলে, অর্থাৎ আহার করিলে, যেমন ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি হয়; তদ্রূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সকলেরই আরাধনা হয়।'

(৫) এইবার পরিশেষে, মহাপ্রভু 'সাধ্য-তত্ত্ব' বা 'প্রয়োজন-তত্ত্বের' নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—

'এবে শুন ভক্তিফল—প্রেম 'প্রয়োজন'।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে—'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের এই 'স্থায়িভাব' নাম॥' চৈঃ চঃ—২।২৩।২-৩

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশুদ্ধা ভক্তির যাজন করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইলে নিজ 'স্বরূপ' ও ভগবানের সহিত তাহার কি 'সম্বন্ধ' তাহা ক্রমে অনুভব হয়, এবং ঐ 'সাধন'-ভক্তিই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সাক্ষাৎ 'প্রেম'-সেবায় পরিণত হয়। যথা, ভাগবতে (১১।২।৪০)—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

'এইরূপ নিয়মে যিনি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তিনি স্বপ্রিয় হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমোদয় বশতঃ শ্লথ-হৃদয় ও মানাপমানাদি বিষয়ে অবধান শূন্য হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় উচ্চঃস্বরে কখনও হাস্য ও চীৎকার, কখনও গান, আবার কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন।'

'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম—'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবনাদিশুদ্ধচিত্তে, করয়ে উদয়॥' চৈঃ চঃ—২।২২।৫৭

'শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥—
'অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা' ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্র্যে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।
(শ্রীরূপশিক্ষা) চৈঃ চঃ—২।১৯।১৪৭-১৪৯

'কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে, 'প্রেম' অভিধান। চৈঃ চঃ—২।২৩।৩
'পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥' ঐ—১।৭।১৩৭
'পুরুষার্থ শিরোমণি, প্রেম মহাধন।' ঐ—২।২০।১১৫
'সেই ভাব গাঢ় হইলে, ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দ ধাম॥" ঐ—২।২৩।৯

জগতের জীব মাত্রেই আনন্দের কাঙ্গাল—একমাত্র আনন্দ প্রাপ্তির লালসাতেই তাহারা যাহা কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"—'আনন্দ হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, (আনন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া) আনন্দেই জীবিত থাকে, আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে প্রবেশ করে।'

"আনন্দো ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন",—'সেই আনন্দময়কে জানিলে আর ভয় থাকে না।'—"রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—'তিনি রসস্বরূপ। জীব এই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই সুখী হয়।'—'আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমের আখ্যান।' চৈঃ চৈঃ—২।৮।১২

এই প্রেমানন্দের তুলনায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দও অতি অকিঞ্চিৎকর—

'কৃষ্ণপ্রেমে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥' ঐ—১।৭।৯৩

যথা, হরিভক্তি-সুধোদয়ে (১৪।৩৬)—

"ত্বৎ-সাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥"

শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনরসিংহদেবকে কহিলেন,—'হে জগদ্‌গুরো, তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধসাগরে থাকিয়া আমায় ব্রহ্মানুভব-জনিত সুখ, গোষ্পদবৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।'

এই প্রেম লাভ হইলেই জীব চরম ও পরম কৃতার্থ হয়; অধিক কি, সালোক্য সাজুয্যাদি ভগবান প্রদান করিলেও, ভগবানের সেবা ছাড়িয়া ভক্ত কদাচ তাহা অঙ্গীকার করেন না।

যথা, ভাগবতে—

"সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" ভাঃ—৩।২৯।১১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—'আমার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতিরেকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না।'

তৎপরে, প্রেমলাভের ক্রম এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন—

'কোনভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয় ॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয়, সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবনাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥' চৈঃ চঃ—২।২৩.৫

যথা, ভক্তিরসামৃতাসিন্ধুতে—(১।৪।১১)

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোথ ভজনক্রিয়া,
ততোনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি,
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ ॥"

'যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥' ঐ—২।২৩।১০

'এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ-কাল নাহি যায়।
ভুক্তি-মুক্তি-ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে 'হীন' করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদারুচি লয়ে কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ গুনাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥
কৃষ্ণরতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।'
কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥ ঐ—২।২৩।১১-২১

যথা, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে—(১।৩।১১)

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তি মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি॥
আসক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি স্থলে।
ইত্যাদয়োনুভাবাঃ স্যুজাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥"

এই শ্লোকটি লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"আমি ভক্তির কথা মুখে বল্লেই কি হইল ?—না, আমি নৃত্য করি, উল্লম্ফন করি, ভাবে মাতিয়া থাকি, একেই কি ভক্তি বলে? ভক্তি কি ?—না, অনন্তভাবে তাঁহাকে ভালবাসা। সমস্ত শরীর মন তাঁহাকে উৎসর্গ করিলে তবে হয়। রূপ গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন যে,—'ভাবের অঙ্কুর মাত্র হৃদয়ে উদিত হইলে এ সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, যথা—'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং ইত্যাদি'।"

শ্রীমৎভগবদ্গীতায় প্রেম প্রাপ্তির ক্রম শ্রীশ্রীগোস্বামীপাদ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"গীতার উপদেশ অতি সুন্দর। প্রথম কর্ম্ম,—প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে করিতে বিবেক-বৈরাগ্য সময়ে সময়ে উদয় হয়।

তখন নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম শেষ হয় ; কিন্তু বাসনা থাকে। কর্ম্ম শেষ হইলে বিষয় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন, প্রভৃতি সাধন-ভজনে মতি হয়,—করিতে করিতে ভক্তির প্রকাশ। ভক্তিতে হৃদয় ব্যাকুল হইলে,—বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ অবস্থা—পরে ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ইত্যাদি।"

('করুণাকণা'—পৃঃ ৩৫)

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু অন্য একভাবেও হরিনামে প্রেম লাভের ক্রম দেখাইয়াছেন—প্রথম,—পাপ বোধ; দ্বিতীয়,—পাপ কর্ম্মে অনুতাপ; তৃতীয়,—পাপে অপ্রবৃত্তি; চতুর্থ,—কুসঙ্গে ঘৃণা; পঞ্চম,—সাধুসঙ্গে অনুরাগ; ষষ্ঠ,—নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি; সপ্তম,—ভাবোদয়; অষ্টম,—প্রেম। ('করুণাকণা'—১৬ পৃঃ)

এই প্রেম লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—'নাম সংকীর্ত্তন'। ইহাই মহাপ্রভু অন্যত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'সকল সাধন শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥' চৈঃ চঃ—৩।৪

'সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম,—প্রেমামৃতাস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি,—সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥' ঐ—৩।২০।১০-১১

'যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥'— ঐ—৩।২০।১৬

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥" ঐ—৩।২০।৫

'তৃণ চেয়ে নীচু হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবে করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কা'রে কিছু না বলিবে॥' চৈঃচঃ—১।১৭।২৩ ২৪

কবিরাজ গোস্বামীপাদ এই শ্লোক সম্বন্ধে পুলকিত অন্তরে বলিয়াছেন—

'ঊর্দ্ধ বাহু কহি, শুন সর্ব্ব লোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥' চৈঃ চঃ — ১। ৭.২৮-২৯

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বর্ত্তমান সময়োপযোগী একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।—যুগধর্ম্মপালক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অপ্রকট হইবার অনতিকাল পূর্ব্বে গম্ভীরার নিভৃত কক্ষে পরম কৃপাপাত্র অতি-অন্তরঙ্গ দুইভক্ত—স্বরূপ ও রামানন্দকে পরম সমাদরে 'সর্ব্ব-গুহ্যতম' কথা সহাস্যবদনে বলিলেন—

'হর্ষে প্রভু কহে,—শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ, পরম উপায়॥' চৈঃ চঃ—৩৩০।৭

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই 'গুহ্যতম' শেষ-বাণীটি পরম তাৎপর্য্যপূর্ণ। পূর্ব্বে, বারাণসী ধামে দশ হাজার সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও বিরাট সভায় শ্রীমুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাও কম তাৎপর্য্যপূর্ণ নহে।—

'নামবিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার 'নাম'—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥' চৈঃ চঃ—১।৭।৭২

তথাহি, বৃহন্নারদীয় বচন (৩৮।১২৬)—

'হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'

এই শ্লোকের মহাপ্রভু স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম্ম আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তাহার নাহিক নিস্তার।
'নাহি,নাহি,নাহি'—এই তিন এবকার॥' চৈঃ চঃ—১।১৭।১৯-২৭

এই 'হরিনাম' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু মৌনাবস্থায় স্বহস্তে লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্রকর্ত্তাগণ কলির দুরবস্থা জানিয়া কেবল 'হরিনাম' এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'হরি'—যে নামে উদ্ধার হওয়া যায় তাহাই হরিনাম।—ব্রাহ্মণের গায়ত্রী 'হরিনাম'। -হরি, দুর্গা, বিষ্ণু, কালী, চণ্ডী, শিব, গায়ত্রী সমস্তই 'হরিনাম'।"

"'হরি'—এ শব্দ মাত্র হরি শব্দ নহে। যে নামে যাহার পাপ-হরণ হয়, তাহাই 'হরিনাম'।—দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, আল্লা, খোদা, যিশু—যিনি যে নামে বিশ্বাসী, তাঁর তাই 'হরিনাম'।"

"এক হরিনামে যে ফল হয়, তাহা আর কিছুতেই নহে। নিজে কষ্ট করা অপ্রয়োজন মাত্র।—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

(করুণাকণা—১১-১৫ পৃঃ)

শাস্ত্রীয় এই শ্লোকদ্বারা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না কি যে—যাগ, যোগ, কর্ম্মাদি কলিকালে যুগোপযোগী নহে? শ্রীশ্রীপরমহংসদেবও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—"কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্ব্বদা তাঁর নামগুণকীর্ত্তন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৩য় ভাগ, ১২০ পৃঃ)

কলির জীব অন্নগত প্রাণ, অল্পায়ু, অল্পমেধা, মন্দবুদ্ধি, ইত্যাদি নানাকারণে অন্য-যুগোপযোগী যাগ, যোগ, তপস্যাদি কলির জীবের উপযোগী পন্থা নহে। ইহাই দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন শাস্ত্রকারগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। তবে তাঁহাদের হিতবাণীতে অনাদর করিয়া দম্ভভরে, 'লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার' উদ্দেশ্যে যদি যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্রতী হই সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু উহা শাস্ত্রানুশাসনের বিরুদ্ধ ইহা জানা উচিত। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে সাতিশয় আগ্রহশীল তাঁহারা এ বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হইবেন এই ভিক্ষা।

শ্রীমৎ ভাগবতাদিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং, ত্রেতায়াং যাজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং, কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥" ভাঃ—১২।৩।৫২

'সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় বহু প্রকার যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনায়, এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যায় যাহা যাহা লাভ হয় তৎসমস্ত কলিতে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে।' কলিযুগের প্রারম্ভেই এই শাস্ত্র সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—

সসাগরা-ধরার অধীশ্বর ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ সপ্তাহান্তে তক্ষক-দংশনেঅবধারিত-মৃত্যু জানিয়া গঙ্গোপকূলেপ্রায়োপবেশন করিলে তথায় নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঋষিবৃন্দ সকলেই সমাগত হইলেন।—তখন "আসন্ন-মৃত্যু জীবের কি কর্তব্য?" —পরীক্ষিৎ মহারাজের এই কাতর প্রশ্নের উত্তর দানে ঋষিগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতানুরূপ বিভিন্ন পন্থার নির্দ্দেশ করিলেন,—কেহ যাগ, কেহ যোগ, কেহ জপ, কেহ ধ্যান, কেহ জ্ঞান, কেহ তপস্যাদির প্রাধান্য দিলে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহারাজ সসম্ভ্রমে যোড়-হস্তে জানিতে চাহিলেন—'ঐ সাধনগুলির মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা ৭ দিন মধ্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে শাস্ত্র হইতে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া কৃতার্থ করুন।' তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই তখন ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে, আসন্নমৃত্যু মহারাজ

অপার-চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সেই সঙ্কটক্ষণে ভগবৎ ইচ্ছায় পরমহংস-চূড়ামণি মহামুনি শুকদেব-গোস্বামী তথায় উপস্থিত হইলে সমাগত ঋষিবৃন্দ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি-পূর্ব্বক করযোড়ে কাতর-অন্তরে তাঁহার আসন্ন-মৃত্যু ও তাঁহার প্রশ্নের বিবরণ সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। তখন পরম কারুণিক শুকদেব গোস্বামী প্রভু তাঁহার ঐ প্রশ্ন 'অভিবাদন' করিয়া, তাঁহাকে পরম আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, পুলকিত অন্তরে বলিলেন,—"বৎস, ভাবনা কি ? সাতদিন তো যথেষ্ট সময় রহিয়াছে—খট্টাঙ্গ মহারাজ তাঁহার আর মুহূর্ত্তকাল পরমায়ু অবশিষ্ট আছে জানিয়া, সেই মুহূর্ত্তে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের নামগুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন—'পরম-উপায়'। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার নিকট উহা শ্রবণ কর ; তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিবে না, তক্ষকদংশন ক্লেশ-অনুভব হইবে না এবং দেহান্তে পরম গতি লাভ করিবে।—ঘটনাক্ষেত্রে কার্য্যতঃ ঠিক তাহাই ঘটিল এবং তদ্দ্বারা অল্পায়ু, কলিকবলিত আসন্নমৃত্যু জীবের সহজসাধ্য নিরুপম উদ্ধারের পথও প্রদর্শিত হইল।

আধুনিক কালেও দেখিতে পাই, আনুষঙ্গিক শ্রবণ কীর্ত্তনসহ, শুধু নাম আশ্রয় করিয়া কলিপাবন অবতার শ্রীপাদ নিত্যানন্দের পরম কৃপাপাত্র* শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরু নানক সাধনার চরম পরম অবস্থা

---

* আমাদের পরম গৌরবের কথা যে, শ্রীশ্রীগুরু নানক মহারাজ আমাদের শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। গুরু নানক স্বীয় ধর্ম্মপ্রচার করিবার প্রারম্ভকালেই বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি যে শ্রীপাদের মন্ত্রশিষ্য, এ বিষয়ে গুরু নানক লিখিত তাঁহার স্বীয় জীবনীতে বর্ণিত আছে এবং গ্রন্থসাহেব গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট আভাস আছে। গ্রন্থসাহেবের শেষ খণ্ডে, নাম মাহাত্ম্যের প্রস্তাবে, গুরু নানক শ্রী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর নাম অনেক করিয়াছেন এবং 'আমার নাম শিক্ষার গুরু শ্রী শ্রীপাদ নিতাই'—এই বার বার ইঙ্গিত করিয়াছেন। (ইহার সবিশেষ বিবরণ—"বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থের প্রথম ভাগ,

লাভ করেন এবং পরবর্ত্তী-কালে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুও ঐ নানকপন্থী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট অলৌকিকভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, ঐ শ্রবণ কীর্ত্তনসহ, কেবল নাম সাধন দ্বারা সাধন রাজ্যের কিরূপ উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কলিতে দুর্ব্বল জীবের পক্ষে এই সরল, সুগম ও অমোঘ পন্থা অবলম্বনই পরম শ্রেয়স্কর।

---

৪০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য (৮)—পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'সুখমণী' গ্রন্থের ৬/০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে –

গুরু নানকের ইষ্টদেবতা 'বিশ্বম্ভর'—

"সিমর যাস বিশ্বম্ভর এক।"—'সেই বিশ্বম্ভর পুরুষ স্মরণ কর।'

বড়ই আনন্দের কথা শিখদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবখানি আগাগোড়া হরিনাম মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। ধন্য শ্রীপাদ, ধন্য তোমার দয়া!—এই ভাবেই বুঝি তোমার 'ভাইয়ার' 'বিশ্বম্ভর' নাম সফল করিবে! মহাপ্রভু তো শ্রীমুখেই বলিয়া গিয়াছেন— 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর 'সাধনে'—শ্রী'নাম'ই একমাত্র অবলম্বন। ইহাতে কোন দেব-দেবী বা ধাম-লীলাদি ধ্যান-ধারণার ব্যবস্থা নাই।—গুরুদত্ত সর্ব্বশক্তিসমন্বিত কেবল শ্রী'নাম' অবলম্বনেই ঐ নামের ভিতর দিয়াই—যথাসময়ে ঐ সমস্ত দেব-দেবী ধাম-লীলাদি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা নিষেধ। বর্ত্তমানে কালনায় শ্রীমৎ ভগবানদাস বাবাজীর আখড়ায় এবং সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ীতে এই কলিযুগোপযোগী "নাম-ব্রহ্মের" পূজা প্রবর্ত্তিত আছে এবং শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুও গেণ্ডেরিয়াতে প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর 'সাধন'—"**প্রতিশ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়।**" গুরুনানকের 'সাধন'—"শ্বাসি গ্রাসি হরিনাম সমালি"—'**প্রতি শ্বাসে ও প্রতিগ্রাসে হরিনাম স্মরণ কর।**'

গুরু নানক নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য, ইহা শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুও ইঙ্গিতে সমর্থন করিয়াছেন।—তাঁহার পরম কৃপাপাত্র শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয় বলিয়াছেন—"কোন সময় রাখালবাবুর বাড়ীতে গোঁসাই কহিয়াছেন—'সদ্গুরু ভগবানের একটি নাম। সদ্গুরু দেশে (ভারতবর্ষে) একসময়ে একজন থাকেন।' ...আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'গুরু নানক ও মহাপ্রভু সমসাময়িক। তাহা হইলে একসময়ে ইহা কেমন করিয়া?' তাহাতে তিনি বলিলেন—'**ইঁহাদের মধ্যে (মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈত-প্রভু) তাঁহাকে কেহ কৃপা করেন নাই, কেমন করিয়া বুঝিলে?**' ('মন্দির' পত্রিকা—১৩৫৮, ২৭০ পৃঃ)

রামানন্দ মহাপ্রভু সংবাদ

(২৬) প্রশ্ন :—রামানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর নিকট 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' কিরূপ নিরূপিত হইয়াছে ?

উত্তর :—দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের গোদাবরী তীরে সাক্ষাৎ হইলে, 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব আলোচনা হইয়াছিল, এস্থলে তাহারই সারমর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে* ।—মূল প্রসঙ্গের আলোচনার পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় অগ্রে জানা প্রয়োজন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে জীবের চরম-পরম প্রয়োজন, বা 'সাধ্য'-বস্তু,—ভগবৎ-প্রেম, বা কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা ; এবং, বিশুদ্ধা, বা অহৈতুকী, ভক্তিই ঐ প্রেম লাভের একমাত্র উপায়, বা 'সাধন', এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস, অতএব শ্রীকৃষ্ণ সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাই হইল জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম ।—

> 'জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
> পিতৃদ্রোহী পাতকীর, জন্ম জন্ম তাপ ॥' (চৈঃ ভাঃ—২।১।২১৭)
> 'কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
> সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥
> তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
> মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥' (চৈঃ চঃ—২।২২।১০-১৮)

---

* এই প্রবন্ধটি প্রধানতঃ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল রাধা গোবিন্দ নাথ মহাশয় সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে লিখিত, এজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে উক্ত উপাদেয় গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী-পাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে, উত্তমা-ভক্তির এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

ভক্তিঃ সিন্ধু—১।১।১

'অন্যাভিলাষিতাশূন্য,'—অর্থাৎ, কৃষ্ণ সেবা ও তাহার অনুকূল বিষয় ব্যতীত ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি বাসনা শূন্য ; 'জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত'—অর্থাৎ, জ্ঞান (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান, বা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান), কর্ম্ম, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভক্তি বিরোধী বিষয়ের সংস্রব শূন্য ; এবং, 'অনুকূলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন,'—অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রিয়া বা ভাবনাদি শ্রীকৃষ্ণসেবার বা কৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল, কায়মনোবাক্যে সে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বা ভাবনা করাই 'উত্তমা ভক্তি'। এখানে 'জ্ঞান' বলিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই বোঝায় ; পরন্তু, ভজনীয় বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য—

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস।' চৈঃ চঃ ১।২।৯৭

এবং 'কর্ম্ম' বলিতে স্মৃতিশাস্ত্রাদিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মাদিই বোঝায় ; ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যাদি যে অবশ্য করণীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইলে, সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন মহতের সঙ্গ ঘটে, তবে তাঁহার কৃপায় পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধা-ভক্তির উদয় হইতে পারে, নতুবা নহে—

'কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ।' চৈঃ চঃ—২।২২।৪৮

গীতাতেও শ্রীভগবানের সর্ব্বশেষ উপদেশ—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—মামেকং শরণং ব্রজ।" গীতা—১৮।৬৬

'সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও',—এস্থলে 'সর্ব্ব ধর্ম্ম' বলিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও যে তাহার অন্তর্গত, তাহা বলাই বাহুল্য।

এইবার আমরা রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' সম্বন্ধে যাহা আলোচনা হইয়াছে তাহা বিবৃত করিব—

(চৈঃ চঃ—মধ্যঃ ৮ম অঃ)

প্রভু কহে—'পড় শ্লোক—সাধ্যের নির্ণয়'।
রায় কহে—'স্বধর্ম্মাচরণে, বিষ্ণু ভক্তি হয়॥' ঐ—২।৮।৫৪

মহাপ্রভু প্রশ্ন করিলেন—'রামানন্দ, জীবের সাধ্য বস্তু কি, শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ তাহা বল।' 'পড় শ্লোক'—অর্থাৎ, যাহা দ্বারা জীবের সাধ্য বস্তু নিরূপিত হইতে পারে এইরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলক সিদ্ধান্তের কথা বল। 'পড় শ্লোক'—কথাটি অতীব সার-গর্ভ। যিনি যতই বড় হউন না কেন, এমন কি স্বয়ং ভগবান হইলেও, তাঁহার উক্তি বা সিদ্ধান্ত শাস্ত্র প্রমাণসহ না হইলে কদাচ নির্ব্বিচারে গ্রহণীয় নহে। 'সনাতন-শিক্ষায়' মহাপ্রভু স্বয়ংও যাহা যাহা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তৎসহ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগীতাতেও অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥" গীতা—৪।২-৩

শরশয্যাশায়িত মহাত্মা ভীষ্মদেবও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সমস্তই পরম্পরাপ্রাপ্ত শাস্ত্র প্রমাণসহ বলিয়াছেন। তাঁহার শাস্ত্রে এতাদৃশ নিষ্ঠা যে, স্বর্গীয় পিতাকে পিণ্ডদান কালে, পিতা সাক্ষাৎ প্রকাশ হইয়া হস্ত প্রসারণ করিলেও, তাঁহার হস্তে পিণ্ড না দিয়া শাস্ত্রানুমোদিত কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন এবং কুশ হইতে তাহা লইতে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে, শাস্ত্রে তাঁহার এতাদৃশ

সুদৃঢ় নিষ্ঠা দর্শনে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া পরম প্রীতি সহকারে আশীর্ব্বাদ করিলেন।—(প্রলয় কালে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হইলে শ্রীভগবান মৎস্যরূপে সর্ব্বাগ্রে বেদ উদ্ধার করেন)। জীব নিজ বুদ্ধিবলে কদাচ তত্ত্বনিরূপণ করিতে সমর্থ নহে;—করিতে গেলে পদে পদে ভুলভ্রান্তি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; একারণ কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে শাস্ত্র প্রমাণ অপরিহার্য্য। শ্রীভগবান সে কারণ গীতায় সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি॥" গীতা—১৬।২৫

মহাপ্রভুও 'সনাতন শিক্ষায়' বলিয়াছেন—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥" চৈঃ চঃ—২।২০।১০৭

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু মৌন অবস্থায় স্বহস্তে লিখিয়াছেন—'শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্যপথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় তাহাও যাইবে না।'—'শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন। ঋষিদিগের পদানুসরণ ভিন্ন গতি নাই।'—'শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে মিলিলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা বিষবৎ ত্যাজ্য।' (করুণাকণা—১৭, ১৮ পৃঃ)

রামরায় বলিলেন—'স্বধর্ম্মাচরণে' বিষ্ণু ভক্তি হয়।—নিজ নিজ বর্ণ বা আশ্রমোচিত যে যে কর্ত্তব্য শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে তাহার অনুষ্ঠানই 'স্বধর্ম্মাচরণ'। এই 'স্বধর্ম্মাচরণে' যে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় তাহার প্রমাণস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ হইতে রামরায় একটি শ্লোক উদ্ধার করিলেন—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণম্॥" বিষ্ণু—৩।৮।৯

অর্থাৎ—'পরমপুরুষ বিষ্ণু, বর্ণাশ্রম-আচার-সম্পন্ন পুরুষকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, বর্ণাশ্রম আচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতির আর

অন্য উপায় নাই।' বিষ্ণুপ্রীতিই যে সর্ব্বোত্তম 'সাধ্য-বস্তু' ইহা ভক্তি মার্গেরই কথা। তবে ভক্তি-শাস্ত্র মতে সেবা ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভগবান ঐকান্তিক প্রীত হয়েন না।

ইহাতে দেখা যাইতেছে ভক্তি-শাস্ত্রে যে-জাতীয় বিষ্ণু-প্রীতি সাধনের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই শ্লোকে সে-জাতীয় বিষ্ণু-প্রীতির কথা বলা হয় নাই। শুদ্ধাভক্তির যাজনে তিনি এতই তুষ্টি লাভ করেন যে--"বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ", 'ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের নিকট আপনাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলেন।' তিনি নিজেই দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—"অহং ভক্ত পরাধীনঃ"। কিন্তু বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠানে তিনি কদাচ এরূপ বশ্যতা স্বীকার করেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কিন্তু বিষ্ণু আরাধনা হেতু তাহাতে ভক্তি আরোপ হওয়ায় 'ভক্তি' বলিলেন; শাস্ত্রে এতাদৃশ ভক্তিকে 'আরোপসিদ্ধা' ভক্তি বলে। এই হেতু মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য', অর্থাৎ বাহিরের কথা, বলিয়া ইহার উপরিতম শুদ্ধা ভক্তির কথা শুনিতে চাহিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের যে স্থান হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে সে স্থানের প্রকরণ বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণের ফলে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি, বা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্তির কথা পাওয়া যায়। অতএব উহা ভক্তিশাস্ত্র অনুমোদিত বিষ্ণু-প্রীতি, বা বিষ্ণু-ভক্তি নহে,—উহা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির, বা ঐহিক সুখ-সম্পদ, বা নির্ব্বাণ মুক্তির অনুকূলে বিষ্ণুপ্রীতি। এই শ্রেণীর বিষ্ণু-প্রীতিতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ (নির্ব্বাণ মুক্তি) পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। এগুলি সমস্তই সকাম। উহাতে ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত পঞ্চম (বা পরম) পুরুষার্থ 'প্রেম' লাভ হয় না। অধিকন্তু, মোক্ষ-বাঞ্ছাকে ভক্তিশাস্ত্রে 'কৈতব প্রধান' বলা হইয়াছে—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥' চৈঃ চঃ—১।১।৫০

রায় রামানন্দের কথা শুনিয়া—

প্রভু কহে—'এহোবাহ্য, আগে কহ আর।'
রায় কহে—'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, সাধ্যসার॥'—

মহাপ্রভু বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে 'স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়' তাহা অতি বাহিরের কথা। উহার পরে যদি কিছু থাকেত বল।" বিষ্ণুভক্তি সাধ্য বস্তু সত্য কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণে যে বিষ্ণুপ্রীতি জন্মে তাহা জীবের সাধ্য বস্তু নহে; কারণ তাহার ফলে ইহকালের সুখ সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদি সুখভোগ লাভ হইতে পারে, ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে নির্ব্বান মুক্তিও বরং লাভ হইতে পারে; কিন্তু এ সমস্তই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের অনেক বাহিরের বস্তু। স্বর্গাদি সুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষা, বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষার (নির্ব্বাণ মুক্তি আকাঙ্ক্ষার) মূলে রহিয়াছে নিজের স্বার্থ,—কাম। উহা স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের বাহিরে; এবং তদাত্ম্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও ভগবৎ সেবাকাঙ্ক্ষার একান্ত বিরোধী; উহা ভক্তের আদৌ লোভনীয় বস্তু নহে—

'নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না চায়।' চৈঃ চঃ—২।৬।৪১

রামরায়ের উল্লেখিত অনুরূপ বিষ্ণুভক্তি বাহিরের বস্তু হওয়ায়, তাহার 'সাধন' যে 'স্বধর্ম্মাচরণ' তাহাও বাহিরের বস্তু, তাহা জীবের স্বরূপের অনুকূল নহে।

ভক্তের চরম-পরম-আকাঙ্ক্ষা ভববন্ধন হইতে 'মুক্ত' হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করতঃ, স্বাস্থ্যভাবানন্দে বিভোর হইয়া, নিত্য লীলায় প্রবেশ করিয়া, 'ইষ্টের' পরিকর রূপে তাঁহার সেবা প্রাপ্তি। যাহাতে এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়,—স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া তাঁহাতে লীন হয়, ইহার কল্পনাও ভক্তের মর্ম্মান্তিক পীড়াদায়ক।

এই সকল কারনেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, বা স্বধর্ম্মাচরণকে, মহাপ্রভু 'বাহ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ; নতুবা, যাহাতে চতুঃবর্গের ফল লাভ হয় সেই স্বধর্ম্মাচরণকে কদাচ হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'এহো বাহ্য' কথাটি প্রয়োগ করেন নাই। সকাম ধর্ম্মাচরণে গতাগতি নিবৃত্তি হয় না—

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥" গীতা—৯।২১

—'এইরূপে সেই বেদোক্ত কর্ম্ম অনুসরণ করিয়া ভোগবাসনা-বশতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।'—এমন কি, ব্রহ্ম-লোকবাসীগণেরও ঐকান্তিক (অহৈতুকী) ভক্তির অভাবে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥" গীতা—৮।১৬

কেহ কেহ বলেন, এখানে যে 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' আলোচনা হইয়াছে, এই সাধন পর্য্যায়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নিম্নতম সোপান মাত্র ; কিন্তু এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রায় রামানন্দ 'সাধ্য-সাধন তত্ত্বের' কথা প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক পুরুষার্থ রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বলেন, এস্থলে স্বধর্ম্মাচরণকেই 'বাহ্য' বলা হইয়াছে, পরন্তু 'বিষ্ণুভক্তি', বা বিষ্ণুর আরাধনাকে, 'বাহ্য' বলা হয় নাই, কারণ বিষ্ণু আরাধনা সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গত। বিষ্ণুর আরাধনা না করিলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করা সত্ত্বেও জীবের পতন হয়।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥" শ্রীভাঃ—১১।৫।৩

'এই চারি বর্ণ ও আশ্রমের সাক্ষাৎ জনক স্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানকে যাহারা ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতন প্রাপ্ত হয়।'

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও 'সনাতন-শিক্ষায়' বলিয়াছেন—

'চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥' চৈঃ চঃ—২।২২।১৯

ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা শ্রীমৎ ভাগবতে বর্ণিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের আচরণে সুন্দর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাঁহারা স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন ভিক্ষা করিলেও, তাঁহাকে অনাদর করিয়া তাহারা যজ্ঞে মনোনিবেশ করিলেন! পরে, কোনরূপ সংস্কারবর্জ্জিতা, শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা তাঁহাদের পত্নীদিগের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ও পরম প্রীতিসহ তাঁহাকে অন্নদান এবং তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অশেষ কৃপা দর্শন করিয়া, ঐ যাজ্ঞিকগণ পরম বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজদিগকে ধিক্কার প্রদান করিলেন।

সার কথা এই যে—বিষ্ণুভক্তি জীবের সাধ্য বস্তু বটে, কিন্তু যে বিষ্ণুভক্তি কেবল স্বধর্ম্মাচরণের ফল স্বরূপ স্বর্গাদি স্ব-সুখ-ভোগ মাত্র প্রদান করে—যে বিষ্ণু-ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায় না—তাহা জীবের 'সাধ্য' নহে। যে বিষ্ণু-ভক্তিতে কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের 'সাধ্যসার', কারণ তাহা জীবের স্বরূপের অনুকূল।

এতাদৃশ ভক্তি প্রাপ্তি শুধু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন দ্বারা সম্ভব নহে, তবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন মহতের সঙ্গ ঘটে তবেই, তাঁহার কৃপায় শুদ্ধাভক্তির উদ্ভব হইতে পারে, নতুবা নহে।

'কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ।' চৈঃ চঃ—২।২২।৪৮

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥' ঐ—২।১৯।১৩৩

'কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥' ঐ—২।২২।২৯

এই সকল কারণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম 'বাহ্য' বুলায়, রায় রামানন্দ বলিলেন—'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পন' সাধ্য সার।' ইহাতে বোঝা যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অপেক্ষা 'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পন' শ্রেষ্ঠ। বর্ণাশ্রমাদি বেদ-বিহিত কর্ম্ম সকাম, ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তার বন্ধন জন্মে। ভগবান বলিয়াছেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" গীতা—৩।৯

ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে; তদ্ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্মে ইহ-লোকে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব হে কৌন্তেয় তুমি ফলানু-সন্ধানশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।'

ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে বেদাদি বিহিত কর্ম্মদ্বারা যে বন্ধনের আশঙ্কা আছে, 'ফলানুসন্ধান' রহিত হইয়া সেই সকল কর্ম্ম করিলে আর বন্ধনের আশঙ্কা থাকে না! এই জন্যই কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের ব্যবস্থা। এই কারণে রামানন্দ রায় তাঁহার উক্তির প্রমান স্বরূপ গীতার এক শ্লোকে উদ্ধৃত করিলেন—

"যৎ করোষি, যদাশ্নাসি, যজ্জুহোষি, দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" গীতা—৯।২৭

(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন)—'তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর,—তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর।' যেহেতু—

"শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।" গীতা—৯।২৮

—'এইরূপে সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিলে, তুমি শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে।' কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিলে, বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মাচরণের ন্যায়, কর্ম্মবন্ধন হয় না বলিয়াই, ইহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানকর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনন্য-ভক্তিতে যাহাদের অধিকার নাই, অথচ নিকৃষ্ট সকাম ভক্তিতেও যাহাদের অভিরুচি নাই, তাহাদের জন্যই এই সাধনের ব্যবস্থা।

'শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ'কে মহাপ্রভু 'বাহ্য' বলিলেন এই হিসাবে যে, কর্ম্মবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করার জন্যই প্রধানতঃ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়; সুতরাং এই কর্ম্মার্পণও স্বরূপের অনুকূল নহে, ইহাতে নিজকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করার কামনাই মুখ্য। যেখানে নিজ স্বার্থের অনুসন্ধান আছে, সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না। অতএব ইহা 'বাহ্য'—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥" চৈঃ চঃ—১।৪

'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' হইল ফলাভিসন্ধান-যুক্ত স্বধর্ম্ম, আর 'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ' হইল ফলাভিসন্ধান শূন্য স্বধর্ম্ম—এই দুইটীকেই যখন মহাপ্রভু 'বাহ্য' বলিলেন, তখন রায় রামানন্দ 'স্বধর্ম্ম-ত্যাগের' কথা বলিলেন—

প্রভু কহে—'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'
রায় কহে—'স্বধর্ম্মত্যাগ, এই সাধ্য সার॥'

স্বধর্ম্মত্যাগ যে 'সাধ্যসার' তাহার পোষকতায় রামরায় গীতার প্রমান উল্লেখ করিলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ॥" গীতা—১৮।৬৬

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'হে অর্জ্জুন, সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি কোনরূপ শোক করিও না।'

এই শ্লোকে জীবের স্বরূপানুবন্ধী-কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ সেবায় প্রতিকূল একটা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ—'সর্ব্বধর্ম্ম' (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও এই সর্ব্বধর্ম্মেরই অন্তর্গত, বলাই বাহুল্য) পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও। এইরূপ সমস্ত-ধর্ম্ম ত্যাগ করার জন্য তোমার যদি পাপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়, তবে ইহাও বলিতেছি—'এই পাপের জন্য তুমি কোন প্রকার ভয় করিও না—আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব।' এই ধর্ম্মত্যাগ ও শরণাগতিতে নিজের পাপ হইতে রক্ষার জন্য একটা স্বার্থানুসন্ধান, বা অভিসন্ধি, রহিয়াছে। সুতরাং ইহা "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" হইল না—কাজেই উত্তমা (বা বিশুদ্ধা) ভক্তির তুলনায় ইহা 'বাহ্য'। এই সর্ব্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতিতে নিজ দুঃখ বিনাশেচ্ছারূপ কামনা অন্তর্নিহিত থাকায়, সকাম-ভক্তি মধ্যে পর্য্যবসিত হওয়াতে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়া তাদৃশ সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগতিকেও বিশেষ সমাদর করিলেন না। এইখানে একটা কথা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য,—গীতার সর্ব্বশেষে ভগবান 'সর্ব্বগুহ্যতম' বাক্য বলিতে গিয়া, দুইটি শ্লোকের মধ্যে এই শ্লোকটী উল্লেখ করিলেও, ইহা গীতার 'সর্ব্বগুহ্যতম' শ্লোক নহে এবং সর্ব্ব-গুহ্যতম-শ্লোককে মহাপ্রভু 'বাহ্য' বলেন নাই। সর্ব্ব-গুহ্যতম-শ্লোক বলিতে আরম্ভ করিয়া তাহা কি, প্রথমে তাহাই বলিলেন, যথা,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে॥" গীতা—১৮,৬৫

'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ' (নবম) অধ্যায়ের সর্ব্ব শেষেও প্রায় এই একই শ্লোকই বলিয়াছেন।

ইহার অর্থ,—'তুমি মদেকচিত্ত ও মদ্‌ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর ও আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।'—

ইহা সমস্তই বিশুদ্ধ ভক্তি-অঙ্গ-যজনের কথা,—ইহাই চরম পরম গুহ্যতম তত্ত্ব।—এক্ষণে, এতদর্থে উপস্থিত যাহা করিতে হইবে অর্জ্জুনকে তাহাই নির্দ্দেশ করিলেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি"; অর্থাৎ, 'অর্জ্জুন, আমি এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব না, এই কারণ এই অসুর-মারণ, ভূভার-হরণ কার্য্যটি তোমাকে নিমিত্ত করিয়া সম্পন্ন করিব, তুমি কোন বিচার না করিয়া—ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন প্রকার অপেক্ষা (উপেক্ষা নহে) না করিয়া, এক্ষণে একান্ত শরণাগত-চিত্তে (স্বধর্ম্মাচরণ হিসাবে নহে) আমার নির্দ্দেশ সমাপন কর; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব।'

'স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার' পোষকতায় রামরায় ভাগবতেরও একটি শ্লোক (ভাঃ—১১।১১ ৩২) উদ্ধৃত করিলেন—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—'হে উদ্ধব, (বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে) আমা কর্তৃক যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষগুণ সম্যকরূপে অবগত হইয়া, তৎসমুদয় (নিত্য-নৈমিত্তিকরূপ স্বকীয় বর্ণাশ্রমাদি) ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করে সে ব্যক্তি 'সত্তম'। পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় এ শ্লোকেও (দোষগুণের) বিচারের কথা রহিয়াছে। প্রাণের টানের সেবা অপেক্ষা, বিচার করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় সেবা অনেক বাহিরের বস্তু, এই কারণেই মহাপ্রভু ইহাকে 'বাহ্য' বলিয়া অবিহিত করিলেন—

প্রভু কহে—'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'
রায় কহে—'জ্ঞান মিশ্র-ভক্তি সাধ্য সার॥'

কোন সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের কৃপা আকর্ষণ করিয়া সাধকের সাযুজ্য প্রাপ্তির আনুকূল্য করাই এই 'জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তি'র কার্য্য, বা

'সাধন', যেহেতু ভক্তি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—'কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে'। (চৈঃ চঃ—২।২২।১৬) 'ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।'
(চৈঃ চঃ—২ ২২।২৪)

জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি শুদ্ধা-ভক্তিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে, এজন্য রামরায় উহা 'সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের' পরে, উচ্চ স্থানে উল্লেখ করিলেন,এবং ইহার পোষকতায় গীতার একটি শ্লোক উল্লেখ করিলেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" গীতা—১৮.৫৪

'ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, কোন বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরাভক্তি লাভ করেন।'

জ্ঞানমিশ্র-ভক্তি পরাভক্তিতে পরিণত হওয়ার নিশ্চয়তা নাই, কারণ উহা সাযুজ্য মুক্তির সাধনরূপেও নির্দ্দিষ্ট আছে; এ কারণ পরাভক্তি লাভের নিশ্চয়তা না থাকাতেই; উহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য লাভের নিশ্চিন্ত সাধন নহে, বলিয়াই ইহাও 'বাহ্য' বলা হইয়াছে। আর এককথা,—জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলে শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে ভজনের বিঘ্ন জন্মে, যেহেতু—'জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃতই' শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ। একারণ,—

প্রভু কহে,—'এহো বাহ্য, আগে কহ আর'
রায় কহে,—'জ্ঞান-শূন্য-ভক্তি, সাধ্য সার॥'

'জ্ঞান-শূন্য-ভক্তি'—জ্ঞানের সংশ্রবশূন্য ভক্তি—(জ্ঞান-কর্ম্মাদি অনাবৃত ভক্তি) জীবের স্বরূপানুবন্ধী স্বাভাবিক অহৈতুকী ভক্তি।

'জ্ঞান-শূন্য-ভক্তি' বলিতে—ভগবানের ঐশ্বর্য্য মহিমাদি বিচার শূন্য ভক্তি।—উপাসনা আরম্ভের সুবিধার জন্য, এবং অন্য আবেশ পরিত্যাগের জন্য, ভগবানের স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মহিমাদি জ্ঞান সাধকের

প্রথমে কিছু দরকার হয়; কিন্তু ভক্তিতে প্রবেশ করিলে ঐ জাতীয় জ্ঞানও অকিঞ্চিৎকর এবং চিত্ত-বিক্ষোভের হেতু হয় বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে। তখন কোনরূপ বিচারভাব- বর্জ্জিত কেবল স্বাভাবিক অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে। বিচার করিয়া তবে ভক্তি করিলে, অন্য অপেক্ষা থাকা প্রযুক্ত তাহা স্বাভাবিক অনুরাগ হইল না। তাহা কদাচ শুদ্ধা-ভক্তি বা নির্হেতু ভালবাসার লক্ষণ নহে। শিশু যেমন তাহার মাতা—দেবী, কি রাক্ষসী, তাহার খোঁজ না লইয়া স্বাভাবিক অনুরাগভরে তাহার মাতার স্তন্য-পীযূষ পান করিয়াই কৃতার্থ হয়, তদ্রূপ নির্ব্বিচারে ভগবানের কোন গুণাগুণের অনুসন্ধান না লইয়া স্বাভাবিক অনুরাগ-ভরা যে প্রীতি, তাহাই জ্ঞান-শূন্য ভক্তি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এই কারণেই রামানন্দ রায় কর্ত্তৃক এই 'জ্ঞান-শূন্য-ভক্তি', 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের' এতাদৃশ উন্নত স্তরে উল্লেখিত হইয়াছে এবং এই কারণেই মহাপ্রভু ইহাকে আর 'বাহ্য' বলিয়া উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, 'এহো হয়' বলিয়া অভিহিত করিলেন—

> প্রভু কহে—'এহো হয়, আগে কহ আর।'
> রায় কহে—'প্রেমভক্তি, সর্ব্বসাধ্য সার॥'

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহাশূন্য দৃঢ় শ্রদ্ধালু ব্যক্তি যদি জ্ঞান-কর্ম্মাদি সংস্রব ত্যাগ করিয়া, স্মরণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গের আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে, এজন্য মহাপ্রভু এক্ষণে বলিলেন—'এহো হয়'। শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে; সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শ্রীকৃষ্ণসেবা, বা কৃষ্ণপ্রেমের, সাক্ষাৎ কারণ হইল না, এজন্য মহাপ্রভু বলিলেন—'এহো হয়, আগে কহ আর।'—অর্থাৎ, 'ইহার উপরে যদি কিছু থাকে বল।' এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি, শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ বলিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় এবারে মহাপ্রভু 'এহোবাহ্য' বলেন নাই—'এহো হয়', ('এহো বাহ্য' নহে) 'এহো গ্রাহ্য' বলিলেন।

'প্রেমভক্তির' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এইরূপ লক্ষণ লিখিয়াছেন—'জলবিন্দু মীন, দুঃখপায় আয়ুহীন, প্রেম বিন্দু এই মত ভক্ত।' (প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, তখন ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তি চিত্তে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধ-সত্ত্বে পরিণত হয় এবং এই শুদ্ধ-সত্ত্বই প্রেমাঙ্কুর (বা রতি, বা ভাব) রূপে পরিণত হইয়া চিত্তের মসৃনতা সম্পাদন করে। এই প্রেমাঙ্কুরের পরিপক্ক অবস্থাই 'প্রেম'। ভক্তের প্রেমই হইল শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির একমাত্র হেতু। স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ তিনি সর্ব্বদা প্রীতির জন্য লালায়িত, তাই যেখানে বিশুদ্ধ প্রেম সেইখানেই তিনি বর্ত্তমান।

অধিকারী ভেদে রতি, বা প্রেম, পাঁচ প্রকার; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। পরবর্ত্তী কয়েক পয়ারে রায় রামানন্দ যখন দাস্য সখ্যাদি রতির কথা যথাক্রমে বলিলেন, তখন মনে হয় ঐই পয়ারে প্রেমভক্তি শব্দদ্বারা 'শান্ত-রতি'র কথাই যেন উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। অথবা, এস্থলে 'প্রেমভক্তি' শব্দে সাধারণ প্রেমভক্তির কথা বলা হইয়াছে। রায় রামানন্দ নিজ উক্তির পোষকতায় নিম্নের শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলেন—(পদ্যাবল্যাং—১৪)

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ, ক্রীয়তাং যদি কুতোপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং, জন্মকোটীসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

'যদি কোন (সৎসঙ্গাদিরূপ) কারণ বশতঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্তা মতি (বা বুদ্ধি) ক্রয় করিবে; এই ক্রয় ব্যাপারে স্বীয় লালসাই একমাত্র মুল্য, নতুবা কোটী জন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না।' কাহারও মতি, বা বুদ্ধি, বা চিত্তবৃত্তি যদি কৃষ্ণ-ভক্তিরূপ-রসের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়—মতি, বা চিত্ত, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুখী হয়, তাহা হইলেই সেই মতিকে কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিত-মতি বলা যায়। ইহা পাইবার

একমাত্র মূল্য—লালসা ; এই লালসাই ঐকান্তিক ভক্তের প্রার্থনীয় বস্তু। একমাত্র সাধু-সঙ্গ, বা মহৎকৃপা, ব্যতীত অন্য কিছুতেই এই 'সেবা-লালসা' পাওয়া যায় না।

'শান্ত' রসের লক্ষণ 'কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা' ; কিন্তু উহা 'মমতা' গন্ধহীন, অর্থাৎ, শান্ত ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠতা আছে সত্য—শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বাসনা তাঁহার নাই সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে তাহার নিতান্ত আপনার জন এই আত্মীয়তা জ্ঞান তাহার নাই। এইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন—'শান্ত-রতিও সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদনের জন্য সেবা বাসনা নাই ; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদন-মূলক সাধ্যের কথা বল।'—

প্রভু কহে—'এহো হয়, আগে কহ আর।'
রায় কহে—'দাস্য প্রেম, সর্ব্ব সাধ্য সার॥'

'দাস্যে', শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা আছে, তাই তাঁহার প্রীতির জন্য সেবা আছে। 'শান্তে', এই মমতা-বুদ্ধি ও সেবা নাই। এজন্য ইহা 'শান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু 'দাস্য' রসে কৃষ্ণের সুখার্থ সেবা থাকিলেও গৌরব-বুদ্ধি আছে,—সম্ভ্রম আছে। এজন্য সেবার কালে সময়-সময় সঙ্কোচ জন্মে ; সুতরাং সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা যায় না। এজন্য ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে, একারণ—

প্রভু কহে—'এহো হয়, আগে কহ আর।'
রায় কহে—'সখ্য প্রেম, সর্ব্ব সাধ্য সার॥'

যাঁহারা প্রেমাধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার তুল্য বলিয়া মনে করেন; কোন মতেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ 'সখা' বলে। তাঁহাদের 'বিশ্রম্ভ-রাতকে' 'সখ্যপ্রেম' বলে। ইহাতে শান্তের 'এক-নিষ্ঠতা' ও দাস্যের 'সেবাত্ব' আছেই, অধিকন্তু আমি কৃষ্ণের সুখের জন্য (উচ্ছিষ্ট ফল প্রদান, স্কন্ধে আরোহনাদি) যাহা করিব তাহা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই প্রীতির সহিত স্বীকার

করিবেন। এইরূপ বিশ্বাসময় ভাবও আছে যাহা দাস্যে নাই। এজন্য ইহা দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যে—দাস্যের ন্যায় গৌরব বুদ্ধি, সম্ভ্রম, বা সেবায় সঙ্কোচ নাই।

দাস্য-সখ্যাদি-ভাব—দুই জাতীয়; এক, ঐশ্বর্য্যাত্মক, আর শুদ্ধ মাধুর্য্যাত্মক। দ্বারকা, মথুরাদিতে ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব, আর ব্রজে মাধুর্য্যাত্মক ভাব। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট রায় রামানন্দ যে দাস্য সখ্যাদির কথা বলিয়াছেন, তাহা ব্রজের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন বিশুদ্ধ রতি সম্বন্ধেই বলিয়াছেন; কারণ, ঐশ্বর্য্যাত্মিকা রতি উত্তম সাধ্য বস্তু হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে তাদৃশ প্রীত হন না—'ঐশ্বর্য্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।' (চৈঃ চঃ—১।৪।১৬) এক্ষণে, 'সখ্য'—দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়—

প্রভু কহে—'এহোত্তম,—আগে কহ আর।'
রায় কহে—'বাৎসল্য প্রেম, সর্ব্ব সাধ্য সার॥'

'সখ্যপ্রেম'কে মহাপ্রভু 'উত্তম' বলিলেন। এপর্য্যন্ত আর কোন 'সাধ্য'কে উত্তম বলেন নাই। ইহাকে 'উত্তম' বলার তাৎপর্য্য এই যে, শান্ত-দাস্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে বড় মনে করা হয়, আর ভক্ত নিজেকে ছোট মনে করেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের অধীন হ'ন না। সঙ্কোচাভাব বশতঃ, স্বচ্ছন্দ-সেবা সম্ভব হয় বলিয়াই সখ্যপ্রেম 'উত্তম' হইল। এক্ষণে, ইহা অপেক্ষা প্রেমের কোন পরিপক্ব অবস্থা যদি থাকে তাহা বলিতে বলায়, রায় রামানন্দ—'বাৎসল্য প্রেমের' উল্লেখ করিলেন।

মাতা পিতা প্রভৃতিরূপে যাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে 'বাৎসল্য প্রেম' বলে। এই রতিতে সখ্য অপেক্ষা মমতাধিক্য আছে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য জ্ঞানে এবং আপনাদিগকে পালক জ্ঞানে নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন,

ভৎর্সন, বন্ধনাদি করিয়া থাকেন। ইহাতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিষ্ঠা, পালনরূপে সেবা, অসঙ্কোচভাব তো আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য এবং আপনাকে পালক জ্ঞান আছে। এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ পিতার পাদুকা মস্তকে বহন করিয়া থাকেন। যশোদা-মাতার স্তন্য পান করেন এবং তৎকর্ত্তৃক বন্ধনাদি শাস্তিও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। 'বাৎসল্য' সখ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়—

'প্রভু কহে—'এহোত্তম, আগে কহ আর।'
রায় কহে—'কান্তাপ্রেম, সর্ব্ব সাধ্য সার।'

শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্লভ আর আপনাদিগকে তাঁহার উপভোগ্যা কান্তা মনে করিয়া, নিজেদের সমস্ত সুখ-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-লালসা তাহাকে 'কান্তাপ্রেম' বলে। কান্তা বলিতে এস্থলে পরকীয়া ভাবাপন্ন ব্রজ গোপীদিগকে বুঝাইতেছে; কারণ, এই উক্তির পোষকতায় রায় রামানন্দ ব্রজ-গোপীদিগের কান্তা প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'কান্তা প্রেমে'—শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ ভাব, বাৎসল্যের লালন মমতাধিক্য তো আছেই; অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণ সুখের জন্য নিজাঙ্গ দিয়া সেবাও আছে, এজন্য ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভাগবতের 'ন পারয়েহং' ইত্যাদি (১০।৩২।২১) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি গোপীদিগের প্রেমে তাহাদের নিকট চিরকালের জন্য ঋণী হইয়াছেন। এই ঋণ শোধ করিবার তাঁহার কোন উপায় নাই। তাহার দুইটি কারণ,—প্রথমতঃ গোপীদিগের স্বসুখ বাসনার লেশ মাত্র নাই; তাহাদের বাসনা একমাত্র কৃষ্ণের সুখ; এই বাসনা যদি তিনি পূরণ করেন তবে নিজেরই লাভ হয়, পরন্তু গোপীদিগকে কিছুই প্রতিদান দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ গোপীরা

প্রত্যেকেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কোন একটি-গোপীর জন্য অপর গোপীগণকে ত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং তিনি অনন্যভাবে কোন এক গোপীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি গোপীদিগের অনুরূপ ভজন করিতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহাদের নিকট চিরদিনের তরে ঋণী, অতএব এই কান্তাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।—

"'আমাকে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
আমি তারে ভজি তৈছে এ মোর স্বভাবে॥'
—এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥" চৈঃ চঃ—২।৮।৭৩

রায় রামানন্দ 'কান্তাপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার' বলিয়াই, মহাপ্রভুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, এই উক্তিটি পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—

'কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইঞা বিচারিলে আছে তরতম॥' ঐ—২।৮।৭৩

'যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম'—যে ভক্ত যে ভাবে, বা রসে, ডুবিয়া আছেন, তিনি তাহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করেন। ইহা আপাতঃ দৃষ্টিতে বিচিত্র মনে হইলেও, ইহা বস্তুতঃ তাহাই; নতুবা, বিভিন্ন রসের ভক্তগণের নিজ নিজ ভাব হইতে অপরের ভাব শ্রেষ্ঠ মনে হইলে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবে নিত্য-স্থিতি-লাভ সম্ভবপর হয় না; অধিকন্তু, প্রেমাধীন, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ সাধকের চরম পরম আকাঙ্ক্ষা পূরণ জন্য তাঁহাকে ঐ উচ্চস্তরে লইবার জন্য সমুৎসুক হওয়াই

স্বাভাবিক ; এমত অবস্থায় কোন সাধকেরই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাবের কোন একটিতেই নিত্যস্থিতি, বা সিদ্ধ অবস্থা লাভ সম্ভবপর হয় না ; এবং তাহা হইলে কেহই নিত্য দাস, নিত্য সখা, নিত্য মাতা বা নিত্য প্রেয়সী থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকরগণের সকলেরই নিজ নিজ ভাবে নিত্যস্থিতি,—তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিজ ভাবের বিপর্য্যয় ঘটা কদাচ সম্ভব নহে ;—যাঁহারা মাতৃস্থানীয়া তাঁহাদের মধুর রসের দিকে লোভ, বা আকর্ষণ, হওয়া অতীব দোষাবহ ও রসাভাস। ঐরূপ অপর অপর ক্ষেত্রেও তাহাই হয়। এ কারণ লীলাময়ের এমনি বিচিত্র ব্যবস্থা যে, সকলেই আপন আপন ভাবকে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে 'সর্ব্বোত্তম' বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন।

ইহাতে আমাদের (তটস্থজনের) অনুমান হয়,—নবযোগেন্দ্রাদি শান্ত-ভক্তগণ সকল প্রকার কামনা বাসনা শূন্য হইয়া, একান্ত নিষ্ঠার সহিত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণগান-রসে পরমানন্দে ডুবিয়া থাকিয়াই, তাঁহারা পরম চরিতার্থ ;—শ্রীকৃষ্ণ মমতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সাক্ষাৎ সেবার জন্য তাঁহাদের কখন লালসা জাগে না। শান্তরসেই তাঁহারা চির নিমগ্ন। এদিকে, দাস্যরসে নিমগ্ন ভক্তরাজ হনুমান ভাবেন,—'আমার শরীরের প্রতি অণুপরমাণু রাম নামাঙ্কিত— রামময় ; চিত্ত-ইন্দ্রিয়-কায়, স্বসুখ-বাসনাশূন্য শ্রীরামপ্রীত্যর্থে,—তাঁহার সেবার জন্য, সর্ব্বদা লালায়িত। এই সেবানন্দের অপেক্ষা জগতে কি আর অধিক আনন্দ থাকিতে পারে ?—কদাচ নহে। আবার—সখ্যরসে নিমগ্ন শ্রীদাম সুদামাদি, ভাই-কানাইকে নিঃসঙ্কোচে ভালবাসিয়া, উচ্ছিষ্ট দিয়া, কাঁধে চড়িয়া-চড়াইয়া, গোষ্ঠ ক্রীড়া করিয়া সখ্যরসে ডুবিয়া পরম কৃতার্থ। তাঁহাদের আর অন্যরসে নিমগ্ন সেবকদের সেবানন্দ সুখের খবর লইবার আকাঙ্ক্ষাই নাই। তেমনি আবার,—পরম বাৎসল্যময়ী মা-যশোদার অনুভব,—'আমার বুকের রক্ত ক্ষীর করিয়া আমি আমার প্রাণ-গোপালকে বুকে ধরিয়া স্তন পান

করাইয়া,—'স্তন ক্ষীরে, আঁখি নীরে ভাসি',—প্রাণঢালা স্নেহমমতাপূর্ণ লালনপালন করিয়া যাদৃশ নিরুপম আনন্দলাভ করিয়া থাকি, তাহার কি জগতে তুলনা আছে?—কদাচ নহে।' ঐরূপ আবার, প্রেমময়ী কান্তাগণ, —আপন বলিতে কিছু না রাখিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া গোবিন্দের (দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর) সকল প্রকার নির্ব্বাধ সেবা করিয়া, আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করেন এবং ঐ প্রকার সেবার তুলনায় জগতে অন্য প্রকার সেবাসুখ অধিক হওয়া অসম্ভব জ্ঞানে বিভোর।—এই প্রকার, যিনি যে রসে ডুবিয়া আছেন, তিনি তাহাই 'সর্ব্বোত্তম' বলিয়া মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করেন, তাঁহাদের আর ঐ রস হইতে মাথা তুলিবার ইচ্ছাও নাই, অবসরও নাই। যাঁহারা ঐ সকল বিভিন্ন রসে ডুবিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই তাঁহাদের ভাবের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হয়েন; অপরের অনুভব-বেদ্য নহে। আর যাঁহারা উহার কোন রসেই ডোবেন নাই,—যাঁহারা 'তটস্থ'—নিরপেক্ষ, তাঁহারা বাহির হইতে কেবল বিচার করিয়া স্থির করিতে পারেন যে, যখন শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের নিঃসঙ্কোচ ভালবাসা, বাৎসল্যের লালন-পালন এবং কান্তার নিজ অঙ্গদানে সেবা,—মধুর রসের সেবায় এ সমস্তই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, তখন কান্তাপ্রেমই প্রকৃত পক্ষে 'সর্ব্বোত্তম', ইহাতে অনুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। কবিরাজ গোস্বামী পূর্ব্বেই এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—

> 'তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
> সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥' চৈঃ চঃ—১।৪।৪০

অর্থাৎ, যাঁহারা কোন রসেই ডোবেন নাই,—আমাদের মত 'তটস্থ', তাঁহারা যদি বাহির হইতে বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শৃঙ্গার রসকেই 'সর্ব্বোত্তম' বলিয়া গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।—এক্ষণে এই তত্ত্বটিই আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য রামানন্দ রায় বলিতে লাগিলেন,—

> 'গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য করে প্রতিরসে।
> শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥' চৈঃ চঃ—২।৮।৬৭

'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হইতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥' ঐ—২।৮।৭৭

'এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে ॥' ঐ—২।৮।৭৮

প্রভু কহে—'এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥'
রায় কহে—'ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এত দিন নাহি জানি আছিয়ে ভুবনে ॥
ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥' ঐ—২।৮।৭৩—৭৫

রায় কহে—'তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
এ জগতে নাহি রাধা প্রেমের উপমা ॥' ঐ—২।৮।৭৭

'শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপন।
ইহাতেই অনুখানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥'

প্রভু কহে—'যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই-সব-রসবস্তু তত্ত্ব হইল জ্ঞানে ॥
এবে সে জানিল সেব্য, সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মনে হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ—রাধিকার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্ব রূপ ॥' ঐ—২।৮।৮৮-৯২

মহাপ্রভুর ঐ প্রশ্নে, রায় রামানন্দ এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা বলিলেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহার সভার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥' ঐ—২।৮।১০৬-১০৯

তৎপরে, তিনি যে রস-স্বরূপ—'রসঃ বৈ সঃ', সেই স্বরূপের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন—

'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী, কাম বীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥' (২।৮।১১০—১১১)
'শৃঙ্গার রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মাপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥' ঐ—২।৮।১১৩
'আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥' ঐ—২।৮।১১৫

এইবার, সংক্ষেপে রাধিকার স্বরূপ বলিতেছেন—

'কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, তটস্থ, কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি—সভার উপরে॥' ঐ—২।৮।১১৭-১১৮
'সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিনি রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ,—যাঁরে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই-শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার—'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা—রাধাঠাকুরাণী॥'
'সেই মহাভাব হয়—চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করে—এই কার্য্য যার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ॥' ঐ—২।৮।১১৮-১২৮

(তখন) প্রভু কহে—'জানিল কৃষ্ণ-রাধা প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥'
রায় কহে—'কৃষ্ণ হয়ে, ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া, যাঁহার চরিত॥' ঐ—২।৮।১৪৬-১৪৭

(কামক্রীড়া,—অর্থাৎ প্রেমক্রীড়া; গোপীদের প্রেম, 'কাম' বলিয়া অভিহিত। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা পর প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

(তখন) প্রভু কহে—'এই হয়, আগে কহ আর।'
রায় কহে—'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর॥
যে বা প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥'
এত কহি, আপনকৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥' (২।৮।১৪৯-১৫১)

গীতটি শ্রবণ করিয়া রামরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিবার হেতু,—নিজ আনন্দাতিশয্য; অথবা, এই প্রসঙ্গ আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া সমীচীন নয়,—যে হেতু তাহা হইলে এইবায় নিজস্বরূপ ব্যক্ত হইয়া

পড়িবার (যাহা গোপন করিতে তিনি সমুৎসুক) আশঙ্কা রহিয়াছে। কারণ তিনি যে—'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ।' (চৈঃ চঃ—১।১।৫)

'রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হইল এক ঠাঁই॥' ঐ—১।৪।৪৯-৫০

'প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত'—'প্রেম জনিত বিলাসের বিবর্ত্ত।'—স্বসুখ বাসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের 'বিষয়' যিনি, কেবলমাত্র তাঁহার সুখ বিধানের বাসনা (সেই 'প্রেম') হইতে উদ্ভুত, এবং সে বাসনার প্রেরণায় সংঘটিত 'বিলাস'। 'বিবর্ত্ত' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়। ইহার তিনটি অর্থ—ভ্রম, বিপরীত এবং পরিপাক। তাহা হইলে, 'প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত' শব্দের অর্থ হইল—প্রেম জনিত বিলাসের পরিপক্কতা, বা চরমোৎকর্ষাবস্থা। এই চরম উৎকর্ষ অবস্থায় দুটী লক্ষণ প্রকাশ পায়—ভ্রান্তি ও বৈপরীত্য। রায় রামানন্দের গীতের মধ্যে, 'না সো রমণ, না হাম রমণী' বাক্যে এই 'বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল 'ভ্রান্তি'—নায়কনায়িকার 'আত্মবিস্মৃতি'—একতাপ্রাপ্তি (তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং)।

রাধাগোবিন্দের দুই অপ্রাকৃত ভাগবতীতনুর—পরম মিলনের পরিণতিই—শ্রীগৌরাঙ্গ; ইহাই স্বরূপগোস্বামীর করচায় (চৈঃ চঃ—১।১।৫) স্থিরীকৃত হইয়াছে। রায় রামানন্দের গীতটিতে তাহার আভাস থাকায়, আত্মগোপন করিবার জন্য, মহাপ্রভু তাঁহার মুখে হাত দিয়ে, আর অধিক বলিতে নিষেধ করিলেন।

(ইহার পরে) প্রভু কহে, 'সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥(২।৮।১৫৭-১৫৮)

(রায় কহে) 'অত্যন্ত রহস্য শুন—সাধনের কথা—
রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সর্বে এক সখিগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখীবিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া, সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলার নাহি অন্য গতি।
সখী ভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ-সেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে, আর নাহিক উপায় ॥'

ঐ—২।৮।১৫১-১৫৬

'সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখির মন ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥'

ঐ—২।৮।১৬৭-১৭০

'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥'
'নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য ॥'
'নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণেসুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥'

'সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি, সেই কৃষ্ণে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥' (২।৮।১৭৪-১৭৮)
'গোপী-অনুগতি-বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥' ঐ—২।৮।১৮৫
'এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥' ঐ—২।৮।১৮৭

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়, 'প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী' ব্যপদেশে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইল—

প্রশ্ন—প্রভু কহে, 'কোন্ বিদ্যা—বিদ্যা মধ্যে সার?'
উত্তর—রায় কহে—'কৃষ্ণভক্তি বিনা, বিদ্যা নাহি আর॥'
প্রঃ—'কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?'
উঃ—'কৃষ্ণ প্রেমভক্ত বলি, যার হয় খ্যাতি।'
প্রঃ—'সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?'
উঃ—রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার,—সেই বড় ধনী।'
প্রঃ—'দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?'
উঃ—'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু, দুঃখ নাহি আর।'
প্রঃ—'মুক্তমধ্যে কোন্ জীব, মুক্ত করি মানি?'
উঃ—'কৃষ্ণ প্রেম যার,—সেই মুক্ত শিরোমণি!'
প্রঃ—'গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম?'
উঃ—'রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি, যে গীতের মর্ম্ম।'
প্রঃ—'শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয় জীবের হয় সার?'
উঃ—'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা, শ্রেয়ঃ নাহি আর।'
প্রঃ—'কাহার স্মরণ জীব; করে অনুক্ষণ?'
উঃ—'কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা, প্রধান স্মরণ।'

প্রঃ—'ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?'

উঃ—'রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ, ধ্যান প্রধান।'

প্রঃ—'সর্ব্বত্যজি জীবের, কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?'

উঃ—ব্রজভূমি বৃন্দাবন—যাঁহা লীলা রাস।

প্রঃ—শ্রবণ মধ্যে জীবের, কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?'

উঃ—রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি, কর্ণ-রসায়ণ।

প্রঃ—উপাস্যের মধ্যে, কোন্ উপাস্য প্রধান ?

উঃ—শ্রেষ্ঠ উপাস্য, যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।

প্রঃ—মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই—কাঁহা দোঁহার গতি ?'

উঃ—'স্থাবর দেহে দেব দেহে যৈছে অবস্থিতি।'

অরসজ্ঞ কাকচুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান, করে ভাগ্যবান॥ ঐ—২।৮।১৭

ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ।
প্রভু পদে ধরি রায় করে নিবেদন॥—

'এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কর মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঁই শ্যামগোপ-রূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। (পঞ্চালিকা-প্রতিমা)
তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপট কহ প্রভু, কারণ ইহার॥' ঐ—২।৮।২২৫-২২৭

তখন মহাপ্রভু নিজ-স্বরূপ সঙ্গোপন করিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ চতুরতা দেখাইলে, কিছুতেই যখন রামানন্দ ক্ষান্ত হইলেন না, তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—

'রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥'
রায় কহে, 'তুমি প্রভু, ছাড় ভারিভূরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কইলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন ব্যবহার?'
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।—
রসরাজ মহাভাব—দুই একরূপ॥
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।—
'তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন।
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহ না স্পর্শে অন্যজন॥'

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন॥' ঐ—২।৮।২২৮-২৯।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তত্ত্ব—'রসরাজ মহাভাব—দুই একরূপ'। **'রসরাজ'**—অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং **'মহাভাব'**-স্বরূপিনী শ্রীরাধা ;—এই দুয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব রূপ।

আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন এই তিনটি না হইলে কোন বস্তুর আস্বাদন হয় না। ভক্তিরাজ্যে এই তিনটি বস্তুই—ভগবান, ভক্ত ও ভক্তি। ভক্তের ভাব-ভক্তি বা অনুরাগটি, যখন গাঢ়তম অবস্থায় উপনীত হয়—পূর্ণতম হইয়া উঠে, তখন ভগবানও পূর্ণতম রূপে প্রকাশিত হন। **এই ভক্তভাবের পূর্ণতম বিকাশের নামই—মহাভাব এবং শ্রীমতী রাধিকাই মহাভাব-স্বরূপিনী।** ভগবানের এই যে পূর্ণতম প্রকাশ,—রসের পূর্ণতম আস্বাদনের বস্তু, ইনিই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ দান করিয়া মহাভাব-স্বরূপিনী পূর্ণ-শক্তি রাধাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করেন, আবার, পূর্ণ শক্তিও আনন্দ দান করিয়া পূর্ণশক্তিমানকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এই ভাবে ক্রমশঃ উভয়ে কোন অনির্ব্বচনীয় একত্ব অভিমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। মহারসানন্দের এই প্রকার আদান-প্রদানের দ্বারা কোন এক অভিনব বিচিত্রতার যে চরম ছড়াছড়ি, **ইহাই মহারাস**। এই মহারাস অবস্থাতেই উভয়ে, বিশেষতঃ শ্রীরাধিকাতেই, কোন অনির্ব্বচনীয় মাদন-ভাবের আবির্ভাব হয়। এই মাদন রসানন্দাকৃষ্ট, মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, চরম রসরাজ মুর্ত্তি প্রকটন পূর্ব্বক, ঐ মাদনরসে যেন আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নিজ অভিমান হারাইয়া ফেলেন। আবার মাদনবতী শ্রীরাধা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে এই মাদনরস-সুধা পান করাইতে করাইতে তাঁহাকে নিজের অভ্যন্তরে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া নিজের অভিমানকেও হারাইয়া ফেলেন। **উভয়ের এই বিমিশ্র একাভিমানযুক্ত রসবিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ।** ইঁহাই পরব্রহ্মের রসানন্দের

মদীয় কুলদেবতা

শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

চরম প্রকট মূর্ত্তি। ইহা একটি অপূর্ব্ব আস্বাদনীয় বস্তু। এই যে ভেদেতে-অভেদ এবং অভেদে-ভেদ, ইহা একটি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রস আস্বাদনের ধারা। **পরব্রহ্মের এই অপূর্ব্ব আস্বাদনের রূপটিই** শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ইহাই অভিনব বিবর্ত্ত অদ্বৈত বাদ, বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদ—ইহা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতবাদ নহে। ইহা আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের আনন্দশক্তি পরম-ভগবতীর সহিত অখণ্ড রসাস্বাদনের এক বৈচিত্রময় যুগলের একীভাব অদ্বৈত। ইহাই রসতাৎপর্য্যক শ্রুতির চরম পর্য্যবসান। ইহাই, গোড়ীয় দর্শন শাস্ত্রকে অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতম করিয়াছে।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে **কবিরাজ গোস্বামীপাদ আবেগভরে বলিতেছেন—**

'সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয়, ইহার শ্রবণে।
প্রেম-ভক্তি হয়, রাধা-কৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব, জানি ইহা হইতে।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে॥
অলৌকিক লীলা, এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর॥' ঐ—২।৮।২৫৮-২৬১

অন্যত্র লিখিয়াছেন—(২।১৮।২১৫)
অলৌকিক লীলা প্রভুর, অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের, না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা, অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা, সত্য করি মান॥
যেই তর্ক করে ইহা—সেই মূর্খরাজ
আপনার মুণ্ডে সে, আপনি পাড়ে বাজ॥
চৈতন্যচরিত্র এই—অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায়—যার এক বিন্দু॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকবিগর্হিত লীলা

(২৭) **প্রশ্ন :—শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণে, লাম্পট্যাদির তাৎপর্য্য কি ?**

উত্তর :—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পর্য্যালোচনায় তাঁহার চৌর্য্য, লাম্পট্য, মিথ্যাভাষণাদি লোকবিগর্হিত লীলাগুলি ভক্তগণের নিকট কি হেতু এতাদৃশ পরম উপাদেয় বলিয়া গণ্য হয়,—ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি,—ইহা জানিবার জন্য শ্রদ্ধালুব্যক্তি মাত্রেরই ঔৎসুক্য জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

লৌকিক জগতে যাহাতে আমরা অন্যের অবিরোধে ভোগসুখ প্রাপ্ত হই, তাহার জন্য কতকগুলি আইন-কানুন—'বিধি-ও-নিষেধ', বাঁধিয়া লইয়াছি। যাহাতে কাহারও ভোগসুখের ব্যাঘাত না ঘটে,—সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে, ইহাই সকলের লক্ষ্য এবং ইহার প্রতিপালনে সকলেরই স্বার্থসিদ্ধি হয় ; নতুবা নানাদিকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারাদিতে সকলেরই স্বার্থসিদ্ধি, বা ভোগের, বিঘ্ন উৎপাদন করে। —যেমন, মনে করুন, যদি সকলেই মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে সকলেই লুকাইয়া ছাপাইয়া নিজ নিজ ভোগের সুবিধার জন্য সচেষ্ট হয়, তাহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং কেহ প্রবঞ্চক হইয়া অপরের সুখের হানি করিয়া অন্যায়রূপে নিজের সুখ-সুবিধা করিয়া লয়, তাহাতে অপরের মর্ম্মপীড়ার কারণ হয়। ভোগের রাজ্যে যত বেশী ভাগীদার, ততই সুখের হানি এবং সকলেরই যখন সেই এক লক্ষ্য—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা",—নিজ নিজ ভোগসুখ,—তখন সকলেরই এই নীতি হওয়াই স্বাভাবিক,—কেহ যেন কোন ন্যায় বা অন্যায় পন্থায় নিজ ভোগসুখ খর্ব্ব করিয়া অপরের সুখের হানি না ঘটায়। তাঁহাদের মধ্যে আইন-কানুন

শিথিল করিলেই—'জোর যার মুল্লুক তার' হইবে, অথবা 'ছলে-বলে-কৌশলে সকলেই নিজের কোলে ঝোল টানিবে'—তাহাতে সরল প্রকৃতি লোকেদের স্বার্থহানি ঘটিবে। সে কারণে ঐ সকল নৈতিক নিয়ম প্রচলন ও তাহার প্রতিপালনে সকলেরই আগ্রহ রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং ঐ নিয়ম-ভঙ্গকারীর দণ্ডের ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত।

এক্ষনে, আসুন আমরা প্রাকৃত কামের (ভোগের) রাজ্য হইতে অপ্রাকৃত প্রেমের (বা ত্যাগের) রাজ্যে (শ্রীবৃন্দাবনে) গমন করি। সে রাজ্যে সকলেরই একান্ত লক্ষ্য—নন্দনন্দনের (আনন্দময়ের) আনন্দ বর্দ্ধন,—প্রেমিক কবি জয়দেবের ভাষায়—"পূরয় মধুরিপু কামং"—'মধুসূদনের কামনা পূরণ কর'। বৃন্দাবনবাসী সকলেরই ঐ একমাত্র লক্ষ্য, ব্রত বা কামনা,—নন্দনন্দনের কামনা পূরণ করা। এতদর্থে তাঁহারা সকলেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এ কার্য্যে যিনি যতদূর অগ্রসর, তাঁর তত গৌরব ও প্রশংসা। শ্রীমতী রাধাতে ইহার পরাকাষ্ঠা, এজন্য তিনি সমর্থার শিরোমণি এবং কান্তাগণের মধ্যে কৃষ্ণের একান্ত-বল্লভা। শ্রীমতীর মুখ দিয়াই মহাপ্রভু প্রেমের পরাকাষ্ঠার উক্তি বাহির করিয়াছেন—

'না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁয় হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখ-বর্য্য ॥ চৈঃ চঃ—৩।২০।৪৩

—ইহাই প্রেমের চরম ও পরম অবস্থা ; এই অবস্থাই বৃন্দাবনবাসী সকলের লক্ষ্য। সুতরাং তথাকার সকল প্রকার বাঁধন (বা বিধি-নিষেধ) খুলিয়া দিলে কাহারও কোন প্রকার আতঙ্কের সম্ভাবনা নাই। সকলের উদ্দেশ্যই সাক্ষাত, বা পরোক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বর্দ্ধন ; অতএব সেখানে যতই প্রাণ খোলাখুলি, স্বচ্ছন্দভাব, ততই তাহা, তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল ও আনন্দবর্দ্ধক।

এ দিকে, শ্রীকৃষ্ণও—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং", প্রতিজ্ঞার কারণ, তাঁহাদের ভজন-অনুরূপ প্রতিদানের জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত এবং "স্বজন-প্রেম বিবর্দ্ধন-চতুর" স্বভাব হেতু, সর্ব্বদাই কিরূপে তাঁহার সখা, সখী, মাতৃ-পিতৃস্থানীয়গণের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে পারেন তাহারই অনুসন্ধানতৎপর। ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে, তিনি লোকাপেক্ষা, ধর্ম্মাপেক্ষা, প্রভৃতি সমস্তই জলাঞ্জলি দিতেও সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই ব্রজধামে যতই কৃষ্ণ-প্রেমের অংশীদার জুটিবে, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে; রাস-ক্রীড়ায় তিনশত কোটী স্থানে যদি আরও তিন শত কোটী গোপী সমবেত হইতেন, তাহা হইলে সকলের উল্লাস আরও বৃদ্ধিই পাইত। সংকীর্ত্তনাদিতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভোগ-রাজ্যে ঠিক তাহার বিপরীত। ভাগীদার জুটীলেই আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থের স্বল্পতার আশঙ্কায় উদ্বেগ, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ।

কুকুর, বিড়াল, গরু, বাছুর প্রভৃতি 'পোষ' মানিলে এবং তাহাদের দ্বারা কাহারো কোনরূপ অনিষ্টাশঙ্কা না থাকিলে, তাহাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। অবাধে, স্বচ্ছন্দে বেড়াইবার জন্য নির্ভয়ে ছাড়িয়া দেওয়া চলে এবং তাহাতেই আনন্দ। তদ্রূপ বৃন্দাবনের সব ব্যাপারেই প্রেমের খেলা। এতদর্থে লৌকিক রীতি-নীতি (মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, ইত্যাদি), বিধি-নিষেধ কোথাও শিথিল করিবার প্রয়োজন হইলে, প্রেমিক ভক্তগণ ও ভগবান স্বয়ং, তাঁহাদের পরস্পরের প্রেমোল্লাস বৃদ্ধি করিবার জন্য, অবিচারে ও নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা করিয়া থাকেন। তাহাতে কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্ট তো হয়ই না, বরং সকলের আনন্দ বৃদ্ধি হয়।—দ্বাপরে, প্রেমের ধাম বৃন্দাবনের কৃষ্ণ—**লীলাপুরুষোত্তম**।—সুনির্ম্মল, নিরুপম প্রেমলীলা পরিপুষ্টির জন্য এখানে সকল প্রকার বিধির বন্ধন, সকল প্রকার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। রাগ মার্গের (বিমল অনুরাগের) ভজন

আস্বাদন ও প্রবর্ত্তন করিবার জন্যই এই রসিক-শেখর, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—

'রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইল, ইচ্ছার উদ্গম॥' চৈঃ চঃ—১।৪।১৫

ত্রেতায়, শ্রীরামচন্দ্র অবতারে, দেখি—তিনি **মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম** রূপে অবতীর্ণ। একারণ হাজার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলেও কুত্রাপি তিনি শাস্ত্র বিধির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। এজন্য বিধিরাজ্যে, তিনি আদর্শ রাজা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ প্রভু ;— কুত্রাপি ইহার তুলনা মিলিবে না। এস্থলে ভগবান ও তাঁহার অন্তরঙ্গ-গণের একমাত্র লক্ষ্য বিধির মর্য্যাদা রক্ষণ। বিধির রাজ্যে সীতার মত পত্নী ; ভরত-লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা ; দশরথ-কৌশল্যার মত জনক-জননী ; হনুমানের মত দাস, প্রভৃতির তুলনা জগতে আর দ্বিতীয় কুত্রাপি মিলিবে না। আবার প্রেমের রাজ্যে—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরগণের মত এতাদৃশ প্রেমোন্মত্ততা,—ভগবান হইয়া বিধিব্যবস্থার এতাদৃশ লঙ্ঘন, জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না।

কলিযুগে আবার, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অনর্পিত প্রেমধন আপামর সাধারণে, অকাতরে বিলাবার তরে; **প্রেমপুরুষোত্তমরূপ** হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজধামে ব্রজবাসীকে বিবিধ, বিচিত্র লীলামাধুর্য্যরসে ডুবাইয়া, অশেষ বিশেষপ্রকারে প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করাইয়া, নিজ অন্তরঙ্গগণেরই সেবাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন ; পরন্তু, ব্রজধাম ব্যতীত বাহিরের কাহারই এই নিগূঢ় রস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য ঘটিল না। এবার কলিযুগে তাই করুণা-পরবশ হইয়া অবিচারে, যারেতারে, অনর্গল প্রেম বিতরণের তরে, পাত্রাপাত্রের কোন প্রকার বিচার না করিয়া, সংকীর্ত্তনরঙ্গে নাচিয়া গাইয়া, হাতে ধরিয়া, পায়ে পড়িয়া; মার খেয়ে বুকে ধরিয়া, স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-

লতাসহ বিশ্ব প্রেমে ডুবাইয়া নিজের প্রেম-পুরুষোত্তম নাম সার্থক করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কাহারও বাড়ীতে সোজাসুজি যাইয়া, চাহিয়া খাইলে ঐ প্রেমময়ী গোপীর যত না আনন্দ হয়, তাহার স্বহস্তে, সযত্নে প্রস্তুত ও সঙ্গোপনে তাঁরই জন্য রক্ষিত ক্ষীর, সর, নবনী যদি তিনি খুঁজে খুঁজে বাহির করিয়া গোপনে চুরি করিয়া খাইয়া আসেন, এবং তাঁর নিজ প্রিয়জনে (বানরাদিকে) ঐ সমস্ত সাধ মিটাইয়া বিতরণ করিয়া আসেন, ইহাতে ঐ গোপীর অধিকতর আনন্দেরই কারণ হইয়া থাকে,—বস্তুতঃ, ইহাপেক্ষা সেই গোপীর আনন্দের বিষয় আর কি আছে? ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের কাহার প্রতি কতটা আন্তরিক আকর্ষণ তাহা প্রকাশ পায় এবং সুপ্তপ্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজ পরিকরগণ-সহ পরকীয়া-ভাবে রাসাদিতে মিলনেরও ঠিক ঐ একই উদ্দেশ্য,—সোজাসুজি গোপীগণকে বিবাহ করিয়া, ঐ স্বকীয়াগণের সহিত রাসাদি লীলা করিলে ঐ লীলার অপূর্ব্ব চমৎকারিত্বই বিলুপ্ত হয়। ঐরূপ মিথ্যা ভাষণাদিও, শুধু তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন নিমিত্তই।—লৌকিক জগতে আমরা দেখিতে পাই, ফুটবল খেলার সময় কেহ চাতুরী পূর্ব্বক বলটীকে একদিকে কিক্ (kick) করিবার ভান করিয়া, যদি বিপরীত দিকে কিক্ করিয়া প্রতিপক্ষকে 'বঞ্চনা' করিতে সমর্থ হয়, তবে সকলেই তাহার কৌশলের 'তারিফ' করে এবং উভয় পক্ষই ঐরূপ ছলনায় পরাজিত করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করে, তাহাতে খেলার আনন্দোচ্ছাস বৃদ্ধিই হয়। ঐ স্থানে ঐরূপ বঞ্চনা করার জন্য কেহ কাহারও দোষ ধরা দূরে থাকুক, বরং ঐরূপ চাতুর্য্য-নৈপুন্যের প্রশংসাই করিয়া থাকে।—এই খেলার প্রসঙ্গে আরও একটি রহস্যজনক ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে,—খেলিতে গিয়া কেহ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ও হস্ত-পদে ক্ষত-বিক্ষত হইলে, দুঃখিত অন্তরে যদি কেহ তাহাকে প্রশ্ন করে,—"কেন ভাই, শুধু শুধু এই দুর্ভোগ?"—প্রত্যুত্তরে উল্লাসভরে সে উত্তর করিবে—

"আরে ভাই! এইতো সুখ, এই ত মজা, এই তো খেলা"; আবার তদবস্থাপ্রাপ্ত একটি মুটে মজুরকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলে,—সে তাহার ভাগ্যকে নিন্দা করিবে এবং উহা তাহার উদরান্ন ও পরিবার পোষণ জন্য দুর্ভোগ, বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিবে। ভগবল্লীলা ও সাধারণ কর্ম্মপরতন্ত্র জীবের কর্ম্মের এই প্রকারই পার্থক্য। বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্য, লাম্পট্যাদির জন্য তাড়ন, ভৎ‍্সন; দারুণ মানভঞ্জন জন্য শ্রীমতীর চরণ ধারণ; প্রভৃতিতে তাঁহাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না; তথাচ, এ সকলি তাঁহার প্রেমলীলা পুষ্টির পরিবর্দ্ধক বিধায়, স্বেচ্ছাময় ভগবান এ সকল অতি সমাদরে, পুলকিত অন্তরে, অঙ্গীকার করিয়া পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জমান হইয়া থাকেন এবং ভক্তকে নিমগ্ন করেন। "লোকবৎতু লীলা কৈবল্যং" (ব্রহ্ম সূত্র)— 'সাধারণ চক্ষে লৌকিকের মত প্রতীয়মান হইলেও উহা সমস্তই ভগবানের লীলা মাত্র।'

শ্রীবৃন্দাবন লীলায় গোপী গোপীদের মধ্যে মান, অভিমান; ঈর্ষ্যা, দ্বেষ; কাম, ক্রোধাদির যথেষ্ট প্রকাশ দেখা যায় সত্য, কিন্তু লৌকিক জগতের কাম ক্রোধাদির সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। তাহা সমস্তই ত্রিগুণাতীত, অপ্রাকৃত, প্রেমোত্থ কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি মাত্র। উহাদের প্রকাশে ভক্ত ও ভগবানের বিমল প্রেমের উল্লাসই বৃদ্ধি হয় মাত্র। উহা কাহারও মর্ম্মপীড়াদায়ক, বা আনন্দের বিরোধী হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি, যদি বৃন্দাবনে জটিলা কুটিলাদি গুরুজন, এবং চন্দ্রাবলি প্রভৃতি বিপক্ষ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ না থাকিতেন, তাহা হইলে না জানি শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসহ মিলনের কতই না সুযোগ ঘটিত এবং উভয়ের কত মিলনানন্দ সম্ভোগ হইত; কিন্তু এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীরাধার মিলনের যতই প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয়, এবং যতই তিনি প্রেমাতিশয্যে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়েন, ততই দুর্লভত্বপ্রযুক্ত মিলনানন্দ বৃদ্ধি হয় এবং ততই

তাঁহাদের প্রেম সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে। পশুরাজ সিংহ যেমন নিজ বিক্রমে, ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী গজরাজের কুম্ভ বিদারণ করিয়া, তাহা ভক্ষণে অধিকতর পুষ্ট ও বিক্রমশালী হয়, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধাও শ্রীকৃষ্ণ মিলনের দারুণ প্রতিবন্ধক,—লজ্জা, ধৈর্য্য, কুল, শীল, মানাদি সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া, বর্ষাভিসারাদিতে, যখন ঘন ঘটাচ্ছন্ন করকা ঝঞ্ঝাপাতের মধ্যে, ভীষণ ভুজঙ্গ ও হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে, ঘোর তিমিরে, দেহস্মৃতি হারাইয়া, একাকিনী উন্মাদিনীর ন্যায়, প্রাণকান্তের তরে পরিভ্রমণ করেন, তখন তাঁহারি দুর্ব্বার প্রেমের পরাক্রম অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া ওঠে; এবং তদবস্থায় সঙ্কেত কুঞ্জে সমাগত, তাঁহার জন্য তুল্য রূপ উৎকণ্ঠিত, প্রাণবল্লভ গোবিন্দসহ দুর্লভ মিলনের অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব মাত্র গোবিন্দগত-প্রাণ, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক ভক্তের অনুভব-বেদ্য,—তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মা স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

"তাবদ্‌রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহং।
তাবন্মোহোঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ, নতে জনাঃ।" ভাঃ—১০।১৪।৩৬

—'হে কৃষ্ণ, রাগাদি ততদিন পর্য্যন্তই চৌর এবং গৃহ তাবৎ পর্য্যন্তই কারাগৃহ, মোহও তাবৎ পর্য্যন্ত পাদশৃঙ্খল হইয়া থাকে,—যতদিন কেহ তোমার স্বজন হইতে না পারে।'

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান, বা রোষভরে, ভৎর্সনাদি করিলে তাহাতে তাঁহার পরমানন্দেরই উদয় হয়,—

'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥' (চৈঃ চঃ—১।৪।২৩)

'কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎর্সনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥' (চৈঃ চঃ—৩।২০।১৪৭)

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে মানভরে উপেক্ষা করিয়া অনুশোচনা করিতেছেন—

"রোখ তিমির এত বৈরীকি জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান॥" (বিদ্যাপতি)

অর্থাৎ, 'রোষ, বা ক্রোধরূপ তম, এত শত্রু তাহা আমি জানিতাম না, তাহাতে দুর্লভ রত্ন আমার কাছে গৈরিক (গিরিমাটি) বলিয়া প্রতীত হইল।'—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে তাঁহার ভাবী মিলনানন্দের ক্ষুধা বা প্রেম-পিপাসাই বর্দ্ধিত হয়, এবং ঐ সঙ্গে বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদের পর অভিনব 'কলহান্তরিতা' রসনির্য্যাস অস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণও তীব্র লালসান্বিত বা ব্যাকুল হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবা কেহ অধিকতর প্রীতি দ্বারা বশীভূত করিতেছে এই আশঙ্কা যখন কাহারও প্রাণে উদয় হয়, অমনি তাহার শ্রীকৃষ্ণ সেবাযোগ্য হইবার লালসা আরও প্রবলতর হয়। রাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার পদ-চিহ্নসহ শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়ায় ঈর্ষাভরে খেদ করিয়া বলিতেছেন—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" ভাঃ—১০।৩০।২৮

—'হে সখীবৃন্দ, এই নারী নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান হরির আরাধনা করিয়াছে; যে হেতু কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্নচিত্তে ইহাকে বিজন প্রদেশে লইয়া আসিয়াছেন।'

দ্বেষ প্রকাশেও গোপীদিগের প্রীতি-বিবর্দ্ধন আচরণই দৃষ্ট হয়—

"যে গোপী মোরে করে দ্বেষ, কৃষ্ণের করে সন্তোষ,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুই তার ঘরে যাইয়ে, তার সেবাদাসী হইয়ে
তবে মোর সুখের উল্লাস॥" চৈঃ চঃ—২।২০।৩৭

আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের অকৈতব-প্রেম, কাম বলিয়া অভিহিত লইলেও, উহা কদাচ প্রাকৃত কাম নহে—নতুবা, নারদ উদ্ধবাদি ভাগবতোত্তমগণ তাঁহাদের উদ্‌ভ্রান্তভাব দেখিয়া এতাদৃশ লুব্ধ হইতেন না এবং তাঁহাদের চরণ-ধূলি পাবার আশায় বৃন্দাবনের একটি গুল্মলতা হইবার আকাঙ্ক্ষাও জানাইতেন না। যথা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ॥" ঐ—১।২।২৫

অর্থাৎ—'ব্রজগোপরামাগণের প্রেমই—"কাম", এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে ; (কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ কাম নহে, যেহেতু) উদ্ধবাদি ভগবদ্‌ভক্তগণও এই প্রেম প্রার্থনা করেন।'

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি 'কাম'
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা, ধরে 'প্রেম' নাম॥" ঐ—১।৪।১৪১
"সহজে গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত-কাম।
কাম ক্রীড়াসাম্যে তাঁর, কহি কাম নাম॥" ঐ—২।৮।১৭৪
"কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেমত প্রবল॥ ঐ—১।৪।২৪২

শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাকৃত মদনের অধিকার নাই। তথায় পরমানন্দদায়ক অপ্রাকৃত মদন,—মদনমোহনের, নিত্যলীলা বিরাজমান্ ; প্রাকৃত মদন স্বয়ং তথায় স্তব্ধ ও বিমুগ্ধ—

"পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" ঐ,—২।৮।১১০

মদন স্বয়ং যে রূপ দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মদনমোহন রূপে বৃন্দাবনে বিরাজিত—কাম ত্রিভুবন বিজয়ী হইয়াও সেই অপ্রাকৃত রূপসাগরে ডুবিয়া যায় ; পরমানন্দ পরিতৃপ্ত কন্দর্প তথায় মাথা তুলিতে পারে না, তুলিতে চায়ও না। যাহাদের হৃদয়ে এই

মদনমোহন বিরাজ করেন, তাহাদিগের আর প্রাকৃত-মদনের দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হয় না।

এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরগণের আচরণাদিকে লৌকিক জগতের রীতি-নীতির সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিতে যাওয়া কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে।

মায়িক জগতে, প্রকৃত সুখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। ভ্রম বশতঃ যাহা সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র; যেহেতু এজগতে সমস্ত সুখই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী—নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ মাত্র; আর প্রেমের ধাম বৃন্দাবনে, কোন লীলা আপাতঃ দুঃখজনক মনে হইলেও তাহা সমস্তই সুখেরই নামান্তর, কারণ তথায় সমস্তই রসময় (রসঃ বৈ সঃ) নন্দ (আনন্দ) নন্দনের সহিত প্রেমময়ী গোপী-গণের প্রেমের খেলা—সে সমুদয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য পরস্পর প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন। সে ধামে সমস্ত লীলাই নিত্য— আবহমান হইতে চলিতেছে এবং আবহমান কাল পর্য্যন্ত চলিবে। একদিনের একটি বিচিত্র মধুর লীলা আস্বাদন করিলেই ইহা পরিস্ফুট হইবে।—

একদা নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সঙ্কেত-কুঞ্জে যাইতেছেন। পথিমধ্যে চন্দ্রাবলীর প্রধানাসখী ভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, অপ্রতিভ হইয়া নিজ ভাব গোপন করতঃ, অনিচ্ছাপূর্ব্বক চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করিলেন। তথায় আমোদ প্রমোদ এবং উৎকণ্ঠার সহিত নিশিযাপন করিয়া. নিশিশেষে চন্দ্রাবলী সামান্য নিদ্রিত হইলে, অন্ধকারে ভুলক্রমে (?) চন্দ্রাবলীর নীলশাড়ী পরিধান করিয়া, নিদ্রাবিশূন্য উৎকণ্ঠিতা রাধার কুঞ্জদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় বহু চাটুবাক্যে, সমস্ত ঘটনা গোপন করিয়া, রাধার চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াও, কোন প্রকারেই তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে অসমর্থ হওয়ায়, পরিশেষে প্রত্যাখাত হইয়া, বাষ্পাকুললোচনে কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া রাধাকুণ্ডের

তীরে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া, 'রাধার' নাম গ্রহনান্তর, রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নাগর অশ্রুসিক্ত নয়নে, বিষণ্ণ মনে, কুঞ্জ হইতে চলিয়া যাওয়ায়, শ্রীমতীর বিরহানল প্রদীপ্ত হইল এবং কান্তের উপর নিদারুণ মান করার জন্য, বহুতর আক্ষেপ ও কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বৃন্দারাণী প্রিয় সখীকে আশ্বাস দিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে রাধাকুণ্ডতীরে ধূলিধূসরিত ও ক্রন্দনরত দেখিয়া, নিজ ভাব গোপন করতঃ, শ্রীকৃষ্ণের কাতর অনুনয়েই যেন, দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে নিকুঞ্জে আনয়ন করিল, এবং পুনরায় রাধার চরণ ধারণ ও বহু মিনতি করাইয়া, মানিনীর মান ভঞ্জন করতঃ উভয়ের মিলন সংসাধন করিল।

এই ভাবে শ্রীরাধিকার 'অভিসার' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'বাসক শয্যা', 'উৎকণ্ঠা'য় সারা নিশি জাগরণ, নিশিশেষে রতিচিহ্নসহ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে 'খণ্ডিতা', তৎপরে 'কলহান্তরিতা' ও 'মানভঞ্জনা'দি সমাপনান্তে, নাগরেন্দ্র 'আসর জমকাইয়া' শ্রীমতী রাধা ও সখীগণসহ উল্লাসভরে রঙ্গরস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে নিশিশেষে চন্দ্রাবলী জাগরিত ও চকিত হইয়া, বল্লভকে পার্শ্বে না দেখিয়া, ভদ্রা ও শৈব্যা প্রভৃতিকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেন। চতুরের শিরোমণি কৃষ্ণকে বেশ একটু শিক্ষা দিবার ও বিপক্ষীয়াগণের আনন্দের বিঘ্ন উৎপাদন মানসে, ঈর্ষান্বিত হইয়া ভদ্রা গর্ব্বভরে রাধার কুঞ্জাভিমুখে গমন করিল। যাইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ-ত্যক্ত বসন ও চন্দ্রাবলীকে প্রদত্ত মালাটি সঙ্গে লইয়া রোষভরে, দ্রুতগতিতে অতর্কিত ভাবে, রাধার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সমাগত হইয়া, বিদ্রূপ করতঃ বলিতে লাগিল— "হে হরি! এই যে ধূর্ত্ত, লম্পট এখানে,—লুকিয়ে পালিয়ে আসা হয়েছে,—তা বেশ! এখন একটা খপর জানতে এলাম,—আমাদের প্রিয় সখীকে রাত্রে আলতা পরাইয়া খুপিটা কোথায় রাখা হয়েছে?

আর একটা কথা,—নিজের কাপড়টা ফেলে, আমাদের সখীর শাড়ীটা পরে পালিয়ে আসা হয়েছে। দাও, ঐ শাড়ী দাও, আর এই লও তোমার কাপড়, এই বলিয়া সজোরে উহা শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—আরও একটা কথা, আমাদের সখি বলে পাঠাইলেন,—'এর পর যদি নিজে মালা গাঁথিতে পারত মালা দিও, নতুবা অপরের-গাঁথা মালা (এই মালাটি রাধা সযতনে স্বয়ং গাঁথিয়া, সঙ্কেতকুঞ্জে আমন্ত্রণের সময়, ললিতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন) কদাচ দিবে না'— এই বলিয়া এবং আরও বহু প্রকার শাসাইয়া মালাটি শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে সজোরে নিক্ষেপ করতঃ, আর কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, রোষ ও গর্ব্বভরে তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ইহার ফলে, তখন সখী সমাজে সকলের মনে কি বিপর্য্যয় ঘটিল তাহা সহজেই অনুমেয়।—শ্রীকৃষ্ণতো ভদ্রাকে হঠাৎ দেখিয়াই চমকিত, সন্ত্রস্ত; তৎপরে ঐরূপ দারুণ ভৎর্সনা শুনিয়া, অতীব ক্ষুব্ধ, লজ্জিত ও ভীত মনে, হেটমুণ্ডে, নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।— আবার শ্রীমতী রাধা ও সখীগণ প্রথমে চমকিত ও হৃষ্ট, পরে নাগরের 'কীর্ত্তিকলাপ' সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় লজ্জিত, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট ও অভিমানিনী হইল, তৎপরে এই সংবাদ যখন অপরাপর সমস্ত সখীগণের নিকট পৌঁছিল তখন সপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃদ্পক্ষ ও তটস্থপক্ষ,—বিভিন্ন ভাবাপন্ন সখীগণের বিভিন্ন প্রকার ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল এবং এই বিচিত্র লীলাবলীর সংযোগকর্ত্রী পৌর্ণমাসীর (যোগমায়া দেবীর) যখন শ্রুতিগোচর হইল, তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না আবার ইহাতেই কি এই মধুর লীলার পরিসমাপ্তি ঘটিল!—ভদ্রা প্রস্থান করা মাত্র, শ্রীমতী ও সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে রোষভরে—'শঠ, লম্পট, 'শত-ঘরিয়া', কপট, নির্লজ্জ, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, চোর, ডাকাত, সর্ব্বস্বহারী, মিথ্যাবাদী, কুটিল, কুহক, ধূর্ত্ত, গণ্ডমূর্খ (মুরখরাজ), (ধর্ম্মশাস্ত্রে) দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কি আর বলিব '—ধিক্ ধিক্ তোরে শত ধিক্',—এই প্রকার যাহার

মুখে যাহা আসিল, সে তাহাই বলিয়া, নানা প্রকার ভর্ৎসনা ও গঞ্জনা দিতে লাগিল। তখন রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি নীরবে, পুলকিত অন্তরে, মাথা হেঁট করিয়া, তৎসমস্ত আনন্দভরে শ্রবণ করতঃ, মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে বিশ্ববিমোহন-চাহনি চাহিয়া, একটু মধুর হাস্য করিলেন! —অমনি তাহাতে তাহারা সকলে মুগ্ধ হইয়া, সমস্বরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সেই হাসির হিল্লোলে তাহাদের সকল গর্ব্ব, সকল অভিমান, ক্ষোভ, রাগ, দ্বেষ কোথায় ডুবিয়া গেল!

এইরূপে তখন সমগ্র বৃন্দাবনে সখীমহলে বেশ একটা বিমল আনন্দের তুফান বহিয়া গেল। এই প্রকার মধ্যে মধ্যে বাহ্যিক নানা প্রকার ভাব বৈচিত্র্যের সমাবেশ হইলেও, তাহাদের অন্তরে নিরন্তর একটা না একটা আনন্দ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য ঘটে।—বস্তুতঃ, ইহাতে কাহার যথার্থ মর্ম্মপীড়াদায়ক কিছুই ঘটে না। এই আনন্দময় ধামে নিত্যই নব নবায়মান আনন্দ হিল্লোলের, একটা না একটা, অভিনব তরঙ্গের উদ্ভব হয় মাত্র।

এইতো গেল রসের দিকের কথা। আবার তত্ত্বের দিক দিয়া দেখি, —ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা, আচরণাদি বাহ্যতঃ বিসদৃশ দেখাইলেও, তত্ত্বতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। এই অনিত্য মায়িক জগতে, মায়ামুগ্ধ জীব, জাগতিক ব্যাপারে, দেহে—অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে—মমতা বুদ্ধি প্রযুক্ত, যাহা কিছু বলে বা আচরণ করে, তৎ সমস্তই মায়িক, বা মিথ্যা। তাহার মধ্যে পারমার্থিক কোনই সত্য নাই। দেহ-গেহাদি সমস্তই যখন জড় ও অনিত্য, তখন চৈতন্য-স্বরূপ চিৎকণ জীবের সহিত তত্ত্বতঃ দেহাদির কোনই সম্পর্ক নাই; এইহেতু আমি ক্ষুধিত, আমি পীড়িত, আমার গৃহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, ইত্যাদি যাহা কিছু বলি সমস্তই তত্ত্বতঃ মিথ্যা। আবার নিত্য-সত্য-স্বরূপ চিদানন্দময় ভগবান যাহা কিছু বলেন, বা করেন, তাহার কোনটিই মিথ্যা হইবার নহে।

পরাৎপর ভগবানের 'পর' কে আছে যে, পরের দ্রব্য চুরি করিবেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন সবই তাঁর, তখন তিনি কারই বা দ্রব্য চুরি করিবেন! তদ্রূপ ভগবানের আবার 'পর'কে, যে পরদার গমন করিবেন! তিনি সর্ব্বঘটে অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান; বৃন্দাবনে প্রকট হইয়া তিনিই সাক্ষাৎ সেবা গ্রহণ করিতেছেন এইমাত্র প্রভেদ।

মৃদ্‌ভক্ষণ লীলায় তিনি যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করেন নাই বলিয়াছেন তাহাও কদাচ মিথ্যা নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখ বিবরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া বোঝাইলেন যে, তাঁহার ভিতরেই যখন অখিল ব্রহ্মাণ্ড, তাহার বাহিরে যখন কিছুই নাই, তখন তিনি আবার ভক্ষণ করিলেন কিরূপে! বাহিরের বস্তু মুখের ভিতর দিলে তবেত ভক্ষণ,—তাহা এক্ষেত্রে যখন অসম্ভব, তখন তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে তিনি মৃত্তিকা ভক্ষণ করেন নাই।

আবার, 'গোপাল-তাপনী' শ্রুতিতে দেখি,—যমুনার অপর পারে অবস্থিত দুর্ব্বাসা মুনির জন্য ভোজন-সামগ্রী লইয়া যাইবার সময়, কি ভাবে গোপীগণ যমুনা পার হইবেন, শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—' "কৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী", এই বাক্য বলিলেই যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন।'—গোপীগণ উহা শ্রবণ করিয়া বিদ্রূপাত্মক উপহাস করিলেও, যমুনাকে উহা বলাতে সত্যসত্যই তিনি পথ প্রদান করিলেন! আপ্তকাম, আত্মারাম, অচ্যুত যে প্রকৃতই ব্রহ্মচারী তাহাতে আর সন্দেহ কি। এইরূপ সত্যব্রত, সত্যসঙ্কল্প, সত্যস্বরূপ ভগবানের সকল আচরণ, সকল সঙ্কল্প, ও সকল কথাই, ত্রিকাল সত্য।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, তাহা হইলেও তিনি লৌকিক দৃষ্টিতে এরূপ লোক-বিগর্হিত পরদারাভিমর্ষনাদি বিসদৃশ আচরণই বা করেন কেন? তাহাতে শুকমুনি বলিলেন—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥" ভাঃ—১০।৩৩।৩৬

—'শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধানার্থ মনুষ্যদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক তাদৃশী ক্রীড়া সমূহ ভজনা করেন, যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর হইয়া থাকে।'

ভক্ত-চিত্ত-বিনোদনার্থ ভগবান এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তদের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় এবং তৎসঙ্গে যাঁহারা উহা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন তাহাদেরও চিত্ত ঐ সকল লীলাতে আকৃষ্ট হওয়ায়, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী আপন অপ্রন স্বরূপানুবন্ধী সেবাকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হয়, ও পরিণামে তাঁহারা পরাভক্তি, বা প্রেমলাভ, করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

সাধারণ লৌকিক বিধি ব্যবস্থা মত বিবাহাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়াদের সহিত রাসাদি লীলা করিলে, উহা কদাচ এতাদৃশ চিত্ত-বিনোদকরূপে প্রতিভাত হইত না এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদিগের (বা ভগবানের জন্য ভক্তের) লজ্জা, ধৈর্য্য, কুল, শীল, মান,—এমনকি কুলকামিনীর দুস্ত্যাজ্য পতি-পরিত্যাগ-রূপ, "সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের", নিরুপম দৃষ্টান্তও জগতে প্রদর্শিত হইত না; আবার কৃষ্ণগতপ্রাণা প্রেমোন্মাদিনী গোপীদিগের শ্রীচরণ-ধূলি পাইবার জন্য নারদ-উদ্ধবাদিরও এতাদৃশ তীব্র লালসা জাগ্রত হইত না।

এই পরকীয়া ভাব না থাকিলে শ্রীরাধার মুখে কদাচ—

'জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' (বিদ্যাপতি)

—ইত্যাদি, রূপ চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠা সম্ভব হইত না। যতক্ষণ তীব্র ক্ষুধা ততক্ষণই ভোজনানন্দ; পরকীয়াতে নিরন্তর বিচ্ছেদাশঙ্কা, একারণ নিত্য-নব মিলনানন্দ,—"অনুদিন বাড়ল, অবধি না গেল", এবং এজন্যই—

'দুঁহু ক্রোড়ে, দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ লাগিয়া।
তিল এক না দেখিলে, যায় যে মরিয়া ॥'
'এমন পিরিতি কভু না দেখি না শুনি।
নিমিষে মানয়ে যুগ, কোড়ে দূর মানি ॥' (মহাঃ পদাঃ)

এইরূপ অনুপম ভাবের অভিব্যক্তি—এরূপ অপূর্ব্ব মিলনানন্দ মাধুর্য্য, স্বকীয়াতে কদাচ সম্ভবে না। এজন্য কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥' চৈঃ চঃ—১।৪।৪২

এই অপূর্ব্ব রস আস্বাদনের জন্যই, ভগবৎ ইচ্ছাতেই, বৃন্দাবনে যোগমায়া কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব সমাবেশ—

'মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥' চৈঃ চঃ—১।৪।২৬

আর এক কথা,—সাধারণে যদি কেহ কোন অপকার্য্য করে, তাহার মূল কারণ,—কাম ক্রোধাদির বেগ সম্বরণ করিতে না পারাতেই, অগম্য-গমন, বা অবাচ্য-বচন বলিয়া থাকে ; কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তাহা কদাচ প্রযোজ্য নহে। তিনি যে আপ্তকাম, আত্মারাম—সদা স্বানুভাবানন্দে বিভোর ;—তবে তিনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু এবং তাঁহার চিরদিনের (গীতা—৪।১১।১১) প্রতিজ্ঞা—

'আমাকেত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
আমি তারে ভজি তৈছে, এ মোর স্বভাবে ॥' চৈঃ চঃ—১।৪।১৮

—এই জন্যই তাঁর এই মধুর প্রয়াস। উক্ত গোপীদিগের মধ্যে অনেক ঋষিপূর্ব্বা, দেবীপূর্ব্বা ও শ্রুতিপূর্ব্বা ছিলেন। তাঁহারা এইভাবে গোবিন্দসহ মিলনের তীব্র লালসায় জন্মান্তরে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া ভগবান তাঁহাদিগকে কৃতার্থ

করিলেন এবং জগৎকে রাগমার্গীচিৎ ভজনের পথ দেখাইলেন। নতুবা, তাঁহার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এরূপ লোক বিগর্হিত আচরণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎস-হরণ-কালে, তিনি যখন নিজেই গোবৎস, গোপবালকাদি হইয়া বিবিধ লীলা করিলেন, এবং রাসলীলাতেও তিনি কোটি কোটি ব্রজাঙ্গনার কাছে কোটি কোটি কৃষ্ণ হইয়া রাস বিহারাদি করিলেন, তখন ইচ্ছা করিলে তিনি কি নিজেই কোটী কোটী গোপী হইয়া কোটী কোটী কৃষ্ণ সহ বিহার করিতে পারিতেন না?

আর এককথা,—সাধারণ কর্ম্মপরতন্ত্রহীন মহাপুরুষগণ,—'ঈশ্বর'গণই যখন কর্ম্মাকর্ম্মের পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়েন না, তখন বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের যে ইহাতে কোন পাপস্পর্শ হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু, যাঁহার নাম গুণ কীর্ত্তন, বা চরণকমল স্মরণ করিয়া, অতি-বড়-দুরাচারীও সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত, হইয়া অখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করে, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবার কর্ম্মবন্ধন কোথায়? বস্তুতঃ, বৃন্দাবনের এই মধুর লীলা, চিদানন্দময় রসরাজ ভগবানের সহিত চিদানন্দময়ী মহাভাব-স্বরূপা গোপীদিগের অপ্রাকৃত মধুর মিলন।

পঞ্চভূতাত্মক জড় দেহের সহিত কদাচ অপ্রাকৃত চিন্ময় গোবিন্দের মিলন সম্ভবপর নহে। রাসলীলাদি স্থূল মায়িক দেহের ব্যাপার হইলে, ঐটুকু সঙ্কীর্ণ স্থানে, যমুনাপুলিনে কদাচ তিনশত কোটি গোপীর সমাবেশ হওয়াই সম্ভবপর নহে। (সমগ্র পৃথিবীর লোক সংখ্যা ইহা হইতে ন্যূন।) অতএব উহা সাধারণ লৌকিক ব্যাপারের সহিত কদাচ তুলনার যোগ্য নহে। ইহার ভিতর আরও একটি চমৎকার রহস্য নিহিত রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের রাসলীলার সমকালেই, তাঁহাদের পতিগণ যোগমায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাহাদের পত্নীগণকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিতেন। শুকদেব গোস্বামীর এই উক্তির দ্বারাই রাসলীলার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইল এবং সমস্ত সংশয়ের নিরসন হইল।

অধিকন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, এই অপ্রাকৃত লীলায় লৌকিক ব্যবহারিক জগতের কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে;—যে ভুবন পাবনী-লীলা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ, বা বর্ণন করিলে, পরাভক্তি লাভ হইয়া অচিরাৎ কামরূপ হৃদ্‌রোগ সমূলে উৎপাটিত হয় বলিয়া ফলশ্রুতি; আজন্ম-তত্ত্বধ্যাননিরত পরম-ভাগবত মহামুনি শুকদেব গোস্বামী, প্রায়োপবিষ্ট আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিৎ ও ঋষিগণ সমক্ষে, স্বয়ং পুলকভরে যাঁহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহা মহাপ্রভু, গম্ভীরার নিভৃত কক্ষে প্রকট-লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর, দিব্যোন্মাদ অবস্থায়, স্বয়ং আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন;—সেই লীলা যে কত পবিত্র, কত মহীয়ান্ তাহা একমাত্র ভাগ্যবান পরম ভাগবতগণেরই অনুভববেদ্য,—তাহা কদাচ ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। আমরা পরে এই রাসলীলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভগবানের নরলীলা রহস্য উদ্‌ঘাটন মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। তিনি কৃপা করিয়া যদি কোন দিন কাহাকেও বুঝাইয়া দেন তবেই তাহার বোধগম্য হয়, নতুবা নহে—ইহা তাঁহার একান্ত কৃপাসাপেক্ষ।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"যখন তিনি যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেইরূপই আচরণ করেন। লীলা সময়ে তাঁর আপন মায়াশক্তি দ্বারাই তিনি আপনাকে আপনি আচ্ছন্ন রাখেন,—যেমন গুটিপোকা আপন সূতায় আপনি আবদ্ধ হয়। তাঁর লীলা কি বুঝবার সাধ্য আছে?—শুধু তাঁর কৃপা।"

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৩য় খণ্ড, ৯৮ পৃঃ)

"...সাধকেরা প্রথম এই ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করেন। অবতার তত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে, বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় 'আহা! উহু! গেলামরে, মলামরে,'—বলে চীৎকার করে ছট্‌ফট্ করছেন, শোকেতে অস্থির হয়ে—'কোথা গেলরে, কোথা গেলে পাবরে', বলে কেঁদে কেঁদে দেশ দেশান্তরে

পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন! কখনও ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন, কখনও বা পিপাসায় অস্থির হচ্ছেন!—ইনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্যাগী, আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ—পরমেশ্বর; ইহা মনে করা, বিশ্বাস করা, কি তামাসার কথা! তিনি যাঁকে দয়া করেন, সেই মহাভাগ্যবানই-মাত্র তাঁকে বুঝিতে পারেন, না হলে কারো সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রহ্মার (গো-বৎস হরণের কালে, ব্রহ্ম মোহন লীলায়) এতে সংশয় হয়েছিল।…ভগবানের নরলীলা, তাঁর কৃপা না হ'লে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও বুঝ্‌বার যো নাই; মানুষের আর কথা কি?" (ঐ—১০২ পৃঃ)

শ্রীশ্রীরাসলীলা

প্রশ্ন ঃ—ভগবানের পরদারাভিমর্ষণরূপ লোক-বিগর্হিত রাস-লীলার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর ঃ—কোন গভীর তত্ত্বসম্বলিত প্রসঙ্গের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে আন্তরিক প্রয়াস থাকিলে, বিশেষ শ্রদ্ধালু হইয়া ঐ প্রসঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের, দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে অনুধাবন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই পরম নিগূঢ় রাসলীলা তত্ত্বটি—অতীব গভীর, অতীব গুহ্য এবং অতীব রহস্যময়। এই তত্ত্বের সবিশেষ আলোচনার পূর্ব্বে, এই লীলা প্রসঙ্গ কোথায়, কখন, এবং কাহার দ্বারা, কি উদ্দেশ্যে, কাহাকে বর্ণনা করা হইয়াছিল,—তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন; নতুবা, পদে পদে বিষম ভ্রমে পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

আমরা দেখিতে পাই, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, পরমভাগবত, মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ মহাশয় সপ্তাহান্তে (তন্মধ্যে রাসলীলা প্রসঙ্গের পূর্ব্বেই পাঁচদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে), তক্ষক দংশনে অবধারিত মৃত্যু, ব্রহ্মশাপ গ্রস্ত, গঙ্গোপকূলে প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগে

কৃত-সঙ্কল্প, এবং ব্যাস নারদাদি প্রমুখ দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণ, একান্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে তথায় সমাগত, ও সকলেই, পরমহংস চূড়ামনি, নিরন্তর তত্ত্ব-ধ্যান-নিরত, স্বানুভাবানন্দ-বিভোর, চিরব্রহ্মচারী, দিগম্বর, বৈরাগ্যের প্রকট-মূর্ত্তি, ভকতগণ-মুকুটমণি, পরমকৃপালু, শ্রীশ্রীশুক-মুখ-কমল-নির্গলিত আত্যন্তিক ক্ষেমকর, ভুবন-পাবনী ভাগবত লীলা-কথা-শ্রবণে একান্ত সমুৎসুক ;—এতাদৃশ অপূর্ব্ব দেশকাল পাত্র সমাবেশে কিরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা হওয়ার সম্ভাবনা তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বাহ্নে এই সকল নিগূঢ় তথ্য সম্যক্ অনুধাবন না করিয়া, এই পরম রহস্যময় রাসলীলা প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী ও প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের রাসলীলা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিই আমার প্রধান অবলম্বন ;—স্থানে স্থানে তাঁহাদের ভাব এবং ভাষা ও উদ্ধৃত হইয়াছে, এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী-পাদের চরণপ্রান্তে বসিয়া বহুদিন যাবৎ ধারাবাহিকরূপে রাসলীলা সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করিবার আমার সৌভাগ্য ঘটিয়া ছিল,—ইহাতেও আমি এই প্রবন্ধটি লিখিবার বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

আচার্য্যবর শ্রীজীব গোস্বামীপাদ **রাসের লক্ষণ** এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য নর্ত্তকীর মধ্যে যদি কোন নট নৃত্য করে, তাহা হইলে সেই নৃত্যকে "হল্লীষক" নৃত্য বলে। উহা যদি বিবিধ তালমান ও গতি সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাসনৃত্য বলে। এই রাস-নৃত্য স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, পৃথিবীর কোনও ব্যক্তির কথাতো স্বতন্ত্র।

শ্রীভগবান মৎস্য-কূর্ম্ম-রাম-নারায়ণ আদি মূর্ত্তিতে অনন্ত লীলা করেন সত্য, কিন্তু কোন মূর্ত্তিতেই একাধিক প্রেয়সীর সহিত সম্বন্ধ রাখেন না; সুতরাং সেই সেই মূর্ত্তিতে রাসের কল্পনা বা সম্ভাবনা সমীচীন নহে ;

অথবা, চৌষট্টি যোগিনী-সহ, মা কালীর নৃত্য ; বা, ভূত-প্রেতাদির সহিত মহাদেবের নৃত্য ; বা হনুমান, জাম্বুবানের সহিত, রাবণ বধের পর, শ্রীরামচন্দ্রের নৃত্যাদিকে রাস-নৃত্য বলা যায়না। একমাত্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অগণিত গোপরমণীর সহিত এই রাস নৃত্য করিয়া থাকেন ; এবং এই লীলা একমাত্র তাঁহারই নিজস্ব।

'রসানাং সমূহো রাসঃ'—রাসলীলায় সমস্ত রসের উৎস প্রসারিত হয়, এই জন্যই রাসলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রাসলীলায় লক্ষ্মীর বা মহিষী-দিগের অধিকার নাই! সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বৈদগ্ধাদিতে পরিপূর্ণ, নিখিল রমণী কুলের শিরোমণি, নিত্য-কিশোরী, ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে অখিলরসামৃত-মুর্ত্তি পুরুষকুল-শিরোমণি নিত্য-কিশোর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের রাসলীলাতেই নিখিল বিলাস-বৈচিত্র্যের ও নিখিল রস-বৈচিত্র্যের নির্ব্বাধ, পূর্ণতম অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে। অন্যধামে, বা অন্য লীলায়, এরূপ পূর্ণতম বিকাশের একান্ত অভাব। শ্রীকৃষ্ণই নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—'যদ্যপি আমার নানাবিধ মনোহারিনী প্রচুর লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলা স্মরণ করিলে আমার মন যে কীদৃশ ভাবাপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না।'—(বৃহৎ বামন পুরাণ)

'রাস শব্দের যৌগিক অর্থ—'পরম রসময়ী লীলা ;—যে লীলায় নৃর্ত্য, গীত, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি রসসমূহ আছে তাহাই রাসলীলা।

এই রাসলীলার নায়িকা গোপীগণ মধ্যে, নিত্য-সিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সহচরীবর্গ প্রভৃতিকে নিত্য-সিদ্ধা বলা যায় ; এতদ্ভিন্ন পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও শ্রীমৎ ভাগবতে দেখা যায়—দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, এবং স্বর্গবাসিনী দেবকন্যাগণও, গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন,—ইহারা সাধন-সিদ্ধা। অতএব সাধন-সিদ্ধা গোপীগণকে ঋষি-পূর্ব্বা, শ্রুতি-পূর্ব্বা ও দেবী-পূর্ব্বা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই রাসলীলা,—

ভগবানের মধুররসাশ্রিত গোপীগণের সহিত চরম পরম পবিত্র মধুর প্রেমের মিলন,—উহা কদাচ প্রাকৃত কাম-ক্রীড়া নহে।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা প্রাকৃত 'কাম' ও গোপীদিগের 'প্রেম' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।—শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু একস্থানে বলিয়াছেন,—"কাম শারীরিক গুণের সান্নিধ্য। বহির্মুখ থাকিলেই —'কাম'; শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়িলেই —'প্রেম';—তখন আত্মার অঙ্গ অথবা আত্মা।"

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৫ম খণ্ড, ৯৯ পৃঃ)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"কাম ক্রোধ ইহারা সাধারণতঃ রিপু হইলেও, প্রভুর সেবায় লাগাইলে ইহারাই আবার পরম হিতকারী বন্ধু।"

শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ আত্মহারা মমতাই শাস্ত্রে 'প্রেম' নামে অভিহিত। 'কাম' মনের বৃত্তি, বা বাসনা, কিন্তু 'প্রেম' মনোবৃত্তি বা বাসনা নহে, উহা একনিষ্ঠ, উহা আত্মার বৃত্তি। কাম ও প্রেম উভয়েরই আনন্দলিপ্সা বলবতী, কিন্তু কাম প্রাকৃত পদার্থের আশ্রয়ে আনন্দ ভোগ করিতে চায়; পরন্তু, প্রেম পদার্থের অপেক্ষা না করিয়া বিমল আনন্দই আস্বাদন করিতে অভিলাষী। প্রেম বা আনন্দলিপ্সাই জীবের আত্মগত স্বরূপ-ধর্ম্ম; কেবল কামের কুহকে পড়িয়া ক্ষণভঙ্গুর সুখে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সচ্চিদানন্দময় ভগবান তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি নামক নিজ প্রেমাংশ দ্বারা নিত্যই নিজানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন। একমাত্র আনন্দই জীবের উপজীব্য, ভূতের সন্তোষ সাধনই ভূতময় দেহের উদ্দেশ্য হইলেও, নিত্যাস্বাদিত নিত্যানন্দ আস্বাদনের বলবতী বাসনা তাহাদের অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর জল প্রবাহের ন্যায় অস্পষ্টরূপে নিরন্তর বহিয়া যায়।

ভূতময়-শরীরস্থ মন সর্ব্বদাই আনন্দের আশায় পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে গমন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে

না, হইবারও কথাও নয় ; কারণ, প্রকৃত নিত্য-শরীর নয়, আত্মা, যাহা —'নিত্য-আনন্দ', চাহিতেছে তাহা পাইতেছে না। জীবের স্বরূপতঃ যে আনন্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ, সেই আনন্দই তাহার উপজীব্য, তাহা অতীব মোহাচ্ছন্ন হইলেও, জীব একেবারে ভুলিতে পারে নাই। আনন্দই ব্রহ্ম, সেই আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি। অতএব জীবের স্বাভাবিক অনুরাগ কেবল আনন্দের উপরেই, চিদানন্দময় দেহে সেই নিত্য আনন্দের অভাব হইলে, পার্থিব বা স্বর্গীয় কোন পদার্থই তাহা পূরণ করিতে পারে না। সকলেই স্বরূপতঃ ঐ প্রেমের কাঙ্গাল,—যে যাহা চায় আনন্দের আকর্ষণেই চায় ; কেহ পুত্র কামনা করিতেছে, কেহ পত্নী কামনা করিতেছে, কেহ ধন কামনা করিতেছে ; কিন্তু একমাত্র আনন্দেরই পিপাসা সকলেরই। আবার, একই ব্যক্তি একবার পুত্র কামনা, একবার পত্নী কামনা, একবার ধন কামনা করিতেছে ;—ইহার কাম্য পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু প্রেমের বিষয়—আনন্দ, পরিবর্ত্তিত হয় না। সেই আনন্দ-লিপ্সা পত্নী কামনা, পুত্র কামনা, ও ধন কামনার মূলে সর্ব্বদা সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনীয় পদার্থ কামনার নাম—"কাম" এবং অপরিবর্ত্তনীয় অবিচ্ছিন্ন নিত্য-আনন্দ-লিপ্সার নাম—"প্রেম।"

এখন আমরা বুঝিলাম,—প্রেম নিত্য, কাম আগন্তুক ; প্রেম অপ্রাকৃত ও আনন্দ বিষয়ক, কাম প্রাকৃত ও পদার্থ বিষয়ক। প্রাকৃত পদার্থে আনন্দ নাই, জীব মোহবশতঃ ধনপুত্রাদির কাছে আনন্দ পাইবার অভিলাষ করে, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যখন সংসারের নেশা ছুটিয়া যাইবে, তখন আপনাকে আপনি চিনিতে পারিবে, আপনার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে,—কে আমি, এবং আমারই বা কি, তাহা জানিতে পারিবে। তখন বুঝিতে পারিবে,—আমি অস্থিমাংসময় দেহ নহি,—আমি চিদানন্দ-কণা, চিদানন্দ-সাগরের সাথে—আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত, মিলিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত,

কৃতার্থ, শান্ত। যেমন কোন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি মোহবশতঃ একটি সুশীতল জলপূর্ণ নিশ্ছিদ্র কুম্ভের গাত্র মাত্র লেহন করিতে থাকে, বা কভু বক্ষে, কভু ললাটে, কভু অপর অঙ্গে, বিশেষ আগ্রহ সহকারে বহুবার ধারণ করিয়া—'আঃ! আঃ!' করিয়া বৃথা তৃষ্ণা নিবারণের ভাব প্রদর্শন করিলেও, কোন ক্রমেই তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, বরং ব্যাকুলতাই বৃদ্ধি পায়;—তখন ঐ অবস্থার মর্ম্মজ্ঞ কোন দয়ালু ব্যক্তির উপদেশে ঐ কুম্ভ ছিদ্র করিয়া জলপান করিলে তবে তাহার তৃষ্ণার প্রকৃত উপশান্তি হয়; তদ্রূপ, মায়িক জগতের মায়িক পুত্র-কলত্রাদি (আবৃত-ব্রহ্ম) বক্ষে ধারণ করিয়া জীবাত্মা যখন চির আকাঙ্ক্ষিত, বিমল-নিত্য-আনন্দ লাভে বারম্বার ব্যর্থ মনোরথ হয়, তখন সৌভাগ্যক্রমে সাধু-গুরু-মহতের কৃপায় অনাবৃত-ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা-নন্দের সন্ধান পাইয়া জীব কৃতার্থ হয়। ঐ আনন্দসাগরে মিলিবার জন্য জীবের নিত্য অন্তর্নিহিত অস্ফুট ব্যাকুলতাই—'প্রেম'। নরলোকে সেই কাম-গন্ধহীন বিশুদ্ধ-প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্যই প্রেমরূপিণী গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আনন্দঘন-মূর্ত্তি মদনমোহনের এই অপূর্ব্ব রাসলীলা—

> 'চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মনমথে, নাম ধরে মদনমোহন।
> জিনি পঞ্চশরদর্প, স্বয়ং নব-কন্দর্প, রাস করে লইয়া গোপীগণ॥'
>
> (চৈঃ চঃ—২।২১।১২৭)

প্রাকৃত মদনের প্রলোভনে পড়িয়াইত মন চঞ্চল হইয়া প্রাকৃত ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য লালায়িত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে; পরন্তু, যদি ঐ 'মনোরথে' মদনমোহনকে চড়াইয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রাকৃত মদন আর সেখানে ঘেঁষিতে পারে না, তাহার সকল দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।—ক্ষীর-সর-রাবড়ির আস্বাদন পাইলে, আর চিটে-গুড়ের জন্য কেহই লালায়িত হয় না; তদ্রূপ অপ্রাকৃত নবীন-মদনের বা মদনমোহনের দর্শন-স্পর্শনাদি আনন্দের আস্বাদ

পাইলে, প্রাকৃত ভোগবাসনার জন্য মন আর কদাপি চঞ্চল হয় না। তখন চিত্তবৃত্তি সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীগোবিন্দেতেই নিরোধ, বা চির-নিবিষ্ট, হইয়া থাকে। উহাতে প্রাকৃত পদার্থ অবলম্বনে কাম্য সুখের, বা কামনার, গন্ধ মাত্র নাই। কবিরাজ গোস্বামী 'কাম' ও 'প্রেমের' স্বরূপ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

'গোপীগণের প্রেম—'অধিরূঢ়-ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম,—কভু নহে কাম॥' (ঐ—১।৪।১৬১)

যথা, গৌতমীয়তন্ত্র বচন—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

—'গোপরামাদিগের প্রেমই, কাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কাম নহে;—পরম ভাগবত উদ্ধবাদিও গোপীদিগের এই প্রেম বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।'

'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য—হয় প্রেমতো প্রবল॥
তুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন-ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥' (১।৪।১৪১-১৪৫)

'কাম' ও 'প্রেম'—এই উভয়েরই ধাতুগত অর্থ—"প্রীতির ইচ্ছা।" এই তুই রকমের প্রীতির ইচ্ছার মধ্যে নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা তাহা সংকীর্ণ ও অনুদার; সুতরাং নিন্দনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য;

আর কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহা যে অত্যন্ত ব্যাপক, অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়।—একটি ইচ্ছা কেবল নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, অপরটি বিভুবস্তু, শ্রীকৃষ্ণের সুখে পর্য্যবসিত। অধিকন্তু, কৃষ্ণপ্রীতি ইচ্ছারূপ প্রেম, প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে,—উহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বিশেষ; সুতরাং, উহাও অপ্রাকৃত চিন্ময়, পরম বিশুদ্ধ, স্বসুখ-কামনারূপ মলিনতা শূন্য। কাম-ক্রীড়ার সহিত প্রেম ক্রীড়ার অনেকটা বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গোপী-প্রেমকে কাম বলা হয়; কিন্তু প্রেম স্বরূপতঃ কাম নহে। কাম প্রাকৃত মায়াশক্তির বৃত্তি, আর প্রেম অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তির (চিচ্ছক্তির) বৃত্তি।

প্রেম কীদৃশ দুর্লভ নিরুপম নিধি, 'রাধামাধবোদয়' গ্রন্থের একটি লীলা বর্ণনার দিগ্‌দর্শনে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।—একদিন শ্রীমতীর মনে সাধ হইল আপনি অভিসারে না গিয়া তাঁহার প্রিয়সখী ললিতাকে বিলাসকুঞ্জে পাঠাইবেন। নিজ হৃদ্‌গত ভাব গোপন করিয়া, এবং ললিতাকে কিছু না জানাইয়া, তাহাকে অতি মনোহর সাজে সাজাইলেন; এবং পরে একখানি পত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেতে সবিশেষ জানাইয়া ঐ পত্র একটি মালার ভিতর গোপনে রাখিয়া ঐ মাল্যসহ তাহাকে কুঞ্জে পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ললিতার ঐ মনোহর বেশ দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন; পরে মালাটি গ্রহণ করিতেই গুপ্ত সঙ্কেতলিপি পাঠ করিয়া সবিশেষ অবগত হইলেন এবং হৃষ্টমনে ললিতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ললিতা বাধাপ্রদান করিয়া রুষ্টভাব ধারণ করিলে, চিঠির মর্ম্ম তাহাকে সবিশেষ জ্ঞাপন করায়, প্রিয়-সখীর প্রীত্যর্থে ও শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহাতিশয্যে তথায় অবস্থিতি ও বিলাসাদিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এইমতে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে শ্রীমতী রাধা বিশাখা সহ, উল্লাস অন্তরে সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ললিতা বিরস বদনে বসিয়া আছেন ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট আক্ষেপ

করিতেছেন! তাহা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, ললিতা বিষণ্ণ অন্তরে খেদ করিতে করিতে ছল ছল নেত্রে বলিতে লাগিলেন,—'আমি তোমার প্রিয়তম নর্ম্মসখী জানিয়া শুনিয়াও, আমার প্রতি কেন এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিলে? তিলার্দ্ধেক শ্রীকৃষ্ণ বিরহে তোমার কি নিদারুণ বিরহযাতনা হয়, তাহা আমা অপেক্ষা কেহই অধিক অবগত নহে, আমি তোমার অন্তরতম নর্ম্মসখী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি, এমত অবস্থায় তোমাকে এভাবে নিদারুণ বিরহ বেদনা দিয়া কৃষ্ণ সঙ্গমে সুখী হইব এরূপ ধারণা তোমার কোথা হইতে আসিল? এদিকে প্রাণাধিক প্রিয়তম কৃষ্ণকেও সুখী করিবার আমার সামর্থ্য কোথায়? "শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপন। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।' (চৈঃ চঃ—২।৮।৮৮)—সেই তোমার সেবা-সুখ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া এতক্ষণ তাঁহাকে সুখী করিবার পরিবর্ত্তে কেবল দুঃখই দিলাম, একি বিড়ম্বনা! তোমার মনস্তুষ্টির কারণ বাহিরে কৃষ্ণসুখার্থ প্রসন্নভাব দেখাইলেও, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কেবল কাঁদিয়াছি, একারণ এখন তোমাকে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।'—এই রহস্যটি সম্যক উপলব্ধি হইলে প্রেমের রহস্য কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। এই রহস্যটি কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—

'সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হইতে তাহা কোটি সুখ পায়॥' (২।৮।১৬৭-১৬৮)

আবার প্রেমময়ী শ্রীরাধাও নিজ সখী ললিতাদিকে এই ভাবে সুখী করিয়া নিজ সঙ্গম হইতে কোটি গুণ সঙ্গম-সুখ অনুভব করেন। যথা,—

'যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥

নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট।
তাসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥'। (ঐ—২।৮।১৭১-১৭৩)

প্রেমের এই নিরুপম বিচিত্র লীলা প্রাকৃত জগতে ধারণার অতীত। সেবার প্রকার ভেদে গোপীগণ দুইভাগে বিভক্ত—সখী ও মঞ্জরী। যাঁহারা স্বীয় অঙ্গদানাদি দ্বারা শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয়া সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধন করেন, তাহাদিগকে সখী বলা যায়—যেমন ললিতা, বিশাখা আদি। আর যাঁহারা নিজাঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন; পরন্তু, শ্রীরাধা গোবিন্দের মিলনের সেবানুকূল্য সম্পাদনে সদাই তৎপর, তাহাদিগকে মঞ্জরী বলা যায়। ইহারা শ্রীরাধার অনুগত কিঙ্করী—একান্ত দাসী অভিমানী এবং ইহারা অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গসেবায় সখী অপেক্ষায় মঞ্জরীদের অধিকার অনেক বেশী। সাধন-সিদ্ধা গোপীগণ সকলেই মঞ্জরী। মঞ্জরীগণের মধ্যে নিত্য-সিদ্ধাও আছেন।

ইঁহাদের চরিত্র অতীব অপূর্ব্ব। ইঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সম্ভোগের লেশমাত্র লালসা বিদ্যমান নাই। গোপীগণ হইতে ইঁহারা বয়সে ন্যূন। ইঁহাদের সমক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দ নিঃসঙ্কোচে নিভৃত নিকুঞ্জ বিলাসাদি করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়েই অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারিণী। ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যিক কোন প্রকার রতি বিলাসাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও, শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিলাসাদি দর্শনে এই ভাবময়ীদের দেহে রতিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ এক অপূর্ব্ব রহস্য,—একান্ত সেবপরায়না মঞ্জরীদিগের প্রতি রসিকেন্দ্র চূড়ামণির এ এক অনুগ্রহদান,—"সুখবাঞ্ছা নাই, সুখ হয় কোটিগুণ।"—ইহা প্রেম রাজ্যের এক বিচিত্র বিধান!

অশ্লীল বোধে যাঁহাদের এই মধুর রাসলীলায় অরুচি, তাঁহারা একটি

কথা বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন,—যখন রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বয়স মাত্র আট বৎসর। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন,—'ব্রহ্ম আশ্চর্য্য এবং ব্রহ্মের শ্রোতা, বক্তা, জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য';—অর্থাৎ, অতীব বিরল। এই অত্যাশ্চর্য্য নরাকৃতি পরব্রহ্মই ভক্তাভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সবিগ্রহে শ্রীবৃন্দাবনলীলায় নায়ক হইয়াছেন; সুতরাং জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহার লীলা আশ্চর্য্য, বা অসম্ভব বোধ হওয়া, কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। জীব স্বভাবতঃ যাহা চাহে তাহাই তাহার চরম প্রাপ্তব্য। অতএব সূর্য্য ও সূর্য্য কিরণের ন্যায় ভগবান হইতে পৃথক অথচ অপৃথকভাবে, চিন্ময়দেহে চিরকাল চিদানন্দময়ের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক নিত্যানন্দ আস্বাদন করাই জীবের 'স্বরূপে অবস্থান' ও নিরতিশয় আনন্দ লাভ।

'রম' ধাতুর অর্থ আনন্দ আস্বাদন করা—আনন্দময় পরমপতির সহিত মিলিত হওয়াই জীবরূপা প্রকৃতির আনন্দাস্বাদন, বা রমণ; এবং শরণাগত ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করাই ভগবানের আনন্দ আস্বাদন বা রমণ। আত্মারাম ভগবানের রমণের জন্য কামিনী কাঞ্চনাদি দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয় না; এবং জীবের ন্যায় অভাব পূরণার্থ নৈমিত্তিক ইচ্ছাও হয় না—তিনি ইচ্ছাময়। কেবল একান্ত শরণাগত মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই এই অপূর্ব্ব প্রয়াস। ইহা অঘটন ঘটন-পটিয়সী, বা অসাধ্য-সাধিকা, যোগমায়ার এক অপূর্ব্ব লীলা।

মূল কথা, শ্রীভগবানের মধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ ও রসাস্বাদন করিতে হইলে, 'তাদৃশ চিত্তে'—'রসিক ও ভাবুক' হইয়া শ্রবণ করা উচিত। রুক্ষভাবপূর্ণ সংশয়-চিত্তে এই পরম নিগূঢ় ও পরম মধুর লীলার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ কদাচ সম্ভব নহে; পরন্তু, তাঁহারা এই পরমোদার ও ভুবন-পাবনী লীলাকে 'অশ্লীল' মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন; অথবা 'রূপক', 'প্রক্ষিপ্তাদি' বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন; অথবা আধ্যাত্মিকাদি ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়া প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ

ও আস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন মাত্র। পিত্তদোষে দূষিত রসনায় মিছরির মিষ্টতা অনুভব হয় না বলিয়া মিছরির তিক্ততা প্রমাণের চেষ্টা করা অপেক্ষা, নিজ পিত্তদোষ নিবারণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব বহির্মুখতা দোষে শ্রীভগবানের লীলা কথার মাধুর্য্যাস্বাদন হয় না বলিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য কথায় রত থাকা অপেক্ষা, বহির্মুখতা দোষের প্রতীকার করাই সমীচীন। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, পরমহংস শিরোমণি শুকদেব গোস্বামী, আসন্ন মৃত্যু পরমভাগবত মহারাজ পরীক্ষিতের চরম পরম কল্যাণার্থ, সর্ব্বলীলা মুকুটমণি যে ভুবন-পাবনী লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কখনই প্রাকৃত নরনারীর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি (বা বাঞ্ছা) মূলক উদ্দাম কামক্রীড়া কাহিনী নহে। কিম্বা, প্রহেলিকাময় রূপক বর্ণনা নহে; অথবা, শ্রীভগবানের লীলা-রস-বিমুখ, শুষ্ক জ্ঞানিগণের স্বেচ্ছা-পরিকল্পিত, আধ্যাত্মিকাদি পরিকল্পনা মাত্র নহে। উহা সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ প্রেমময় ভগবানের এক নিরুপম প্রেমময়ী লীলা এবং প্রেমবান ভক্তগণের প্রাণের অন্তরতম আস্বাদ্য বস্তু। এই রাসলীলার শেষ শ্লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে,—যদি কেহ শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে এই পরম মধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ, বা কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভান্তে, কামাদি হৃদ্‌রোগের সমূলে অপগম হয়। এতএব বিশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানের এই মধুর লীলা-কথা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিয়া, বিবিধ বিষয় বাসনা বিক্ষুব্ধ হতাশ হৃদয়কে একটু আশ্বস্ত করাই বুদ্ধিমাসের কার্য্য।

এই স্থলে 'অশ্লীল' ও 'প্রক্ষিপ্ত' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্বের আলোচনা অনুরূপ দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই বোঝা যায় এই লীলা পরম পবিত্র, ইহাকে অশ্লীল আখ্যায় অভিহিত করা অতীব গর্হিত,—প্রত্যুত, অপরাধজনক। 'কাম', অথবা 'রমণ', বাক্যাদির প্রয়োগ দেখিলেই যদি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীমৎ ভগবদ্‌গীতাতেও যখন

ঐ সকল বাক্যাদির বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে তখন, তাহাও তো অশ্লীল বোধে পরিত্যাগ করিতে হয়। গীতায় যথা,—"প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ" (১০।২৮), "ধর্ম্মবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ" (৭।৯), "মম যোনি র্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।।" (১৪।৩), "নতেষু রমতে বুধ" (৫।২২), ইত্যাদি। মূল কথা, বাহ্য চাকচিক্যময় আধুনিক সভ্য জগতের ভিতরে অসংযমের মাত্রা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উহা সর্ব্বদা লোক চক্ষুর অন্তরালে ঢাকা দিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে,—সকলে সর্ব্বদাই শঙ্কিত পাছে ঐ সকল গলদ বাহির হইয়া পড়ে, তাই এই উদ্ভট প্রয়াস! আজ বহুদিনের একটা কথা মনে হইল, কলিকাতায় অবস্থিতি কালে একদিন 'দেবালয়ে' একটি বিশিষ্ট ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা শুনিতে যাই। তিনি বিলাতের আচার-বিচার প্রসঙ্গে বলিলেন,—তিনি যখন বিলাতে ছেলে-মেয়েদের একটি বোর্ডিংএ থাকিতেন, তখন একদিন রাত্রি-ভোজনের পর ঐ বোর্ডিংয়ের কর্ত্রী তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান এবং তাঁহাকে অবিলম্বে ঐ বোর্ডিং পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ঐ কর্ত্রী বলিলেম,—তিনি নাকি ভোজন-কালে উলঙ্গ (naked) অবস্থায় ভোজনালয়ে গিয়াছিলেন! তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করায়, তদন্তে প্রকাশ পাইল, তাঁহার একটা মোজার গোড়ালির কাছে একটু ছেঁড়া ছিল,—এই গুরুতর অপরাধ! ইহাতেই তথায় শ্লীলতার হানি হয়; কিন্তু সপ্ত পুত্রের মাতা সপ্তবার বিবাহ করাতে, অথবা পরস্ত্রীকে বুকে ধরিয়া নৃত্য (*Ball Dance*) করিতে শ্লীলতায় কোনই হানি হয় না!

আধুনিক সভ্যজগতের এই এক অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিলেন; এইবার আমাদের দেশের আবহমান কাল প্রচলিত সভ্যতার একটি অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করুন—শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আমাদের, ১৩০৬ সালে, প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। মকর-সংক্রান্তির দিন দারুণ শীতে প্রত্যুষে দেখিলাম, হাজার হাজার প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্ত্তি, শান্ত-

শিষ্ট সাধু-মহাত্মাগণ, ভস্মে বিভূষিত হইয়া, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানার্থে ধীর-স্থির-পদবিক্ষেপে শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করিতেছেন, আর তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে, কাতারে কাতারে, হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ, মেজিষ্ট্রেট, মেম সাহেব, রাজা, রাণী প্রভৃতি, কেহ গজ পৃষ্ঠে, কেহ অশ্বারোহণে, কেহ বা ভূমিতে অবস্থিতি করিয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাব-বিহ্বল নেত্রে দেখিতেছে,—সকলেই স্থির গম্ভীর, নিস্তব্ধ ও পুলকিত ! এ দৃশ্য যিনি জীবনে একবার দেখিয়াছেন তিনিই ধন্য হইয়াছেন। উহা দর্শনে অতিবড় কামুকের কলুষিত হৃদয়ও, সেই ক্ষণেকের তরে, কি এক অনির্ব্বচনীয় দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া যায় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়! আর্য্য সভ্যতায় সনাতন পন্থী এই সকল সাধুগণই আমাদের জাতীয় সম্পদ। কতশত ঝড়-ঝঞ্ঝাপাতের মধ্যেও ইঁহারাই আবহমান কাল হইতে ভারতের কৃষ্টি অক্ষুন্ন রাখিয়া আসিতেছেন। আধুনিক ভোগ সর্ব্বস্ব সভ্যতার আবিলতা ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় নাই। মানসচক্ষে আর এক দিব্য দৃশ্যের কথা মনে ভাবুন,—নবযৌবন সম্পন্ন পরম-সুন্দর, পরমহংস চূড়ামণি শুকদেব গোস্বামী, নগ্ন-দেহে প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক, পিতৃগৃহ হইতে নির্জ্জন কাননাভিমুখে উদভ্রান্ত-প্রায় চলিয়াছেন, আর পথিপার্শ্বে অপ্সরাগণ নির্ব্বিকার চিত্তে নগ্ন-দেহে জল-ক্রীড়া করিতেছেন! তৎপরেই, মহামুনি বৃদ্ধ ব্যাসদেব পুত্রের অনুসরণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে, সুরকামিনীগণ লজ্জিতা হইয়া শশব্যস্তে নিজ নিজ বসন পরিধান করায় মহর্ষি বিস্মিত হইলে, তাঁহারা বলিলেন,—"আপনার স্ত্রী পুরুষ বলিয়া ভেদ জ্ঞান আছে, আপনার পুত্রের তাহা নাই, এজন্য তাঁহাকে দেখিয়া তিনি যুবক হইলেও, আমাদের কোনই লজ্জার উদ্রেক হয় নাই।"

এক্ষণে অনুধাবন করুন, এহেন বালক-স্বভাব মহাযোগেশ্বর শুকদেব গোস্বামী, উলঙ্গ অবস্থায়, আসন্ন-মৃত্যু একান্ত শরণাগত, মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে সমাসীন; তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কত যোগীন্দ্র, কত

মুনীন্দ্র, মহর্ষিবৃন্দ, শুকমুখ-নির্গলিত অমৃতময় ভাগবতী কথা শুনিবার জন্য সমুৎসুক, আর তিনি প্রশান্ত চিত্তে, স্নেহ-দয়ার্দ্র-হৃদয়ে, পুলকিতান্তরে তৎসময়োপযোগী পরম উপাদেয় শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে,—অতিগুহ্য,—গোপীদিগের বস্ত্রহরণ, রাসাদিলীলা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্থানে স্থানে গোপীসহ-গোপীনাথের বিহার-বিলাস-বিভ্রমাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতি সরল স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণন করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের গুহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত বর্ণনায় আবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন! উহা কত মধুর, কত পবিত্র, এবং কীদৃশ প্রাণমন-রসায়ন ভাবের অভিব্যক্তি! সেই শুকদেব গোস্বামীই রাসলীলা বর্ণনা পরিসমাপ্তিতে, পরম পুলকিতান্তরে, বলিয়াছেন,—"গোপীসহ-গোপীনাথের এই মধুর লীলা যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ বা বর্ণন করিবেন, তিনিই পরাভক্তি লাভ করিয়া সমূলে কামরূপ-হৃদ্‌রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।"—পরমতত্ত্বদর্শী মুনীবরের মুখে এই অভয়বাণী (ফলশ্রুতি) শ্রবণ করিয়াও, এই ভুবন-পাবনী লীলাকে অশ্লীল নামে অভিহিত করা কতদূর অজ্ঞতার ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়। রসিক-চূড়ামণি রামানন্দ রায়ের, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নৃত্যগীত অভিনয়াদি শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে, সুন্দরী যুবতী দেবদাসীগণের অঙ্গমার্জ্জন ও বেশভূষাদি করিবার কালে, তাহাদের গুহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দর্শন-স্পর্শন ঘটিত; তথাচ তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিতেন,—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উক্ত রাসলীলা শ্রবণাদির ফল-শ্রুতি শ্লোকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; যথা ঃ—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী, আরে সুন্দরী তরুণী।
তাঁর সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥

স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য-অঙ্গের হয় তাঁহা দর্শন-স্পর্শন॥
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য, তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

... ...

কিন্তু শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥—
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে, শুনে, করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্‌রোগ কাম তার, তৎকাল হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥" চৈঃ—৩।৫।৩৫-৪৫

মূলকথা, পাশ্চাত্য-শিক্ষার-প্রভাবে আমরা শাস্ত্রে-বর্ণিত ঋষি ও মহাজন বাক্যে একেবারে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছি, একারণেই এই দুর্দ্দশা! নতুবা, আমরাতো সকলেই জানি শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্ত্রীলোক, বা ঐ প্রসঙ্গী, হইতে কিরূপ দূরে দূরে থাকিতেন এবং তাঁহার প্রিয়ভক্ত, কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে,এক বৃদ্ধা পরম তপস্বিনীসহ (স্ত্রীলোক)-সম্ভাষণ করার জন্য, কিরূপ কঠোর-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন!—বৎসরান্তে প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেও, এই স্ত্রী-সম্ভাষণ অপরাধের কারণ কোন মতেই তাহার মুখ দর্শন করেন নাই! সেই মহাপ্রভুই, তাঁহার প্রকট কালের শেষ দ্বাদশ বৎসর কাল,এই গোপীসহ-গোপীনাথের রাসাদি লীলা আস্বাদনে দিবারাত্র, সর্ব্বক্ষণ, বিভোর হইয়া দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। ইহা হইতেই, এই ভুবন-

পাবনী লীলার ভাবগাম্ভীর্য্য ও উপাদেয়ত্ব সম্যক উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা যে কত মধুর, কত পবিত্র, কত উদার, তাহা পরমভাগবত ভক্তাগ্রগণ্য নারদ উদ্ধবাদি হইতেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রাসাদিতে অভিসারে গমনপথে, গোপীদিগের দিব্যোন্মাদ-ভাবে, তাঁহারা এতাদৃশ চমৎকৃত হয়েন যে, তাঁহারা পুলকিতান্তরে তদ্ভাবাবিষ্ট গোপীদিগের একটু পদধূলি পাইয়া ধন্য হইবার প্রত্যাশায়, বৃন্দাবনের যে কোন একটি তৃণ-গুল্ম-লতা হইবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়া থাকেন। আধুনিক যুগেও দেখিতে পাই, বৈরাগী-শিরোমণি চিরব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব,—যিনি স্বীয় সহধর্ম্মিনীকে পর্য্যন্ত জগন্মাতার প্রতিভূ-জ্ঞানে, মাতৃভাবে, ফুল-চন্দন দিয়া পূজা আরত্রিকাদি করিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই চির-বৈরাগী মহাপুরুষ ব্রজের এই অপ্রাকৃত মধুর-রস আস্বাদনে লোলুপ হইতেন এবং নিজে গোপীভাবে বিভোর হইয়া গোপী-বেশে, ভূষণাদি ধারণ পূর্ব্বক, রস-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া, ঐ রস সম্যক আস্বাদন করতঃ, পরম কৃতার্থ হইতেন। আবার কঠোর নৈতিক-পথাবলম্বী একান্ত সত্যনিষ্ঠ শ্রীশ্রী-গোস্বামী প্রভুও ব্রাহ্ম-বন্ধুদের সকল প্রকার বিদ্রূপ নির্য্যাতনাদি উপেক্ষা করিয়া,—এমন কি, তাঁহাদের সহিত সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াও, কি ভাবে রসকীর্ত্তনাদি আস্বাদন করতঃ, সেই রসে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত অবস্থায় কত সময় ঐ ভাব-সমাধিতে অতিবাহিত করিতেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমত অবস্থায়, এতাদৃশ পরম পবিত্র মধুর লীলাকে অশ্লীল বোধে দূরে পরিত্যাগ করার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে!

অশ্লীলতার ভয়ে তাহা হইলে তো আমাদের নিত্য আরাধিত শিব-শক্তির মিলন-আদি সৃষ্টিতত্ত্বের মূর্ত্ত-প্রতীক শিবলিঙ্গের পূজা, বা উলঙ্গিনী জগজ্জননী শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজা, বা পরকীয়া-রসতত্ত্বের অভিব্যক্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-বিগ্রহের সেবা-পূজাদি পরিহার করিতে

হয়!—মূল কথা, অভিনব পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে; এবং আমরা ক্রমেই অন্তঃসারশূন্য বাহ্য চাকচিক্য-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছি এবং শাস্ত্র সদাচার ও মহাজনদের বাক্যে যথাযথ শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছি। এইভাবে আমাদের মধ্যে পরম পবিত্র সর্ব্ব প্রকার প্রীতির সরসভাব (যথার্থ আত্মীয়তা) বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

পাছে কোন পাঠক ভ্রমে পতিত হইয়া এই অপ্রাকৃত প্রেম-লীলাকে লৌকিক কাম-ক্রীড়ার সহিত সমপর্য্যায়-ভুক্ত করিয়া বসেন, এই আশঙ্কাতেই শুকদেব গোস্বামীপাদ, "এই" রাসলীলা প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই 'ভগবানপি' বলিয়া আরম্ভ করিয়া, পুনরায় এই লীলা বর্ণনার উপসংহারে,—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ ইদঞ্চ 'বিষ্ণোঃ'", বলিয়া ভগবানের সহিত গোপীদিগের এই লীলা যে অপ্রাকৃত, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিলেন। কোন প্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংসার সম্যক অনুধাবন করিয়া, তবে তাহার তাৎপর্য্য নিরূপণ করাই বিধেয়।

তারপর, আর একটি গুরুতর অভিযোগ এই যে,—মূল ভাগবতে এই সকল 'অশ্লীল' লীলা ছিল না, পরে 'প্রক্ষিপ্ত' হইয়াছে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভাগবতের পরম-তত্ত্ব-সম্বলিত ভুবনপাবন সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি,—এই সকল মধুরলীলা, 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া, বাদ দিলে শ্রীমদ্ ভাগবতে আর রহিল কি! তাহা ছাড়া, আর একটা কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, যদি উহার কোন অংশ প্রক্ষিপ্তই হইয়া থাকে তাহা কখন, বা কতদিন পূর্ব্বে হইয়াছে?—পরম সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার, শ্রীধর স্বামিপাদ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে, বর্ত্তমান আকারের এই সমগ্র ভাগবতটিকে অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিয়া, ইহার টীকা করিয়াছেন; ইহার কোন অংশই তিনি প্রক্ষিপ্ত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা তত্ত্ব-বিরুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; এবং ভারতের চারি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ সকলেই, বর্ত্তমান আকারের ভাগবতকেই অখণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—কোন লীলাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; সর্ব্বোপরি একটা প্রধান কথা এই যে, শ্রীশ্রীমহা-

প্রভু, যিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান 'ভাগবত', তিনি এই বর্ত্তমান ভাগবতের সমগ্রই সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন,—ইহার কোন অংশই প্রক্ষিপ্ত, বা অশ্লীল, বলিয়া বাদ দেন নাই; তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—সনাতন গোস্বামী পাদ, জীব গোস্বামী পাদ, প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ, এই বর্ত্তমান আকারের ভাগবতের,—বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বলিত দশম স্কন্ধের, বিষদ টীকা টিপ্পনী করিয়াছেন;—তাঁহারা কুত্রাপি এই সকল লীলা, বা কোন অংশ, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; পরন্তু, প্রত্যেক শ্লোকের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য-পূর্ণ ব্যাখ্যা ভক্তগণে পরিবেশন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এমত অবস্থায় তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া, এই সকল মধুর, পবিত্র, লীলাগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনাদর করা পরম দুর্দ্দৈব ভিন্ন আর কি হইতে পারে! মূল কথা, অপরে যাহা বলেন বলুন, আমরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, বা তাঁহার সাক্ষাৎ চরণাশ্রিত লীলা-অনুভব-সিদ্ধ আচার্য্য-রত্নগণের, অপেক্ষা অধিক তত্ত্বজ্ঞানী, বা ভক্ত, হইবার স্পর্দ্ধা রাখিনা। তাঁহারা যখন এই বর্ত্তমান আকারের সমগ্র ভাগবতটি পরম শ্রদ্ধা-সহ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমরা নিঃসংশয়ে, এই আকারেই ইহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না;—পরন্তু, ঐরূপ করা ঘোর অপরাধ জনক ও ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিব।

"গোপীপ্রেম 'অশ্লীল' ও 'প্রক্ষিপ্ত'" সম্বন্ধে, আমাদের স্বামীজী বলিয়াছেন,—"প্রথমে, এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি, ছাড় দেখি; তখনই—কেবল তখনই, তোমরা গোপী-প্রেম কি তাহা বুঝিবে। ইহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে,—সর্ব্বত্যাগ না হইলে, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন ইহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি-মুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কামিনী-কাঞ্চন যশ-লিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়! **কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপীপ্রেম** এমন কি,

স্বামী বিবেকানন্দ
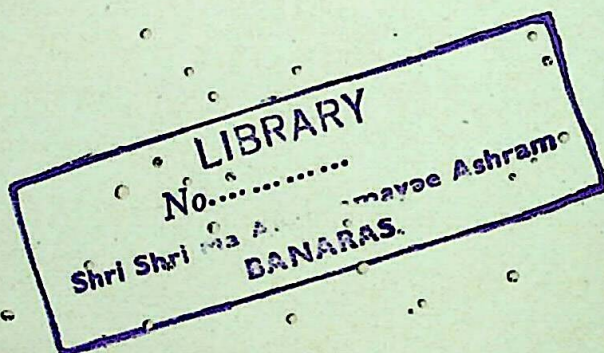
দর্শন-শাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না!...গোপীপ্রেমে ঈশ্বর রসাস্বাদনের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান!—ইহা জগতে এক অতি দুর্লভ বস্তু!"

"আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত প্রেম-লীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি একরকম! সাহেবরা ইহা বড় পছন্দ করে না! অমুক পণ্ডিত গোপীপ্রেমটাকে বড় সুবিধা মনে করেন না! —তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে ভাসিয়ে দাও! সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া?—কখনই টিকিতে পারে না!...এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত! সাহেবরা যাহা না চায়, সব উড়াইয়া দিতে হইবে! গোপীদের কথা, এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত!—যে সকল ব্যক্তি উহা বলেন, তাহারা অতি ঘোর বণিকবৃত্ত্য। যাহাদের ধর্ম্মের আদর্শ পর্য্যন্ত ব্যবসাদারিতে দাঁড়াইয়াছে!...ইহাদের ধর্ম্ম প্রণালীতে অবশ্য গোপীদের স্থান নাই!" (ভারতে বিবেকানন্দ—২৬৫, ২৬৮ পৃঃ)—ইহার উপর টিপ্পনি অনাবশ্যক।

যখন রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের তখন বয়স, লৌকিক হিসাবে, ৮ বৎসর এবং গোপীদিগের ৬।৭ বৎসর! ঐ বয়সে, লৌকিক জগতে যৌবনোচিত ভাবের অভিব্যক্তির সমাবেশ কদাচ সম্ভব নহে; অথচ রাসলীলা বর্ণনায় দেখি শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ সকলেই উদ্ভিন্ন-যৌবন নায়ক-নায়িকার ন্যায়, রাস-বিলাসে বিভোর। ইহাতেই বোঝা যায়, উহা জগতের লৌকিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—এ এক অলৌকিক লীলা। শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে, যশোদা মাতার নিকট স্তন্যপায়ী বাল-গোপাল, রাখালদের কাছে পৌগণ্ড বয়সী রাখাল বালক, এবং রাসাদি লীলায় রাসবিহারী নবকিশোর নটবর মদনমোহনরূপে বিরাজিত! আমাদের মত মায়িক দেহীর পক্ষে এরূপ কখনই সম্ভবপর নহে,— সচ্চিদানন্দময় তনু ভগবানের পক্ষেই সম্ভব। 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং'

(গীতা—৪।৯)। আবার প্রকৃত বয়স হিসাবে, গোপীরা ও রাসবিহারাদি লীলার সম্পূর্ণ অযোগ্যা হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায়, যোগমায়ার প্রভাবে, প্রেমময়ী চিদানন্দময়ী গোপরমণীগণের প্রেম-সেবাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য, যথাযোগ্য শ্রীকৃষ্ণ সেবার উপযুক্ত অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত নব-কিশোরী দেহ ধারণ করিয়া, নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষানুরূপ শ্রীকৃষ্ণসহ বিলাসাদির সৌভাগ্য লাভ হয়।—ইহা আমাদের মত মায়িক প্রাকৃত দেহে কদাচ সম্ভব নহে।

মূলকথা, আমরা যতই কেন পাণ্ডিত্যের বড়াই করি এবং যতই কেন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-ধারী হই, এ সকল অলৌকিক ব্যাপার আমাদের মত ঘোর বিষয়াসক্ত, ভজন-বিমুখ, বহির্মুখ জীবের বুদ্ধির অগোচর। এ সকল গভীর রহস্যময় তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে হইলে বিশেষ শ্রদ্ধালু হইয়া, পরম ভাগবত, ভজনানন্দী, মহানুভব আচার্য্যগণের চরণ আশ্রয় ভিন্ন আমাদের গতি নাই; নতুবা, আমাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে ইহা নিশ্চিত। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ-অনুগ্রহভাজন রূপগোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতি মহানুভবগণের অনুভব ও বিচার, প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করাই নিরাপদ; নতুবা, পদে পদে ভ্রমে পতিত হওয়া অনিবার্য্য।

'এক এক বৃক্ষতলে এক এক দিন বাস।
কভু চানা চর্ব্বন, কভু উপবাস'॥ চৈঃ চঃ—২।১৪।৯৭

'সাড়ে সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা সেই নহে কোন দিনে॥' ঐ—৩।৬।৩০৪

—তাঁহাদের এতাদৃশ অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভজন এবং পাণ্ডিত্যের কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! তাঁহারা অগাধ-শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত-রত্নাদি উদ্ধার করিয়াছেন, যদি অবনত মস্তকে পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে

নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব। এই লীলা বুঝিতে হইলে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

সর্ব্বপ্রথমে, টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধর স্বামী (যাঁহাকে মহাপ্রভু এতদূর উচ্চ আসন দিয়াছেন যে (শ্রীধর) 'স্বামী' না মানিলে 'বেশ্যায় গণন' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, সেই শ্রীধর স্বামী) মহাশয় এই রাস-লীলা প্রসঙ্গের অবতারণায়, একটি মঙ্গলাচরণ শ্লোকে, এ সম্বন্ধে এক অতি সারগর্ভ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যদ্দারা রাসলীলার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যথা,—

"ব্রহ্মাদিজয়-সংরূঢ়-দর্প কন্দর্প-দর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপী রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥"

অর্থাৎ,—'কন্দর্প, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া চিরকাল দর্প করিয়া থাকে; ভগবান কমলাপতি কন্দর্পের সেই দুর্দ্দর্প দমন করিয়া গোপীদিগের মণ্ডল মধ্য-শোভা পাইতেছেন।' সুচতুর স্বামী-পাদ মঙ্গলাচরণের ছলে ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, ভগবানের রাসলীলায় প্রাকৃত কাম-প্রসঙ্গ একেবারে নাই। ইহা একমাত্র পরম পবিত্র প্রেমের লীলা। ইহার সমর্থনে, স্বামীপাদ প্রথমেই ভাগবতের রাসলীলা বর্ণনা হইতে চারিটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(১) 'যোগমায়ামুপাশ্রিত',—অর্থাৎ, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশ করিয়া; (২) 'আত্মারামোপ্যরীরমৎ'—আত্মারাম হইয়াও রমন করিলেন; (৩) 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ'—সাক্ষাৎ মদনের মনোমোহন; এবং (৪) 'আত্মন্য-বরুদ্ধ-সৌরতঃ',—অর্থাৎ, সুরত-ক্রীড়াকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ বা বশীভূত রাখিয়া।—এই সকল বাক্য দ্বারা তিনি যে কাম-পরতন্ত্র নহেন; পরন্তু, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে।

অতএব রাসক্রীড়া উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের কাম-বিজয় খ্যাপনই উদ্দেশ্য। এইভাবে শৃঙ্গার কথাচ্ছলে পরম নিবৃত্ত-মার্গ

প্রদর্শনই এই রাসলীলা বর্ণনের তাৎপর্য্য। ইহাই স্বামীপাদ রাসপঞ্চাধ্যায় ব্যাখ্যায় সম্যক প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান 'আত্মারাম', এই শব্দের প্রয়োগে ইহাই সুস্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁহার গোপীগণের সহিত রমণের কোনই প্রয়োজন নাই; কেননা, আত্মারামের রমণের জন্য কোন প্রকার বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। আবার তিনি স্বয়ং 'মন্মথ-মন্মথ',—তাহার মদনাবেশ না থাকায়, তাঁহার রমণী-বিলাসের কোনই প্রয়োজন নাই। তবে, তিনি অসংখ্য পর-বধূর সহিত এইরূপ শিষ্টজন-বিগর্হিত লীলা করিলেন কেন?—এই সন্দেহ দূর করিবার জন্যই অনেকে অনেক প্রকার ব্যাখ্যায় প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তখন বয়স ৭।৮ বৎসর এবং গোপীদিগের বয়স ৪।৬ বৎসরের অধিক নহে, অতএব ঐ লীলার মধ্যে দোষনীয় ব্যাপার কিছুই নাই।—কিন্তু রাসলীলা বর্ণনা পাঠ করিলে, উহা যে বালক বলিকার ক্রীড়া-কৌতুক নহে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। উহা কিশোর-কিশোরীর বিলাস-বিভ্রমাদি বর্ণনায় পরিপূর্ণ। আবার কেহ বা, উহাকে রূপক-বর্ণনা, এবং কেহ বা, আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা করিয়া একটা অভিনব ভাবের প্রবাহ সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; আবার কেহ বা, শ্রীমৎ ভাগবতাদিতে বর্ণিত এই লীলাটিকে, 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন!—কিন্তু এই সব কোন বিচারই শ্রীধর স্বামীপাদ, বা আর কোন পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ টীকাকারের, সম্মত নহে। অতএব, ওসকল মনঃকল্পিত ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া, শ্রীধর স্বামীপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে প্রাণিধানযোগ্য। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বামীপাদ এই রাসলীলায় 'কাম-বিজয়' ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য,—জগতের সর্ব্ব জীবই সর্ব্বদা কোন না কোন কামে অভিভূত হইয়া বিবিধ কাম্য-বস্তু ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ, এবং বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষিগণ পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে কামের

তাড়না ভোগ করিয়া কামের দুর্জ্জয়ত্বই খ্যাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়াও মোক্ষ বাসনা, বা অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির কামনার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। আত্মশক্তিতে এই কাম জয়ে অসমর্থ হইয়া, যদি কেহ কোন কাম-জয়ীর শরণাগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনিও স্মরণীয়রূপে কোন কামজয়ীর উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইবেন না। তাই, কামহতজীবগণের কামজয়ের উপায় প্রদর্শন করিবার জন্য, পরম করুণাময় শ্রীভগবান, সাক্ষাৎ 'মন্মথ মন্মথরূপে' রাসস্থলে অবতীর্ণ হইয়া, শত কোটী গোপাঙ্গনার সহিত রাসক্রীড়া করিলেন এবং জগৎকে দেখাইয়াদিলেন যে, অজেয় কামকে যদি কেহ জয় করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ 'মন্মথ-মন্মথ', রাসবিহারীর চরণে শরণাগতিই, একমাত্র উপায়। এই রাসলীলা প্রসঙ্গে সর্ব্বশেষ—"বিক্রীড়িতং" ইত্যাদি শ্লোকে, তাহাই সুস্পষ্ট ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রাকৃত রসশাস্ত্র নহে, কিম্বা, প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কেলি-বর্ণনা হইবার উদ্দেশ্য নহে। ইহা মুখ্যতম ভক্তিশাস্ত্র এবং সর্ব্ব বেদান্তের সার। এই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরম অনির্ব্বচনীয় রসের সন্ধান পাইলে, আর অন্য কোন প্রাকৃত রসেতেই কাহার কোন আগ্রহ থাকে না। ইহাতে, পরম মধুর শৃঙ্গার রাসাস্বাদন ছলে, জগৎকে এক অভিনব পরম উজ্জ্বল নিবৃত্তি পথের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বর্ণিত আছে,—ইহা সর্ব্ব বেদান্তের সারভূত। কেননা, সাধারণ বেদান্ত শাস্ত্রে কেবল সংসার নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধেই নির্দ্দেশ দেখা যায়, কিন্তু সংসার নিবৃত্তির পরে, কি ভাবে রসরাজ শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ হয়, তাহা, একমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, যেন তাঁহারা এই মুক্তিদায়িনী অপ্রাকৃত মধুর লীলার উপরিভাগে, প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের আবরণ দেখিয়া, অবহেলায় আত্ম-বঞ্চিত না হ'ন।

এই লীলায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও ভক্ত-বাৎসল্য এবং গোপীদিগের স্বরূপ ও ভগবৎ-প্রেম সম্যক অনুধাবন করিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন।

এই রাসলীলার বাহ্য আবরণ উন্মোচন করিলেই দেখা যায়, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের—'আত্মারামতা', 'যোগেশ্বরত্ব', 'ভক্তবাঞ্ছা পূরণ'; এবং 'গোপীগণের পরাপ্রেম', 'সর্ব্বত্যাগ' ও 'ঐকান্তিক কৃষ্ণ সেবাকাঙ্ক্ষা', প্রভৃতি শত শত জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই লীলা বর্ণনার উপসংহারে, পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্পষ্টই তাই লিখিয়াছেন, (ভাঃ—১০।১৩৩১)

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

—'শ্রীভগবান মরজগতের ভক্তগণকে কৃতার্থ করিবার জন্যই পরম করুণা পরবশ হইয়া নররূপে অবতীর্ণ হইয়া, নানা লীলা করিয়া থাকেন: আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই মধুর লীলা শ্রবণ করিয়া, ইহাই জীবনের সর্ব্বস্বরূপে আস্বাদন করা উচিত।'

অতএব মধুর লীলাময় শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া যদি কেহ, তাঁহার সেই পরম মধুর লীলাকথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি ইহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে, পরম নিবৃত্তির সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন; এবং চিরজীবনের মত তাহার 'কাম প্রবৃত্তির' নিবৃত্তি হইবে।

শ্রীভগবানের এই পরম মধুর রমণ-লীলার তত্ত্ব গ্রহণে অক্ষম হইয়া, যাহারা এই রমণকে মিথ্যা মায়িক, বা কল্পিত, মনে করেন; কিম্বা কোন প্রকার অভিনব অধ্যাত্মিকতার গর্ত্তে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা কোন-দিনই শ্রীভগবানের এই পরম অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিতে সমর্থ হ'ন না; এবং প্রেমের অচিন্ত্য প্রভাব সম্বন্ধে কোনই ধারণা করিতে পারেন না। যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর- শ্রীভগবানের

ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা গুণের অনুসন্ধান করেন, ও প্রেমের অচিন্ত্য প্রভাব বৈভব ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারাই এই সকল লীলা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান যে অযাচিত করুণা বিতরণ করেন, তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

শ্রীভগবান সর্ব্বেশ্বর হইলেও, নানা শাস্ত্রে তাঁহার ভক্ত পরাধীনতার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তাধীন ভগবানের ভক্ত-মনোরথ পরিপূরণের জন্য নানাবিধ লীলা প্রকাশ হইয়া থাকে; কাজেই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমাধীন হইয়া, তাঁহাদের মনোরথ পরিপূরণের জন্য আত্মারাম হইয়াও শ্রীভগবানের যে রমণেচ্ছা হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

এইবার আমরা এই রাসলীলার অধিনায়ক বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।—ব্রহ্ম-সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্ব্ব-কারণ-কারণং।" (ব্রহ্মঃ—৫।১)

'শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি কিন্তু সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ।' শ্রীমৎ ভাগবতে, ভগবানের বিবিধ অবতার নিরূপণ কালে বর্ণিত আছে,—

"এতেচাংশ কলাঃ পুংস ; কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" ভাঃ—১।৩।২৮

—'এই সমস্ত মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার, পুরুষের অংশ ও বিভূতি; কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান। উক্ত অবতার সকল দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন।'

ভগবানের বিভিন্ন অবতারগণের মধ্যে কেহ বা তাঁহার অংশ, কেহবা কলা, আর শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান। মৎস্য কূর্ম্মাদি বিভিন্ন অংশ, বা কলাকে, স্বয়ং ভগবানের—'অবতার' বলা হয়; এবং স্বয়ং ভগবানকে

'অবতারী' বলা হয়। ইহারা সকলেই সর্ব্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ স্বয়ং ভগবানেরই বিভিন্ন প্রকাশ; এবং শক্তি প্রকাশের তারতম্য অনুসারে অংশ, কলারূপে গণ্য হইয়া থাকেন; নতুবা, তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনই প্রভেদ নাই।

'ভগবান',—'ভগ'—অর্থাৎ, 'ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য,--এই 'ষড়ৈশ্বর্য্য,' যাঁহার আছে,— তিনিই ভগবান। অবতার মাত্রেই এই ষড়ৈশ্বর্য্য বিদ্যমান; তবে, যে অবতারে যে শক্তির যতটুকু প্রকাশের প্রয়োজন, তদুপযুক্ত ঐ শক্তিরই প্রকাশ হইয়া থাকে। 'স্বয়ং ভগবান' শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনেই এই সকল ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম প্রকাশ,—তবে উহা মাধুর্য্যে ঢাকা বলিয়া সকল সময় উহা যথাযথ বোধগম্য হয় না। এই মাধুর্য্যেই ভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি,—"মাধুর্য্য ভগবত্তা সার, ব্রজে কইলেন পরচার।" (চৈঃ চঃ—২।২১।১১০)—উহার ব্রজে পূর্ণ বিকাশ এবং শ্রীশ্রীরাসলীলাতেই তাহার চরম পরিণতি। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্তি হইলেও; ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের অনুগত ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত; সুতরাং, ব্রজে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশয়ী প্রাধান্য। যেমন কোন সম্রাট, যখন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনাদি কার্য্যে রত থাকেন, তখন তাঁহার স্বরূপের যেরূপ অভিব্যক্তি হয়; তিনি যখন বন্ধু-বান্ধবের সহিত ক্রীড়া কৌতুকাদিতে রত থাকেন, তখন তাঁহার স্বরূপ অধিকতর অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; এবং তিনিই যখন অন্তঃপুরে স্ত্রী পুত্রাদি অন্তরঙ্গসহ অধিকতর স্বচ্ছন্দে বিহার করেন, তখন তাঁহার স্বরূপের সম্যক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; আবার তিনি যদি কোন গুপ্ত প্রণয়িণীর প্রেম পাশে আবিদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে সেইখানেই, তাঁহার সহিত রসালাপাদিতে তাঁহার চরম প্রীতিপূর্ণ স্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় পুতনা-রাক্ষসী-বধ আছে এবং রামলীলায় তাড়কা-রাক্ষসীবধ আছে; কিন্তু এই দুই রাক্ষসী বধে অনেক পার্থক্য;

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া, ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন অস্ত্র প্রয়োগে, রাক্ষসীর বিনাশ করিয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপায়ী শিশু মূর্ত্তিতে, স্তন্য পান করিতে করিতেই, ঘোরাকৃতি পুতনা রাক্ষসীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন। এইরূপ অঘাসুর-বকাসুর বধ, গোবর্দ্ধনধারণ, প্রভৃতি সকল অলৌকিক লীলাতেই ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও, লীলারসে-মত্ত অবস্থায় সাধিত হওয়ায়, তাহা অভিনব মাধুর্য্য সিন্ধুতে নিমজ্জিত। মাতা যশোমতীকে মাটি খান নাই দেখাইবার ছলে, বিরাট-রূপ দেখাইয়া তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিলেও, মা যশোমতী, বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের মত, ভয় বিহ্বল চিত্তে স্তবস্তুতি করেন নাই; পরন্তু, উহা তাঁহার গোপালেরই প্রভাব জ্ঞান না করিয়া, কোন গ্রহ বা দেবতার আবেশ জ্ঞানে সন্ত্রস্ত হইয়া, অধিকতর প্রীতিভরে তাঁহাকে বুকে ধরিয়া লইলেন এবং সন্তানের অকল্যাণ আশঙ্কায়, কল্যাণ বিধান জন্য, বৃদ্ধদের পদধূলি গ্রহণ, রক্ষাকবচ প্রভৃতি বন্ধন করিয়া দিয়া তবে আশ্বস্ত হইলেন। এইরূপ দাবাগ্নি মোচন, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক প্রভাব ব্রজবাসী সকলেই অল্পবিস্তর দেখিলেও, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি আপন আপন সম্বন্ধ অনুরূপ প্রেম, কখনই শিথিল হয় না, মা-যশোমতী ও নন্দ-মহারাজের নারায়ণে পরম ভক্তি থাকায় সেই নারায়ণেরই প্রভাবে, এই সকল অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে,—এইরূপ তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা! বালক কৃষ্ণ একটু ক্ষুধাতেই কাতর হয়, মা যশোদা প্রহার করিতে উদ্যত হইলে ভয়ে কাঁপিতে ও কাঁদিতে থাকে, শ্রীদামাদি রাখালবালক লুকাইলে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে হার মানিয়া, তাহাদিগকে স্কন্ধে বহন করিতে বাধ্য হয়,—এহেন গোপ-বালকের পক্ষে কি কখন ঐ সকল অলৌকিক কার্য্য সম্ভবে!—কদাচ নহে, এইরূপই তাঁহাদের প্রতীতি। গোপীদিগের বিরহাদি অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ঐশ্বর্য্য-ভাবের প্রকাশ দেখা যায়, তাহা ক্ষণিক,—

পরক্ষণেই তাহাদের উচ্ছলিত প্রেম-সাগরের মাঝে মদ্যপানে মত্তব্যক্তির 'দেহ-গেহ' বিস্মৃতির ন্যায় কোথায় যেন বিলীন হইয়া যায় এবং নিজেদের আপন গোপবালকরূপে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার সেবা করিবার জন্য লালসান্বিত হয়।

এইখানে একটি রহস্য ভুলিলে চলিবে না। আপ্তকাম, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও, প্রেমে বিভোর হইয়া, সত্য সত্যই তিনি ঐরূপ ক্ষুধাতুর, ভীত বা ভ্রান্ত হয়েন; নতুবা, যদি অন্তরে ঐরূপ ভাব না জাগিয়া বাহ্যিক ঐসকল ভাবের ভনি, বা অভিনয়, করেন বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে ঐসকল লীলার মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও ঐ সকল চমৎকারী লীলার সম্যক রস আস্বাদন সম্ভব হয় না।

ব্রজে তিনি সর্ব্বদাই মাধুর্য্যরসে আত্মহারা হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহারাদি বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন;—লীলার পরিপুষ্টির জন্য যখন যেটুকু ঐশ্বর্য্যের, বা অচিন্ত্য-শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন, তাহা যোগমায়াদেবী, যেন তাঁহার অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই, পরিপূরণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র প্রমাণে ও শাস্ত্রীয় যুক্তিতে দেখা যায়,—শক্তি ও শক্তিমানের তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, ভাগবতসন্দর্ভে বৈষ্ণব-আচার্য্য-প্রবর শ্রীজীব গোস্বামীপাদ—"যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ, যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ", এই গৌতমীয় তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া চিৎশক্তিরূপা দুর্গা ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তবে শক্তিমান-শক্তির আধার-আধেয় ভাবে, একটু মুখ্য-গৌণ ভাব স্বীকার করিতেই হয়। "শক্তিমাত্রেই শাক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন। অতএব ভগবানের শক্তি ভগবানকে মুগ্ধ করিলেন, বা ভগবানের শক্তি যোগনিদ্রা ভগবানকে নিদ্রিত করিলেন বলিয়া, শক্তিকেই বড় করিয়া বিতর্ক করা উচিৎ নহে।" শক্তি-নিরুদ্ধ শক্তিমানের আমরা কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু শক্তিমান না থাকিলে, শক্তির অস্তিত্ব কল্পনাই করিতে পারা

যায় না। ভগবানের শক্তি যোগমায়া ও যোগনিদ্রা শ্রীভগবানের ইঙ্গিতেই তাঁহাকে লীলারস আস্বাদন করাইবার জন্য মুগ্ধ, বা নিদ্রিত, করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

ভক্তপ্রবর তুলসীদাস-কৃত রামায়ণের একটি ঘটনা বর্ণনায়, এই তত্ত্বটি বেশ সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে,—রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ হইলে, শ্রীরামচন্দ্র অতি বিহ্বল অবস্থায় লক্ষ্মণসহ দণ্ডকারণ্যে সীতা অন্বেষণে পরিভ্রমণ কালে,—শঙ্কর রামকে দেখিয়া, উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া, নিজ পরিচয় না দিয়া,—'জগৎ পবিত্রকারী সচ্চিদানন্দ জয়'—এই বলিয়া প্রণাম করিয়া সতীর সহিত চলিতে লাগিলেন। তখন আনন্দে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল। শিবের এই অবস্থা দেখিয়া সতীর বিশেষ সন্দেহ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—'যে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, যিনি মায়া রহিত, জন্ম হীন, সেই ব্রহ্ম কি দেহ লইয়া মানুষ হইতে পারেন!—না, তিনি কখন মুগ্ধের ন্যায় স্ত্রী খুজিয়া ফিরিতে পারেন! আবার শিবের আচরণও মিথ্যা হইবার নয়, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ!'—শিব অন্তর্যামী,—সব জানিলেন ও স্নেহ-ভরে বলিলেন,—'সতি! শোন, তোমার স্ত্রী স্বভাব, কিন্তু তুমি ঐ বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখিও না, ইনিই আমার ইষ্টদেব মায়াতীত পরব্রহ্ম; নিজ ইচ্ছায় ভক্তের হিতের জন্য রঘু-কুলমণি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।'—শিব এইরূপ বহু উপদেশ দিলেন; কিন্তু সতীর কোন মতেই তাহা মনে ধরিল না। তখন, হরির মায়া প্রবল এবং দৈবের নির্ব্বন্ধ জানিয়া, তিনি হাসিয়া দেবীকে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য অনুমতি দিলেন। তখন সতী পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া, সীতার রূপ ধরিয়া; যে পথে রাম আসিতে ছিলেন, সম্মুখ হইয়া সেই পথে চলিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ রাম সতীর কপট বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং হাত জোড় করিয়া সতীকে প্রণাম করিলেন এবং—'আপনি একা কেন, মহেশ্বর কোথায়?'—বিস্ময় ভরে, জিজ্ঞাসা করিলেন। [বাহিরে, মায়ামুগ্ধের ভাব প্রকাশ পাইলেও,

ভিতরে, পূর্ণ জ্ঞান বিরাজিত! ইহা বুদ্ধির অগম্য—মহামায়াও বিমুগ্ধ!] এই রহস্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সতী অতিশয় লজ্জিতা ও নিজেকে ধিক্কার করতঃ, বিষন্ন মনে শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া পরীক্ষার বিবরণ, অস্পষ্ট, জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু, শঙ্কর ধ্যানে সবিশেষ জ্ঞাত হইলেন এবং সতী তাঁহার ইষ্টদেবী, সীতার বেশ ধারণ করিয়াছিলেন জানিয়া, বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং ইহার পর তাঁহার সহিত স্ত্রী সম্পর্ক বজায় রাখা ভক্তি পথের বিঘ্ন ও নীতি বিরুদ্ধ জ্ঞানে, সে দেহে সতীর সহিত সে সম্পর্ক ত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, সতী দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, পরে যখন শঙ্করের সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন দক্ষ প্রজাপতি দম্ভ ভরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে বাদ দিয়া, বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সতী তাহা শ্রবণ করিয়া, এভাবে জীবন ধারণ দুর্বিসহ বোধে, শিবের একপ্রকার অনিচ্ছাতেই, বিনা নিমন্ত্রণে শিবদ্বেষী পিতার যজ্ঞে গমন করিয়া যোগাগ্নিতে দেহ ত্যাগ করিয়া, হিমালয়ের ঘরে পার্ব্বতী হইয়া জন্মিয়া, শিবকে পাইবার জন্য বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিলেন।

ভগবানের সমস্ত মধুর রহস্যময় লীলা, তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। আনন্দের স্বভাব সমালোচনা করিলে দেখা যায়, আনন্দ কখনও তাহার নিজ আধারে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, সে তাহার স্বভাবিক উচ্ছাস বশতঃ আধার প্লাবিত করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে এবং আপন মনে আপন খেলায় মাতিয়া যায়। অতএব আনন্দ-সিন্ধু শ্রীভগবানের এইরূপ আচরণ কিছুই আশ্চর্য্যের নহে। পরম প্রেমবতী ব্রজ সুন্দরীগণের মনোরথ-পূরণই শ্রীভগবানের মুখ্যতম প্রয়োজন এবং তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ আস্বাদন। শ্রীভগবান তাঁহার প্রেমবান ভক্তের ভাব-দর্শনে নিজেরই আনন্দ স্বরূপের প্রতিবিম্ব সমর্পণ করিয়া

তাহাই নিজে গ্রহণ করেন ;—ইহাই তাঁহার আনন্দ আস্বাদন ;—ইহাই তাঁহার রমণ।

এইবার আমরা রাসলীলার প্রথম শ্লোকের, ভগবানের—'যোগমায়ামুপাশ্রিত' সম্বন্ধে আলোচনা করিব,—

রাসলীলার প্রথম শ্লোকেই, 'যোগমায়ামুপাশ্রিত', এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিরূপা যোগমায়ার উল্লেখ করিয়া, এই লীলায় তাঁহার ঐ শক্তির সমধিক প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। ষড়্‌বিধ মহা-ঐশ্বর্য্যের নিকেতন শ্রীভগবান, তাঁহার যোগমায়া শক্তির পূর্ণ প্রকাশ করিয়া, এই লীলার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার এই যোগমায়া-শক্তি প্রভাবেই তিনি এই লীলায় সম্পূর্ণ আবিষ্ট ও আত্মহারা ; কিন্তু এই লীলায় যখন যাহা প্রয়োজন, ঐ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া-শক্তিই, তাঁহার বিনা অনুসন্ধানে 'যোগাইয়া, সকল বিষয়ের যথাযথ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। চৌরাশী-ক্রোশ ব্রহ্মমণ্ডল বংশীধ্বনিতে প্রতিনাদিত হইলেও উহা একমাত্র মধুর-রসাশ্রিত গোপীগণ ব্যতীত আর কাহারও কর্ণগোচর হইল না ; এবং তাঁহারা সকলেই অনতিবিলম্বে একত্রে তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন, কোন প্রতিবন্ধকই তাঁহাদের কৃষ্ণসমীপে আগমনের বাধা জন্মাইতে পারিল না ; তিনশত কোটী গোপীর ঐ সঙ্কীর্ণ যমুনা তীরে স্থান সঙ্কুলান হইল ; শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদের, একই সময়ে, সকলেরই কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রাস-নৃত্যাদি করিলেন ; গোপীগণ বনে আসিলেও তাঁহাদের স্বামীরা তাঁহাদের পত্নীদিগকে তাঁহাদের পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিলেন ; ব্রহ্মরাত্র ধরিয়া এই রাসলীলা সম্পন্ন হইল ; লৌকিক বয়স হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম বৎসরের বালক এবং গোপীগণ ৬।৭ বৎসরের বালিকা মাত্র হইলেও, রাসলীলার সম্পূর্ণ সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য, তিনি নব-কিশোর-নটবর এবং গোপীরা উদ্ভিন্ন-যৌবনা নবকিশোরী হইয়া, প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণের গলা ধরিয়া নৃত্য গীত ও বিবিধ বিলাসাদিতে মগ্ন হইলেন ;—

এইরূপে নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য ঐ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার অনুসন্ধান ব্যতীতই, সুচারুরূপে যথাযথ সংঘটিত হইল। বৃন্দাবনে দাম-বন্ধন, ব্রহ্মা-মোহনাদি বিবিধ বাল্য-লীলায় তাঁহার যোগমায়া-শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও, সর্ব্বলীলা-মকুটমণি এই পরম মধুর রাসলীলায় তাঁহার এই অচিন্ত্য মহাশক্তির পূর্ণতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চারিটি অসাধারণ গুণ প্রকাশিত হয়, যাহা অন্য কোন স্বরূপ বা অবতারের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রজ ছাড়া দ্বারকা মথুরাদি ধামে প্রকাশ হয় না; এবং ঐ চারিটি অসাধারণ গুণের প্রত্যেকটি আবার, যোগমায়া প্রভাবে এই অপূর্ব্ব রাসলীলায় পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া, ঐ লীলার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। "লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেনুরূপয়োঃ।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)—'প্রিয়গণের সংখ্যা বৃদ্ধিকারী তাঁহার 'লীলা মাধুর্য্য' ও 'প্রেম মাধুর্য্য' এবং তাঁহার 'বেনু-মাধুর্য্য' ও 'রূপ-মাধুর্য্য'—এই চারিটি হইল শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ,—ইহা তাঁহার অন্য আর কোনও স্বরূপে নাই।

(১) **'লীলা-মাধুর্য্য',**—অগণিত সখা-সখী-সহ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি তিনি দ্বারকায় অবস্থান কালেও তাঁহার ব্রজলীলার কথা, শয়নে স্বপনে জাগরণে; চিন্তা করিয়া সর্ব্বদাই তিনি ব্যাকুল হন। (বৃহদ্ভাগবতামৃতং—১।৬।৩৯-৪৩)। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—ব্রজলীলার মত মধুর লীলা তাঁহার অন্য কোন ধামে নাই।

(২) **'ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য',**—পুতনা বধ, শকট ভঞ্জন, কালীয় দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ, ব্রহ্মমোহন প্রভৃতি, প্রত্যেক ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা সমস্তই সহজভাবে, সহজ নর-লীলা রক্ষা করিয়াই নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাঁহার পূর্ণ মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া, মাধুর্য্য দ্বারা আত্মগোপন করিয়াই যেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি

ক্রিয়া করিয়াছে, ইহা ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ;—ইহাও একমাত্র ব্রজের সম্পত্তি।

ঐশ্বর্য্যের বিকাশ অন্য ধাম হইতে ব্রজে অনেক বেশী, কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব-বুদ্ধি বা রূঢ়ত্বাদি মিশ্রিত নাই। এই ঐশ্বর্য্য ভাবে, মাধুর্য্য কিছু মাত্র শিথিল করে না। এজন্য ব্রজের ঐশ্বর্য্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না, বরং বর্দ্ধিত হয়, ইহাই ব্রজের 'ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য'।

শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ গোপবালকোচিত অজ্ঞতার অন্তরালে যে পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতার ও ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখা যায় তাঁহা বড়ই মনোরম।

(৩) 'বেনু-মাধুর্য্য,'—শ্রীকৃষ্ণের বেনুরবে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গুল্মলতার পর্য্যন্ত,—অশ্রু, কম্প পুলক হয়, বৃক্ষ হইতে মধু ক্ষরণ হয়, গোবর্দ্ধন শিলা গলিয়া যায়, এবং যমুনা উজান বহে। গোপাঙ্গনা দূরের কথা, দেবাঙ্গনা পর্য্যন্ত উন্মত্তের-প্রায়, লজ্জা ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মদানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে ছুটিয়া আসিয়া থাকেন। বেনুধ্বনি সর্ব্বভূত মনোহর,—'যার বেনু ধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।' (চৈঃ চঃ—২।২১।১০৮)

(৪) 'রূপ-মাধুর্য্য',—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ-রূপ, অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়,—'যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ' (চৈঃ চঃ—৩।৫।১৮৪)। এই রূপের এমনি আকর্ষণী-শক্তি, যে অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রতিবিম্বে নিজের রূপ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া থাকেন এবং তাহা আলিঙ্গন আস্বাদনের জন্য প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন।—'শৃঙ্গাররস সর্ব্বস্বময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর॥' (চৈঃ চঃ—২।৮।১১২)

পরকীয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইবার কিছু আলোচনা করিব।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—'লক্ষ্মীগণ', 'মহিষীগণ', ও 'ব্রজাঙ্গনাগণ'; তার মধ্যে, লক্ষ্মীগণ শ্রীভগবানের, নারায়ণ মূর্ত্তির

প্রেয়সী ; মহিষীগণ, শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীভগবানের, মহারাজ-লীলা-বিগ্রহের প্রেয়সী ; এবং গোপীগণ, ব্রজবিহারী স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ; ইঁহারা—পরকীয়া। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা, আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—'কন্যকা' ও 'পরোঢ়া'। যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং যাঁহারা পিতৃগৃহে অবস্থান করেন, এইরূপ যে সকল গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তাভাব পোষণ করেন (যেমন কাত্যায়নী ব্রতপরায়না কুমারিকাগণ), —তাহাদিগকে 'কন্যকা' পরকীয়া বলে। আর অন্য গোপের সহিত যাহাদের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু পতিসঙ্গ না করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের নিমিত্ত লালসাবতী—তাহাদিগকে 'পরোঢ়া' কান্তা বলে। বলাবহুল্য, এই 'পরোঢ়া' ব্রজসুন্দরীগণের কখনও সন্তানাদি জন্মে নাই ; যোগমায়া প্রভাবে ও কৃপায়, তাঁহারা কখনও পুষ্পবতী হ'ন নাই।

কৃষ্ণ প্রেয়সীগণ মধ্যে লক্ষ্মীগণ অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের কান্তা এবং তাঁহাদের মধুরভাবে সেবাতেও ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি আছে এবং তাঁহাদের সহিত শ্রীনারায়ণ বিগ্রহের মিলনের আদি ও অবসান নাই। সেজন্য উঁহাদের প্রেমসেবায় মিলনোৎকণ্ঠা ও বিরহাস্বাদন নাই ; এই হেতু মিলন-সুখানুভূতিও অপূর্ণ। মহিষীদিগের বিবাহ-বিধি অনুসারে মিলন হয় এবং আজীবন পতি-বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের লীলা বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রথম-মিলন জন্য উৎকণ্ঠা থাকিলেও, পত্নীরূপে অঙ্গীকৃত হওয়ার পরে, আর ইহাদের মিলন ও যথোচিত সেবা প্রাপ্তির কোনই বাধা বিঘ্ন থাকে না এবং সেই হেতু তদ্রূপ কোন উৎকণ্ঠাও থাকে না। ইঁহারা নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তভাবে পতি-বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের সেবাধিকার পাওয়ায় ইঁহাদের উৎকণ্ঠা-বিহীন নির্ব্বাধ সেবাকে পূর্ণ বলা যায় না। কেন না,—"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে" (উজ্জ্বলনীলমণি),—'বিরহ ব্যতীত কদাপি সম্ভোগের পুষ্টি হয় না'। 'যেখানে নিরন্তর মিলন, বিরহের কোনই আশঙ্কা

নাই, সেখানে মিলনের সুখানুভূতি হয় না। তীব্র ক্ষুধায় অন্ন পাইলে যেমন তাহার রস আস্বাদন হয়, মন্দ ক্ষুধায় কদাপি তাহা হয় না। ব্রজের গোপীগণ সকলেরই 'পরবধূ' বলিয়া অভিমান, কাজেই তাঁহাদের পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবাধে ও নিরুদ্বেগে মিলন সংঘটন হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরহাশঙ্কা ও ও মিলনোৎকণ্ঠা পরিপূর্ণ থাকে। এই অবস্থায় তাঁহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে অনির্ব্বচনীয় সুখ আস্বাদন করেন, তাহার সহিত লক্ষ্মীগণের চিরমিলন এবং মহিষীগণের অবাধ মিলনের আনন্দের তুলনাই হয় না। শ্রীভগবানের লক্ষ্মী ও মহিষীগণের সহিত স্বকীয়া কান্তা-ভাবে এবং গোপীগণের সহিত পরকীয়া কান্তা-ভাব-সম্বন্ধ লীলা রসাস্বাদনও তদনুরূপই হইয়া থাকে। পরকীয়া ভাবের নিত্য নব নব উৎকণ্ঠাময় মিলনে, সম্ভোগ সুখের পূর্ণ পরিপুষ্টি হইয়া থাকে।—

> 'পরকীয়া ভাবে অতি রসে উল্লাস।
> ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥' (চৈঃ চঃ—১।৪।৬৯)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব প্রেমরস নির্য্যাস স্বয়ং আস্বাদন করিবার ও গোপীগণে আস্বাদন করাইবার আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের নিমিত্তই, তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার এই অঘটন সংঘটন—

> 'মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
> যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
> আমিও না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
> দুঁহার রূপে গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥' (চৈঃ চঃ-১।৪ ২৮)

'উপপতি ভাবে',—অর্থাৎ ভগবান প্রকৃতপক্ষে কাহারও উপপতি হইতে পারেন না। যিনি সর্ব্বঘটে নিরন্তর সমভাবে বর্ত্তমান, অপূর্ব্ব রসের খেলা খেলিবার জন্য, নিজ স্বরূপ-শক্তি গোপীগণের সহিত তাঁহারই এই অভিনব মিলন। যিনি জগৎপতি তিনি কি কাহারও পর, যে

তাহার সহিত মিলনে পরপুরুষ মিলন হইবে ? 'উপপতি ভাবে' মিলন; প্রত্যুত, তিনি কাহারও উপপতি হইতেই পারেন না।

ভগবান নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"—

'আমাকে' তো যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে-সে ভাবে ভজি এমোর স্বভাবে॥' (চৈঃ চঃ—১।৪।১৮)

এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে, যে ভক্ত তাঁহার প্রীতি সাধন জন্য যে পরিমাণ আত্মসুখ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ভক্ত সেই পরিমাণে তাঁহার প্রীতি পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। যিনি তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, ভগবানও তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত। এই হেতু দেখা যাইতেছে, মধুর রসাশ্রিত প্রেয়সীগণের সহিতই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সম্বন্ধ; তন্মধ্যে কৃষ্ণের নিমিত্ত গোপীদিগের ত্যাগের তুলনায় মহিষীদিগের ত্যাগ অতীব অকিঞ্চিৎকর। গোপীদিগের নিজের বলিতে যাহা কিছু—কুল, শীল, ভয়, মান, অভিমান, লজ্জা, ধৈর্য্য, 'দেহ-গেহ', ইহকাল-পরকালাদি—সর্ব্বস্বই গোবিন্দের সুখের জন্য উৎসর্গীকৃত, আত্মসুখবাঞ্ছা সম্পূর্ণ তিরোহিত; পরন্তু, মহিষীদিগের কুলমান লজ্জাদি সমস্তই বজায় রাখিয়া, শ্রীকৃষ্ণকেও পাইবার জন্য লালসা, কৃষ্ণকে না পাইলে শত শত জন্ম প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত, তথাচ শ্রীকৃষ্ণের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত পাগলিনী' হইয়া, কুল মান লজ্জাদি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। রুক্মিণীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে তৎকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে লিখিত পত্রই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া না লইয়া আসিলে, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কৈ, তাঁহার জন্য তো গোপীদিগের মত তিনি কুল মান লজ্জাদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর মত গৃহের বাহির হইতে সাহস করিতে পারিলেন না। তারপর দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের এসকলতো বজায় রহিয়াছেই, অধিকন্তু

তাঁহারা সকলেই পুত্রকামী,—তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দশ দশটি করিয়া পুত্র, এবং ইহাদের প্রতি তাঁহাদের আবেশও বড় কম নহে। লৌকিক বিধিমতে, সন্তান স্তন্য-পান ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত, পতি-পত্নীর কোন প্রকার দৈহিক ভোগ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অবৈধ। এতাবত কাল তাঁহারা নিজ অঙ্গদানে পতি সেবায় বঞ্চিত, ইহা তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই, পুত্র আকাঙ্ক্ষায়, বরণ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের যখন এত সকল বিষয়ে এতাদৃশ অভিনিবেশ রহিয়াছে, তখন গোপীদিগের তুলনায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে আবেশ কতটুকু, এবং ভগবানের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে, ভগবানেরও তাঁহাদের প্রতি আবেশ কতটুকু? এজন্যই তিনি মহিষীদিগকে বুকে ধরিয়াও, নিদ্রিত অবস্থায়, রাধা প্রভৃতির জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকেন! আর গোপীদিগের ক্ষেত্রে কি দেখি,—তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্ব্বক্ষণ সম্পূর্ণ আবেশ এবং তাঁহার সুখের জন্য তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না, জগতে এমন কিছুই নাই; তাঁহাদের দেহ চিরপবিত্র এবং কৃষ্ণ সেবায় সদা উন্মুখ, এমন কি যোগমায়া প্রভাবে তাঁহারা কখনও পুষ্পবতী হয়েন না। কৃষ্ণগত-প্রাণ গোপীরা এ প্রকার সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করিয়াছেন যে সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবানকে পর্য্যন্ত হার মানাইয়া তাঁহাদের প্রেমে ঋণী করিয়াছেন! তাঁহাকে পুলকিত অন্তরে নিষ্কপটে বলিতে হইয়াছে,—'ব্রহ্মার পরমায়ু পাইলেও তোমাদের অনুরূপ ভজন করিয়া, তোমাদের ঋণ আমি কোন প্রকারে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব না।'—"ন পারয়েহং" ইত্যাদি, (ভাঃ ১০।৩২।২১)—ভগবৎ উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লজ্জা-কুলশীল-মান, পুত্র, 'দেহ-গেহা'দি কোন দ্বিতীয় বস্তুতে কিছুমাত্র আবেশ থাকিতে, ও একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনবোধ থাকিতে, গোপীদিগের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমোন্মাদভাব লাভ করা কদাচ সম্ভবপর নহে। একারণ দিব্য-উন্মাদাদি মহাভাবের লক্ষণ একমাত্র গোপীতেই বর্ত্তমান, মহিষীগণে বা অন্য কুত্রাপি নহে, এবং পরকীয়াভাবে বিভাবিত কেবল

গোপীদিগের মুখেই এরূপ বলা সম্ভব,—"জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥" ; "তুহুঁ ক্রোড়ে তুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া, তিল এক না দেখিলে যায় যে মরিয়া।" ; আবার, "এমত পীরিতি কভু না দেখি না শুনি, পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥" ; এবং গোবিন্দ-দর্শনে-বাদী নয়নের নিমেষকে নিন্দা করা কেবলমাত্র গোপীতেই সম্ভব। এই কারণেই, ভগবানের সহিত মিলনের জন্য গোপীদিগের ঐরূপ উদ্‌ভ্রান্ত পাগলিনীর ভাব দেখিয়া, তাঁহাদের পদধূলি পাইবার নিমিত্ত, উদ্ধব নারদাদি ভাগবতোত্তমগণের বৃন্দাবনের একটি তৃণ লতা গুল্ম হইবার আকাঙ্ক্ষা। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—'পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥' (চৈঃ চঃ—১ ৪ ৪৬)

এইখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গোপীসহ গোপীনাথ মধুর পরকীয়া রস আস্বাদন করিবেন বলিয়াই, তিনি সাধ করিয়া যোগমায়া কর্ত্তৃক আত্ম-বিস্মৃতি ঘটাইয়াছেন ; নতুবা, গোপীরা প্রকৃতপক্ষে যে পর-বধূ নহেন, রাসলীলা প্রসঙ্গে পরম লীলা-রসতত্ত্বজ্ঞ শুকদেব গোস্বামীপাদ বহু স্থানে তাঁহাদিগকে 'কৃষ্ণবধূ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গোপীগণও উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ; পরিনীতা পত্নী ভিন্ন পর-পুরুষকে কেহ আর্য্যপুত্র বলিতে পারে না। তবে তাঁহাদের সহিত অপর গোপগণের যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা কেবল প্রতীতি মাত্র ; বস্তুত, তাঁহাদের সঙ্গে গোপীদিগের দৈহিক কোন প্রকার সম্পর্কই ঘটে নাই, কেবল তাঁহারা পরকীয়া এই অভিমান জাগাইবার জন্য যোগমায়া কর্ত্তৃক এইরূপ অপূর্ব্ব কৌশল মাত্র। শ্রীভগবানের নিমিত্ত, স্ত্রীলোকের প্রাণ, অপেক্ষাও দুস্ত্যজ, পতি-ত্যাগ প্রদর্শন জন্যই এই বিচিত্র লীলা সমাবেশ।

এইবার আমরা, অতি সংক্ষেপে, মূল রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব এবং ভাগবত হইতে আমাদের এই প্রবন্ধের উপযোগী বিশেষ বিশেষ

অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব।—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শারদ-পূর্ণিমায় পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত রাসলীলার সম্পূর্ণ অনুকূল প্রকৃতির শোভা অবলোকন করিয়া, গোপাঙ্গনাগণকে যমুনা পুলিনে নিজ সমীপে আনিবার জন্য, মন-প্রাণ-আকর্ষী পরম মধুর বংশী-ধ্বনি করিলেন। সেই ধ্বনি কেবল শ্রীকৃষ্ণসহ মিলনে একান্ত উৎকণ্ঠিতা গোপীগণই শুনিতে পাইলেন; আর কাহারও কর্ণগোচর হইল না। বংশীধ্বনি শুনিবামাত্র গোপীগণ তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্যসমূহ—গোদোহন, রন্ধন, শিশুকে দুগ্ধ-পানকরান, ভোজন, পতিসেবা প্রভৃতি, তদবস্থায়ই পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণ সমীপে গমন করিলেন। কেহ বা ব্যস্ততা প্রযুক্ত, বেশভূষার বিপর্য্যয় অবস্থায়, পরস্পর কেহ কাহারও উদ্যম কাহাকেও না জানাইয়া, কৃষ্ণ অন্তিকে গমন করিলেন। ভগবান গোবিন্দ, তাঁহাদের চিত্ত আত্মসাৎ করায়, তাঁহারা বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন; একারণ প্রস্থান-কালে তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ নিষেধ করিলেও, তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না। প্রেম-রূপিণী ব্রজগোপীদিগের পবিত্র-চিত্ত সংসারের আকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিরা উঠিয়াছিল, তাই যোগমায়ারূপী শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-শক্তি, বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ সমীপে পৌঁছাইয়া দিল; কাহারও কোন বাধাই, প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াও, কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। গৃহ মধ্যে অবস্থিতা কতকগুলি গোপী প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত, কোন ক্রমেই গৃহ মধ্য হইতে বহির্গত হইতে না পারিয়া, তদবস্থাতেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত গোপীগণের দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণ বিরহতাপে সর্ব্ববিধ অশুভ দূর হইয়া গেল; এবং ধ্যানযোগে মিলনপ্রাপ্তি-জনিত পরমানন্দে সর্ব্ববিধ শুভেরও অবসান হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ধ্যানযোগে উপপতি বুদ্ধিতে সেই পরমাত্মাকে পাইয়া, সর্ব্ববিধ বন্ধন মুক্ত হইয়া গেল; এবং তৎক্ষণাৎ গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিল।—এইখানে একটা কথা জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ

প্রেয়সী গোপীগণ নিত্য-সিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ। এই সাধন-সিদ্ধাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্তির অনুরূপ প্রেম, পরিপক্কতা লাভ করে নাই, এই হেতু গোপীগণের দেহে প্রাকৃতাবেশাংশ থাকায়, সেই সমস্ত দেহই, তাঁহাদের পতিগণ অবরোধ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই গুণময় দেহই তাঁহারা ত্যাগ করিলেন।

যাহা হউক, ঐ গোপীগণের ঐ ভাবে গুণময় দেহ ত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা পরীক্ষিৎ সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন.—'হে মুনে, ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র কান্ত বলিয়াই জানিতেন, তাঁহাদের কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণতে ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না; কিন্তু তথাপি সেই গুণাসক্ত ব্রজরমণীগণের কি প্রকারে গুণময় দেহের নিবৃত্তি হইল?—তাহাতে শ্রীশুকদেব বলিলেন,—'শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও যখন ভব-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া গুণময়-দেহ মুক্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহার্দ্য, প্রভৃতি যে কোন ভাবেই কেহ ভগবানকে ভজনা করুন না কেন, তিনি সেইভাবেই তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন। অচিন্ত্য-শক্তি-নিকেতন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলায়, বা মহিমায়, আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই; শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণের গুণময় দেহ নিবৃত্তি হওয়া তো সামান্য কথা, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে, ক্ষণকাল মধ্যে সর্ব্ব জগৎ গুণবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক, বাক্য-বিশারদগণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ বেণু-নাদ-আকৃষ্ট, গোপীগণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া, প্রথমে স্বাভিপ্রায় সঙ্গোপন করতঃ, ঔদাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক, বিমুগ্ধ করিবার অভিলাসে, বলিতে লাগিলেন। (শ্লোকগুলির (ভাঃ—১০।২৯।১৮-২৭) বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল)—

(১) **"হে ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের শুভাগমন ত? তোমাদের**

কি প্রিয়াচরণ করিব ? ব্রজের মঙ্গল ত ? তোমাদের এখন এখানে আগমনের কারণ কি বল।

—ইহা বিলাসময় বাক্য-ভঙ্গি। নিজেই আহ্বান করিয়া নিজেই আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

(২) "এখন রাত্রিকাল, অতি ভয়ঙ্কর সময় ; হিংস্র জন্তু ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ; হে সুন্দরীগণ, এ সময়ে স্ত্রীজাতির এখানে অবস্থান করা উচিৎ নয়, অতএব ব্রজে ফিরিয়া যাও।

—এইবার, গোপীদিগের ভগবৎ-প্রেমের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার ভান করিয়া, প্রথমে প্রাণভয় দেখাইলেন।

(৩) "তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে না দেখিয়া অনুসন্ধান করিতেছে ; আত্মীয় স্বজনের মনে উদ্বেগ উৎপাদন করিও না।

—এই শ্লোকে কর্ত্তব্য-ভঙ্গের লৌকিক ভয় দেখাইলেন। ইহাও এক পরীক্ষা ;—গোপীদিগের নিকট লৌকিক ব্যবহার বড়, কি শ্রীকৃষ্ণ বড়।

(৪) "যমুনাস্পর্শী মন্দমারুতে আন্দোলিত তরুপল্লবে সুশোভিত, চন্দ্রালোকে আলোকিত, কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করা হইল ত ; তবে আর কেন, এখন ব্রজে ফিরিয়া যাও।

—কর্ত্তব্য-ভঙ্গের ভয় দেখাইলে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া, গোপীগণ অভিমানে মুখ ফিরাইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণের ভাব দেখাইলে, প্রণয়গর্ভ এই পরিহাস-বাক্য বলিলেন। তাহাতে তাঁহাদের প্রণয়-কোপ আরও বৃদ্ধি পাইল।

(৫) "হে সাধ্বীগণ, তোমরা অতিসত্বর ব্রজে ফিরিয়া যাও, এবং নিজ নিজ পতিসেবায় রত হও। বৎস ও বালকগণ রোদন করিতেছে। গৃহে গিয়া গাভী দোহন এবং শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাও।

—গোপীদিগের ভাব যেন লক্ষ্য না করিয়াই তিনি এই শ্লোকে পরিহাস মূলক শ্লেষাত্মক আশ্বাস-বাক্য প্রয়োগ করিলেন; এবং তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা যেন একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে বোঝাইয়া দিলেন। এই শ্লোকে এবং এই রাসলীলায় বর্ণনায় অন্যত্রও, 'পুত্র' শব্দ প্রয়োগ আছে, ইহা ভগ্নী, ভ্রাতা প্রভৃতির পুত্র, অথবা সম্পূর্ণ পরিহাস-বাক্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস-বিলাসাদি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্র হওয়া তো দূরের কথা, কদাপি পতিগণের সহিত অঙ্গসঙ্গই হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের মতে এই সময় ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন বয়স; লীলা কৌতুক বশতঃ, যোগমায়া শক্তি প্রভাবে, অন্য গোপের সহিত বিবাহিত মাত্র। তাঁহাদের সহিত ইহাদের কোনরূপ দৈহিক স্পর্শ হয় নাই। তাঁহারা নিজ স্বামীকে, স্বামী বলিয়াই মনে করিত না।

(৬) "অথবা যদি আমার প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া থাক, তাহাই করিয়াছ সন্দেহ নাই; কেননা জীব মাত্রই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে।

—এই শ্লোকে বাহ্যতঃ যদিও আশ্বাসের আভাস রহিয়াছে তথাপি সাধারণ জীবের সহিত তাঁহাদের আচরণ এক পর্য্যায়ে গণ্য করায়, তাঁহাদের অভিমান-বহ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

(৭) "কল্যাণীগণ, অকপটে নিজ নিজ পতি ও পতি-বন্ধুগণের সেবা এবং সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম।

—এই শ্লোকে পতি-সেবাদি স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম, এবং তাহা পরিত্যাগ অতীব গর্হিত; ও ঐহিক পারত্রিক ঘোর অশুভপ্রদ,—তাহাই জানাইলেন।

(৮) "যে সকল রমণীর ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অভিলাষ আছে তাঁহাদের পতি,—দুশ্চরিত্র, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, অক্ষম, রোগী কিম্বা দরিদ্র হইলেও, যদি পাতকী না হয়েন, তবে কোন রূপেই পরিত্যজ্য নহেন।"

—ধর্ম্ম ভারতবর্ষীয়া আর্য্য-নারীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং বিনয়, নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও গৃহকার্য্যে অনুরাগ তাহাদের অযত্ন-লভ্য স্বাভাবিক স্বর্গীয়ভূষণ। প্রেম-পরীক্ষক ভগবান দেখিলেন,—গোপীগণ তাঁহার জন্য প্রাণ-পরিত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন এবং রমণীভূষণ লজ্জাদিও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত; একারণ এখন ধর্ম্মনাশ ও সদাচারের ভয় দেখাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীজাতির অন্য কোনও ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন নাই; একমাত্র পতি সেবাতেই তাহাদের সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া যায়; পক্ষান্তরে, পতিকে অনাদর করিয়া, শত শত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, তাহা বিফল। এইরূপ শাস্ত্রাভিপ্রায় দেখাইয়া, ভগবান্ গোপীদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

(৯) "দেখ, কুলনারীর উপপতি সংসর্গ, অতি তুচ্ছ অথচ কষ্টসাধ্য ও ভয়াবহ; উপপতি-সঙ্গ করিলে কুলনারীর পূর্ব্ব-কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়, দেশ বিদেশে নিন্দার সীমা থাকে না, এবং পরজন্মে স্বর্গলাভও হয় না।"

—ইহা কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সকল প্রকার ভয় প্রদর্শণের সারোপসংহার।

(১০) "শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে ও কীর্ত্তনে, আমার প্রতি যেরূপ অনুরাগ জন্মে, আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না; অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও।"

—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে, ঔপপত্য কুলস্ত্রীগণের পক্ষে কিরূপ ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় তাহাই দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করিলেন; তাহাতেও যখন কোন প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তখন সর্ব্বশেষে প্রতি নিবৃত্ত করিবার, প্রকারান্তরে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ, বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং কৌশলে ভগবান আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন,—"তোমরা যদি ভগবান বলিয়া আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে চাও, তবে গৃহে

গিয়া অদর্শন জন্য কাতর প্রাণে অনুক্ষণ আমার লীলাগুণকীর্ত্তন কর। আমার নিকট থাকা অপেক্ষা, তাহাতে অধিকতর অনুরাগ জন্মিবে। ইহার আর কি প্রত্যুত্তর আছে?—এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদি গোপীগণ ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিনিবৃত্তি সূচক বাক্যের প্রতিবাদে এই কথা বলেন যে,—তাঁহার জন্য লজ্জা, মান, ভয়, কুলশীলাদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সেবা করা সকলের পক্ষে পরম কল্যাণকর;—তদুত্তরে, যেন ভগবান বলিলেন,—'আমার নিকট থাকা অপেক্ষা, দূরে দূরে থাকিয়া, আমার লীলাগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তনে অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইবে। অতএব আর প্রতিবাদ না করিয়া তোমরা গৃহে যাও।'

ভগবান গোপীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য, অকাট্য প্রমাণসহ যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই শাস্ত্রবিধিসম্মত এবং লৌকিক বিচারে সুসঙ্গত; বাহ্য দৃষ্টিতে তাহার উপর কথা বলিবার আর কিছুই নাই,—এ সমস্তই বিধি মার্গের সদাচার সম্পন্ন সদুপদেশ; কিন্তু ভগবান ভক্তাধীন, তিনি চিরদিনই ভক্তের নিকট হার মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তম গোপীদিগের কাছেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন?—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা বলিলেন, গোপীগণ তাহা সমস্তই স্বীকার করিয়া, তৎপরে তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা যাহা বলিবেন, তাহা অনেক উচ্চস্তরের কথা। তাহা শোনাইয়া তাঁহাকে একেবারে নির্ব্বাক করিবেন। এইভাবে নিজের পরাভব স্বীকার করিয়া পুলকিতান্তরে জগতে গোপীদিগের জয় ঘোষণা করিয়া, ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ রসিকের-শিরোমণি এবং ভাবুকের-চূড়ামণি,—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একান্ত কৃপাপাত্র,—তাঁহারা, এই দশটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় অসাধরণ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক শ্লোকের বাহ্যতঃ নিবারণ (প্রত্যাখ্যান), বা উপেক্ষা; ও অন্তরে, অনুমোদন, বা প্রার্থনাময়-ভঙ্গি, উভয় পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহা

অতি সুন্দর ও সুসঙ্গত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা, আর এস্থলে বিবৃত হইল না।

ভগবান গোপীদিগকে যাহা যাহা বলিলেন ভাগবতের দশটি শ্লোকের অনুবাদে, উপরে তাহা বর্ণিত হইল ; এবং উহার প্রত্যুত্তরে গোপীগণ এগারটি শ্লোকে যাহা যাহা বলিবেন. তাহাও সবিস্তারে পরে বর্ণিত হইবে ; তাহার কারণ এই উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যেই রাসলীলার সকল রহস্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এগুলি বিশেষ ভাবে অনুধাবন যোগ্য।

রসিক-শিরোমণি, বাক্‌বিশারদ-চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বংশী-ধ্বনিতে গোপীগণকে আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহাদের সুগুপ্ত প্রেমের বার্ত্তা তাঁহাদের নিজমুখে ব্যক্ত করাইয়া, স্বকর্ণে শ্রবণ করিবেন, এবং সেই অতুলনীয় প্রেমসিন্ধুর বিন্দু কণিকা, প্রেমবান ভক্তগণকে কিছু আস্বাদন করাইবেন, এই অভিপ্রায়ে কৃত্রিম-বাক্যের আবরণ দিয়া, এমন ভাবে বাক্-বজ্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়-কোষাগারের লজ্জা ধৈর্য্যাদির কপাট চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া, তাহা হইতে সুদুর্লভ প্রেম রত্নরাজি বহিস্কৃত হইয়া পড়ে, এবং ভগবান কীদৃশ প্রেমোন্মাদিনীগণের সহিত ঈদৃশ-রাসবিলাস করিয়া থাকেন তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস জগতের লোক পা'ন। বস্ত্রহরণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের উন্মুক্ত দেহ দেখিয়াছেন, আর আজ তাঁহাদের উন্মুক্ত হৃদয় দেখিবার লালসায় এই প্রত্যাখ্যান ভঙ্গিমা।

সে যাহা হউক এক্ষণে যাঁহার জন্য সমস্ত ভোগবাসনা জলাঞ্জলি দেওয়া হইল, সেই শ্রীগোবিন্দের মুখে, এতাদৃশ দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে গোপীগণ ভগ্নমনোরথ ও বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহাদের চিন্তার পরিসীমা রহিল না। তখন কৃষ্ণানুরক্ত গোপীগণ শোক-সন্তপ্ত ও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া অভিমান ভরে, কিঞ্চিৎ কোপাবেশে, গদ্ গদ্ বাক্যে, বলিতে আরম্ভ করিলেন—

(১) "হে বিভো, আমাদিগকে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার

উচিৎ নয়। হে স্বচ্ছন্দ পুরুষ, আমরা ঐহিক, পারত্রিক সমস্ত ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণমূলে আশ্রয় লইয়াছি; অতএব যেমন আদিদেব নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেন, সেইরূপ আমাদিগকে গ্রহণ কর ;—পরিত্যাগ করিও না।

—'বিভো'—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বান্তর্যামী। শ্রীকৃষ্ণকে 'বিভো' বলিয়া সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—'তুমি যখন সর্ব্বান্তর্যামী, তখন অবশ্য আমরা সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া, কেবল তোমার সেবাকাঙ্ক্ষায়, তোমার চরণে একান্ত শরণাগত, তাহা (আমাদের হৃদ্গত ভাব) সম্যক অবগত হইয়াও, আমাদিগকে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার কদাচ উচিৎ নয়।

—ইহা তো ঈশ্বরোচিৎ সম্বোধন এবং ঈশ্বরোচিৎ বিজ্ঞাপন। অতএব, বুঝিতে পারা যায় যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়াই তাঁহার আশ্রয় লইয়াছেন ; এবং এই শ্লোকেই, পরবর্ত্তী বাক্যে গোপী-দিগের অত্যুচ্চ ঈশ্বরানুরাগই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাঁহারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ প্রার্থনা করিতেছেন না ;—তাঁহার ভগবানের প্রীত্যর্থে, তাঁহার ঐকান্তিক সেবা প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্রজের গোপ-গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সময় সময় ঈশ্বরোচিৎ ঐশর্য্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠে ; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা উচ্ছ্বসিত প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

(২) "হে কৃষ্ণ, আমরা বুঝিলাম ধর্ম্মশাস্ত্রে তুমি 'দিগ্‌গজ' পণ্ডিত; তুমি যে বলিলে,—'পতি, পুত্র ও সুহৃদবর্গের সেবা স্ত্রীজাতির স্বধর্ম্ম'—তাহা সত্যই ; আমরা তাহা স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তুমি ঈশ্বর, অতএব তুমিই তোমার ঐ উপদেশের বিষয়, বা একান্ত যোগ্য পাত্র,—অর্থাৎ, তোমার সেবাতেই আমাদের সর্ব্ব সেবা সিদ্ধ হউক ; কারণ তুমি নিখিল দেহধারীর আত্মা, প্রিয়তম ও বন্ধু।

যাহারা, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাকৃত পদার্থই পরম পদার্থ এবং প্রাকৃত সুখই চরম সুখ মনে করে ;—পরমবস্তু ও পরমানন্দের স্বরূপ

অবগত নহে তাহাদেরই জন্য বিধি-নিষেধাত্মক বেদাঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্র। পরন্তু, যাঁহারা পরমবস্তুর তত্ত্ব অবগত হইয়া, পরমানন্দের আস্বাদনে সাংসারিক সকল প্রকার ভোগসুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য উহা নহে। যাঁহারা আনন্দঘন মদনমোহন রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাকৃত সমস্ত ভোগসুখ তৃণবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাঁহারই আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই ;—সুতরাং, ভগবৎ-সর্ব্বস্ব গোপীদিগেরও নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, গোপীদিগের ন্যায় উচ্চাধিকারীর পক্ষেই এই ব্যবস্থা, নিম্নাধিকারীর বৈধ-ধর্ম্মত্যাগে পাপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইলে, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ থাকে না ; বস্তুতঃ, তাহার প্রয়োজনও থাকে না ; এবং সে অবস্থায় ধর্ম্ম-ত্যাগে কোনপ্রকার প্রত্যবায়ও হয় না।

জগৎপতি ভগবানের সেবা প্রাপ্তির উপায়-রূপেই পতিব্রতা রমণীগণের পতি-সেবাঙ্গ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। তাঁহার সেবা অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র জাগতিক পতি-সেবাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই সার্থকতা নাই। জগৎপতির প্রতিনিধি বুদ্ধিতেই, জাগতিক পতির সেবা বিধেয়। যতদিন পর্য্যন্ত জগৎপতির সাক্ষাৎ সেবার অধিকার না হয়, ততদিনই নানাবিধ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত বাধ্য-বাধকতা থাকে ; কিন্তু জগৎপতির সাক্ষাৎ-সেবা পাইলে আর অপর কাহার সেবার দায়িত্ব, বা বাধ্য-বাধকতা, থাকে না। অতএব গোপীগণ ঠিকই বলিলেন—'তোমার সেবাতেই পতিপুত্রাদি সকলেরই সেবা সিদ্ধ হউক'।

যেমন পতি বিদেশে অবস্থান কালে চিত্রপটে তাহার পূজা করিলেও, ঐ পতি গৃহে প্রত্যাগত হইলে চিত্রপটে পূজার আর কোনই সার্থকতা থাকে না ; তদ্রূপ সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি হইলে; আর তাঁর প্রতিনিধি-পূজার কোনই সার্থকতা থাকে না।

এই শ্লোকটিতে গোপীগণ যাহা বলিলেন, তাহা সমস্ত উপনিষদের সারাংশ, বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত এবং সাধকের ভগবৎ প্রাপ্তির

অব্যবহিত সাধন। সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া গোপীগণ তাঁহাকে "ধর্ম্মবিদ্" (ধর্ম্মশাস্ত্রের 'দিগ্‌গজ' পণ্ডিত !) বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন।

(৩) "তুমি সকলেরই আত্মাস্বরূপ, সুতরাং নিত্যপ্রিয়; এইজন্য পণ্ডিতগণ তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন। পতি-পুত্রাদি কেবল দুঃখ দায়ক; তাহাদিগকে লইয়া কি হইবে? অতএব হে বরদ-শ্রেষ্ঠ, হে কমললোচন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও; বহুদিন হইতে তোমার আশায় আছি, সে আশা ছেদন করিও না।"

—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দুটি বিশেষণ দিলেন,—'স্বে-আত্মনি' এবং 'নিত্য প্রিয়'। "নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্বং—আত্মত্বং"—'আত্মাই অহৈতুক প্রেমের বিষয়'। সেই চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্যামী আত্মাই বাহিরে বিগ্রহবান শ্রীকৃষ্ণ। "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত,"—'হে অর্জ্জুন, আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আত্মাস্বরূপে আছি!' (গীতা—১০।২০); এবং ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে আত্মার-আত্মা পরমাত্মা বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং,"—'এই কৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা, জানিও' (ভাঃ—১০।১৪।৫৫); আবার শ্রুতি বলিয়াছেন —'এই আত্মা যাহাকে কৃপা করেন, তাহারই নিকটে নিজ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন'। অতএব যদি আত্মা স্বাভাবিক প্রেমাস্পদ হইলেন, তাহা হইলে পরমাত্মা অধিকতর প্রেমাস্পদ এবং সেই পরমাত্মাই যখন তনুমান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তিনি স্বাভাবিক অধিকতম প্রেমাস্পদ। জরাজীর্ণ, অথবা অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইলেও, মনুষ্য মরিতে চায় না; তাহার কারণ—আত্মপ্রেম; ঐ শরীর হইতে আত্মা প্রিয়।

দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয়, জীবাত্মা প্রিয়তর এবং পরমাত্মা প্রিয়তম। পরমাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া জীবাত্মা প্রিয় এবং জীবাত্মাকে অপেক্ষা করিয়াই দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয় হইয়া থাকে। পার্থিব কোন পদার্থই নিত্য-প্রিয় নয়,—নিত্য-প্রিয় কেবল আনন্দ। সেই

আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপ্রিয়। অতএব গোপীগণ পরমার্থ-তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছেন।

(৪) "পূর্ব্বে আমাদের চিত্ত আনন্দের সহিত গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিত, তুমি আমাদের সেই মন অপহরণ করিয়াছ এবং পূর্ব্বে আমাদের যে হস্ত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, সেই হস্তও তোমা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, কেননা হস্তাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের অধীন। আমাদের পা তোমার চরণসমীপ হইতে এক পাও চলিতে চায় না,—তবে বল দেখি, আমরা কিরূপে ব্রজে যাই এবং গিয়াই বা কি করিব?"

—ইহা দ্বারা গোপীগণ সুস্পষ্ট জানাইলেন তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা থাকিলে তবেত গৃহে যাইবেন। বংশীরবে তাঁহাদের মন-প্রাণ অপহৃত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাগমন কোনমতে সম্ভব নহে; এবং তাহা কোন প্রকারে সম্ভব হইলেও, তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রকার গৃহকর্ম্ম আর সম্ভবপর নহে।

(৫) "হে সখে কৃষ্ণ, তোমার সহাস্যবদন অবলোকনে এবং সুমধুর মুরলী গান শ্রবণে আমাদের কামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব তুমি তোমার অধরামৃত সেচন দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত কর। তাহা না করিলে আমরা কামানলে তো দগ্ধ হইতেছিই, তাহার উপর তোমার বিরহানলে অধিকতর দগ্ধ হইয়া, ধ্যানেতেই তোমার চরণ সমীপে উপস্থিত হইব।"

—প্রগাঢ় প্রেমে ভগবানকে আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। তাই গোপীগণ 'সখে' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। গোপীগণ বর্ত্তমান শরীরে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে, মরিয়াও পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; —প্রকৃত প্রেমের স্বভাবই এইরূপ।

(৬) "হে কমললোচন, বনবাসীগণই তোমার পরম প্রিয়; আমরাও বনবাসিনী। সেইজন্য লক্ষ্মীরও আনন্দদায়ক তদীয় চরণতল কদাচিৎ যখন স্পর্শ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি,—দুঃখের কথা

বলিব কি, তদবধি সত্যই, অন্য কাহারও নিকটে অবস্থান করিতে পারি না।”

—প্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনা পরমানন্দময় মূর্ত্তিমান ভগবানের দর্শন ও স্পর্শন পাইয়াছেন ; সুতরাং তাহাদের সমস্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তু তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত সাধক মাত্রেরই এই অবস্থা। গোপীগণ বেদানুমোদিত চরম কথাই বলিতেছেন।

(৭) “ব্রহ্মাদি অন্যান্য দেবতাগণ যাঁহার কৃপাকটাক্ষ পাইবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত, সেই লক্ষ্মী তোমার বক্ষঃস্থলে স্থান পাইয়াও তুলসীর সহিত ভক্ত-সেবিত চরণরজঃ প্রার্থনা করিয়া থাকেন ; সেইরূপ আমরাও তোমার পদরজঃ প্রার্থিনী হইয়াছি।

(৮) “অতএব, হে ক্লেশনাশন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা তোমারই উপাসনা করিবার অভিলাষে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি ; হে পুরুষোত্তম, তোমার মধুর হাস্য ও সপ্রেম নিরীক্ষণে আমাদের হৃদয় উৎকট কামে জর্জ্জরিত হইতেছে, আমাদিগকে দাস্যে নিযুক্ত কর।

(৯) “আমরা তোমার কুণ্ডলালঙ্কৃত গণ্ডস্থল, সুধাময় বিম্বাধর, সহাস্য-দৃষ্টিপাতযুক্ত অলক-রাজিত শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া, তোমার অভয়প্রদ, সুদীর্ঘ বাহু যুগল নিরীক্ষণ করিয়া এবং তোমার কমলানন্দ-দায়ক বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া, দাসী হইতে আসিয়াছি।”

—এই উপরের তিনটি শ্লোকে দাস্যভাবের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাকৃত জগতে প্রভুত্বেই সুখ ; সুতরাং সকলেই প্রভুত্ব চাহে। দাসত্ব সহজে কেহ চায় না। কিন্তু অপ্রাকৃত নিত্যানন্দময়ের দাসত্বের যে সুখ, তাহা শতভৃত্য-পরিসেবিত আসমুদ্র-ক্ষিতিপতিও কল্পনাতে আনিতে পারেন না। **এই দাস্যময় বাক্য,—মাধুর্য্যাত্মক-দাস্য বুঝিতে হইবে,—ইহা চাকরাণীর দাস্য নহে।**

আমাদের দেশের বিনয়ালঙ্কৃত আর্য্য ললনাগণ আপন পতিকে পত্র

লিখিবার সময় নিজেকে সেবিকা, বা দাসী, নামে অভিহিত করিয়া গৌরব বোধ করিতেন, ইহাই আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত শিষ্টাচার। ইহার ভিতর এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য নিহিত রহিয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য আসুরিক সভ্যতার অনুকরণে এই শিষ্টাচার অপমানজনকবোধে ক্রমেই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহা দেশের পরম দুর্দ্দৈব বলিতে হইবে।

আমরা আমাদের দেশের সীতা-সাবিত্রীকে আদর্শ আর্য্য রমণী বলিয়া গৌরব বোধ এবং পূজা করিয়া থাকি; কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতাভিমানিনী-গণ তাঁহাদের আচরণ অনুবর্ত্তন করা অপমানজনক মনে করেন! সীতা-সাবিত্রী উভয়েই রাজকন্যা ও রাজমহিষী ছিলেন, তথাপি তাঁহারা আপনাদিগকে দাসী অভিমানে, নিজ নিজ শ্বশুর-শাশুড়ীর ও স্বামীর পদ সেবা ও চরণ বন্দনা করিতেন এবং হৃষ্টচিত্তে স্বয়ং স্বহস্তে রন্ধন করতঃ, তাঁহাদিগকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া নিজদিগকে পরম সৌভাগ্য-বতী মনে করিতেন। সাবিত্রী রাজার একমাত্র সন্তান, তথাপি শ্বশুরালয়ে রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুর ও স্বামীর অমর্য্যাদা আশঙ্কায় পিতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কার বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীপ্রদত্ত শাঁখা-সিঁদুর ও সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে রন্ধন এবং পরম নিষ্ঠার সহিত স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী ও তপোবন-বাসীগণের পরিচর্য্যা ও প্রণামাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করায়, ঋষিগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণের "অবৈধ্যাশিষঃ" ('অবৈধব্য আশীর্ব্বাদ') লাভ করায় যমরাজের প্রসাদে, মৃতস্বামীকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং তাঁহার বরে শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের সকল প্রকার আপদের উপশান্তি ঘটাইয়া, উভয় কুল উজ্জ্বল করিলেন! ঈদৃশ সেবা আচরণই আর্য্য নারীজাতির তপস্যা; এবং এইরূপ তপস্যা প্রভাবে এই প্রকার অসাধ্য সাধন সংঘটন হইয়া থাকে—ইহাই আর্য্য ঋষিদিগের উপদেশ। তাঁহাদের আর অন্য তপস্যায় প্রয়োজন নাই। যেদেশের পত্নী, পতির সেবা করিলে, বা পুত্র পিতার সেবা করিলে, অমনি তাঁহারা বিব্রত হইয়া সেবার পরিশোধ-রূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া

তবে নিশ্চিন্ত হয়েন, সেই দেশের রীতি-নীতির অনুসরণ করিবার জন্য আধুনিক শিক্ষিত সমাজ লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে! ইহাতেই বোঝা যায় আমাদের আদর্শের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে গুরুজনের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় প্রতি সংসারে বিমল সুখ শান্তি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে! গৃহে হাজার মন-কষাকষি, 'খট-মট' হইলেও বধূমাতারা যদি দিবাবসানে বিশেষ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পদসেবা করেন তাহা হইলে সেই দণ্ডেই তৎসমস্ত আগুন জল হইয়া যায় —(ইহা এক অমোঘ অস্ত্র কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন) এবং প্রত্যক্ষ গুরুজনের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ধন্য হইয়া যান। যে ভাগ্যবতীরা ইহার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। গুরুজনের তরে রন্ধন, হৃষ্টচিত্তে স্বয়ং পরিবেশন ও গুরুজনের পদ-সংবাহন ইহাই তো আর্য্য নারীজাতির তপস্যা এবং ইহা পরম কল্যাণকর।

(১০) "হে কৃষ্ণ, তুমি বলিয়াছ, উপপতি আশ্রয় করা স্ত্রীজাতির পক্ষে অত্যন্ত নিন্দিত। আচ্ছা বল দেখি, ত্রিভুবনে এমন নারী কে আছে, যে তোমার মনোহর-পদবিশিষ্ট অমৃতময় বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং ত্রিভুবন সুন্দর ঐ রূপ অবলোকন করিয়া, আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হয়? তোমার গীত শ্রবণে এবং তোমার রূপ দর্শনে গাভী-মৃগ-পক্ষী ও বৃক্ষসকল রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।"

—স্ত্রীজাতির উপপতি আশ্রয় করা অতীব নিন্দিত জঘন্য কার্য্য তাহা আমারও কোনমতে অস্বীকার করিতেছিনা; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এ দোষ আমাদের,—না, তোমার? ত্রিভুবনে এমন কেহ আছে কি, যে তোমার বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার ঐ ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়?—তোমার ঐ অস্ফুট মধুর বেণুধ্বনি শ্রবণে ও রূপ-মাধুর্য্য দর্শনে,—আমরা তো মেয়ে মানুষ, তাহাতে

স্বজাতি, সমবয়সী, ব্রজবাসী, আমাদের কথা স্বতন্ত্র ;—উহা শ্রবণ করিয়া কত দেবাঙ্গনা, ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, শিবাণী, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মী পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসে। যথা,—

'সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবে মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোলে হইতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে॥" (চৈ চঃ—২।২১।১১৭)

—নারীতো দূরের কথা, পুরুষ পর্য্যন্ত পাগল হইয়া যায় ; অধিক কি, তোমার রূপ দেখিয়া তুমি নিজেই পাগল হইয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য লালায়িত হও ! যথা,—

'রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।' (ঐ—২।২১।১০৪)

—মানুষতো দূরের কথা, পক্ষীগণ আত্মহারা-প্রায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে ; গো-মহিষাদি পশুগণ মুখের তৃণ মুখে করিয়া, এক দৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া থাকে ; তোমার বংশীগান শ্রবণে শুষ্কতরু পল্লবিত হয়, গোবর্দ্ধন-শিলা গলিয়া যায়, যমুনা উজান বহে !—এমত অবস্থায়, আমার সরলা, অবলা, গোপবালা, আমরা তোমার চরণে বিনামূল্যে যে বিক্রীত হইয়া যাইব ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? আমরা তোমার চরণে চির-বিক্রীত হইয়াছি বলিয়া ত্রিজগতের কোন্ রমণীই পাতিব্রত্য স্পর্দ্ধায় আমাদের উপর দোষারোপ করিতে পারিবেনা। তাই বলিতেছি, দোষ তোমার—না, আমাদের ? সত্য কথা বলিতে কি, এখন আমাদের

যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যদি না গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমাদের অন্যত্র যাইবার কোনই সামর্থ্য নাই। যদি নিতান্তই না গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমরা আর কোথাও যাইব না ;.. তোমারই চরণপ্রান্তে প্রাণত্যাগ করিব।

(১১) "নিশ্চয়ই সুরলোক-পালক আদিদেব নারায়ণের ন্যায়, তুমি ব্রজবাসীর শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে ; অতএব, হে দীননাথ, এই ব্রজবাসিণী কিঙ্করীদিগের সন্তপ্ত স্তনমণ্ডলে ও মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর।"

—এই শেষ শ্লোকে গোপীগণ তাহাদের চরম অভিপ্রায় জানাইলেন। ইহা শ্রীধর স্বামীপাদ-উক্ত—'শৃঙ্গার কথোপকথন'। ইহা সর্ব্বত্যাগিণী ভগবদনুরাগিণী পরমানন্দ-প্রার্থিণী, প্রেমময়ীদের প্রেমানন্দ মিলনের প্রার্থনা। এই আনন্দঘন স্বরূপের সংস্পর্শেই ভক্তের সর্ব্ব-সন্তাপের চির-নিবৃত্তি। গোপীগণ দুর্ব্বার কামানলের চির-নির্ব্বাণ চাহেন, তাই তাঁহারা আনন্দ-বিগ্রহের নিকট, তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। প্রেমমার্গের ভগবৎ-সাধক পুরুষ হইলেও তাহার এই দশাই হইবে। ভক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবানই একমাত্র পুরুষ, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই প্রকৃতি ; অতএব প্রকৃতি হইয়া সকলকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীশুকদেব কহিলেন—"গোপীদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরম সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও; গোপীদিগের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে দয়া পরবশ হইয়া, সহাস্য-মুখে তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিলেন।"

(ভাঃ—১০।২৯।৩৯)

—শুকদেবের এই শ্লোকটির প্রত্যেক কথাগুলি বিশেষ তাৎপর্য্যময় ও গম্ভীরভাব ব্যঞ্জক। 'যোগেশ্বরেশ্বর' বলার উদ্দেশ্য,—তাঁহার অচিন্ত্য-যোগ-প্রভাবে শতকোটী রমণীর, প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ, সমকালে

প্রত্যেকেরই কণ্ঠধারণপূর্ব্বক, রাসনৃত্য বিহারাদি করিলেন। 'আত্মারাম হইয়াও রমণ করিলেন,' বলার তাৎপর্য্য এই যে—ভগবান স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ, তাঁহার আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে কোন প্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না; স্বভাবতঃ অপূর্ণ জীবগণের যেমন আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে, শব্দ স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিতে হয়, ভগবানের আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে সেইরূপ কোন প্রকার বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করিতে হয় না; কেননা তাঁহার স্বরূপই আনন্দময়। তিনি আত্মারাম হইয়াও প্রেমাধীন; একারণ প্রেমিক ভক্তের সেবাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন। 'কাতরোক্তি-শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া',—উক্তি হইতে তাঁহার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির গন্ধ মাত্রও নাই, কেবল ভক্তের কাতরোক্তিতে, দয়া-পরবশ হইয়া, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণমাত্র,—ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীগণ ভগবৎকৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; তখন ভক্তবৎসল ভগবানও তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। ভগবান তো দয়ার সাগর; কিন্তু তাঁহার দয়া চাহে কে? চাহিবেই বা কেন? কাহারও প্রকৃত অভাব বোধ জাগিলে তবেতো প্রকৃত ব্যাকুলতা জাগিবে। একারণ তিনি তাঁহাদের কাছে দয়ারসাগর হইয়াও নির্ব্বিকার হইয়াই থাকেন। ভগবানকে পাইতে হইলে ব্রজগোপীর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে। গোপীরা অন্তর্য্যামীকে নিষ্কপটে অন্তরের কথা জানাইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিলেন; অন্তর্যামীও তাহা বুঝিলেন। দয়ার সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদের সকল সাধ পূরণ করিলেন ও তদ্দারা, গোপীগণকে নিমিত্ত করিয়া, জগৎবাসীকে এক অভিনব সর্ব্বচিত্তাকর্ষী সুমধুর ভজনের পথ প্রদর্শন করিলেন। 'সহাস্যমুখে',—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গোপীগণের প্রেমের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি তাঁহাদের নিজ মুখেই ব্যক্ত হওয়ায়, এবং এইভাবে গোপীগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্মের সবিশেষ সকল নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ায়, পরম

পুলকিতান্তরে তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া, 'সহাস্তমুখে' তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিলেন।

উপরে উল্লিখিত এগারটী শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা-ভঙ্গিময় উক্তির সমুচিত প্রত্যুত্তর দানে ভগবানকে নিরুত্তর করিয়া যাবতীয় ভক্ত-গণের পরম প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সমস্তই শাস্ত্র সম্মত, সমস্তই বেদের কর্ম্ম-মীমাংসার (বা পূর্ব্ব-মীমাংসার) প্রতিধ্বনি মাত্র এবং সমস্তই সুসম্মত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহার উপর কোন কিছু কথা বলিবার আর উপায় নাই; ইহা সমস্তই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধিমার্গের শাস্ত্র বিহিত অনুশাসন। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক ভক্তের চরম পরম জ্ঞান বৈরাগ্যের কিছুরই অভাব হয় না, তাঁহারা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিলেও প্রয়োজন সময়ে তাহা তাঁহাদের নিকট স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাঁহারা যে সকল উচ্চস্তরের কথা বলিলেন তাহা বেদ বেদান্তের সার, বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের, ব্রহ্ম-মীমাংসার (বা উত্তর মীমাংসার) প্রতিধ্বনি মাত্র এবং সর্ব্বজ্ঞ মুনি-ঋষিগণেরও বিস্ময় উৎপাদক! তাঁহারা অদ্যাবধি গোপীদিগের এই প্রত্যুক্তির চমৎকারিতা হৃদয়ে অনুভব করিয়া পুলকিতান্তরে তাঁহাদিগকে জয় ঘোষণান্তর বিমল যশোগান করিয়া কৃতার্থ হয়েন!—যাহা হউক, গোপীগণকে নিকটে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রীতি-সম্ভাষণ না করিয়া সাম্য অবলম্বন পূর্ব্বক, উপেক্ষা ভঙ্গির আচরণ দ্বারা তাঁহাদের প্রতি বিবিধ প্রত্যাখ্যান বাক্যদ্বারা, তাঁহারা যে সকল অমূল্য প্রেম-রত্ন-রাজি হৃদয়-সম্পুটে অতিযত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজ মুখেই তাহা ব্যক্ত করাইয়া, এক্ষণে স্বকর্ণে শুনিবার লালসা সম্যক্ চরিতার্থ হওয়ায়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ আনন্দসাগরে নিমজ্জমান হইলেন।

পূর্ব্বে অন্ন-ভিক্ষা-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক পত্নীদিগকে নিকটে আনয়ন

করিয়া, অনুরূপ সুসঙ্গত সদুপদেশ বাক্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; কিন্তু এক্ষণে, প্রেমোন্মাদিনী সর্ব্বত্যাগিনী গোপীগণের নিকট তিনি নিজেই পরীক্ষায় পরাজিত হইলেন। তাঁহারা যাহা প্রত্যুত্তর দিলেন তাঁহার উপরে শ্রীকৃষ্ণের আর বলিবার কিছুই রহিল না; পরন্তু, তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া সেই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি, আপ্তকাম, স্বয়ং ভগবানকে যেমন ভাবে পাইয়া তাঁহারা চরম চরিতার্থতালাভ করিতে বাসনা করিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন এবং তাঁহাদের সেবার অনুরূপ ভজন করিয়া নিজেও পরম আনন্দ আস্বাদন করিলেন। এমন কি, তাঁহাকে নিজ মুখে বলিতে হইল—তাহাদের প্রেম-ঋণ তিনি শোধ করিতে অসমর্থ এবং বলিতে হইল তিনি তাঁহাদের সহিত রাস-বিলাসে যেরূপ আনন্দলাভ করিলেন কুত্রাপি তিনি সেরূপ আনন্দলাভ করেন নাই। অহো!—ধন্য গোপী প্রেম! ধন্য তাঁহাদের প্রেমের প্রভাব!!"

গোপ-রমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যাহার আকর্ষণে আত্মারাম-শিরোমণি ভগবানেরও রমণেচ্ছা হইয়াছে! নির্ব্বিকার ভগবানেরও ভাব-বিকার প্রকাশ পাইয়াছে; 'নিরীহ' ভগবানেরও গোপীগণের সহিত মিলন সংঘটনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং পূর্ণকাম ভগবানেরও সকাম হইতে ইচ্ছা হইয়াছে!

প্রেমবতী ব্রজ রমণীগণ আত্মারাম-শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট, এই সমাদর ও আলিঙ্গন-চুম্বনাদি নানাপ্রকার প্রেম-ব্যবহার পাইয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন; তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু বিক্ষুব্ধ হইয়া,—'আমাদের মত ভাগ্যবতী কে?'—এই প্রকার প্রবল গর্ব্ব ও মানের উত্তাল তরঙ্গ তাহাতে প্রকাশিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তাদৃশ সৌভাগ্য-গর্ব্ব ও মান দেখিয়া, তাহার প্রশমন ও প্রসাদনের জন্য সেই বিহার স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অকস্মাৎ এইরূপ ঘটিলে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা বিলাসাদির স্মৃতিতে, আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলাতেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন এবং কখন উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণ লীলাগান করিতে করিতে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কখন শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ করিতে লাগিলেন, এবং কখন বা নানাবিধ উন্মাদ চেষ্টায়, যেখানে সেখানে, শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ ও যাহাকে তাহাকে, এমন কি বৃক্ষ লতাদিগকে পর্য্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নিত পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং তৎসহ একটি গোপীরও পদ-চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া, অভিমানভরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই প্রধানা গোপীকে (পরম 'আরাধিকা'—রাধিকাকে) নির্জ্জনে একাকী আকুল আর্ত্তনাদ করিতে দেখিলেন! তখন তাঁহারা তাঁহার মুখে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরম সমাদর, এবং তাহাতে তাঁহার অভিমান-প্রযুক্ত দুর্ব্যবহার বশতঃ, দারুণ অপমানের কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

'অহং'-মন-শূন্য বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম যেখানে, আনন্দময় ভগবানও সেইখানে। গোপীগণ যখন সেই প্রেম হারাইলেন—আত্মাভিমান আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিল, হৃদয়স্থ কৃষ্ণ আত্মাভিমানে আবৃত হইয়া গেলেন, বাহিরেও তিনি অদৃশ্য হইলেন।—তৎপরে যখন অত্যন্ত অনুতাপে আত্মাভিমান দূর হইয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল; সেই কৃপাই পদাঙ্করূপে দর্শন দিল, আবার সেই পদাঙ্কই গোপীদিগকে শ্রীরাধার নিকট পৌঁছাইয়া দিল। মহাভাবরূপ প্রগাঢ় প্রেম না হইলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, আবার সেইরূপ প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমও কৃষ্ণকৃপা সাপেক্ষ। গোপীদিগের কৃষ্ণদর্শনের সময় হইয়াছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় মহাভাবরূপিনী শ্রীরাধার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত এক্ষণে তাঁহারা সকলেই আকুল-প্রাণে পুনরন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ও সর্ব্বব্যাপী; আমাদের হৃদয় তমঃ-পূর্ণ তাই দেখিতে পাই না। ভগবান গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া জগবাসীকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। গোপীদিগের এখন নিজ দোষ স্মরণ হইয়াছে, তাই এত লাঞ্ছনা পাইয়াও, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া যমুনা পুলিনে সকলে একত্র সমবেত হইয়া, আকুল প্রাণে কৃষ্ণগুণ গাহিতে লাগিলেন। আত্মদোষ স্বীকার করিয়া অনন্যচিত্তে কৃষ্ণগুণগান করাই, কৃষ্ণ লাভের উপায়। অগ্নির উত্তাপ না পাইলে,—অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া না গলিলে, সুবর্ণের মলিনতা অপগত হয় না। যখন গোপীগণ বিলক্ষণ মনস্তাপ পাইলেন,—চিত্ত কৃষ্ণ বিরহানলে দগ্ধ হইয়া গেল, তখন তাঁহারা আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে করিতে 'সুস্বরে' তাঁহার গুনগান করিতে লাগিলেন। বিরহ-বিহ্বলা গোপীদিগের তাৎকালিক উক্তিতে বিরহিনী নায়িকার ভাব প্রকাশ পাইলেও, উহাতে ভগবৎ প্রেম-পিপাসু ভক্তের ভাবই অধিকতর সুস্পষ্ট। চিদানন্দঘন, সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইতে হইলে,—পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে, আনন্দ-বিগ্রহের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে,—জীবকেও ঠিক এই রূপই হইতে হইবে।—ঘোর বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণি বেশ্যার জন্য উদ্ভান্ত প্রেমের কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। 'তাঁহার প্রতি যেরূপ তীব্র অনুরাগ, উহা যদি ভগবানের প্রতি যাইত, তাহা হইলে তিনি চিরদিনের তরে কৃতার্থ হইতেন,'—চিন্তামণির মুখে এই কথা শুনিয়া সুকৃতিশালী বিল্বমঙ্গলের চৈতন্যোদয় হইল! তিনি তখন,—ঐ চিন্তামণির চিন্তা, জগচিন্তামণির চরণে—অর্পণ করিয়া চিরদিনের তরে ধন্য হইয়া গেলেন! ভগবানও আজ গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে সেই শিক্ষাই দিলেন। আজ কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীগণ জাতি, কুল, লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, দেহ, গৃহ, আত্মীয় স্বজন, ইহলোক, পর-লোক, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া উদ্ভ্রান্ত পাগলিনীর ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান করতঃ, সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কি মনোহর দৃশ্য!—

কি পবিত্র ভাব,—কি অলৌকিক সম্মিলন! দেখিলে, শুনিলে, ভাবিলে, পাষাণও গলিয়া যায়। ইহাই গোপীভাব এবং ইহাই ভগবৎ-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। এই শুকদেব বর্ণিত 'গোপী-গীতা' সাধক মাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত অনুশীলন যোগ্য।

তখন গোপীদিগের আকুল ক্রন্দনে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মদন-মোহনরূপে আবির্ভূত হইলেন। 'অপ্রাকৃত-মদন'—মদন নিজে যে রূপের কাছে মুগ্ধ হইয়া যায়, ভগবান সেই অপ্রাকৃত মদন, বা মদনমোহন রূপে রাসলীলা করিতে আবির্ভূত হইলেন। সে রূপ দেখিলে কামের ক্রিয়া একেবারেই থাকে না, কাম নিজে ত্রিভুবন বিজয়ী হইয়াও, সেই মদন-মোহন রূপ সাগরে ডুবিয়া যায়, মাথা তুলিতে পারে না,—তুলিতে চায়ও না। ত্রিগুণ সম্বন্ধ শূন্য অভূতাবৃত পরমানন্দের যদি কোনও রূপ হয়, তাহাই মদন-মোহন রূপ। গোপীগণের নিকট নিখিল আনন্দের মূল-স্বরূপ সেই পরমানন্দ মূর্ত্তিমান;—তিনি মন্মথ-মন্মথ অর্থাৎ মদন-মোহন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনে ব্রজরমণীগণ যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। প্রিয়তমকে সমাগত দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-নেত্রে সকলেই যুগপৎ উত্থিত হইলেন। কেহ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন; কেহ চন্দন চর্চ্চিত বাহু নিজ স্কন্ধে রাখিলেন; কেহ করপুট দ্বারা চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন; কেহ সন্তপ্ত বুকের উপর শ্রীকৃষ্ণের পদ-কমল রক্ষা করিলেন; কেহ প্রণয়-কোপে দূর হইতে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন; কেহ অনিমেষ নয়নে বদন কমল দর্শন করিতে লাগিলেন; এবং কেহবা নেত্ররন্ধ্র দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ে লইয়া নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক যোগীর ন্যায় পরমানন্দে পুলকিত হইয়া রহিলেন। এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-জনিত পরামনন্দে তাঁহাদের সকলের সকল সন্তাপ দূর হইল। তখন ভগবান তাঁহাদিগকে পরম সুখকর যমুনা পুলিনে লইয়া গেলেন এবং তাঁহারা তথায় পরমানন্দে নিজ নিজ উত্তরীয়

দ্বারা তাঁহার উপবেশনের জন্য আসন নির্ম্মাণ করিলে, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে উপবেশন করিলেন, তাহাতে তিনি ত্রিলোকের অতুলনীয় পরম অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তখন গোপীগণ তাঁহাদের অঙ্কে-স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদ সংবাহন করিতে করিতে, ঈষৎ-প্রণয়-কোপের ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক,—পরিহাসময় চতুরতাপূর্ণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ দিয়া, সহসা অন্তর্ধান-রূপ গর্হিত আচরণের, তথ্য বাহির করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—(১) "কেহ ভজনা করিলে ভজনা করে; (২) কেহ কেহ না ভজিলেও ভজনা করে; (৩) আবার কেহ কেহ ভজিলেও ভজেনা, না ভজিলেও ভজেনা :—এই বিষয়টী আমাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও,—(অর্থাৎ তুমি ইহার মধ্যে কোন শ্রেণীর বলিয়া দাও)।"—ভগবান কেন ভক্তের নিকট আত্ম-গোপন করেন, আবার কেনই বা কাহারও কাহারও নিকট প্রকট হইয়া চির বিরাজিত থাকেন, ইহাই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে জগতে প্রচারিত করিবার অন্তরের বাসনা? ইহাতে যেমন চাতুরী, তেমনি মাধুরী।

ভগবান তিনটি প্রশ্নেরই যথাক্রমে উত্তর করিলেন,—(১) যাহারা পরস্পর ভজনা করে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে, তাহাদের আচরণ কেবল স্বার্থের জন্য, উহাতে সৌহার্দ্দ নাই,—ধর্ম্মও নাই। (২) দয়ালু ব্যক্তি এবং পিতামাতা, ভজনা না করিলেও ভজনা করেন। এরূপ ভজনে নির্ম্মল ধর্ম্ম আছে, সৌহার্দ্যও আছে; আর (৩) আত্মারাম, অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি শূন্য; আপ্তকাম, অর্থাৎ পূর্ণ-মনোরথ; অকৃতজ্ঞ, অর্থাৎ কৃতঘ্ন এবং গুরুদ্রোহী, অর্থাৎ উপকারীরও অপকারী;—ইহারা ভজিলেও ভজেনা, না ভজিলেও যে ভজেনা তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্নোত্তের-বচন-ভঙ্গিতে চতুর-চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে,—যে শ্রেণীর ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনি কোনটিই নহেন; তাহারা তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছে। মানব প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোনই সাদৃশ্য নাই।—(১) তিনি প্রথম

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন ;—কারণ ভক্ত ভজিলে তিনি কৃপা করেন সত্য ; কিন্তু ইহা লৌকিক স্বার্থ-সাপেক্ষ কপট ভজন নহে এবং লৌকিক কপট প্রতিদানও নহে।

(২) তিনি দ্বিতীয়-শ্রেণীভুক্ত নহেন,—তাহার কারণ দয়ালুর দয়া এবং তাঁহার স্নেহ সম্পূর্ণ পৃথক।—দয়ালুর দয়া সত্ত্ব গুণের বিকার মাত্র। একজনের দুঃখ দেখিলে দয়ালুর কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, তাই তিনি দয়া করিয়া নিঃস্বার্থভাবে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে চাহেন ; কিন্তু ভগবান্ প্রাকৃত-গুণের অতীত এবং নিত্যানন্দ স্বরূপ ; সুতরাং জাগতিক প্রাকৃত দুঃখে তাঁহার দুঃখ হওয়া সম্ভবপর নহে ; অথচ তিনি দয়া করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে, সাধুদের কৃপাবশেই অপ্রাকৃত ভক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়ায়, শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় ; কোন সময়েই স্বতন্ত্ররূপে শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত। তাহা ছাড়া পিতামাতার স্নেহ উপাধিক, কেবল নিজ নিজ পুত্রাদির উপর, আর ভগবানের স্নেহ ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া। ফলতঃ, তাঁহার দয়া ও তাঁর স্নেহ কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়া হয় না ; তিনি দয়াময়, তিনি স্নেহময়—সকলের প্রতিই তাঁর দয়া—তাঁর স্নেহ সমভাবেই রহিয়াছে,—লইতে পারিলেই হইল। যিনি তাঁহার শরণাপন্ন হন, তিনিই তাঁহার কৃপালাভ করিয়া থাকেন।

(৩) তিনি তৃতীয় শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত নহেন ; তাহার কারণ—যাঁহারা 'আত্মারাম' তাঁহারা আত্মানন্দেই অন্তর্মুখ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বহির্দৃষ্টি নাই ; কিন্তু তিনি আত্মারাম হইলেও তাঁহাকে সকলই দেখিতে হয় ; তিনি প্রতিনিয়তই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের অন্তর বাহির দেখিতেছেন। আর যাঁহারা 'আপ্তকাম, তাহাদের বহির্দৃষ্টি না থাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা নাই, এজন্য কাহাকেও ভালবাসেন না। তিনি 'আপ্তকাম' সত্য, কিন্তু ভক্তের ইচ্ছা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ইচ্ছা করায় ; সুতরাং ইঁহাদের সঙ্গেও তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। তিনি 'অকৃতজ্ঞ নহেন, কারণ ভক্তের ভজনা রূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকেন এবং

'গুরুদ্রোহী'দের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না ;—প্রত্যুত, তিনি ঐরূপ পাষণ্ডদের শাসনকর্ত্তা। মোট কথা, মানব প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোনই সাদৃশ্যই নাই—তিনি 'সৃষ্টি-ছাড়া'।

ভগবান ভজনকারীকে যে সদুদ্দেশ্যেই ভজন করেন না, তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া বলিলেন,—"ধনহীন ব্যক্তি দৈব-লব্ধ-ধন বিনষ্ট হইলে, যেমন সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আর কিছুই জানিতে পারে না, ভজনকারীগণের ধ্যানের অবিচ্ছেদের নিমিত্ত আমিও তদ্রূপ ভজনকারীগণকেও ভজন করিনা, অর্থাৎ তাহার নিকট ধরা দিই না ;—হয়তো মাত্র ক্ষণিকের তরে দেখাদিয়া অন্তর্হিত হই।"

এই বার রাসলীলায় যাহা কিছু প্রাকৃত প্রণয়ের আবরণ ছিল, তাহা উন্মোচিত হইল। ভগবানের নিজ মুখ হইতেই নিজ ভগবত্তা প্রকাশ হইয়া গেল। ভগবান কেবল আপনার দোষ প্রক্ষালন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ; প্রত্যুত ক্লেশ-প্রদানের মধ্যেও বিশুদ্ধ সুহৃদভাবের পরিচয় দিলেন। সংসার যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিরদিনের জন্য ভগবানকে পাইতে হইলে, নিরন্তর ভগবৎচিন্তা চাই ;—অনুতপ্ত চিত্তে, কাতর প্রাণে, অবিচ্ছেদে, ভগবৎ-চিন্তা চাই। তাই অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেন। ভগবান যাহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া মনে করেন, লালসা জাগাইবার নিমিত্ত তাহাকে একবার দর্শন দিয়া, মুগ্ধ করিয়া, পরে অন্তর্হিত হয়েন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ বচন হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত কাম-বিলাসের কত উর্দ্ধে। জানা যায় জীবের প্রেম বৃদ্ধির নিমিত্ত পরম কল্যাণময়, আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি অনির্ব্বচনীয়, নিগূঢ় কামনা ! আরও বুঝিতে পারা যায়,—গোপীগণের সহিত গোপী-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রাস-বিলাস-কাহিনী, তত্ত্বহীন শৃঙ্গার কথার ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। ইহাতে, শুদ্ধ-সত্ত্ব নির্ম্মল প্রেমের অনুসন্ধান আছে, যাহার আনন্দরসাস্বাদনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পরম ভক্তি লাভ হয়।

ভগবান আরও বলিলেন—"আমি বাহ্যতঃ তোমাদের উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য, এবং মুখ্যতঃ, আমার বিরহে তোমাদের উন্মত্তভাবে অন্বেষণ ও আকুল ক্রন্দন নিজ চক্ষে নেপথ্যে দেখিবার ও শ্রবণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তোমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছি ; এবং চিরদিনের তরে আত্মদান করিব বলিয়াই ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হইয়াছি। আমি তোমাদের প্রিয়, আমার অপরাধ ধরিও না" ।—এত বলিয়াও যেন তাঁর তৃপ্তি হইল না, সেই জন্য পুনরায় পুলকভরে জানাইলেন,—তাহারা তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, দেবতাদের পরমায়ু পাইলেও তিনি তাহাদের প্রেমময় ব্যবহারের প্রতিদান দিতে পারিবেন না ; কেবল মাত্র তাহাদের উদারতা-গুণেই তাহা পরিশোধ করিয়া লইতে হইবে।

কথাটা আপততঃ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু কাথাটা সত্য। ভক্ত, জ্ঞানীর ন্যায় ব্রহ্মে লীন হইয়া আপন পৃথক সত্ত্বা নষ্ট করিতে চাহেন না,—চিন্ময় নিত্যদেহ ধারণ করিয়া অনন্ত কাল, অতৃপ্ত অন্তঃকরণে, ভগবদানন্দ আস্বাদন করিতে চাহেন। ভক্তাধীন ভগবানকে ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিতেই হয়। অপ্রাকৃত ভগবদানন্দ আস্বাদন করিয়া ভক্তের "অলং-বুদ্ধি" হয় না ; এবং অসীম অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের পরমানন্দও নিঃশেষ হয় না ; অতএব ঋণ পরিশোধের কার্য্য চিরকালই চলিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ঐকান্তিক ভক্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক-নিষ্ঠ হইয়া অখিলেশ্বরের ভজনা করিতে পারে ; কিন্তু অখিলপতি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং একারণ ভক্তের একনিষ্ঠ ভাব অনুরূপ ভজন করিতে অসমর্থ হইয়া চির-ঋণ-পাশে আবদ্ধ হয়েন। —ধন্য গোপীপ্রেমের মহিমা ! ধন্য প্রেমাধীন ভগবানের প্রেম-বৈচিত্র্য স্বভাব ! সত্যবটে, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, কিন্তু তথাপি ঐকান্তিক ভক্ত-প্রেমের নিকট তাঁহার ভগবত্তা স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে ! ইহাই লীলার পরমতম মাধুর্য্য ! ভক্ত-প্রেমাধীন-ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত সদাই ব্যগ্র। এমন কি স্বয়ং ভক্তভাব

অঙ্গীকার করিয়াও ভক্তের ঋণ প্রতিবিধানে তিনি নিত্যই প্রযত্ন করিয়া থাকেন। মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার ঋণ পরিশোধার্থেই তিনি গোপীভাবে-বিভাষিত হইয়া, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া; অযাচিত ভাবে নিরুপম গোপীপ্রেম সম্পদ অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছেন! ইহাইতো প্রেমিকের ঐকান্তিক ভজন-নিষ্ঠার 'আত্ম-বিস্মৃতি';—ইহাই তো সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজগোপীবৃন্দের ও গোপীকুল শিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেম-ঋণের পরিশোধ প্রয়াস!

গোপীগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরম মনোহর বচনাবলি শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার কর-চরণাদি অঙ্গ-স্পর্শে পরিতৃপ্ত হইয়া, বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন; এবং তীব্র বিরহ-সন্তাপে-সন্তপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অকৃতজ্ঞ, অথবা বিশ্বস্ত-জনের প্রতি দ্রোহী, বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে সম্যক বুঝিতে পারিয়া, পরম পরিতৃপ্তি লাভ হেতু, সকল দুঃখ দূর করিলেন।

তখন ভগবান গোবিন্দ পরমানন্দিতা নিজানুবর্ত্তী-নারীকুল-শিরোমণি গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। ব্রজ-গোপীগণ পরম শোভাময় মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলেন, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলস্থ দুই-দুই গোপীর মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের সকলেরই কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক রাসোৎসব আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন,—'কৃষ্ণ আমারই কাছে আছে, অন্য কাহারও কাছে নাই।'

তখন রাস-দর্শনোৎসুক সস্ত্রীক সুরগণের শত শত বিমানে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল; দুন্দুভি-ধ্বনি ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বগণ পত্নীগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মহিমা গান করিতে লাগিলেন। তখন রাস-মণ্ডপে ব্রজবালাদিগের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিনীর তুমুল মিশ্রিত ধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-পরশে অতীব আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে অতি উচ্চ ও সুমধুর-স্বরে গান করিতে লাগিলেন। তখন বালক যেমন আপন প্রতিবিম্বের

সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান রমাপতি আলিঙ্গন, প্রণয়-নিরীক্ষণ, করগ্রহণ, পরম আমোদ ও হাস্য সহকারে ব্রজগোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

ভাগবত-বক্তা সর্ব্বলোক হিতৈষী শুকদেব গোস্বামী এইভাবে রাস-লীলা বর্ণনা করিয়া, সুচতুর চিকিৎসকের ন্যায়, শ্রুতি-মধুর বাক্যরসে প্রলুব্ধ করতঃ, অতত্ত্ব-দর্শী কোমলমতি মানবগণকে ধীরে ধীরে দুর্ব্বোধ পরমার্থতত্ত্ব আস্বাদন করাইতেছেন। শুকদেবের এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান অন্য কোন নারীর সহিত ক্রীড়া করেন নাই; তিনি আপন প্রতিবিম্ব বা ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গোপীগণ পরনারী নহে,—তাঁহারই নিজ হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূতা মূর্ত্তি; ইহা আনন্দঘন-বিগ্রহের সহিত মহাভাব-স্বরূপিণী প্রেমময়ীদের পরমানন্দময়ী ক্রীড়া।

ব্রজ রমণীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-স্পর্শে আনন্দবশে এত আকুল-চিত্তা হইলেন যে, তাঁহাদের মস্তকস্থ পুষ্প-মালা ও অঙ্গস্থ অলঙ্কার বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের আলুলায়িত কেশ, শ্লথ পরিধেয় ও স্থানচ্যুত কঞ্চুলি যথোচিতভাবে প্রতিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। বিমানস্থ দেব-কামিনীগণ ঐ ক্রীড়া দেখিয়া, তাহা পাইবার কামনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নিশাকরও তদ্দর্শনে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত বিস্মিত হইলেন। ভগবান আত্মারাম হইয়াও, যত গোপী তত রূপ, ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। অধিকক্ষণ নৃত্য-গীতে গোপীগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুকোমল করে তাঁহাদের বদন মার্জনা করিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহাদের শ্রম অপনয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত যমুনা জলে অবগাহন করিয়া তাঁহাদের সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন। তৎপরে যমুনা তটস্থ সুখকর কাননে গোপীদিগের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐরূপে সত্য-সঙ্কল্প, স্বাত্মরত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবলাগণের

সহিত কবি-প্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত শৃঙ্গার-রসের সকল প্রকার অভিনয়ে, চন্দ্রালোকিত সেই সুদীর্ঘ শর্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন।

আমরা দেখিতে পাই রাসলীলার যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বিহারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শুকদেব গোস্বামী সেই সেই স্থানেই, তাঁহাকে 'ভগবান', 'আত্মারাম', 'স্বাত্মরত', 'আপ্তকাম' প্রভৃতি বিশেষণে তাঁহার পূর্ণতা ও নিষ্কামতার পরিচয়ে, পাঠক ও শ্রোতৃগণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, পাছে রমণের কথা শুনিয়া মনে কামোদ্ভূত প্রাকৃত রমণের ভাব আসিয়া পড়ে। শুকমুনি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,— শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান, তিনি আত্মারাম, স্বাত্মরত, তিনি নিজানন্দ-পূর্ণ, তাঁহার প্রাকৃত রমণ-কামনা হইতেই পারে না; কেবল যোগমায়া-আশ্রয়ে কৃপাপরবশ হইয়া ঐরূপ আচরণ।

এই রসলীলা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ব্রহ্মণ! সমস্ত জগতের নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান নিশ্চয়ই ধর্ম্মরক্ষা ও অধর্ম্ম নাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষয়িতা হইয়া, কিরূপে এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রী সংস্পর্শ করিলেন; যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও, এরূপ লোকবিগর্হিত কার্য্য করিলেন কোন্ অভিপ্রায়ে, আমাদের এই সংশয় দূর করিয়া দিন।"

—পরম-ভাগবত রাজা পরীক্ষিতের মনে কোন সংশয় না হইলেও, তত্রস্থ অপরাপর শ্রোতাগণের এবং সংশয়াচ্ছন্ন কলিহত জীবের কল্যাণার্থে এই মহামূল্যবান ও অতি যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। —সংশয়ের মূল কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ 'আপ্তকাম' হইয়াও এরূপ লোক-বিগর্হিত কার্য্য করিলেন কোন অভিপ্রায়ে? কথাগুলি বড়ই মূল্যবান, বড়ই অর্থপূর্ণ।—যদি কেহ কোন অগম্য-গমন, বা অবাচ্য-বচন প্রয়োগ করিয়া ফেলেন, কেবল কাম বা ক্রোধের বেগ সম্বরণে অসামর্থ্যই তাঁহার একমাত্র কারণ; কিন্তু এক্ষেত্রে দেখিতেছি তিনি 'আপ্তকাম', তাঁহার এতাদৃশ কোন বেগেরই সম্ভাবনা নাই। তাছাড়া, ব্রহ্মমোহন লীলায় দেখি,

গো-বৎস ও গো-পালক, ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অসংখ্য গোপবালক ও গোবৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এক বৎসর গোষ্ঠ ক্রীড়া করিয়াছিলেন; অতএব তিনি ইচ্ছা করিলেইতো এইরূপ নিজেই শতকোটী গোপীরমণীর মূর্তি ধরিয়া তাঁহাদের সহিত অনায়াসে কামক্রীড়া করিতে পারিতেন; অতএব 'পরস্ত্রী-সহ' এরূপ লোক বিগর্হিত লীলা করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, আপনি পরম লীলারহস্যজ্ঞ, আপনি কৃপা করিয়া এই সংশয়ের নিরসন করুন।—ইহাই রাজা পরীক্ষিতের বক্তব্য।

ইহার প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীশুকদেব বলিলেন (ভাঃ—১০।৩০।২৯-৩১)—

(১) "মহারাজ, যাঁহারা ঈশ্বর তাঁহাদের এইরূপ ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যেমন অগ্নি সর্ব্বভোজী হইয়াও তেজোহীন বা অপবিত্র হয় না, সেইরূপ তেজস্বী পুরুষদিগের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম ঘটিলেও তাঁহা দোষের নহে।"

—এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং আমরাও বুঝিতে পারি, কামনাশূন্য হইয়া, অনাসক্তচিত্তে, কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম করিলে তাহাতে পাপ বা পুণ্য হয় না।—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বেদব্যাস মাতৃবাক্যের অনুরোধে যেভাবে ভ্রাতৃবধূতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে পরম শ্রদ্ধা এবং আনন্দে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। এইভাবে ভ্রাতৃবধূ-গমনেও যে অধর্ম্ম হয় না, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, তাঁহারাই 'ঈশ্বর' বা 'তেজীয়ান';—তাঁহাদের পাপ-পুণ্য নাই।—আবার, দেহে যাঁহাদের আত্মাভিমান নাই, তাঁহাদের যে পাপ-পুণ্য নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।—দেহ যদি 'আমি' না হইলাম, তবে যদৃচ্ছাক্রমে দেহকৃত কর্ম্মের ফলও যে 'আমার' হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

(২) "কিন্তু অনীশ্বরগণ, (দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ,)

মনেং মনেও ঐরূপ ধর্ম্ম-গর্হিত আচরণের সঙ্কল্প করিবে না। যেমন মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহ সাগর-সম্ভূত গরল পান করিলে বিনষ্ট হইবেই; সেইরূপ দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, মূঢ়তা-বশতঃ ঐরূপ আচরণ করিলে বিনষ্ট হইবে।"

—দেহাভিমানী, অজিতেন্দ্রিয়, ব্যক্তিগণের ঐরূপ আচরণের অনুকরণে, কিরূপ বিষময় ফল ফলিতেছে তাহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি! এইরূপ কপট বৈরাগী ও গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, যথার্থ মহাপুরুষদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া, নিজেরা তো অধঃপাতে যাইতেছেনই, অধিকন্তু কোমলমতি নর-নারীকে অধঃপাতে যাওয়াইতেছেন! এইভাবে তাহারা তাহাদের কদাচারের দ্বারা পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের কেবল গ্লানি ও অশ্রদ্ধাই আনিতেছেন!

(৩) "মহাপুরুষদিগের বাক্যই সত্য,—অর্থাৎ তাঁহারা যাহা করিতে বলেন, সাধারণ লোক তাহাই করিবে; আর তাঁহাদের যে যে কর্ম্ম তাঁহাদের উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সেই কার্য্যই করিবে।

(৪) "নিরহঙ্কার পুরুষদিগের সদাচরণে পুণ্য নাই এবং অসদাচরণে পাপ নাই।

(৫) "পরমেশ্বর নিয়ন্তা, আর পশু, পক্ষী, মানব ও দেবতা সমস্ত জীবই তাঁহার নিয়মের অধীন। অতএব যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁর, যে পাপ-পুণ্য নাই, একথা বলাই বাহুল্য।"

—কথা এই যে, একজন সর্ব্বনিয়ন্তার অমোঘ নিয়মেই নিখিল জীব পাপ-পুণ্য ভোগ করিতেছে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারপূর্ব্বক—'আমি কর্ত্তা' বলিয়া মনে করিবে, সেই পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিবে, ইহা তাঁহার বিধান বা মায়াশক্তি। অতএব যাঁহার নিয়মে বা মায়াশক্তি-প্রভাবে, জীব পাপ-পুণ্যে আবদ্ধ হয়, তাঁহার নিজের যে পাপপুণ্যের সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য।

(৬) "মুনিগণও যাঁহার পদরজঃ আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া যোগ-বলে সমস্ত বন্ধনছেদন করিয়া স্বেচ্ছাচার করিয়াও বদ্ধ হয়েন না, স্বেচ্ছায় লীলা-বিগ্রহধারী সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায় ?"

—ইচ্ছা দুইপ্রকার,—আপন অভাব (বা বেগ) পূরণের নিমিত্ত কামাধীন ইচ্ছা ; এবং অভাব না থাকিলেও অহৈতুকী স্বাধীন ইচ্ছা। জীবগণের ইচ্ছা কামের (বা কামনার) অধীন, এবং ভগবানের ইচ্ছা তাঁহার নিজের অধীন। যাহারা কর্ম্মাধীন-ইচ্ছায় কার্য্য করে, তাহারাই বদ্ধ, কেন না তাহাদিগকে অসৎ-বস্তুর অধীন হইয়া কাজ করিতে হয় এবং কামের তীব্র তাড়নায় অস্থির হইতে হয়। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারাই কর্ম্মফল-ভোগী। অতএব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, একজন স্বেচ্ছাচারী নিত্যমুক্ত পুরুষের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নিত্যবুদ্ধ-স্বরূপ ; তিনি কর্ম্মাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না ; এবং কার্য্যাধীন হইয়া কোন কার্য্যই করেন না। অতএব যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েন, তাঁহারা অনাশক্তভাবে কার্য্য করিতে পারেন ; সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন হয় না। **যাঁহার আশ্রয় লইলে বদ্ধজীবের কর্ম্মবন্ধন থাকে না, তাঁহার নিজের আবার কর্ম্ম-বন্ধন কোথায় ?**

(৭) "যিনি গোপীদিগের এবং দেহধারী জীব মাত্রেরই অন্তরে অন্তর্যামী হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই এক্ষণে লীলা-বিগ্রহধারী এই শ্রীকৃষ্ণ।"

—শুকদেব গোস্বামী প্রথমে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পরীক্ষিতের প্রশ্নানু-সারে শ্রীকৃষ্ণের পরদার-সঙ্গ অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা প্রতি-পাদন করিলেন। এক্ষণে, এই শ্লোকে প্রকৃত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করিতেছেন, —শ্রীকৃষ্ণ অখিল জীবের আত্মার আশ্রয় ; **তাঁহার কেহই পর নাই, সুতরাং পরদার নাই। পরম চমৎকারী, অপূর্ব্ব সুমধুর পরকীয়া রস**

আস্বাদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় অঘটন ঘটন-পটিয়সী যোগমায়া কর্ত্তৃক গোপীগণ পরকীয়া বলিয়া প্রতীতি মাত্র। প্রত্যুতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বৃন্দাবন লীলাই পরকীয়-লীলা এবং এইজন্য শ্রীবৃন্দাবন-ধামের এত অপূর্ব্ব মহিমা! বৃন্দাবনে পিতা-মাতা (নন্দ-যশোদা) পরকীয়; জাতি, আচরণ, সখা, সখী সমস্তই পরকীয়! অপ্রাকৃত পরম মধুররসের আস্বাদন পরকীয়া গোপীগণেতেই পাইলেন এবং নিখিলেশ্বর ভগবান তাঁহাদের প্রেমে ঋণী বলিয়া নিজ মুখে ব্যক্ত করিলেন! অতএব স্বকীয়া ক্ষত্রিয়া মহিষীগণ অপেক্ষা পরকীয়া গোপীগণের গৌরব অধিক। যেখানে পরপুরুষের প্রতি অকারণে, অনভিসন্ধানে ও অযত্নে অদম্য স্বাভাবিক মানসিক অনুরাগ, সেইখানেই প্রকৃত প্রেমের প্রকাশ। প্রাকৃতভাব পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া, যিনি এই বিশুদ্ধ মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই দিব্যাতি-দিব্য শ্রীবৃন্দাবন লীলায় পরকীয়া-রসের অমৃতাম্বিক আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারিবেন। এখন একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, ভগবান গোপীদিগকে পরিণীতা পত্নী করিয়া ক্রীড়া করিলেই তো চলিত। তাঁহাদিগকে পরপত্নী করিয়া লোক-লোচনে কলঙ্কেরডালি মাথায় লইলেন কেন?

—সাধনমার্গের ইহার প্রথম উত্তর এই যে,—সর্ব্বস্বত্যাগ না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। গোপীগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন কি স্ত্রীজাতির অত্যাজ্য পতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই ভগবানকে পাইলেন, ইহাই জগৎকে দেখাইলেন। দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বকথা এই যে,—পরম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, নিত্য স্বকীয়াগণকে পরকীয়া করিয়া অভিনয়পূর্ব্বক, পরকীয়া-রসের নিগূঢ় রহস্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করাইলেন।

(৮) "স্বয়ং ভগবান নরজগতের জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নরাকৃতি-পরব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলা করিয়া

থাকেন। আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এ মধুর লীলা কথা শ্রবণ করিয়া, ইহাই জীবনের সর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করা উচিৎ।"

—এখন কথা হইতেছে যে, তত্ত্ব বিচার করিয়া হউক, আর যা করিয়া হউক, কৃষ্ণকে নির্দোষ সাজাইলেও, সাধারণ লোকচক্ষে এ কাজটা যে অতীব গর্হিত তাহাতে তো আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাতে বক্তব্য এই যে—ইহা ভগবানের পরম অনুগ্রহ-দানের এক সাক্ষাৎ নিদর্শন। তাঁহার এতাদৃশ লোক বিগর্হিত লীলা করিবার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা শৃঙ্গার রসকেই পরমানন্দ মনে করে, (শৃঙ্গাররসেই মানবের জন্ম, এ হেতু মানব মাত্রেরই শৃঙ্গাররসে স্বাভাবিক আকর্ষণ বর্ত্তমান,) তাহারা শৃঙ্গাররসের লোভেও রাসলীলা শ্রবণ করিলে, ক্রমে ক্রমে অপ্রাকৃত পরমরসের আস্বাদন পাইয়া, ভগবানে তৎপর হইবে। তাঁহারা প্রাকৃত লীলার ন্যায় মনে করিয়া কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিয়াও, ভগবান ও তাঁর লীলার অচিন্ত্য মহিমায়, সাধু-গুরু কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরমতত্ত্বে উপনীত হইয়া অপ্রাকৃত নিত্য পরমানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইবেন।

আমরা শুনিয়া থাকি, ভগবান জল, বায়ু, অগ্নি ও নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়া এবং স্নেহ-মমতাদি দান করিয়া পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল না সৃষ্টি করিলে জীবের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। অতএব ঐ সকল তাঁহার প্রকৃত দয়ায় পরিচায়ক নহে। চিড়িয়াখানা করিবার যাঁহার সখ, তাঁহার উহাতে রক্ষিত জীব জন্তুর জন্য জল, বায়ু, খাদ্য সামগ্রী, স্নেহ, মমতা প্রভৃতির সুব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে; নতুবা জীব জন্তুগুলি বাঁচিবে না, উহাতে দয়ালুতার কিছুই নাই।—বরং এই প্রকার স্নেহ মমতা প্রভৃতি দান কেবল মায়াময় সংসারে আবদ্ধ রাখিবার কৌশলমাত্র! তবে তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আপ্তকাম, আত্মারাম, স্বানুভাবানন্দে বিভোর হইয়াও, মানবাকার বিগ্রহে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া

এইরূপ মানবোচিত লীলায় আত্মস্বরূপের ইঙ্গিত করিয়া, কাল-কলুষিত মানবগণের প্রীতি, মায়ার রাজ্য হইতে মায়াতীত, বা যোগমায়ার রাজ্যে, লইয়া যাইবার পথ দেখাইয়া, অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যদি ভগবানের অসীম দয়ার পরিচয় কোথাও পাইয়া থাকি তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় এবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় ;—অবশ্য শ্রীগৌরাঙ্গলীলা এই, শ্রীকৃষ্ণলীলারই চরম পরম পরিণতি, বা পরিশিষ্ট, মাত্র।—'তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম।'

(চৈঃ চঃ—২।৮।৪৭)

(৯) "ঐ সকল গোপীদিগের পতিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাদের আপনি আপন পার্শ্বেই পত্নীগণকে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন ; সুতরাং কেহই তাঁহার উপর দোষারোপ করেন নাই।"

শ্রীমদ্ভাগবতকে মানিতে হইলে, সমগ্রটিই মানিতে হয়। এবং যদি মানা হয় তাহা হইলে, এই শ্লোকটিতেই রাসলীলার সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন হইয়া যায়। তর্ক করিলে তর্কের শেষ হয় না ; কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা করিলে এখন আর শ্রীকৃষ্ণে দোষারোপ করিবার উপায় নাই। এক্ষণে রাসলীলার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক রহস্য-আবরণ উদ্‌ঘাটিত হইল। চিন্ময়ী-গোপীরাই চিদানন্দ ভগবানের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সেই সমকালেই তাঁহাদের নিজ নিজ পতিগণ তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন! অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে অপার করুণা-সিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া,—এক (মায়িক) ভাগ, গৃহস্বামী সমীপে ; এবং অপর (চিন্ময়ী) ভাগ, আত্মসমীপে রাখিয়া, ভক্ত সাধকের চরম পরম অবস্থা দেখাইলেন। ইহার উপর ভজন সাধন সম্বন্ধীয় উচ্চ উপদেশ আর কি হইতে পারে? ইহাতেও যদি এমন সুমধুর পরম পবিত্র রাসলীলাকে অশ্লীল বলিয়া প্রত্যাখান করি, তাহা হইতে আর দুর্দ্দৈব কি হইতে পারে!

(১০) "ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ-প্রিয়া গোপীগণ তাঁহারই আদেশে অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

(১১) "যদি কেহ শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর রাসলীলা শ্রবণ করেন, অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করেন, তবে, তিনি সত্বর ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন এবং অচিরেই তাঁহার কামাদি হৃদরোগের চির উপশম হয়।"

—এই শেষ শ্লোকে মুনিবর, শ্রোতা ও বক্তার বিশেষণ দিলেন—'ধীর' এবং শ্রবণ কীর্ত্তনের বিশেষণ দিলেন—'শ্রদ্ধার সহিত'। এই রাসলীলার উপরিভাগে প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের আবরণ রহিয়াছে। অতএব চঞ্চলচিত্তে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে যাইলে, প্রথমেই আবরণের উপর দৃষ্টি পড়িলে, অশ্লীল বোধে আর উহা শুনিতে, বা পড়িতে, ইচ্ছা হইবে না। এই জন্যই বর্ত্তমানকালে রাসলীলার উপর অনেকের অশ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথমে দেখিতে হইবে। রাসলীলায়—প্রণেতা কে?—বক্তা কে?—শ্রোতা কে? এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় কি?

এসকল বিষয় চিন্তা করিলে শ্রদ্ধা আপনা আপনিই আসিবে; তখন মনে হইবে লোক-নিস্তারের জন্য নারায়ণাবতার ব্যাসদেব কখনই লোক বিগর্হিত অশ্লীল বিষয় লিখিতেন না; এবং সর্ব্বলোক হিতৈষী পরমভাগবত শুকদেব গোস্বামীও পরম বিপন্ন, একান্ত শরণাগত, রাজা পরীক্ষিতকে আসন্ন-মৃত্যুকালে কোন প্রকার প্রতারণা করিয়া, ভোগ বিলাসাত্মক প্রাকৃত-মানরোচিত শৃঙ্গার রসের কথা শুনাইতেন না। অতএব ভগবানের রাসলীলায় আপাতঃ-প্রতীয়মান শৃঙ্গার রসের অভ্যন্তরে আত্যন্তিক হিতকর, চরম তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। তুষাবরণ দেখিয়া ধান্য পরিত্যাগ করিলে আত্মবঞ্চিত হইতে হয়। যাহাদের প্রকৃতি চঞ্চল তাহারা রাসলীলার উপরিভাগস্থ অশ্লীলতার আবরণ দেখিয়াই চটিয়া যায়, ধৈর্য্য রাখিতে পারে না। আর যাঁহারা স্বভাবতঃ

'ধীর' এবং ঋষিবাক্যে 'শ্রদ্ধাবান', তাঁহারা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক,—উহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনন করিতে করিতে, রাসলীলার অন্তর্নিহিত অমূল্য প্রেম-রত্ন লাভ করিয়া চির-কৃতার্থ হইতে থাকেন।

প্রথম হইতে রাসলীলা যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহাতে, শুকদেব কথিত এই শ্রবণ-কীর্ত্তন ফলশ্রুতি অতীব সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গোপীসহ গোপীনাথের এই অপূর্ব্ব মিলনানন্দোৎসব যথাযথ শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন করিলে, সেই বিমল প্রেমানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেও, তাহাতে লালসান্বিত হইয়া ভাগ্যবান ব্যক্তির শৃগাল-কুক্কুর-সদৃশ অকিঞ্চিৎকর ভোগলালসার প্রতি বিরাগ হওয়াই স্বাবাভিক। মধুচক্রের মধুর আস্বাদ পাইলে, ধুলা-বালি-মাখা মধু খাইতে কাহার আর স্পৃহা হয়? আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতে একরূপে ও একভাবে তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতই আছেন; উহার ভগবদানন্দ আস্বাদন ভিন্ন কার্য্যান্তর নাই;—বাহ্য জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংস্রব নাই; অতর্পণীয় কন্দর্পের চাপল্য বা দৌরাত্ম্য নাই। পরমানন্দ-পরিতৃপ্তা ভগবৎস্বরূপ শক্তির নিকট কন্দর্প বিস্মিত, মোহিত, স্তম্ভিত! সেখানে কাম আপনার আগন্তুক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বরূপ-রূপে, অর্থাৎ প্রেমরূপেই, পরিণত হয়। সেখানে 'কাম' সলজ্জভাবে, কল্পিত নাম ও কল্পিত রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'প্রেম' হইয়া হ্লাদিনী-শক্তির সহিত ভগবদানন্দেই নিরত;—অপরকে উৎপীড়ন করিবার তাহার ইচ্ছা নাই,—শক্তি নাই,—অবসর নাই। কাম নামে কোনও মূল মনোভাব নাই। সচ্চিদানন্দ, নিত্য, নির্ম্মল প্রেম, গুণময়-পদার্থ-নিষ্ঠ হইলেই চঞ্চল-স্বভাব কাম হইয়া দাঁড়ায়। যে যাহা চাহে সে তাহা না পাইলেই অস্থির হইয়া থাকে। কামও সেই আনন্দময় ভগবানকেই চাহে, পায়না বলিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠে। কাম যে দিন পূর্ণানন্দ-স্বরূপ ভগবানকে পাইবে, সেইদিনেই তাহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। কামাসক্ত

মানবই কাম। সেই মূর্ত্তিমান কাম-স্বরূপ জীব যে দিন নিজাভিলষিত, পরমানন্দ পাইবে, সেই দিন ক্ষুদ্র পার্থিব আনন্দে অবজ্ঞা করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হইবে ; সুতরাং চিরশান্তি লাভ করিবে,—আর তাহার প্রাপ্তব্য কিছুই থাকিবে না।—সেই পরমানন্দের মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের এই রসলীলা-রূপ অপূর্ব্ব মিলনানন্দোৎসব, কাহিনী যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে, সেই প্রেমানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেও, অকিঞ্চিৎকর প্রাকৃত ভোগবিলাসের প্রতি বীতরাগ হওয়াই স্বাভাবিক। প্রেম-স্বরূপিণী গোপীকাগণ সংসার-সন্তপ্ত জীবকে চরম-শিক্ষা প্রদান ও বিশুদ্ধ রাগমার্গে গোবিন্দ-ভজনের সর্ব্ব উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন নিমিত্ত এইভাবে পরমানন্দ বিগ্রহে সমালিঙ্গিত হইলেন,—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা। ইহাতে কৃষ্ণগত প্রাণা গোপীগণের চরম-সাধন ও ভগবানের পরম-কৃপায় নিদর্শন পাইয়া জীব কৃতার্থ হয়।

আনন্দ-বিগ্রহে আলিঙ্গিত হইবার একমাত্র উপায় প্রেম। সেই প্রেমের প্রধান লক্ষণ প্রিয়জনের অপ্রাপ্তিতে তীব্র উৎকণ্ঠা; প্রিয় বিরহিনী ব্যাভিচারিনী কামিনীই সেই উৎকণ্ঠার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। এই নিমিত্ত নিজ স্বরূপশক্তি গোপীগণকে ব্যাভিচারিণী পরনারী সাজাইয়া, ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সাধারণের উৎকণ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ রূপ উৎকণ্ঠা হইলেই সাধক ভগবানকে ঐ ভাবে পাইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার চরম শিক্ষা। ইহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া, পুনঃ পুনঃ ঐ সারতত্ব মনন করিলে পরম নিবৃত্তি, বা পরমানন্দ লাভ হইবে সংশয় নাই।

শৃঙ্গার আনন্দের নির্দ্দেশে ভগবদানন্দের দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে ; কারণ প্রাকৃত সকল প্রকার আনন্দ অপেক্ষা স্ত্রী-পুরুষের রমনান্দই, প্রধান। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪র্থ অধ্যায়, তৃতীয় ব্রাহ্মণে) উক্ত হইয়াছে,—"যেমন প্রিয়তমা পত্নী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, মনুষ্যের

অন্তর বাহির কিছুই স্মরণ থাকে না, সেইরূপ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, জীব অন্তর বাহির, সকলি ভুলিয়া যায়।"—প্রেমময়ী গোপীগণ সেই মূর্ত্তিমান আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত সংসার ভুলিবার ও তাঁহাকে ঐ ভাবে পাইবার পথ প্রদর্শন করিলেন। এই প্রকারের ভগবদ্ভজনই জীবের পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত উপনিষদ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাই মনে হয়—সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ অনুচরগণ দ্বারা এবং স্বয়ং গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবগণকে বেদ বিহিত উপনিষদের মর্ম্মবাণী, এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভগবদ্ভজন, শিক্ষা দিয়াছেন!

ইহার মধ্যে ভজনের একটি রহস্যময় তথ্য নিহিত রহিয়াছে। যদি কেহ তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রাণকে জিজ্ঞাসা করে,—"প্রাণ, নিষ্কপটে একবার বলত ঠিক তুমি কি চাও,—কি পাইলে তোমার আকাঙ্ক্ষার যথার্থ পরিপূরণ হয়, তখন তিনি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার প্রাণ একমাত্র সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমানন্দ কৃষ্ণকেই চায়, অপর কিছুতেই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। কেহ যদি নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষে ধ্যানে বসিয়া, তাঁহার প্রাণের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধানে গভীরতম চিন্তায় নিমগ্ন হয়েন এবং নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে থাকেন, কি পাইলে তাঁহার প্রাণের চরম আকাঙ্ক্ষার চির-নিবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে তখন তিনি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার অন্তরাত্মা চায় একমাত্র নিত্য-নবায়মান পরমানন্দ। এতদর্থে প্রয়োজন, এমন একব্যক্তির সহিত পরম নিবিড়তম সম্বন্ধের নিঃসঙ্কোচ নিত্যমিলন, যিনি সর্ব্ব শক্তিমান হইয়াও, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ভাব বর্জ্জিত পরম মাধুর্য্য মণ্ডিত, নিরুপম, চিরসুন্দর, নিত্য নবকিশোর-নটবর সুমধুর ভাষী, জগৎ বিমোহন প্রাণমন-রসায়ন বংশীনাদে বা সংগীতে সুনিপুন, একান্ত প্রেয়সীবশ, পরকীয় ভাবে গুপ্ত প্রেমলিপ্সু, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি নাগর-রাজ।—এই প্রকারে গভীর ভাবে ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইবেন কেমন মদন-মোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেই

একাধারে এই সমস্ত গুণেরই পরিপূর্ণ সমাবেশ, তিনিই জীবের একমাত্র চরম-পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুঃ,—তিনিই এই সকলেরই আদর্শ স্থান অধিকার করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের, এবং প্রাণের অন্তঃস্থলের চরম আকাঙ্খিত বস্তুর কি আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষীভূত সঙ্গতি! দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষীভূত ও পুরাণে বর্ণিত, স্বরূপের সহিত প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর (তাঁহাকে কৃষ্ণ নামে অভিহিত করি, বা যে নামেই করি না কেন,) কি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য! জীব সেই স্বরূপের সহিত মিলনের জন্যই চির-লালায়িত,—জ্ঞাতসারে, বা অজ্ঞাতসারে, জীব মাত্রেই নিরন্তর তাঁহারই নিত্যানন্দময় সঙ্গসুখের সন্ধানে ফিরিতেছে!

এই শেষ শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী কামকে হৃদয়ের রোগস্বরূপ বলিলেন; এবং ঐ রোগ নিবারণের জন্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা শুনিবার ও কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা দিলেন। ইহাতে আমরা বুঝিলাম যে, **কামই জীবের একমাত্র উৎকট রোগ, এবং রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন ঐ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; আর 'শ্রদ্ধাই' ঐ ঔষধের** একমাত্র অনুপান। বস্তুতঃ, পরম-রসের আস্বাদন না পাইলে, কাম মূল-সহ কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না। আনন্দঘন-মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দিত না হইলে, অর্থাৎ আনন্দময়ী রাসলীলায় অপ্রাকৃত আনন্দের আস্বাদন না পাইলে, কিছুতেই কাম ত্যাগ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। **এইখানে একটি কথা প্রণিধান যোগ্য এই** যে, শুকদেব বলিলেন **ভক্তির উদয় হইয়া তৎপরে** কাম নির্ব্বাপণ হইবে। কাম নির্ব্বাপনের পর, ভক্তি বা প্রেমের উদয় ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা নহে—প্রথমে ভক্তি, তাহার পর কাম নির্ব্বাপন। **"ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগং** অপহিনোতি"—অর্থাৎ, '**ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া**, সত্বরই কামনামক উৎকট হৃদ্রোগ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন।' শৃঙ্গার রসাকৃষ্ট

কামুক ব্যক্তিরও শ্রদ্ধার সহিত এই মধুর পরম রমণীয় রাসলীলা শ্রবণ করিতে করিতে সাধারণ অবস্থাতেও অপ্রাকৃত নবীন-মদন, বা, মদন-মোহন শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি উদয়ের বাধা হইবে না। যোগ জ্ঞানাদি সাধনে, চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত, তত্তৎ সিদ্ধি প্রাপ্তির বাধা ঘটে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম,—ইহাই ইহার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিত্ব! অতএব সৌভাগ্যক্রমে যদি এই ভগবৎ-কথায় কাহার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দাচারী কামুক হউক না কেন, তাহারও ইহা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে বাধা নাই, ইহাই প্রতিপাদন করিলেন। এই অপূর্ব্ব লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবে সে অচিরকাল মধ্যে সকল-প্রকার কামনা বাসনা নির্মুক্ত হইয়া ভগবানে পরাভক্তি বা প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাই ইহার ফলশ্রুতি। শ্রীশ্রীরাসলীলা পাঠক ও শ্রোতাদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জাগ্রত হউক এবং ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীশুকদেবের আশীর্ব্বাদে এই, 'শ্রুতিফল' সফল হউক, ইহাই 'রাস-বিলাসের-পরিণতি' 'রসরাজ-মহাভাব-মুরতি' শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রাতুল চরণকমলে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম কিভাবে "কন্দর্প-দর্পহা"—'অপ্রাকৃত নবীন মদন', মদনমোহনরূপে প্রাকৃত মদনকে মোহিত করিয়া রাসলীলা সুসম্পন্ন করিলেন। মদন যেন নিজ পরাজয় স্বীকার করিয়া লজ্জিত* হইয়া পলায়ন করিলেন, এবং গোপীদিগের নিকট শপথ করিয়া গেলেন,—যাঁহাদের মনোরথে-চড়িয়া মদনমোহন মদন-বিজয় ক্রীড়া সম্পাদন করিলেন, সেই গোপী-সহ গোপীনাথের রাসলীলার ত্রিসীমানায় আর কদাচ আসিবেন না।

যাঁহাদের মনে সর্ব্বদা মদন-মোহন বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মদন কর্ত্তৃক বিচলিত করা কদাচ সম্ভবপর নহে। এমন কি, যাঁহারা

---

*টুটল কিয়ে ফুল ধনু গুণ, কিয়ে রতি-রণে ভেল তুণ শূন,
সমর মাঝ পড়ল লাজ, রতি-পতি ভয় ভাজে।* (জগদানন্দ)

শ্রদ্ধার সহিত এই লীলা-কাহিনী শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের উপরও তাহার কোন প্রভাব থাকিবে না। তাঁহাদের কাম সমূলে উন্মূলিত হইয়া প্রেমের উদয় হইবে। কবিরাজ গোস্বামীপাদ এই ভাবে বিভাবিত হইয়াই পুলকিত অন্তরে গাহিয়াছেন,—

'চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরেন 'মদন-মোহন।'
জিনি পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥'

(চৈঃ চঃ—২।২১।৮৪)

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু মৌন-অবস্থায় লিখিয়াছেন,—"'কাম' নষ্ট হইয়া যাউক এ কথা ঠিক না। কাম থাকুক, কিন্তু ত্রিগুণ-অতীত হইয়া ; এবং এই কামই উপাসনা, ভজন, যা কিছু। তখন উহার নাম—'প্রেম'। (করুণাকণা—৬৪ পৃঃ)

সাধকের চরম পরম সিদ্ধ-অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু মৌন-অবস্থায় শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন,—"মানুষ যতই কেন উন্নত হউক না, একেবারে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যায় না।...কিন্তু তখনও তাহার পার্থক্য বোধ থাকে, তখন সে ভগবানের রাসলীলা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে থাকে এবং ধন্য হয়।

'অদ্বৈতবাদ,'—মত নহে, আত্মার একপ্রকার অবস্থা ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইলে তখন আত্মা অপেনাকে ভুলিয়া যা'ন।...আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষিগণ, মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিবেন কেন ? উহাই পরমগতি,—পরম সম্পদ।"

(শ্রীশ্রীসদ্গুরু—৫ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)

দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব

(২৯) প্রশ্ন ঃ—দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ—ইহা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রশ্নে, শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রথমে বিবৃত হইতেছে—

(১)

(১) প্রশ্ন ঃ—মহাশয়, অনেকে বলেন গুরুকরণ না হইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না, এ বিষয়ে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ—(শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু বলিলেন,)—"মতামতের কথা আমি কিছু জানি না; বলিতে পারি না। আমি একথা নিশ্চয় জেনেছি যে গুরু ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও লাভ হ'তে পারে না। সামান্য একটু কিছু জান্‌তে হ'লে, সামান্য একটু কিছু শিক্ষা লাভ কর্‌তে হ'লে, গুরুর প্রয়োজন হয়,—গুরু ব্যতীত হবার যো নাই; আর সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়টি দুর্ব্বোধ, গুরুব্যতীত অনায়াসে তা' লাভ হ'বে, এ কখনও হয় না।"

(২) প্রশ্ন ঃ—ভগবানের উপাসনা করিতে কি গুরুর একান্তই প্রয়োজন? গুরু ছাড়া কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না?

উত্তর ঃ—(শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু মৌন অবস্থায় লিখিলেন,)—"মানব-জীবনে যাহা কিছু শিক্ষা করি, তাহাতেই গুরুর প্রয়োজন। সংসারের মধ্যে যাহা কিছু দর্শন করি, শ্রবণ করি, স্পর্শ করি, আস্বাদ করি, এ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিয়াও, যদি সেই সমস্তের তত্ত্ব জানিতে হয়, তবে ঐ সকল বিষয়ে যিনি অবগত আছেন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে হয়। সেইরূপ ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, জগৎ আছে,—এগুলি সহজজ্ঞানে সকলেই জানে। যদি কেহ সহজ জ্ঞানে সন্তুষ্ট না

হইয়া তাহার উত্তর জানিতে চান, তবে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্ ভিন্ন অন্য পণ্ডিত ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দানে অধিকারী নহেন। এজন্য গুরুভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।"

(৩) প্রশ্ন :—কি প্রকার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সাধারণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে উপকার হয় না? তাঁদের বাক্যে তো বিশ্বাস হয় না।"

উত্তর :—(শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু লিখিলেন,)—"বেদবেত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মেতে শান্তিলাভ করিয়াছেন, এইরূপ গুরুকে অবলম্বন করিবে। যিনি ব্রাহ্মণ, বাসনাহীন, সমস্ত রিপু যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার সমস্ত শরীর নির্ম্মল, অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে, শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে গরিষ্ঠা ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন,—এমন গুরুকে আশ্রয় করিবে।" (আবার লিখিলেন,)—"যাঁহারা যথার্থ মহাজন, তাঁদের আশ্রয় লইতে হইবে।... এজন্য পূর্ব্বপুরুষদিগের পথে চলিতে চলিতে প্রকৃত সাধুর সহিত দেখা হইলে সকল দিক নিরাপদ।...শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধে, উপদেশ যিনি দেন তিনি আর্য্য-ঋষি-শাস্ত্রমতে গুরু নহেন।"

(শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ—৩য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

(৪) প্রশ্ন :—সাধারণভাবে সকলেই তো গুরু,—তবে বিশেষভাবে একজন মানুষকে ধরা কেন?

উত্তর :—"বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধর্‌তে হয়। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে গুরুত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই প্রকৃত গুরু লাভ হয়; তখন সমস্ত পদার্থই গুরুময় হয়ে যায়। এরূপটি হ'লে সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না।"

(৫) প্রশ্ন :—কিরূপ অবস্থার লোককে গুরু করিতে হয়?

উত্তর :—"যাঁতে ভগবানের চিৎশক্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর জ্ঞান-শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই গুরু। গুরু অন্য কেহ হ'তে পারে না। মহাপুরুষেরাই গুরু।"

(৬) প্রশ্ন :—আমাদের তো অন্তর্দৃষ্টি নাই, বাহিরের কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা মহাপুরুষ বুঝিতে পারিব ?

উত্তর :—"সাধারণতঃ এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষদের চেনা যায়—

প্রথমতঃ—মহাপুরুষেরা কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না। কার্য্য দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারেও নিজেকে বড় বলে জানান্ না।

দ্বিতীয়ত :—মহাপুরুষেরা কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না। আত্মার কল্যাণের জন্য কোন একটা অনুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

তৃতীয়ত :—মহাপুরুষেরা কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না। আত্মার কল্যাণকর কোন একটা অনুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

চতুর্থত :—মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবে দয়া করেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষলতার পর্য্যন্ত দুঃখে সহানুভূতি করেন।—অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব করেন। কারোই একটা উদ্বেগের কারণ হ'ন না।

পঞ্চমত :—মহাপুরুষেরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। কখনও কোন কারণে চঞ্চল হ'ন্ না।" (ঐ—৩য়, ১৮০ পৃঃ)

(৭) প্রশ্ন :—গুরু না পাইলে কি ধর্ম্মলাভ করা যায় না ?

উত্তর :—"গুরু না পাইলে ধর্ম্মলাভ হয় না।—ধর্ম্ম একটি প্রণালী নহে, মত নহে, দল বা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্ম। সেই পরাশক্তি ভগবতী বিশ্বজননী স্বয়ং ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে—শক্তি। ধর্ম্ম মত নহে, কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। সকলের পদানত হইয়া পদধূলি লইতে লইতে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া হৃদয় বিনীত হয়। হৃদয় এরূপ বিনীত না হইলে গুরুদর্শন হয় না।" (আশাবতীর উপাখ্যান—১২ পৃঃ)

"ধর্ম্মসাধনের আরম্ভেই গুরুর কৃপাদৃষ্টিতে আত্মা মোহনিদ্রা হইতে

জাগরিত হইয়া স্বীয় গৃহ-দেহকে শুদ্ধ করিবার জন্য গুরুদত্ত মহাশক্তি শরীরে প্রয়োগ করেন, তাহাতে শরীরে এক অপূর্ব্ব তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে।…এই তাড়িতশক্তি যতই শরীরে চালিত হয়, ততই শরীর শুদ্ধ হয়। এজন্য ঐ ক্রিয়াকে 'ভুতশুদ্ধি' কহে।"

(আশাঃ উপাঃ—৩৬ পৃঃ)

"এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ত সহজ উপায় করিয়াছেন। মাতার স্নেহ, স্তন্যদুগ্ধ, জল, বায়ু…অনায়াসলভ্য। সেই শরীর অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অনন্তকাল স্থায়ী; তাহা ভঙ্গুর নহে। দয়াময় প্রভু সেই আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তুকে যে দুষ্প্রাপ্য করিয়াছেন, তাহা নহে। শরীরের পক্ষে যেমন মাতার স্তন্যদুগ্ধ, তদ্রূপ আত্মার পক্ষে প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমরস। শিশু সন্তান ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিলেই জননী সন্তানের মুখে স্তন্যদান করেন। আত্মা ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিলেই, বিশ্বজননী তাহার মুখে অমৃতরস ঢালিয়া দেন। ঈশ্বরের জন্য প্রবল ক্ষুধা, অর্থাৎ অনুরাগ, হইলেই অনায়াসে যোগ লাভ করা যায়। সংসার আসক্তিতে সেই ধর্ম্মক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে এজন্য যোগসাধনের প্রয়োজন। শারীরিক ক্ষুধা নষ্ট হইলে, যেমন মন্দাগ্নির ঔষধ সেবন করিতে হয়, তেমনি আত্মার অনুরাগ-ক্ষুধার মান্দ্যভাব দেখিলেই তাহার চিকিৎসা—সাধন-ভজন করা, নিতান্ত প্রয়োজন।"

(আশাঃ উপাঃ—১১ পৃঃ)

(৮) **প্রশ্ন—নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম করিলে কি ধর্ম্ম হয় না?**

উত্তর—"হবে না কেন? পুষ্করিনী কাটিয়া জলপান করার মত! পিপাসায় প্রাণ যায়—নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জলপান না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জলপান করিলে যে রূপ সুবুদ্ধির কার্য্য হয়, তদ্রূপ! বিশেযতঃ, ঈশ্বরের নাম 'অক্ষর' নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। 'আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শমাত্র যদি প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা

ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটা অক্ষর। এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে।—

[কোন ব্রাহ্মণের যথেচ্ছা-গমনের শক্তির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনায়, ব্যাসদেব একটি বিল্বপত্রে 'প্রণব'যুক্ত রাম নাম লিখিয়া, ঐ লেখা না দেখিয়া গোপনে হস্তে রাখিবার জন্য বিপ্রকে নির্দ্দেশ দিয়া, তাঁহার হস্তে দিলেন। ঐ বিপ্র তখন তাহার সাহায্যে যথেচ্ছ আকাশ পথে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। পরে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ শুষ্ক বিল্বপত্রে কি লেখা আছে দেখিয়া অন্যপত্রে উহা লিখিয়া, শুষ্ক পত্র ফেলিয়া দেওয়ায়, তদ্দ্বারা আর গমনাগমন করিতে সমর্থ না হওয়ায়, বিশেষ লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ-অন্তরে ক্রন্দন করায়, ব্যাসদেব আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে সবিশেষ নিবেদন করায়, তিনি তাঁহার মূঢ়তার জন্য দুঃখ করিয়া বলিলেন] (সংক্ষিপ্ত),—'হে বিপ্র, তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, ঐ পত্রের মধ্যে কি লেখা আছে দেখিও না।—আমি বহুকাল গুরুসেবা পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে, সেই শক্তি আমার দেবভাবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারই কৃপায়, ও বরে, তাহা আমি সঞ্চারণ করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে ঐ শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছা গমন করিয়াছ। এই নামের কয়েকটি অক্ষরের কোন মূল্য নাই।"

(আশাঃ উপাঃ—৪৩ পৃঃ)

শ্রীশ্রীমৌনীবাবার* চিঠির প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু স্বহস্তে লেখেন—

"বাহিরে ধর্ম্ম লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন সমস্তই হয়েছে। সাক্ষাৎ ভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে দর্শনের অধিকার জন্মে

---

* শ্রীশ্রীমৌনীবাবা একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী সত্যনিষ্ঠ, কঠোর তপস্বী। পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীল প্যারীলাল ঘোষ। মৌনীবাবার যে চিঠির প্রত্যুত্তরে

না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু, তিনি বনে বনে পদ্মপলাশ লোচন বলিয়া কাঁদিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না। ঈশা, জন্ দি বেপ্‌টিষ্টের নিকট দীক্ষিত ; চৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন হয় না।

"আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হবেন। লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে, উহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করিতে চান, তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার দূর করুন।

"কি সত্য কি অসত্য, তাহা আপনি জানেন না। এখন পূর্ব্ব শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রহ্মদর্শনে যখন প্রকৃত জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, তখন একটি একটি সত্য জানিতে পারিবেন। গুরু-করণ করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই দর্শন পাওয়া যায়।

"অন্তরে যে বাসনা আছে তাহা পাইবেন, ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্ম-প্রচার প্রভৃতি বাসনাও ত্যাগ করিতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন

শ্রীশ্রীগোস্বামী মহাশয় উপরে লিখিত চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন সেই চিঠির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—

'নির্জ্জন পাহাড়-পর্ব্বতে এতকাল সাধন ভজন তপস্যা করিয়া কাটাইলাম, তাহাতে অনেকটা উপকার পাইয়াছি। আমি মৌনী হইয়াছি, আহারের পরিমান—সারাদিনে আধপোয়া দুধ, নিদ্রা জয় হইয়াছে, ২৪ ঘণ্টা এক আসনে বসিয়া থাকি ; দয়া করিয়া শঙ্কর সময় সময় আমাকে দর্শন দেন। ব্যাসদেব ও কখনও কখন আসিয়া উপদেশ করেন। এ সব হইল, কিন্তু যে জন্য আসিলাম তাহা কোথায় ?—তাহার কোন সন্ধান তো পাইলাম না। সকলেই বলেন, 'সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেও, না হলে আর একপাও অগ্রসর হইতে পারিবেন না।' কি উপায়ে পিতার দর্শন পাইব কৃপা করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ করুন। আমার এখনও ব্রহ্ম দর্শন হয় নাই।"

—এই চিঠিখানি পড়িয়া অমনি শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু স্বহস্তে উপরের লিখিত চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন। (ঐ—৫ম, ২৯৬ পৃঃ)

কাজ করিবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম সহবাস অনেক দূরে। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজে চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে, আপনি তাহা করিয়াছেন। এখন গুরু ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভগবান সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্য জগতে যেমন কোন কার্য্য অনিয়মে চলেনা, সেইরূপ অন্তর্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্গুরুর আশ্রয়-গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি, এজন্য এত লিখিলাম।"

(শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ—৫ম, ২৯৭ পৃঃ)

(১০) প্রশ্ন :—সদ্গুরু কি? তাঁর দীক্ষার বিশেষত্বই বা কি? ঐ দীক্ষা লাভ হইলে কি অবস্থা হয়?

উত্তর :—শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু অর্দ্ধবাহ্য-অবস্থায় এই প্রকার বল্‌তে লাগ্‌লেন—

সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই, তাহা সম্পূর্ণ কৃপা সাপেক্ষ। এই দীক্ষা যে কোন অবস্থায়, যথায় তথায়, একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হ'য়ে থাকে। ভগবানই 'সদ্গুরু'—ভগবানের পদাশ্রিত, ভগবজ্জন, মহাপুরুষেরাই, 'সদ্গুরু'। সদ্গুরু শিষ্য করেন না,—তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে তিনি নিজ ইষ্ট-দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, তাঁ'রই সেবা-পূজা করেন। শিষ্য দেহ তাঁর দেব-মন্দির। দেব-মন্দিরে কোন প্রকার অপচার অনাচার হইলে সেবক যেমন তাহা দেখে লজ্জিত হন, দুঃখিত হন; শিষ্যেরও কোন প্রকার দুর্দ্দশা দেখ্‌লে, এই গুরু তেমনি নিজেরই সেবা-পূজার ত্রুটি হয়েছে মনে করে মলিন হয়ে যান। সদ্গুরু প্রদত্ত নাম—নাম নয়, অক্ষর নয়, বা একটি শব্দ নয়;—একই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তিসঞ্চারই সদ্গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায় একবার কাহার হলে, তার নিজের আর কিছুই কর্‌বার থাকে না। তার জীবনের কার্য্য, এমন কি প্রত্যেকটি

শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত সেই একজনার ইচ্ছাধীন। কুমীরে পোকার আরশুলা ধরার মত, সদ্‌গুরু শক্তি সঞ্চার ক'রে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ক্রমে আত্মবৎ ক'রে নেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে,—"দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।" (ঐ—৩য় খণ্ডে ৩০৫ পৃঃ)

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু মৌন-অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন:—

(১১) "গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করিলে তবে তাহা ফলদায়ী হইবে,—ইহা শাস্ত্র-শাসন। শাস্ত্র ও সদাচার না মানিলে ঋষিদিগের পথের অনুসরণ হয় না।"

(১২) "শাস্ত্রে আছে যাহাদের শ্রদ্ধা বিকাশ হয় নাই, তাহারা ধর্ম্মের জন্য নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যেমন মধুকর এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যায়, সেইরূপ; কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মলাভ হয় না। উপযুক্ত সময় হইলে, শ্রদ্ধা বিকাশ হইতে থাকে, তখন একস্থানেই মন স্থির হয়; —ইহা তন্ত্রের মত। উপনিষদের মত যে,—যতদিন শ্রদ্ধা না হয় গুরু করিবে না।"

(১৩) "যতদিন শ্রদ্ধা না হয় ততদিন পৈত্রিক গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া, পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষদিগের পথে চলিতে চলিতে, প্রকৃত সাধুর সহিত দেখা হইলে, সকল দিক নিরাপদ।"

(১৪) "শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধে, যিনি উপদেশ দেন, তিনি আর্য্য-শাস্ত্রমতে গুরু নহেন। **শাস্ত্র মহাজন-দিগের সঙ্গে যাহা মিলিবে না, তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে।"**

(১৫) "...বৈদিক দীক্ষায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার।... তান্ত্রিক দীক্ষায় চারিবর্ণ ও সমস্ত বর্ণ-সঙ্কর মনুষ্যের অধিকার আছে।"

(১৬) "যদি সাধন-গ্রহণ জন্য বাস্তবিক চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। লোকের নিকট কোন কথা শুনিয়া প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ নহে। লোক সামান্য বস্তু ক্রয় করিবার সময়

দেখিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে। যাঁহার নিকট সাধন গ্রহণ করিবে এবং যেরূপ সাধন লইবে, তাহা শাস্ত্র সদাচার সম্মত কি না, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শত শত সন্দেহ হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রহণের পর একটি একটি ঘটনা দেখিয়া, সন্দেহ উপস্থিত হইলে বিশেষ ক্ষতি হয়। এজন্য কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

(১৭) "আজকাল গুরুকরণ বড়ই সমস্যার বিষয় হ'য়ে পড়েছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাঁরা গুরু ছিলেন,—সব সিদ্ধ পুরুষই ছিলেন। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হ'লেই তাঁদের কুলগুরু বলা হ'ত। এখন কুলগুরু বল্‌তে লোকে বংশ-পরম্পরা গুরু বোঝে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁরা গুরুর কাজ করেন তাঁহারা প্রায়ই দীক্ষা প্রার্থীকে—স্বাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি (—শক্তি ভাবাপন্ন বা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন), বিচার না ক'রে, শুধু বংশের ধারা ধরে, সাধন দেয় বলেই অনেক অনিষ্ট হ'চ্ছে। কারণ সাধনভজন করে লোকে ফল না পাওয়াতে মন্ত্রের উপর, ক্রিয়ার উপর, এবং দেব-দেবীর উপর একটা অবিশ্বাস এসে পড়ছে। তবে কৌলিক গুরুর নিকট বিধিমত দীক্ষা, বা গুরুশক্তির কোন সাহায্য না পেলেও, অন্য কোন অনিষ্টের তেমন সম্ভাবনা নাই; বরং সাধনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও চেষ্টা থাকিলে ওতে উপকারই হয়; কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করায় বিষম বিপদ ঘটে।"

(১৮) "গুরু যে বস্তু তাতো এই দেহ নয়; এই দেহের ভিতর অন্য কিছু;—তাহা জড় নন্। ভগবান বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

(ভাঃ—১১।১৭।২৭)

(১৯) "গুরুর যে দেহ তাহা নিত্য,—তাহা এ দেহ নয়। এ দেহেরই ভিতরে ঠিক এইরূপই অন্য এক দেহ আছে,—তা সচ্চিদানন্দ-

রূপ,—তাহাই নিত্য; এই যে দেহ দেখ্‌ছ, এ তারই ছায়া। যেমন আয়নাতে মুখের ছায়া পড়ে, ছায়াটি ঠিক মুখেরই অনুরূপ, কিন্তু কোন বস্তু নয়, ছায়া মাত্র,—এই দেহও সেইপ্রকার। তাঁর এই ছায়ার দ্বারাই সেই রূপ ধর্‌তে হয়—অন্য উপায় নাই। এইরূপেরই ধ্যানদ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ-রূপ চোখে পড়ে। ছায়া না ধর্‌লে সে কায়া পাবে কি করে?" (ঐ—৪র্থ খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)

(২০) "অগ্নি ত সকল স্থানেই আছে; কিন্তু সে অগ্নি কি কেহ ধর্‌তে পারে,—না, তার দ্বারা কোন কাজ হয়? আগুনের আবশ্যক হ'লে, সর্ব্বত্র যে আগুন আছে, শূন্যে যে আগুন রয়েছে, তা হতে কেহ ইহা নিতে পারে না। প্রদীপ, ধুনী, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জ্বলন্তভাবে, বিশেষরূপে প্রকাশিত রয়েছে, সেইখানেই গিয়ে নিয়ে থাকে। সে রকম ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হলেও, কেউ তো তাঁকে ধর্‌তে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎশক্তির প্রকাশ দেখে, তথাই পূজা করতে হয়। গুরু তো আর মানুষ নয়—গুরুই ভগবান। গুরু-পূজাই —ঈশ্বরের পূজা।" (ঐ—৩য় খণ্ড, ৩৫ পৃঃ)

(২১) "গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে কোন দান-প্রতিদান নাই;—তাহা অমূল্য। তবে যদি কেহ অন্য সময়ে, বৃদ্ধ পিতা জ্ঞানে, বা অন্য অভিভাবক জ্ঞানে, কিম্বা পথের অন্ধকে দানের ন্যায়, দয়া করে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন; নতুবা গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপরাধী হ'ন। অতএব অন্যভাবে গুরুকে কেহ কিছু দিও না।"

(ঐ—৩য় খণ্ড, ২১৯ পৃঃ)

(২২) "...গুরু শিষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌লে, ভগবান গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু-শিষ্য একত্র হয়ে ক্রন্দন কর্‌লে, ভগবান প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা করেন। তখন শিষ্য গুরুকে কৃষ্ণের বামে দর্শন ক'রে সুখী হ'ন, গুরুও শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে সুখী হ'ন।" (ঐ—৩য় খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ)

(২৩) "সদ্‌গুরু লাভ হ'লেই সম্পূর্ণ নিরাপদ।"—"তিনজন্মে নিশ্চয়ই কর্ম্ম শেষ্ করাইয়া নেন্।"

"যতকাল অহঙ্কার আছে, পুরুষকার আছে, ততকাল 'গুরু কর্‌বেন', বল্‌লে চলবে না। নিজেরা খাট। নিজেরা না খাট্‌লে কিছুই হবে না। কেহ সাধ্যমত খাট্‌লেই গুরু তাহাকে সাহায্য করেন। গুরুর বাক্যই গুরু। গুরু যা বলে দেন, তাহা কর্‌লেই গুরুর কৃপা লাভ করা যায়।"

(ঐ—৪র্থ, ৪১ পৃঃ)

(২৪) "গুরুদত্ত বস্তুর উপরে, সাধনভজনের উপরে, কেহ অবজ্ঞা করিলে, মালাতিলক নিয়ে কেহ টানাটানি করিলে, গুরুনিষ্ঠা কেহ নষ্ট করিতে চেষ্টা কর্‌লে,—সে স্থলে বজ্রের ন্যায় কঠোর হ'তে হয়; তার প্রতিবিধান কর্‌তে হয়। আর তা নৈলে ব্যবহারে, 'সর্ব্বদাই পুষ্পের ন্যায় কোমল হবে',—এই ঋষিবাক্য।"

(২৫) "গুরু যেমনই হউন না কেন, শিষ্য অকপটে তাঁর সেবা-পূজা ও শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া এবং অবিচারে তাঁর আদেশ পালন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, এদেশে এর দৃষ্টান্ত বিরল নহে।"

(২৬) "আমাদের এ সাধনে কোনপ্রকার কল্পনা নাই। ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন্ রূপে, কখন্, কার্ নিকট প্রকাশ হ'বেন, কে বলিতে পারে? ভগবানের নাম কর। নাম কর্‌তে কর্‌তে যে রূপে তিনি প্রকাশ হবেন তাই ধরে নিবে। পূর্ব্ব হ'তে কোন রূপের কল্পনা কর্‌তে নাই।"

(ঐ—১৯৬ পৃঃ)

(২৭) ধ্যান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"ভগবানকে কে আর দেখ্‌তে পায়—গুরুই ভগবান। নাম কর্‌তে কর্‌তে গুরুর ভিতর দিয়া, ভগবানের অনন্তরূপ, অনন্ত বিভূতি, বিকাশ পেতে থাক্‌বে।" (ভগবান সদাশিব বলিয়াছেন—'ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ।')

(ঐ—১৯৭ পৃঃ)

(২৮) "নাম কর্‌তে কর্‌তে এমন অবস্থা হয় যে, শরীরের প্রতি-

রক্তবিন্দু, প্রতি অণু-পরমাণু, নাম করে। এ কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। এ অবস্থায় মহাত্মারা বস্ত্রদ্বারা দেহ আবরণ করিয়া রাখেন, গায়ে বিভূতি মাখেন। যেরূপ ধ্যান করা যায়, ধীরে ধীরে দেহটিও সেইরূপ হয়।"

(ঐ—২০০ পৃঃ)

(২৯) "গুরুতে বিশ্বাস হওয়া অতি কঠিন। বিশ্বাস হলেই, কার্য্য সিদ্ধ হয়।...বিশ্বাস হইবার একমাত্র পথ এই,—গুরু যাহা উপদেশ দেন, তাহা আচরণ করা। আচরণ করিতে করিতে, হৃদয়ের বিকাশ হইলেই বিশ্বাস হইবে।" (ঐ—৫ম খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

(৩০) "দীক্ষা সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যবস্থা।—প্রথমতঃ, বৈদিক নিয়মে...বেদজ্ঞ, সদাচারী, আশ্রমী,ব্রাহ্মণ,সদ্‌গুরু শব্দ বাচ্য।...(ইহাতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন) অন্য জাতির অধিকার নাই। দ্বিতীয়,—তান্ত্রিক তন্ত্রে চারিবর্ণের এবং সমস্ত বর্ণ-সঙ্কর মানুষের অধিকার আছে। তন্ত্র সাধনের তিনটি সোপান—পশু, বীর, দিব্য। এই ত্রিবিধ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া, যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থের সহিত মন্ত্র-চৈতন্য করিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধ-মন্ত্রের সহিত 'প্রণব' যোগ হইয়া থাকে! সিদ্ধ-মন্ত্রে যিনি সিদ্ধলাভ করিয়াছেন তিনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু, মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্ব্ববর্ণকে 'প্রণব'-যুক্ত মন্ত্র পদান করেন। তাহা সাধন করিলে নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তি লাভ করেন। সত্য, সত্য, সত্য—শিব বাক্য।"

(৩১) "শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে এক অবস্থা আসে, তাহাতে গুরুদর্শন হয়, এবং গুরুর মধ্যে নামের চৈতন্যরূপ দর্শন হয়। তখনই, গুরু ও ব্রহ্ম এক হইয়া যান। যাহাদের ঐরূপ অবস্থা ও দর্শন লাভ হয়, তাহাদের নিকট, গুরু—"ব্রহ্ম।" (ঐ—৫ম খণ্ড, ১২৩ পৃঃ)

(৩২) প্রশ্ন ঃ—কোন কোন স্ত্রীলোকও যে গুরু আছেন, তাঁরা দীক্ষা দিচ্ছেন, শুনতে পাই তাঁরা নাকি সিদ্ধা?

উত্তর ঃ—"তা দিন! তবে সিদ্ধাই হউন আর মহাসিদ্ধাই হউন,

ব্রহ্ম-বিদ্যালাভ কর্‌লেও নারীদেহ কখনও আচার্য্য হতে পারে না। গুরুর দেহ সর্ব্বদাই পবিত্র, তাঁকে সেবা করে, স্পর্শকরে, শিষ্য শুদ্ধ হ'ন। শাস্ত্র-কর্ত্তারা কোনও কোনও প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণে, 'স্ত্রী-শরীর স্বাভাবিকই অশুচি বলে গেছেন। ব্রাহ্মণীও তো যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্‌তে পারেন না, এখন যদি কেহ তাই করেন, কি কর্‌বে? শাস্ত্র-ব্যবস্থা ও অনুশাসন যাঁরা মানেন না, গ্রাহ্য করেন না, তাঁরা যা ইচ্ছে কর্‌তে পারেন। তাতে আর কথা কি?" (ঐ - ৩য় খণ্ড, ৩০২ পৃঃ)

অন্যত্র বলিয়াছেন—

(৩৩) "যদি স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হয়, তবে সেই গুরুবংশের কাউকে উপগুরু করে, তাঁর নিকট হ'তে সমস্ত পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা করে, পুরশ্চরণ কর্‌লে উপকার হয়;—ইহা দেশাচার; শাস্ত্রশাসন নয়।" (ঐ—৪র্থ খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)

(৩৪) প্রশ্ন :—যোগপন্থাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাবপ্রিয় ও কার্য্য-বিমুখ, একথা সত্য কিনা?

উত্তর :—"ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না…যে দেশের ঋষিরা কবি, ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্য লেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্ব্বিদ ও গণিত-শাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্র-বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থাপক ও রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপ-যোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি, মধ্য, অন্ত,—সেই দেশে যে আজ যোগ, তপস্যা ও আলস্য, এককথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক ব্যাপার কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাযোগীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া 'সংসার ও ধর্ম্ম যে একবস্তু', এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছেন; যে দেশের মহা-তাপসাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য, সকলেই জন সমাজের পরম কল্যাণ সংসাধনের জন্য আপন

আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; অদ্যাপি যে দেশের আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত কত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ....এই হতভাগ্য দেশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন ; হায় ! সেই দেশের লোক হইয়া, চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধের ন্যায় চীৎকার করিতেছি, যোগে আলস্য ও কর্ম্ম-বিমুখতা আনিয়া দেয় !—লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা !...যে মহাত্মা-গণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা যিশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদ, এই দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানব-মণ্ডলীকে পরিচালিত করিতেছে, তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া আজ যে আমরা ইংরাজদিগের যৌবন-সুলভ-চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগকে আলস্য মনে করিতেছি, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা কি হইতে পারে !

বস্তুতঃ যোগ আলস্য আনে না ; বরং ঠিক তার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম—এই তিনের এককালীন সামঞ্জসীভূত উন্নতিই যোগের ফল।...প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে, কার্য্য করিতেই হইবে। তবে কার্য্য সকলের একরূপ কখনই হইতে পারে না।...সকলকেই ধর্ম্মপরায়ণ যোগী হওয়া চাই, অথচ সংসারিক নানা কর্ম্মে বিভক্ত হইবে।......”

(যোগসাধন-প্রশ্নোত্তর—২৭ পৃঃ)

(২)

ভগবৎ-সাধনে শ্রীগুরু পদাশ্রয়ের অবশ্য কর্ত্তব্যতা অধিক বলিবার কিছুই নাই। কেননা জগতে এমন কোন ধর্ম্ম সাধক সম্প্রদায় নাই—কি বৈদিক, কি অবৈদিক, যাহাতে শ্রীগুরু-করণ স্বকৃত হয় নাই।

কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যে, অলক্ষিত ভগবৎ-কৃপা বশতঃ ভাগ্যবান জনেরই, ভগবদ্ভক্ত সঙ্গলাভ সংঘটন হয়। ঐ সঙ্গপ্রভাবে ভগবৎ

কথাদিতে রুচি হইতে থাকে ; তখন এই দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রাণে প্রবল ব্যাকুলতা আসে, এবং উপযুক্ত কর্ণধারের প্রয়োজন বোধ হয়। এই ভবসমুদ্র পারের কর্ণধার এবং শ্রীশ্রীভগবৎ পাদপদ্ম লাভের পথপ্রদর্শক যিনি,—তিনিই গুরু। শ্রীভগবানের করুণাই যেন ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ, গুরুরূপে জীবের পরম কল্যাণার্থে জগতে প্রকটিত হইয়াছে।

জগন্মঙ্গল সাধু-গুরুকে শ্রীভগবানের করুণাবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীভগবানের করুণা-ঘন অবতারই শ্রীগুরুবিগ্রহ বস্তুতঃ জগতের প্রতি শ্রীভগবানের করুণার প্রকাশ সাধু-গুরু দ্বার দিয়াই হয়। শ্রীভক্তিদেবীর রত্ন সিংহাসন—সাধু-গুরুর হৃদয়।

শ্রীগুরুর নিকট দীক্ষার তাৎপর্য্য,—শ্রীভগবানের সহিত শিষ্যের বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করা। শ্রীগুরুদেব করুণাপূর্ব্বক মায়ার বন্ধন শিথিল করিয়া ভক্তি-রস মাখাইয়া শিষ্যের আত্মাটিকে ভগবানের সমীপে নিবেদন করেন—ইহাই হইল দীক্ষা। গুরুকৃপাতে ভগবৎ-জ্ঞানের উন্মেষ হয়, এবং দীক্ষা মন্ত্র লাভে আত্মসমর্পণ হয় ও ভাবী পরমপুরুষার্থ ভগবৎ-সেবোপযোগী দেহ, মন বা প্রাণাদি লাভের উপযোগী ভগবৎ-কিঙ্করত্বের জ্ঞান উদয় হয়—ইহাই বিশিষ্ট সম্বন্ধ। এই দীক্ষা শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ, সদ্‌গুরুর নিকট গ্রহনীয়। যার তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিলে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না।

শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভজন-তৎপর ব্যক্তিই গুরু হইতে পারেন—"শাব্দে পরে, চ নিষ্ণাতং" (ভাঃ—১১।৩।২১)—'শব্দ ব্রহ্মের পরগামী এবং পরব্রহ্মে নিমগ্ন'—অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ও অপরোক্ষ অনুভবকারী মহাপুরুষ-গণই গুরু হইবার যোগ্য। তৎপর্য্য এই যে,—অনেকে শাস্ত্র জানেন ভজন করেন না। আবার কেহ বা ভজন করেন, শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।—উভয়ের মধ্যে কেহই গুরু হইবার যোগ্য নহেন। কেহ কেহ বলেন কুল-গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া, পরে কোন শাস্ত্রজ্ঞ

ভজন-নিপুণ ব্যক্তিকে শিক্ষাগুরু করিয়া শিক্ষা করিবেন। এই সিদ্ধান্ত কোন শাস্ত্র অনুকূল নহে।

প্রশ্ন :—সদ্‌গুরু কাহাকে বলা যায় ?

উত্তর :—'সত্তে', অর্থাৎ সাধু-ব্যক্তিতে, যে **'গুরুত্বের'** আবির্ভাব হয়, সেই স্থলেই সদ্‌গুরু শব্দ ব্যবহার হয়। এখানে দুইটি শব্দ—'সৎ' ও 'গুরু'। "সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ"—'সৎ' বলিতে সাধু ব্যক্তিকে বোঝায়। শুদ্ধ পরতত্ত্ব বিষয়ক সাক্ষাৎ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই এখানে সাধুশব্দের লক্ষ্য। ভগবানই একমাত্র পরতত্ত্ব, ভাগবত-গুণই প্রকৃত সদ্‌গুণ; ভগবৎ-জ্ঞান লাভই পরম সদ্‌গুণ লাভ। যিনি এই ভগবৎ-জ্ঞানলাভে সিদ্ধ হইয়াছেন তিনিই এখানে সাধু-শব্দের লক্ষ্য। সাধু দুই প্রকার—ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ ও ভগবদ্‌ভক্তি সিদ্ধ। ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানীই জ্ঞানমার্গে সিদ্ধ, আর ভগবৎপ্রেম প্রাপ্ত ভক্তই ভক্তিমার্গে সিদ্ধ। এই দুইপ্রকার সাধুশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে গুরুত্বের আবির্ভাব হইলেই এই উভয় ব্যক্তিই সদ্‌গুরু বলিয়া কথিত হয়েন। এই গুরুত্ব বলিতে সাক্ষাৎ-ভগবৎ-উপদেষ্টৃত্বই বুঝিতে হইবে। 'গু'—অন্ধকার: 'রু'—নিরোধক, বিনাশক। যিনি (জ্ঞান অঞ্জন দ্বারা) অজ্ঞান আঁধার বিনাশ বা দূর করেন, তিনিই—গুরু। ভগবদ্‌বিষয়ক উপদেষ্টাই গুরু। অতএব ব্রহ্মতত্ত্বানুভবী জ্ঞানী যদি ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেষ্টার স্তরে আরূঢ় হ'ন, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গে তাঁহাকেই সদ্‌গুরু বলা যায়। আর যিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি যদি ভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টার পদে আরূঢ় হ'ন, তাহা হইলে ভক্তিমার্গে তাঁহাকে সদ্‌গুরু বলা যায়।

শ্রীগুরুতে কোন প্রকার দোষদৃষ্টি শাস্ত্রে প্রবল নিষেধ থাকিলেও, গুরু যদি সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘনে তৎপর হইয়া, সাক্ষাৎ ভক্তি-বিরোধী মত প্রচার, বা আচার করেন, তাহা হইলে তাদৃশ আদেশ প্রতি-পালনে শিষ্য তটস্থ হইবেন,—অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন কি না, ইহাই মনে করিয়া উক্ত ভক্তি-বিরোধী আদেশ প্রতিপালন না

করিয়া, শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া কাতর প্রাণে নিষ্কপটে শ্রীগুরুচরণে সবিশেষ নিবেদন করিবেন। ইহাতে বিফল মনোরথ হইলে, ঈদৃশ গুরুকে দূর হইতে আরাধনা করিবেন। আর যদি গুরু গুরুতর বৈষ্ণব-দ্রোহী হ'ন, তাহা হইলে তাদৃশ গুরু ত্যাগের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। তবে এ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া চাই।

শ্রীগুরুতত্ত্ব একই। শিষ্যের নিজ নিজ গুরুবিগ্রহ ব্যষ্টিভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সমষ্টিভাবে সকলেরই গুরু এক। **এই সমষ্টি-গুরু ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার।** সমষ্টি-গুরুই জগতে নিজের ভাগবতী-ভক্তিময়ী-তনু প্রকট করিয়া ব্যষ্টি-গুরুরূপ ধারণ করেন। ভাগবতী-ভক্তি গুরুশক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া, জাগতিক জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠ হইয়া, জীবকে ভগবানের সন্নিকটে আকর্ষণ করে। সদ্‌গুরু করুণাশ্রয়ে দীক্ষার ইহাই রহস্য। শ্রীগুরুতে ভগবদ্‌-ভাবের অনুভব করাই দীক্ষার সাফল্য।

গুরুরূপে ভগবানের প্রকাশ বা আবির্ভাব এবং গুরু যে ভগবানের অবতার, তাহা একমাত্র তৎশিষ্য বক্তিরই অনুভব-বেদ্য, সর্ব্বসাধারণের বেদ্য নহে। সুতরাং শিষ্যের নিকটেই গুরুতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। অন্যত্র নহে, ইহাও গুরুরূপ অবতারের বিশেষত্ব।*

*__শ্রীগুরুর চরণে তুলসী অর্পণ__—ইহা লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে মতভেদ দৃষ্টহয়। শ্রীগুরু চরণে তুলসী না দেওয়াই গৌড়ীয়গণের অধিকাংশের অভিমত; পরন্তু, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রসিক বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিশিষ্ট ভাগবতগণ ভগবৎ-বুদ্ধিতে শ্রীগুরু-বিগ্রহ-চরণে, বা ঐ পটে, তুলসী অর্পণের পক্ষপাতী। সাধারণ গৌড়ীয়গণের এই বিচার যে,—নিজ নিজ গুরুদেব, তাঁহার শিষ্যের নিকট ভগবানের আবির্ভাব বলিয়া গণ্য হইলেও তিনি যখন দেহাশ্রিত অবস্থায় ভগবানের ভক্ত-আবেশে রহিয়াছেন, তখন তাঁহার চরণে তুলসী দেওয়া সমীচীন নহে এবং তিনিও ভক্তভাবে বিভাবিত অবস্থায় উহা কদাচ গ্রহণ করিবেন না—তবে তিনি যখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য, ভাব-সমাধি অবস্থায় অবস্থান করেন, সে সময়ের কথা স্বতন্ত্র। অপর পক্ষীয়গণ বলেন,—তিনি

(৩)

একটি রহস্যময় দীক্ষা

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত, একান্ত-গুরুনিষ্ঠ,

---

দেহস্থিত অবস্থায় উহা চরণে না গ্রহণ করিলেও, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিগ্রহে, বা পটাদিতে, ভগবৎ-বুদ্ধিতে তুলসী দিতে বাধা কি ?

এখন কথা হইতেছে,—শাস্ত্রে (শিববাক্য) শ্রীগুরুদেবকে—"গুরুরেব পরং ব্রহ্ম" বলা লইয়াছে এবং শ্রীভগবান নিজমুখে,—"আচার্য্য মাং বিজানিয়াৎ" (ভাঃ—১১।১৭।২৭) বলিয়াছেন। এমত অবস্থায় শিষ্য তার গুরু চরণে ভগবদ্-বুদ্ধিতে যদি তুলসী দেন, তাহাতে অযৌক্তিকতা দেখা যায় না। তবে, কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণ গুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধিই করেন, কিন্তু ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে ভগবৎ-প্রিয়ই ('মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ') মনে করেন, তিনি ভগবান হইতে পৃথক—উভয়ের মধ্যে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। ইহা বিভিন্ন সাধকের অনুভবের বা আস্বাদনের তার-তম্য মাত্র।

স্বয়ং ভগবান বৃন্দাবনে যশোদানন্দন রূপে বিরাজ করেন এবং গোপীগণ তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁহার চরণে তুলসী দান করেন না, এবং একারণ গোপী-অনুগত রাগানুগামার্গে ভজনকারী ভক্তেরও শ্রীকৃষ্ণের, বা তাঁহার অভিন্নাত্মা,—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'—(চৈ, চ,—১।১৪৯)—"একাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।" ঐ—১।১।৫), শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী দান করা এই হিসাবে সমীচীন নহে ; অথচ বিধি-মার্গের সাধকদের ভগবদ্-বুদ্ধিতে গোবিন্দচরণে তুলসী-অর্পণ,—ইহাই বিধি। আবার শ্রীরাধিকাচরণে তুলসী দান সম্বন্ধে গৌড়ীয়দিগের মধ্যে দুইপ্রকার মতই প্রচলিত।

মূল কথা, ভগবদ্বুদ্ধিতে শ্রীগুরুচরণে তুলসীদান অযৌক্তিক নহে ; তবে সাধারণতঃ গৌড়ীয়গণের মধ্যে উহা অনুমোদিত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহৎ-ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে গুরুদেব,—'সাক্ষাৎ ভগবান' এবং গুরুদেব—'ভগবদ্ভক্ত', এই উভয়বিধ উক্তির দ্যোতকতায় বহু বচন বর্ত্তমান ; এ কারণেই বিভিন্নপ্রকার ভজন প্রণালীর প্রবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

পরম শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের* মুখবিনির্গলিত দীক্ষা কাহিনী নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

১৯৫১ সালের শিবরাত্রির সময় আমার কাশীতে অবস্থিতিকালে, পূজনীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কয়দিন ধরিয়া, তাঁহার আবাসে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করবার সৌভাগ্য ঘটে। ঐ সময় তিনি স্নেহ-পরবশ হইয়া তাঁহার রহস্যময় দীক্ষা কাহিনী সবিস্তারে আমার নিকট বর্ণনা করেন।—

তিনি চিরদিন নিষ্ঠাবান ও আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী। হাইকোর্টে ওকালতি করার কালে. তিনি শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রবাবুর (যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত লিখিয়াছেন) সহিত একত্রে ঝামাপুকুর লেনে একটি ঘরে মাসিক ১৮৲ ভাড়ায় বসবাস করিতেন। ঐ সময় মহেন্দ্রবাবু নিয়মিত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের 'গুরুদেবাষ্টকং' স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকটি—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্ত-স্তথা ভাব্যত-এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥"

—অর্থাৎ, 'অখিল শাস্ত্রে যাঁহাকে 'সাক্ষাৎ হরি' বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সজ্জনগণ এইরূপ ভাবনাই করেন; কিন্তু যিনি 'প্রভোর প্রিয়,' সেই গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।'

—এই শ্লোকে, শ্রীশ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ গুরুদেব সম্বন্ধে, 'ভগবৎ অভেদ'; এবং 'ভগবৎ-ভক্ত' এই উভয়বিধ বাক্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই—সাধকগণের মধ্যে বিবিধ মতবাদ, ও বিভিন্ন প্রথার পূজার্চ্চেনা প্রবর্ত্তনের কারণ, বুঝিতে পারা যায়।

* শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীসতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের সুসন্তান, প্রথম স্বদেশী-যুগের (বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সময়ের) প্রসিদ্ধ দেশসেবক। [illegible]নি Dawn magazine প্রবর্ত্তক এবং সুপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল, অ[illegible]কুমার দত্ত ও মনোরঞ্জন ঠাকুরতা মহাশয়গণের সহকর্মী। ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীগো[illegible]মীপ্রভুর শিষ্য ও বিশেষ কৃপাপাত্র। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিয়মিত পত্র লিখিতেন।

পরমহংসদেবের সঙ্গ করিতেন এবং তাঁহার সাক্ষাতে শ্রীশ্রীকথামৃত গ্রন্থখানি লিখিতেন। তৎকালে শ্রীশ্রীনরেন্দ্রও (স্বামী বিবেকানন্দ) মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নিকট আসিতেন এবং সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত নানা শাস্ত্র আলোচনা ও শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সম্বন্ধে আলাপ করিতেন, কিন্তু তাহাতে তিনি তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হইতেন না, বা তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেন না। তিনি তখন পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র সকল বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুশীলন করিতেন এবং গুরুবাদের একান্ত বিরোধী ছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে মাতা ও ভগ্নীসহ ভবানীপুরে অবস্থিতিকালে, একদিন পাইখানাতে (তাহার খুব কোষ্ঠ-কাঠিন্য ছিল এবং পাইখানা করিতে অনেক সময় লাগিত) খুবউচ্চরবে,—আকাশ জুড়িয়া (horizon to horizon—ইহাই তাঁহার ভাষা), দৈববাণী শুনিতে পাইলেন —"ভগবান আছেন"। ইহা শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময় সহকারে, পুলকিত চিত্তে, সন্নিকটে বারান্দায় অবস্থিত মা ও ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ উচ্চধ্বনি তাঁহাদের কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই, তাহাতে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন এবং কোন যথার্থ সাধুর সন্ধান লইয়া, তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রাণে আকুলতা জাগায়, মহেন্দ্রবাবুর নিকট গিয়া সমুদয় মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন।—ভিতরে এই মনোভাব যে তিনি তাঁহাকে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের (তিনি তখন অপ্রকট হইয়াছেন) ভক্তগণের নিকটে, কাশীপুর বাগানে লইয়া যান। কিন্তু তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন,—তিনি তাঁহাকে একজন **"সাচ্চা সাধু"** দেখাইবেন বলিয়া, মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে, শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু তখন কতকগুলি শ্রোতাকে সাধারণ ভাবে উপদেশ দিতেছিলেন,—ইহা শুনিয়া তিনি কিছু মুগ্ধ হ'ন। তখন

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনবাবু শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর সহিত সতীশবাবুর পরিচয় করাইয়া দিয়া, সতীশবাবুকে কোন কিছু প্রশ্ন করিবার জন্য উৎসাহ দান করেন, তথাপি তিনি নীরব থাকেন। পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং তাহাতে তিনি এপ্রকার তন্ময় হইয়া যা'ন যে, রাত্রী ৮টা পর্য্যন্ত তাঁহার হুঁস থাকে না। তখন, 'সাধনের লোক ব্যতীত অপরের রাত্রে তথায় থাকিবার নিয়ম নাই,'—এই কথা রাখালবাবুর নিকট শুনিয়া তাহার হুঁস হয়। তখন গোস্বামীপ্রভুর ইঙ্গিতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিলে, তাহা পাইয়া তিনি বাটী চলিয়া আসেন এবং দৈববাণী শোনার পর হইতে যে আকুলতা আসিয়াছিল তাহার অবসান হয়। এই ঘটনার দুই মাস, আড়াই মাস পর পর্য্যন্ত, তিনি আর বিশেষ কিছু খবর লয়েন না। পরে এক বন্ধুর নিকট শুনিতে পা'ন, মনোরঞ্জন বাবুর-স্ত্রী মনোরমাদেবীর সমাধি হয়, এবং শুনিলেন যে, তাঁহার খুব অভাব-অনটন,—একমণ চাউল প্রার্থী। তখন তিনি ঐ বন্ধুকে উপস্থিত কোথাও ধার করিয়া লইতে বলেন, এবং মাসান্তে ৬০৲টাকা দিতে পারিবেন বলিলেন। ঐমাস হইতে South Suburban School এ Additional Teacher পদে তিনি ৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সপ্তাহে দুই দিন পড়াইতে হইত; বাকী সময় High-courtএ 'practice' করিতেন।

তিনি নাম গোপন করিয়া উপর্য্যুপরি তিন মাস উঁহাদিগকে ঐরূপ ৬০৲ টাকা হিসাবে দান করেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃত ভক্তকে সাহায্য করিলে, উহা ভগবানের নিকট পৌছায়। তখন ঐ সমাধি দেখিবার কোন আগ্রহ হয় নাই; পরে মনোরঞ্জন বাবুর বিশেষ অনুরোধে তিনি মনোরমা দেবীর সমাধি দেখিতে যান এবং পাঁচ ছয় দিন ঐরূপ দেখিয়া আসেন। তথাপি তিনি গোস্বামীপ্রভু, বা আর কোন মহাপুরুষকে গুরুকরণ করিয়া দীক্ষা লইতে বিশেষ নারাজ ছিলেন। তাহার তিনটি কারণ—

প্রথমতঃ—স্বার্থসিদ্ধির জন্য গুরু করিবেন কেন?

দ্বিতীয়তঃ—কাহার নিকট মস্তক বিক্রয় করিয়া, পরে যদি তাঁহার মন অপর কোন মহাপুরুষের প্রতি ধাবিত হয় তখন উপায় কি হইবে?

তৃতীয়তঃ—গুরু মনোনোয়ন করিয়া লইবার তাঁহার কি সামর্থ্য আছে?

যাহা হউক এইরূপ যখন মনের দোদুল্যমান অবস্থা তখন এক দিন, রাত ১০৷৷টার সময়, আহারের পর, যখন শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মনোরঞ্জনবাবু হঠাৎ আসিয়া বলিলেন, পরদিন সকাল ১০টার সময় তাঁহার গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা হইবে।—হঠাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া 'তাইত'; 'তাইত', এইরূপ অস্পষ্ট বলিয়া তিনি যেন অনেকটা হতভম্বের মত হইয়া গেলেন এবং 'হাঁ', 'না', কিছু না বলিয়া মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে বাহিরে আসিয়া, তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাস্তা পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু তীব্র চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার বহুক্ষণ যাবত কোন প্রকারে ঘুম হইল না, পরিশেষে একটু তন্দ্রার মত হইলে শুনিতে পাইলেন,—"তোমার এত ভাঙ্গা-জোড়া করার দরকার কি? তিনি তোমার গুরু হয়েন তো, যথা সময়ে কান-ধরিয়া লইয়া যাইবেন ও দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।"—ইহা শ্রবণ করিবার পর সুনিদ্রা হইল। মনোরঞ্জন বাবু প্রাতে ৮টার সময় আসিয়া হাজির। ইতিমধ্যে তিনি আবিষ্টের মত প্রস্রাব, বাহ্যে, স্নানাদি সমাধা করিয়া বসিয়াছিলেন। মনোরঞ্জন বাবু আসিলেই ঐরূপ আবিষ্টের মত কিছু বলিলেন।—সকাল হইতেই তাহার চোখ দুটা নীচু পানেই চাহিয়া রহিল, সামনাসামনি চাহিতে পারিলেন না। এমনি অবস্থাতেই তিনি মনোরঞ্জনবাবুর সহিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ১০টার সময় হাজির হইলেন। গোস্বামীপ্রভু তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দীক্ষা দিবার জন্য অপর ঘরে লইয়া [illegible] তথায় তাঁহাকে বসিতে বলিয়া গোস্বামীপ্রভু মাথা নীচু করিয়া বসিলেন, [illegible] গুলিতে তাঁহার মুখ ঢাকিয়া গেল—এই ভাবে ১০।১৫

মিনিট কাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন যেন Search light আলোর মত তাঁহার মাথায় আলো পড়িতেছে এবং তাঁহার শরীরের মধ্যে এক প্রবল শক্তির খেলা চলিতেছে।—তিনি যেন প্রথমে স্থূল শরীর এবং পরে সূক্ষ্ম শরীর হইতে বাহির হইলেন এবং এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল! অনেকক্ষণ পরে শরীরটা সুস্থ হইল এবং তখন বেশ সোজা-সুজি গোস্বামী প্রভুর মুখের দিকে চাহিতে সমর্থ হইলেন। তখন গোস্বামী প্রভু নাম ও প্রাণায়াম শিক্ষা দিলেন। তাহাতে প্রভূত আনন্দ লাভ হইল।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি গঙ্গাস্নান করেন কিনা গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা করায়, যখন জানিলেন তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিয়া বাসায় ফেরেন, তখন গোস্বামীপ্রভু বলিলেন,—'সূর্য্যোদয়ের পরে স্নান করিলেই চলিবে, বেশী ভোরে উঠিবার প্রয়োজন নাই।' 'ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে ভোরে স্নান করিতে বলিয়াছেন কেন?'—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—'উহাদের ঐরূপ প্রয়োজন আছে, আপনার নাই।' ইহার কিছুদিন পরে বলিলেন,—'আপনায় গঙ্গা স্নানের আর প্রয়োজন নাই, সকালে ঘরে স্নান করিবেন।'—(এই সময় হাঁটিয়া গঙ্গা স্নান করিতে তাঁহার বেশ কষ্ট হইত,—অবশ্য গোস্বামীপ্রভুকে তাহা তিনি কোন দিন জানান নাই।)

পরে একদিন গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কয় ঘণ্টা নাম করেন?'—উত্তরে, দশ ঘণ্টা নাম করি, শুনিয়া বলিলেন,—'এত প্রয়োজন নাই, দুই ঘণ্টা [illegible] আপনার চলিবে; প্রাণায়াম আর প্রয়োজন নাই।'—কাহাকে [illegible] ঘণ্টা, কাহাকেও [illegible] ঘণ্টা নাম করিতে বলিয়াছেন, [illegible] এত অল্প করিতে বলিলেন কেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, —'আপনার [illegible] অধিক প্রয়োজন নাই।'—ইহার কিছুদিন পরে প্রাতে বেলায় মাত্র আধ ঘণ্টা নাম করিতে বলিলেন; এবং কিছুদিন পরে নাম

করা বন্ধ করিয়া দিলেন !—নামে বেশ আনন্দ হইত, তাহা বন্ধ হইল। তখন নাম না করিলেও, সর্ব্বদা গোস্বামী-জীউর [illegible] অনুভব হইত ; কিন্তু তাঁহার উপর নির্ভরতা তখনও দৃঢ় হয় নাই।—এই সময় একবার দুই মাস বাটী ভাড়া দিতে না পারায় চাকরীর চেষ্টা করেন। চাকরীর স্থানে যাইতে উদ্যত হইলে, পূর্ব্ব রাত্রে গোস্বামী প্রভু স্বপ্নে দেখা দিয়া ঐরূপ ধৈর্য্য-চ্যুতির জন্য মৃদু ভৎর্সনা করেন এবং অচিরে ঐ টাকার ব্যবস্থা হয়।

তাঁহার দিবা-নিদ্রা অভ্যাস ছিল না। গোস্বামীপ্রভু উহা জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে দিবা-নিদ্রা যাইতে আদেশ দেন এবং তাঁহার কাছে শুইতে বলেন। তাঁহার নিরম্বু একাদশীর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু একাদশীর দিন ঐ বাসাতেই ফলাহার করিতে আদেশ দেন।

গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন যাইবার প্রাক্‌কালে একদিন বলিলেন,—'আপনাকে কিছুদিন চাকরী করিতে হইব।'—এই প্রস্তাবে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে পরিশেষে তাহাতে স্বীকৃত হয়েন ; কিন্তু নিজে ওজন্য চেষ্টা করিবেন না, কাজ জোগাড় করিয়া দিলে, অগত্যা করিবেন,'—এই সর্ত্তে। তখন ২০০৲ টাকা বেতনের একটি চাকরী জোগাড় হইলে তাহাতে যোগদান করিয়া, মাসে মাসে যাহা বেতন পাইতেন তাহা সমগ্র গোস্বামী প্রভুকে পাঠাইয়া দিতেন। তাহাতে গোস্বামী প্রভু কতকটা যেন অস্বস্তি বোধ করেন এবং কিছুকাল পরে ঐ কার্য্য হইতে তিনি অব্যাহতি পান।

[illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন,—এক বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন কদাকার সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন, [illegible] ভাঁহার নিকট মুক্তিলাভ করিবার জন্য মন্ত্র লইতে আগ্রহ প্র[illegible] গোস্বামীপ্রভুর [illegible]ন। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন এবং গোস্বামীপ্রভু [illegible] দীক্ষায় ফেলিলেন [illegible] ক্ষুব্ধ হইলেন।—অত[illegible] অভিযোগ করিলেন [illegible] তিনি নিজে [illegible] হইতো উহা দিতে পারিতেন, এবং [illegible] কদাকা[illegible]

পুল হইতে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দেন ও ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া দেন,”—এইরূপ প্রবাদ শুনিয়াছি বলায়, বলিলেন,—‘ঐ প্রবাদ ঠিক নহে, তবে মধ্যে মধ্যে তিনি টাকা পুকুরে ফেলিয়া দিতেন সত্য।’

প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন,—গোস্বামীপ্রভু পুরীর বিপুল দান ব্যাপারে শিষ্যদের নিকট হইতে টাকা প্রার্থী হয়েন এবং ঐ সময় চারদিনের মধ্যে হাজার টাকা পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রামে তাঁহার নিকট আদেশ আসে। তখন ঐ টাকা ধারের জন্য দুইদিন ধরিয়া হেমেন্দ্রবাবুর সহিত নানা স্থানে গমন করেন। পরিশেষে বিফল মনোরথ হইয়া রাত্রে বড়ই হতাশ হইলে ভিতর হইতে প্রেরণা আসে,—‘যাঁহার আদেশ তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন’। ইহাতে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েন এবং সুনিদ্রা হয়। পরদিন প্রভাতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঐ টাকার প্রতীক্ষায় বৈঠকখানায় অবস্থান করেন—সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এবং আহারের পরও ঐ ভাবে কাটাইলে পর, চতুর্থদিনে বেলা ১০ টার সময় অজিত বাবু মহাশয় ঐ হাজার টাকার জন্য তাঁহার ভগ্নীর (শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্ত্রীর) গহনা আনয়ন করিলেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কিছু উল্লাস হইল না। যেন সবই স্থির ছিল মনে হইল। তখন মণি মজুমদার মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনই ঐ গহনাগুলি বন্ধক দিয়া, তৎক্ষণাৎ ‘টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার’ করিয়া পুরীতে ঐ হাজার টাকা পাঠাইলেন। এজন্যও তাঁহার বিন্দুমাত্র উদ্বেগভাব হইল না; পরন্তু, সম্পূর্ণ নির্ভরতার ভাবই অনুভব করিলেন। অল্পদিন পরেই হঠাৎ [illegible] একটি পুস্তকের Copyright বিক্রয় করিয়া সহজেই [illegible]দিনা[illegible]কার শোধ হইল। [illegible]

প[illegible] একদিন গিয়া দেখিলাম তাঁহার [illegible] [illegible]স্কার [illegible] হাজার [illegible] করা [illegible] একেবারে [illegible] ফেলিলেন। [illegible] [illegible] অল্পমাত্র [illegible] না [illegible] ঋষিদের সম্মুখ [illegible]

[illegible]

(৪)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুরুতত্ত্বের বিচার

(১) 'যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥' ১।১।২৬

(২) 'গুরু কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥' ১।১।২৭

(৩) 'শিক্ষাগুরুকে তো জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥' ১।১।২৮

(৪) 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥' ২।২।৩০

(৫) 'শাস্ত্রগুরু আত্মরূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥' ২।২০।১০৮

(৬) 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায়, ভক্তি লতা বীজ ॥' ২।১৯।১৩৩

(৭) 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥' ২।৮।৩০০

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু স্তোত্রম্

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

[illegible]

[illegible] জীব[illegible] গুরোর্মূর্ত্তিঃ, পূজামূলং গুরোঃ পদং।
[illegible] গুরো[illegible]ক্যং[illegible] মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥

—xxxx—

[illegible] একটি [illegible] পরে [illegible]

মদীয় গুরু

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

সুস্পষ্ট তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৩য়, ১৬৪, ১৯০ পৃঃ)। এই ভাবে পূর্ণতম-স্বয়ং-ভগবান, 'যুগধর্ম্ম-পালক' রূপে এই সমগ্র কলিযুগ ভরিয়া থাকিবেন। (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৫ম, ১৭২ পৃঃ)

অধুনা তিনি সাক্ষাৎ ভাবে সদ্‌গুরু রূপে বিরাজ করিয়া, সেই অনর্পিত দুর্লভ প্রেমধন (যাহা তিনি প্রকট কালে, মাত্র সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ-ভক্তকে প্রদান করিয়াছিলেন), যোগ্য পাত্রে বিতরণ করিতেছেন।—ইহাই সর্ব্বশেষ, 'সর্ব্ব গুহ্যতম' সংবাদ।

আধুনিক যুগে দেখিতেছি, এই দু'একশত বৎসরেই সাধারণ মানবের জড় বিজ্ঞান-গবেষণার ফলে, যেন এক অভাবনীয় ভোগরাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে! নিত্যই নব নব তথ্য আবিষ্কার হইতেছে এবং তাহার ব্যবহার দ্বারা আমাদের ব্যবহারিক জগতের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রকার প্রতিনিয়ত কতইনা দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগের [illegible] আবিষ্কৃত হইতেছে;

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে এই বড় আক্ষেপ হয় যে, এই মাত্র দুই একশত বৎসরের জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে জগতে ভোগ-বিলাসের কি বিপুল সুবিধার আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার ফলে সারা দুনিয়াটা যেন একেবারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।—ইহার অধিক জগতে আর কিছু আছে তাহা যেন কাহাঁরও ভাবিবারই অবসর নাই! কিন্তু তাহার একটা কথা সর্ব্বদা মনে হয় যে,—সাধারণ মানবের ব্রহ্মচর্য্য নাই, তপস্যা [illegible], কেবল জড়-বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে যদি এত অল্প সময়ে ভোগ-রাজ্যের এত ভোগ্য-বস্তুর উদ্ভব সম্ভব [illegible] আমাদের দেশের, আর্য্য-প্রজ্ঞায়, চিৎ-রাজ্যের [illegible] তার [illegible] ও গবেষণার [illegible], আমাদের [illegible] জগতের যে অতিগুহ্য [illegible] তত্ত্ব তথ্য [illegible] ফল [illegible] এবং [illegible] সন্ধান পাইয়া [illegible] বলিয়া [illegible]

করিয়া গিয়াছেন, তাহা না জানি আধ্যাত্মিক রাজ্যে, চিৎ-জগতের [illegible] কত উপাদেয়, কত কল্যাণকর, এবং মোহমুক্ত-অন্তরাত্মার কত [illegible]। পৃথিবীর আর আর দেশের জনগণ এরূপ দুর্লভ সম্পদের অধিকারী নহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র ;—তাঁহাদের এই আপাতমধুর নশ্বর ভোগবিলাসে মুগ্ধ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে ; কিন্তু হায়! আমরা যে ঐ সকল ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের বংশোদ্ভব আর্য্যসন্তান বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি! তাঁহাদের অলৌকিক কঠোর সাধনলব্ধ ধনের,—তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যানুভূতির, উত্তরাধিকারী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি! এমত অবস্থায় তাঁহারাই একান্ত কৃপা-পরবশ হইয়া পরম স্নেহভরে আমাদেরই 'ভোগের' জন্য, যে সকল [illegible]-মাণিক্যের গুপ্ত ভাণ্ডার অতি যত্নসহকারে আমাদেরই জন্য রাখিয়া গেলেন, তাহা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবারও অবসর হইল না! হায়! আমাদের মত হতভাগ্য আর কে আছে! এতবড় সুদীর্ঘ জীবনটা কেবল পশুবৎ ভোগবিলাসে কাটাইলাম! কত ভাগ্যের ফলে পুণ্যভূমি, সাধনক্ষেত্র, ঋষি-মুনিগণের শ্রীচরণকমলাশ্রিত ভারতে, দুর্লভ মানব জনম লাভ করিলাম, এবং মহতের যথেষ্ট কৃপাও প্রাপ্ত হইলাম ;—ঐ মহাবৈদ্যের নিকট ভবরোগের মহৌষধও মিলিল ; কিন্তু, হায়! হায়! আলস্য বশতঃ তাহা পান করিবার অবসর হইল না!—যাহা একটু বা হইল, তাহাও আবার অনুপান-সহ না করায়, এবং কুপথ্য করার ফলে, কৈ, তাহাতে প্রাণের চরম পরম আকাঙ্খা তো মিটিল না,—এখন উপায় কি? এক্ষণে ভক্তগণের কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল।

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ ; এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইয়া আমার হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে-অবস্থিত, প্রিয়তমের সাথে মিলিবার জন্য 'পাথেয়'র সন্ধানে ব্যাকুল! না জানি কোন্ দুর্লভ [illegible] ফলে, সাধু-গুরু-গোঁসাই কৃপায়, ইতিমধ্যে দুইটি 'পাথেয়'

মিলিয়াছে! একটি,—পরমদয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপ্রত্যাশিত একখানি 'কৃপালিপি', যাহা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়টি— অলৌকিক ভাবে, এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর প্রত্যাদেশে, তৎ নির্দ্দেশিত স্থানে, ধারণাতীত ভাবে, শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহা কর্ত্তৃক এই নরাধম প্রণতজনের মস্তকে রাতুল চরণ দানে চিরদিনেরতরে অধমকে অঙ্গীকার! এক্ষণে আমি 'সর্ব্বশেষ দুর্ল্লভ পাথেয়'র জন্য একান্ত কাঙ্গাল। তাই আজ, যাঁহাদের সেবার্থে এই গ্রন্থখানি লিখিবার ক্ষুদ্র প্রয়াস, তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া, প্রসন্নমনে তাঁহাদের দুর্ল্লভ পদধূলি এই অভাজনের মস্তকে, দান করিয়া কৃতার্থ করুন, করযোড়ে তাঁহাদের শ্রীচরণে এই শেষ কাতর ভিক্ষা।

পদরজঃ প্রার্থী
দীন হীন কাঙ্গাল
প্রণতঃ শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার

পাত্র সূচী

এই পুস্তকের "নমুনা পুস্তিকা' সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় অভিমত

(১) প্রবর্ত্তক

(ভাদ্র, ১২৬০)

শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন—(প্রশ্নোত্তর-মালা)—শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশস্থান—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভবন—১০৯।১১-এ, হাজরা রোড, কলিকাতা।

ইহা একটী বৃহৎ গ্রন্থের স্থচনা। অংশবিশেষ নমুনা-স্বরূপ আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আর্য্য শাস্ত্রগুলি যে আকারে আমরা পাইয়াছি, তাহাতে এমন অনেক কথা ও কাহিনী, উক্তি ও ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা আধুনিক কালের শিক্ষিত মানুষের মনে পরস্পর-বিরোধী অথবা যুক্তি-বিরোধী বলিয়া প্রশ্ন বা খট্কা সৃষ্টি করে। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা না পাইলে, মনের স্বস্তি মিলে না, শাস্ত্রে অন্ধ-প্রত্যয় জন্মে না। গ্রন্থকার এইরূপ কতকগুলি প্রশ্ন গ্রহণ করিয়াছেন ও সাধু-গুরু-বাণীর আলোকে এবং যুক্তিবিচারের কষ্টিপাথরে কষিয়া ঐগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অহল্যার অভিসম্পাত, পঞ্চ কন্যার স্মরণবিধি, শম্বুকের শিরশ্ছেদন, বেদব্যাসের জন্ম ও ভ্রাতৃবধূগমন, যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন ও কুন্তীদেবীর পুত্রোৎপত্তি—এই শাস্ত্রোক্ত কাহিনীগুলির বিচার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ভগবদ্ভজন ও আর্ত্তসেবা অর্থাৎ ভক্তি বনাম কর্ম্ম এবং সত্যভাষণ ও আর্ত্ত-রক্ষা বিষয়েও লেখক আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের বিচার-পদ্ধতি, সূক্ষ্মদর্শিতা ও শাস্ত্র-মর্ম্মে অনুপ্রবেশ শক্তির পরিচয় দেয়। মীমাংসার মূল ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় ও তাঁহার স্ব-গুরু শ্রীশ্রী৺কুলদানন্দ মহারাজের উক্তি ও যুক্তি। এইরূপ বিচার-সূত্র নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য ও অভিনন্দনীয়।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য—গুরু-বাণী প্রচারের সঙ্গে শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবুদ্ধির জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য ভারতীয় শাস্ত্রানুরাগী ও সত্যান্বেষী চিন্তাশীল জনমাত্রের বিশেষ সমাদর লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব ও তাঁহার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিব। নমুনা বইখানির মধ্যে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণ দোষ চক্ষে পড়িল—আসল গ্রন্থে উহার সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

(২) দেশ

(২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬০)

শাস্ত্র-সংশয় নিরসন—(প্রশ্নোত্তরমালা)—শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভবন, ১০৯।১১-এ, হাজরা রোড, কলিকাতা।

পুস্তকখানি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। আংশিকভাবে ইহা আমাদের কাছে মতামত জানিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই অংশে ভগবৎ-ভজন ও আর্ত্তসেবা, অহল্যাকে অভিসম্পাত, অহল্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় কেন? শম্বুকের শিরচ্ছেদন, বেদব্যাসের জন্ম, যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন, দস্যুর নিকট সত্য গোপন, কুন্তী দেবীর পুত্রোৎপত্তি এই কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা রহিয়াছে। লেখকের বিচার ও বিশ্লেষণ ভঙ্গী বড়ই সুন্দর এবং যুক্তির সুসমীচীন বিন্যাসে তাঁহার পটুতা আছে। পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হইলে সংস্কারমুক্ত শাস্ত্র-নিষ্ঠিত উদারবুদ্ধি সমাজ জীবনে সম্প্রসারিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর দেহাশ্রিত অবস্থায় অলৌকিক ঘটনাবলী নিত্য সেবক, শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর ডায়েরীতে যথাযথভাবে লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীকালিদাস বিশ্বাস
সদ্‌গুরুসঙ্গ পাব্‌লিকেশনস্
১৪-বি, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,
শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং
২১৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ প্রথম খণ্ড ৩৲ (৫ম সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড ৩৲, তৃতীয় খণ্ড ৪৲, চতুর্থ খণ্ড ৩৷৹, পঞ্চম খণ্ড ৫৲,—একত্রে ৫ খণ্ড ১৭৲, হিন্দী প্রথম খণ্ড ২৲ ও দ্বিতীয় খণ্ড ৩৲।

আচার্য্য প্রসঙ্গ (শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ডায়েরী) —২৷৹; **উপাসনা তত্ত্ব** ৷৹

Brahmachari Kuladananda (Vol-I) Early Life and Training under Bijoykrishna By Dr. Benimadhab Barua, M.A., D.Lit (Lond.). Foreword By Dr. S. Radhakrishnan, Vice President, Indian Union—Rs. 5/-

৺জগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (গোস্বামী প্রভুর জীবনী), মূল্য ৫৷৹, গুরু শিষ্য সংবাদ মূল্য ২৲, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত, শ্রীঅমিয় কুমার সান্যাল প্রণীত, মূল্য ৩৲, শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন (প্রশ্নোত্তর মালা), মূল্য ৩৷৹ ও কাশীর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের যাবতীয় গ্রন্থাবলী ও ছবি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবীর ১৮″×১৪″ একরংয়ের ছবি, প্রত্যেকটির মূল্য ৸৹, শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ১৮″×১৪″ একরংয়ের চারি প্রকারের ছবি প্রত্যেকটির মূল্য ৸৹ ও ১৬″×১২″ রঙীন ছবির মূল্য ১৲, শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর বাণী ।৹, ছোট ছবি একরংয়ের (নানাপ্রকার) প্রত্যেকটির মূল্য ।৹

নিবেদনের শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	১১	ত্যজ্য	ত্যাজ্য
১৯	৯	কর্ত্তুর্ম্মহসি	কর্ত্তুমর্হসি
৩৮	২৫	বন্দোপাধ্যায়	ভট্টাচার্য্য
৪০	চিত্রসূচী	পৃষ্ঠা ১	পৃষ্ঠা ৭
৪১	২৪	অনাশক্ত	অনাসক্ত
৪৫	২৪	নির্দ্ধেশ	নির্দ্দেশ
৪৭	১৯	সেবাকক্ষা	সেবাকাঙ্ক্ষা
৪৮	২৬	৪১৫	৪১৪

মূলগ্রন্থের শুদ্ধিপত্র

৩	১৭	পক্ষ্যে	পক্ষে
৪	১৬	মাসসিক	মানসিক
৪	১৮	দেহত্মাবুদ্ধি	দেহাত্মবুদ্ধি
৮	৯	উর্দ্ধে	উর্দ্ধে
৮	১০	ঐ	ঐ
১১	২১	প্রীত্যর্থ	প্রীত্যর্থে
১৫	৮	সুধু	শুধু
১৭	১৩	মোহন্ত	মহান্ত
১৮	২০	এজন্ত	এজন্য
১৯	১৫	আচার্য্য	আচার্য্যং
২১	৫	কথাইতেই	কথাতেই
”	১১	তাহার	তাঁহার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১২	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
২৩	৮	ভাষন	ভাষণ
„	২৩	আশ্চর্যরূপ	আশ্চর্য্যরূপ
২৪	১০	সাত্বিক	সাত্ত্বিক
„	২১	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
২৮	৫	রুাচ	রুচি
৪১	১০	তাহাদিগগেক	তাহাদিগকে
৪৩	২৫	প্রমূখ	প্রমুখ
৪৪	২	অচরণের	আচরণের
„	৪	দ্র্যেনাচার্য্য	দ্রোণাচার্য্য
„	৮	অদ্ভূত	অদ্ভুত
৪৫	৭	কটুক্তি	কটূক্তি
„	৮	আনিত	আনীত
„	১৯	যথাবথ	যথাযথ
৪৬	১৪	করুণ	করুন
„	২১	নন্থোনুদ্ভূত	মন্থনোদ্ভূত
৪৭	২১	বিপর্যায়েণ	বিপর্য্যয়েণ
„	২৫	নিমিত্ব	নিমিত্ত
„	২৬	মুঢ়তা	মূঢ়তা
„	২৬	নিশ্চই	নিশ্চয়ই
৪৮	১৫	উদেশ্যে	উদ্দেশ্যে
„	১৭	পত্রনেত্র	পদ্মনেত্র
„	১৯	প্রজ্বলিতো	প্রজ্বালিতো
৪৯	২৪	কবিবে	করিবে
৫৭	৪	তুর্দ্দৈবরই	তুর্দ্দৈবেরই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮	২১	তাহাকে	তাঁহাকে
৫৯	৫	মহত্বেরই	মহত্ত্বেরই
৬১	২১	সয়তান	শয়তান
৬২	২৭	উঁহার	উঁহার
৮৪	৭	মৌনবস্থাকুলীন	মৌনাবস্থাকালীন
৯৪	৩	প্রশ্ন	(১৩) প্রশ্ন
১০২	১৪	ভূষত	ভূষিত
১০৩	১৫	যাদবগণেরর	যাদবগণের
”	১৭	মদগর্ধিবত	মদগর্ব্বিত
১০৪	১৮	গোস্বাম	গোস্বামী
১১০	২৫	সময়	সময়ে
১১৩	১২	প্রস্দ্ধি	প্রসিদ্ধি
১৩২	[illegible]	বাসনাপন্ন	ব্যসনাপন্ন
১৩২	২৭	কটক্তি	কটূক্তি
১৩৭	৯	করজোড়ে	করযোড়ে
১৪২	৮	পুতনা	পূতনা
”	১০	ধাত্র্যচিত	ধাত্র্যচিত
১৫৭	৬	অত্যাধিক	অত্যধিক
১৬০	২৭	কৃৎনশঃ	কৃৎস্নশঃ
১৬৫	২৭	বিভূসক্তির	বিভুশক্তির
১৬৯	১১	হয়	নয়
১৭৬	৫	স্নানাস্তে	স্নানান্তে
১৮২	২	প্রশ্ন	(১৯) প্রশ্ন
”	৯	পুণ্যাত্মা	পুণ্যাত্মা
১৮৪	২৭	ইহকে	ইহাকে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৭	২২	ফরাসি	ফরাসী
১৮৯	২	প্রশ্ন	(২ঃ) প্রশ্ন
১৯৫	২৬	বাইতেছে	যাইতেছে
২০০	৮	যে	যে
২০৪	২৪	করিরাছেন	করিয়াছেন
২০৭	১৯	প্রশ্ন	(২১) প্রশ্ন
২০৮	৩৫	Ghandi	Gandhi
২১৬	৯	Nibedita	Nivedita
২১৭	২	ডুলভ	ডুর্লভ
২১৮	২০	যাঁহরা	যাঁহারা
২১৮	২৩	প্রভৃাত	প্রভৃতি
২২৫	১৪	হাপ	হাঁপ
২২৫	১৫	ব্যধি	ব্যাধি
২২৯	৯১	সাধনাশক্তি	সাধনশক্তি
২৪২	২২	ভাক্ত	ভক্তি
২৫০	১৪	রুচি	রুচিঃ
২৫২	২৪	হরেনামৈব	হরের্নামৈব
২৫৫	২৫	জীবনীভে	জীবনীতে
২৬৫	১৫	ভগবদর্পিত	ভগবদাপিত
২৬৫	১৮	যদাস্নাসি	যদশ্নাসি
২৭৮	১৫	অনুখানি	অনুমানি
২৮০	২৭	এইবায়	এইবার
২৮১	২০	করযায়	কড়চায়
২৯২	১	১৯২	২৯২
২৯৯	১৫	দ্বেয	দ্বেষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	২২	চন্দ্রাবলি	চন্দ্রাবলী
২৯৪	২৫	ভর্ৎসন	ভর্ৎসনে
২৯৫	১	অস্বাদনের	আস্বাদনের
২৯৬	১৬	তাৎপর্য	তাৎপর্য্য
২৯৮	২৭	প্রয়	প্রিয়
৩০০	৪	ভুলিয়া	তুলিয়া
৩০৩	১৪	মোগমায়া	যোগমায়া
৩০৭	২৪	স্বতন্দ্র	স্বতন্ত্র
,,	২৫	মূর্ত্তি	মূর্ত্তিতে
,,	২৬	মুর্ত্তিতেই	মূর্ত্তিতেই
৩০৮	১১	মুর্ত্তি	মূর্ত্তি
৩০৮	১৫	কত্থপি	যত্থপি
৩০৯		অন্তর্মুখা	অন্তর্মুখী
৩১২	১১	বাঞ্ছস্তি	বাঞ্ছন্তি
৩১৫	১০	শ্রীঞ্চষ্ণের	শ্রীকৃষ্ণের
,,	২৪	সেবপরায়ণা	সেবাপরায়ণা
৩২২	৪	সপ্রমান	সপ্রমাণ
,,	৫	দিব্যেন্মাদ	দিব্যোন্মাদ
৩২৫	১৩	বাণকবৃত্ত্য	বণিকবৃত্ত্য
,,	১৫	দাঁড়াইয়াছ	দাঁড়াইয়াছে
৩২৬	১২	চারদন্ত	চারিদন্ত
৩২৭	২৪	মধ্য শোভা	মধ্যে শোভা
৩২৭	২৭	নিবৃত্তমার্গ	নিবৃত্তিমার্গ
৩২৯	১৫	হইার	ইহার
,,	১৮	রাসাস্বদন	রসাস্বাদনে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩৯	১৮	অখিলবসামতমূত্তি	অখিলরসামৃতমূর্তি
,,	২৩	শৃঙ্গায়র নরাজময়	শৃঙ্গার রসরাজময়
৩৪১	১০	তলনাই	তুলনাই
,,	১৫	রসে	রসের
৩৪৩	১২	গোপীদিপের	গোপীদিগের
৩৪৫	১৭	করিরা	করিয়া
৩৫২	১৬	তাঁহার	তাঁহারা
৩৫৮	১৩	পরিবেপন	পরিবেশন
৩৫৯	২২	আমার	আমরা
৩৬০	৮	হইয়াছে	হইয়াছ
৩৬৫	২৬	কারয়া	করিয়া
৩৬৬	১৪	মৃত্তিমান	মূর্ত্তিমান
৩৬৬	২৫	পয়মানন্দ	পরমানন্দে
৩৬০	১২	আপততঃ	আপাততঃ
৩৭১	২৭	প্রতিবিম্বের	প্রতিবিম্বের
৩৭২	১৬	আলুলায়িত কেশ	আলুলায়িত-কেশ, শ্লথ
৩৭২	১৭	প্রাতিবদ্ধ	প্রতিবদ্ধ
৩৭৩	৫	হইয়ছে	হইয়াছে
৩৭৬	২৬	অনাশক্তভাবে	অনাসক্তভাবে
৩৭৭	১৯	উত্তর	উত্তর
৩৭৮	২০	দয়ায়	দয়ার
৩৭৯	১৭	অন্তর্গভ	অন্তর্গত
৩৭৯	২০	পাশ্বেই	পার্শ্বেই
৩৮১	২	ব্রহ্মমূহুর্ত্ত	ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত
৩৮৩	৯	ধার	ধীর

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮০	১৫	বাসলীলায়	রাসলীলার
৩৮১	৭	ষথাযথ	যথাযথ
৩৮২	১৩	কৃপায়	কৃপার
৩৮৪	৩	বস্তুঃ	বস্তু
৩৮৫	১৬	জানাইতেছ	জানাইতেছি
৩৮৬	২১	অপেনাকে	আপনাকে
৩৮৭	১০	পাবেমা	পারেনা
”	”	মিশ্চয়	নিশ্চয়
৩৮৯	৮	বৃথা সময় নষ্ট	পরনিন্দা
”		“আত্মার ··নিযুক্ত থাকেন” বিলুপ্ত হইবে	
৩৮৯	২১	কল্যণকর	কল্যাণকর
৩৮৯	২৪	করোই	কারোরই
৩৯২	২০	পরিমান	পরিমাণ
”	২১	কারিয়া	করিয়া
৩৯৩	৩	নিজে	নিজের
৩৯৪	২১	শাস্ত্র মহাজন	শাস্ত্র ও মহাজন
৩৯৬	১৩	সে রকম	সেইরকম
৪০০	১৮	সংসারিক	সাংসারিক
৪০০	২১	এমন	এখন
”	২২	স্বকৃত	স্বীকৃত
”	২৭	সংঙ্ঘটন	সঙ্ঘটন
৪০১	২৪	তৎপর্য্য	তাৎপর্য্য
৪০৫	২৫	গৌড়ীয়দিগের	গৌড়ীয়গণের
”	২৪	অনুমোনিত	অনুমোদিত
৪০৫	২২	পূজর্চ্চেনা	পূজার্চ্চনা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০৬	২৬	শ্রোতকে	শ্রোতাকে
৪০৮	৫	মনোনোয়ন	মনোনয়ন
৪১০	১৪	হইব	হইবে
৪১১	১১	আপামি	আপনি
৪১১	২৭	অববিত্র	অপবিত্র
৪১২	১৩	দ্বিপ্রহার	দ্বিপ্রহর
”	১৫	টাকায়	টাকার
৪১৫	১৭	প্রত্যাবৃক্ত	প্রত্যাবৃত্ত
”	১৮	নহে	নহেন
”	২০	উপার	উপায়
”	২১	প্রবচেণ	প্রবচনেন
”	২২	মেধমা	মেধয়
৪১৬	১৬	দিব্যোন্নাদ	দিব্যোন্মাদ
”	২১	এক্ষনে	এক্ষণে
৪১৮	৬	অধূনা	অধুনা
৪২২	২৭	(মহর্ষি)	মহর্ষি
৪২৩	৬	নারান	নারাণ
৪২২	১৪	(৫০)	(৩০)
(কৃপালিপি)		৩১৫	সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে
ঐ		৩১৩	ঐ